প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

জ

ট

ত

দ

ধ

ন

প

ব

ল

শ

স

হ

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

৫

মাসানুক্রমিক সূচী।

বৈশাখ।

জ্যৈষ্ঠ।

আষাঢ়।

শ্রাবণ।

ভাদ্র।

আশ্বিন।

কার্ত্তিক।

অগ্রহায়ণ।

পৌষ।

মাঘ।

ফাল্গুন ও চৈত্র।

চিত্র সূচী।

রাণী ভবানী।

প্রথম পরিচ্ছেদ—বংশাবলী।

রাজসাহী প্রদেশে ছাতিনগ্রাম নামে একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রাম ছিল। গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নহে,—কিন্তু এখন আর সেকালের শ্রী সৌভাগ্য কিছুই নাই। চারি দিক বন জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কেবল স্থানে স্থানে দুই চারিটি পুরাতন দীঘি পুষ্করিণী এবং কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ পূর্ব্বগৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে! গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস যে, সেকালে এক জন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা এই গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেন। সে রাজ্যের কোন চিহ্ন নাই ; সে রাজবংশেরও কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না ;—তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সেই হিন্দুরাজ্যের নাম সপ্তপর্ণগ্রাম ছিল, তাহাই এখন ছাতিনগাঁ নামে পরিচিত হইয়াছে।

নবাবী আমলে ছাতিনগাঁর চৌধুরীবংশের সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল, গ্রামের অবস্থাও কথঞ্চিৎ ভাল ছিল বলিয়াই শুনিতে পাওয়া যায়। তৎকালে আত্মারাম চৌধুরী নামে এক জন ধনাঢ্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। এখনও স্থানে স্থানে আত্মারামের উচ্চ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে এখন আত্মারামের কথা ভুলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু আত্মারাম-দুহিতা রাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাঙ্গালীর সাহিত্যে, ইতিহাসে, কবিতায় এবং জনশ্রুতিতে নিশিত হইয়া, সকলের নিকটেই চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

যেখানে রাণী ভবানীর জন্ম হয়, সেই স্থানটি এখন কতকগুলি অযত্নসম্ভূত লতা গুল্মে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। ভবানী নিজ জন্মস্থানের পুণ্যভূমি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার উপর এক রমণীয় দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে মাতার নামানুসারে জয়দুর্গা নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জন্মভূমির উপর চিরদিন দেবার্চ্চনা হইবে বলিয়া রাণী ভবানী জয়দুর্গার নিত্যপূজা ও

মহোৎসবাদির জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গণের সম্মুখে জয়দুর্গার মন্দির, মন্দিরের পার্শ্বে রন্ধনশালা, এবং প্রবেশপথে সুগঠিত তোরণযুক্ত সিংহদ্বার গঠিত হইয়াছিল। সেই তোরণশিরে বসিয়া প্রভাতে সায়াহ্নে বৈতালিকগণ সুললিত রাগ রাগিণীতে জয়দুর্গার জয়গান করিত, সশস্ত্র প্রহরী প্রহরে প্রহরে সদর্পে পাদচারণ করিয়া বেড়াইত, এবং উৎসবসময়ে তোরণ-দ্বারে ধূম-জ্যোতি বিকীরণ করিয়া ভবানীর কামান থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিত। এখন সে সৌভাগ্যগর্ব্ব জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে; জয়দুর্গার মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; সেই ভগ্নাবশেষের উপর লতাগুল্ম দেহ বিস্তার করিয়াছে; একখানি পর্ণ-কুটীরে জয়দুর্গা আশ্রয় লাভ করিয়া নিত্যপূজা গ্রহণ করিতেছেন। দীঘির জল মসীমলিন হইয়া উঠিয়াছে; সিংহদ্বার ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়াছে; লতাবিতানে মুখ লুকাইয়া ইষ্টকস্তূপের মধ্যে ভবানীর কামান জরাজীর্ণকলেবরে কালাতিপাত করিতেছে। সকলই শ্রীহীন হইয়াছে,—কিন্তু তথাপি সেই পুণ্যভূমির ধূলিমুষ্টির সহিত রাণী ভবানীর পুণ্যস্মৃতি যেন জীবন্তভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে!

যে সময়ে পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্য পরমুখ-প্রত্যাশী বিলাস-লোলুপ নামসর্ব্বস্ব দিল্লীশ্বরের কুক্ষিচ্যুত হইতেছিল; যখন বাহুবল এবং ষড়যন্ত্রই সমুদায় রাষ্ট্রনীতির অদ্বিতীয় মীমাংসক হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহাবিপ্লবকালে জন্মগ্রহণ করিয়া, সম্পদে বিপদে নানা ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়াও রাণী ভবানী অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল রাজসাহীর বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় যে সকল পুণ্যকীর্ত্তির সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা অল্পদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইতেছে।

আজ কাল "রাজসাহী" বলিতে যত ছোট খাট একটি জেলা বুঝায়, সেকালে তাহা বুঝাইত না। সেকালের রাজসাহীরাজ্য পরিদর্শন করিয়া এক জন ইংরাজ * লিখিয়া গিয়াছেন যে, "গত শতাব্দীর মধ্যভাগে রাণী ভবানীর অধিকৃত রাজসাহীর বিস্তৃত রাজ্য ভ্রমণ করিয়া আসিতে ৩৫ দিন সময় লাগিত। সেই বিস্তীর্ণ জনপদের বার্ষিক আয় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, তাহা হইতে বৎসর বৎসর ৭০ লক্ষ টাকা নবাব-সরকারে রাজকর প্রদান করিতে হইত।" আর এক জন অনুসন্ধাননিপুণ সমসাময়িক ইংরাজ লেখক বলেন যে,

* Holwell.

"বঙ্গদেশে,—এমন কি সমুদায় ভারতবর্ষে, রাজসাহীর মত এত বড় জমিদারী আর কোথায়ও ছিল কি না সন্দেহ। ইংরাজ কুঠিয়ালদিগের অধিকাংশ পণ্য-দ্রব্য এবং অত্যুৎকৃষ্ট রেশম এই জমিদারীর মধ্যেই উৎপন্ন হইত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও রাজসাহী, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, যশোহর, বীরভূমি ও বর্দ্ধমানের অধিকাংশ জনপদ এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজ-শাসনের আরম্ভ-সময়ে রাজসাহীর আয়তন ১২৯০৯ বর্গমাইল স্থিরীকৃত হইয়াছিল।" *

নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা রামজীবন এই বিস্তৃত রাজ্যের প্রথম রাজা, এবং তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া পুত্রবধূ মহারাণী ভবানী সেই বিখ্যাত রাজবংশের উজ্জ্বল রত্ন। নাটোর রাজবংশের সে বিস্তৃত রাজ্য আর নাই, কালক্রমে তাহা সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু রাণী ভবানীর বংশধর বলিয়া, কি স্বদেশে কি বিদেশে, তাঁহাদিগের পদগৌরব ও রাজসম্মান এখনও অটুট রহিয়াছে।

পৃথিবীতে কাহারও চিরদিন সমান যায় না। অধঃপতিত বাঙ্গলাদেশেরও এক সময়ে গৌরবের দিন আসিয়াছিল। সেই গৌরবের দিনে, শতসৌধ-বিভূষিত গৌড়নগরীর উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া, পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ কাশী কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। সে গৌরবের দিন চলিয়া গিয়াছে;—আছে কেবল দুই চারিখানি জরাজীর্ণ প্রস্তর-ফলক; তাহাই লইয়া স্বদেশ বিদেশের পরিব্রাজকগণ শ্মশানভস্মের মধ্যে অতীত-গৌরবের বিলুপ্তকাহিনীর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

অনুসন্ধান-নিপুণ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অনুমান ১০৪০ খৃষ্টাব্দ বা তৎ সমকাল হইতে পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি বিগ্রহপালকে পরাজয় করিয় হিন্দুধর্ম্মানুরাগী আদিশূর বাঙ্গলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। †

---

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র-বিশারদগণও বলিয়া থাকেন—

"সকল-গুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
হুতবহ-সমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥
তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপাল-বংশং
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস।
আগত্য গৌড়ং নৃপতেরনুজ্ঞয়া নাম্না বরেন্দ্রং বহুশস্যযুক্তং
আশ্রিত্য দেশং খলু বিপ্রবর্য্যা বাসং প্রচক্রুর্বহুমানযুক্তাঃ॥"

আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবেদাঙ্গপারগ যে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশ্যপ-গোত্রীয় সুষেণ মুনি এক জন। নাটোর রাজবংশীয়গণ এই সুষেণবংশের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

আদিশূরের পরবর্ত্তী সময়ে প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রশূরের শাসনকালে, বাঙ্গলাদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্ব্বে করতোয়া,—এই দুই নদীর মধ্যস্থ স্থান বরেন্দ্রশূরের নামানুসারে বারেন্দ্রভূমি বলিয়া পরিচিত হয়। স্বনামখ্যাত বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থানের নামানুসারে রাঢ় ও বারেন্দ্র আখ্যা প্রদান করেন। সেই সময়ে সুষেণের অধস্তন অষ্টম পুরুষে স্বর্ণরেখ ও ভবদেব নামে দুই ভাই বর্ত্তমান ছিলেন; স্বর্ণরেখ ও তাঁহার সন্ততিগণ বারেন্দ্রদেশে বাস করিতেন বলিয়া বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মণদিগের আচার ও চরিত্রগত পার্থক্য দেখিয়া বল্লালসেন তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদার নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই মর্য্যাদানিরূপণের সময়ে কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ-বংশের ক্রতু ও মতু নামে দুই ভাই রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বাসগ্রামের নামানুসারে ক্রতু ভাদুড়ী ও মতু মৈত্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাটোর-রাজবংশধরগণ সেই মৈত্র-বংশের সন্তান।

বল্লালসেনের সময়ে মতু ও তাঁহার সন্তানগণ কুলীন-পদবী লাভ করিয়াছিলেন। মতুর বংশে সুষেণের অধস্তন ষোড়শ পুরুষে কেশব মৈত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কুলীন বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র জীবর মৈত্রেয় চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর "উপকারের করণে" লিপ্ত হইয়া কুলচ্যুত হন। * একবার কুলচ্যুত হইলে আর কেহ কুলীন হইতে পারেন না; সুতরাং জীবর-মৈত্রেয়ের বংশধরগণ আর কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। নাটোর-রাজবংশধরগণ এই জীবর মৈত্রেয়ের বংশজাত।

বল্লালী আমলে বাসগ্রামের নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের "গাঁই" অর্থাৎ পদবী নির্ণীত হইত। নবাবী আমলে নিত্য নূতন পদবীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। যাঁহারা মুসলমানসরকারে কোনরূপ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ নানাবিধ যাবনিক উপাধি লাভ করিয়া আজিও তাহা গৌরবের সহিত বহন করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান রাজ্য আর নাই;—কিন্তু রায়, চৌধুরী, মজুমদার, খাঁ, মুন্সী, সরকার প্রভৃতি মুসলমান-

---

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দত্ত উপাধি এখনও হিন্দু মুসলমানে সমভাবে বহন করিয়া আসিতেছেন। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া জীবর মৈত্রেয়ের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে কামদেব মৈত্রেয় "সরকার" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই কামদেব সরকার নাটোর রাজ-বংশের আদিপুরুষ।

কামদেব সরকার পুঁঠিয়াধিপতি নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে পরগণে লস্করপুরের অন্তর্ভুক্ত বারইহাটী গ্রামের তহশীলদার ছিলেন। সেই কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদাই পুঁঠিয়ার রাজধানীতে গমনাগমন করিতে হইত। পুঁঠিয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন; তাঁহাদের বংশগৌরবের উপযোগী পুণ্যকীর্ত্তিরও অভাব ছিল না। তৎকালে পুঁঠিয়া বিদ্যাশিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিয়াছিল; রাজানুকম্পায় বিবিধশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তথায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া অকাতরে বিদ্যাদান করিতেন। কামদেবের তিন পুত্র রাম-জীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম পুঁঠিয়ার রাজধানীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন।

মধ্যমপুত্র রঘুনন্দন বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রতিভাশালী শাস্ত্রবিশারদ রাজ-মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত। রঘুনন্দন অতি অল্পবয়সেই সেই প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তিনি রাজানুকম্পায় সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া অতি অল্পবয়সেই পুঁঠিয়ার রাজসরকারে এক জন ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ কার্য্যকুশল রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

প্রতিভার সঙ্গে জনশ্রুতির চির-সংস্রব। রঘুনন্দন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবনের সম্বন্ধেও একটি কৌতুকাবহ অলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, রামজীবন ও রঘুনন্দন পুঁঠিয়ার রাজসরকারে দেবপূজকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক দিন রাম-জীবন শ্রান্তদেহে পুষ্পোদ্যানে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা আসিয়া দেখিলেন যে, এক বিষধর কালসর্প ফণাবিস্তার করিয়া রামজীবনকে রৌদ্র-তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা রাজ্যলাভের পূর্ব্ব-সূচনা বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল; রাজা সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, রামজীবন ও রঘুনাথকে ডাকাইয়া, অতি সংগোপনে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে এইরূপে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, কালে তাঁহারা রাজা হইলে যেন পুঁঠিয়ার রাজ্যে কখনও হস্তক্ষেপ না করেন। এই জনশ্রুতির মূল্য কি, কবে কোথা হইতে কোন্ সূত্রে ইহার উৎপত্তি,—তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য

ইতিহাস নাই ; লোকমুখে ইহা এতই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে যে, নাটোর রাজবংশের কাহিনী লিখিতে গিয়া বাঙ্গালী লেখকমাত্রেই এই অলৌকিক জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহীর রাজাদিগের পরিচয় দিতে গিয়া স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতা রিভিউ পত্রে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহার উল্লেখ আছে ; কিন্তু তিনি রামজীবনের পরিবর্ত্তে রঘুনন্দনের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *

এই জনশ্রুতি কালে ইতিহাসেও স্থান লাভ করিয়াছে ; কিন্তু সকল স্থলেই "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। এক জন তহশীলদারের পুত্রকে উত্তরকালে রাজ্যলাভ করিতে দেখিয়া, ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা বা কার্য্যকারণশৃঙ্খলার যথোপযুক্ত বিচার না করিয়া কল্পনা-লোলুপ জনসাধারণ যে রামজীবন ও রঘুনন্দনের সম্বন্ধে দুই চারিটি জন-শ্রুতির সৃষ্টি করিবে, তাহা একেবারে অসম্ভব নহে।

রামজীবন ও রঘুনন্দন যখন বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মহাবিপ্লবের সূচনা হইতেছিল। তখন আরঙ্গজীব বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন,—চারি দিকে তাঁহার বাহুবল ও ততোধিক কূটবুদ্ধির অপূর্ব্ব কৌশলের প্রকাশ্য অভিনয় আরব্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাদশাহ আরঙ্গজীবের নাম অনল

---

* "Raghunandana was employed in the Putiya family. He at first served in an humble capacity, but he subsequently rose to power and affluence, partly through the influence of that family, and partly through his own intelligence, cunning and unscrupulousness. It was originally his business, as we have already stated, to gather flowers for the Puja of the family idois. Tradition says that on one occasion while he was employed in this vocation, he was fatigued and fell asleep in a garden, and a snake was observed to spread its hood over his head to protect him from the scorching sun. This circumstance being reported to Darpanarain Rai, the head of the Putiya family, he was surprised at it, and predicted from it the future greatness of Raghunandana. He sent for Raghunandana, assured him that he would de a great Raja and extorted from him a promise not to dispossess his family by fair or foul means, of the Pergana Lashkarpore."—The Rajas of Rajshahi.

অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কঠোর শাসনের সহস্র নিদর্শনে ভারত-বর্ষের হিন্দুতীর্থগুলি আজিও পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; আজিও বারাণসী, বৃন্দাবনের হিন্দু দেবমন্দিরের উন্নত ভিত্তির উপর আরঙ্গজীবের উচ্চ মসজেদ্-চূড়া তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে।

আরঙ্গজীব ধর্ম্মান্ধ হইয়া যে সকল মর্ম্মপীড়ায় হিন্দুহৃদয় দলিত করিয়াছিলেন, লোকে তাহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি যে উপায়ে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেই সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য অসি-হস্তে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনের জন্য তাঁহার কলঙ্ক-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। বৃদ্ধ পিতা সাহজাহানকে নিরপরাধে অন্যায়-কৌশলে আগ্রা দুর্গের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃসন্তানদিগের তপ্তশোণিতে সন্তরণ করিতে করিতে বাদশাহ আরঙ্গ-জীব ভারতবর্ষের স্বর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ভাল করিয়া সেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতেই পিতৃদ্রোহের জীবন্ত অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। যে সিংহাসনে প্রজাবৎসল আকবর বাদশাহ উপবেশন করিয়া হিন্দু মুসলমানকে প্রীতিবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, কর্ম্মদোষে সেই সিংহাসনে বসিয়া এক দিনের জন্যও আরঙ্গজীব [illegible]দ্বেগ হইতে পারেন নাই।

পৃথিবীতে কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং কপ[illegible]ই তাঁহার কূটনীতির মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ের অবিশ্বাস লুকাইয়া রাখিয়া মুখের সরলতা দেখাইতে কখনই তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই; কিন্তু এত করিয়াও মোগলের অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। যে রাজপুত-বীরগণ অসি-হস্তে দেশ বিদেশে মোগলের বিজয়-পতাকা বহন করিতেছিলেন, তাঁহারাও একে একে গোপনে গোপনে শত্রু হইতে আরম্ভ করিলেন; যে মুসলমান অমাত্যগণ ছায়ার ন্যায় নিয়ত সম্রাটের অনুবর্ত্তন করিতেন, তাঁহারাও সুযোগ বুঝিয়া একে একে বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিলেন; এক দিন যে মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ "পার্ব্বত্য মূষিক" নামে ঘৃণার সহিত উপহসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ছলের পরিবর্ত্তে ছল, কৌশলের পরিবর্ত্তে কৌশল প্রয়োগ করিয়া, আরঙ্গ-জীবের সকল চেষ্টা বিফল করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যে পরাক্রান্ত হিন্দু-রাজ্যসংস্থাপনের সূত্রপাত হইল; দেশের পর দেশ মহারাষ্ট্র সেনার ঔনলু-

যাতনায় বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল; সম্রাটপুত্রগণ পিতার অসাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া তাঁহার জীবনকালেই সিংহাসনলাভের জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন; দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যার মুসলমান রাজপ্রতিনিধিগণ স্বাধীনরাজ্য-সংস্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন;—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরঙ্গজীব চাহিয়া দেখিলেন যে, চারি দিকেই পিতৃশাপের জলন্তশিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়াছে; পদতলে মোগলের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছে, জরাপলিত দুর্ব্বল মুষ্টি হইতে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড খসিয়া পড়িতে চাহিতেছে!

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গালা দেশেও সেই অধঃপতনের পূর্ব্বসূচনা আরব্ধ হইয়াছিল। যিনিই বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন, তিনিই ছলে বলে কৌশলে স্বাধীন হইবার আয়োজন করেন; কখন বহুব্যয়ে ও সৈন্যক্ষয়ে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিতে হয়, কখন বা অন্যান্য প্রদেশের রাজকোষ হইতে অর্থভিক্ষা করিয়া বাঙ্গলা দেশের অভাবমোচন করিতে হয়। বাঙ্গলার এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া, আরঙ্গজীব এক নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন। এক জন মাত্র নবাবের হস্তে সৈন্যবল ও ধনবল থাকাতেই পদে পদে বিপদ উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি বাঙ্গলা দেশের জন্য দুই জন নবাব নিযুক্ত করিলেন। এক জন "নবাব নাজিম" হইয়া সৈন্যবলে দেশরক্ষা ও রাজদণ্ডে প্রজাশাসন করিবেন, এবং আর এক জন "নবাব দেওয়ান" হইয়া রাজকর সংগ্রহ করিয়া, উভয় নবাবের আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া দিবেন। এই কৌশল-নীতি অবলম্বন করিয়া আরঙ্গজীব আপন পৌত্র আজিমশ্বান্‌কে "নবাব নাজিম" ও আপন বিশ্বস্ত অনুচর মুর্শিদ কুলীখাঁকে "নবাব দেওয়ান" করিয়া, ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন। এই উভয় নবাব ঢাকা নগরের রাজধানীতে থাকিয়া বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুলীখাঁ ব্রাহ্মণ-সন্তান; অতি অল্প বয়সে এক ধনাঢ্য মুসলমান তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত ও পারসী আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত করেন। ইসলাম ধর্ম্মে কুলীখাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রতিভা ও শিক্ষার বলে বাদশাহের নিকট কর্ম্মকুশল বীরপুরুষ বলিয়াই সমধিক পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কুলী খাঁ যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেই বাদশাহ

তাঁহাকে নবাব-দেওয়ান করিয়াছিলেন। মুসলমান হইলেও হিন্দুর প্রতি তাঁহার প্রাণের মধ্যে অজ্ঞাতসারে যে সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা কোনদিনই বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষা প্রতিভা ও কার্য্যতৎপরতার সমধিক সম্মান করিতেন, সুতরাং তাঁহার শাসনসময়ে প্রতিভাশালী কার্য্যকুশল হিন্দুদিগের পক্ষে পদোন্নতি লাভ করার কোনরূপ বাধা বা অসুবিধা ছিল না।

কুলী খাঁ বাঙ্গলাদেশে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রাজকোষের শোচনীয় অবস্থার মূলকারণ বুঝিতে পারিলেন। দিল্লীর দরবারের প্রিয়পাত্র মুসলমান অমাত্য ও সেনাপতিগণ বাদশাহদিগের মনস্তুষ্টি করিয়া সময়ে সময়ে বহুতর নিষ্কর "জায়গীর" পুরস্কার পাইতেন। তাঁহারা বাদশাহের মন্ত্রিসভার সহায়তায় বাঙ্গলাদেশের উর্ব্বর ভূমিগুলি জায়গীর লইতে পারিলে অন্য প্রদেশে জায়গীর লইতে স্বীকৃত হইতেন না। এইরূপে বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ স্থানই জায়গীরদারদিগের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট স্থানে যে সকল হিন্দু জমিদার বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই রাজকর দিতেন না; এবং সুযোগ বুঝিলে দিল্লীর অধীনতা পর্য্যন্তও অস্বীকার করিতেন। কুলী খাঁ সম্রাটের অনুমতি লইয়া মুসলমান জায়গীরদারদিগকে উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশে জায়গীর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বাঙ্গলার সমুদায় স্থান "সকর" করিয়া লইলেন, এবং প্রথম বৎসরেই বাদশাহের নিকট এক কোটি টাকা রাজকর পাঠাইয়া আরঙ্গজীবের সবিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গলার জমিদারদিগের পক্ষ হইতে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য নবাব-দরবারে এক এক জন মোক্তার রাখিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা নবাব-দরবারে নিজ নিজ প্রভুর পক্ষে প্রতিনিধিস্বরূপ সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতেন। ইংরাজদিগের সমসাময়িক কার্য্যবিবরণীতে লিখিত আছে যে, প্রধান প্রধান জমিদারগণ আপন আপন পদমর্য্যাদার অনুরূপ এক এক জন মোক্তার রাখিয়া রাজধানীর সহিত চিঠিপত্র চালাইতেন। *

* "It was the custom for the landholders of distinction and othe principal inhabitants to maintain in proportion to their rank an intercours with the ruling power, and in person or by Vakeel or agent to b in constant attendance at the seat of Government.—Fifth Report.

যাতনায় বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল; সম্রাটপুত্রগণ পিতার অসাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া তাঁহার জীবনকালেই সিংহাসনলাভের জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন; দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যার মুসলমান রাজপ্রতিনিধিগণ স্বাধীনরাজ্য-সংস্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন;—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরঙ্গজীব চাহিয়া দেখিলেন যে, চারি দিকেই পিতৃশাপের জলন্তশিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়াছে, পদতলে মোগলের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছে, জরাপলিত দুর্ব্বল মুষ্টি হইতে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড খসিয়া পড়িতে চাহিতেছে!

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গালা দেশেও সেই অধঃপতনের পূর্ব্বসূচনা আরব্ধ হইয়াছিল। যিনিই বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন, তিনিই ছলে বলে কৌশলে স্বাধীন হইবার আয়োজন করেন; কখন বহুব্যয়ে ও সৈন্যক্ষয়ে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিতে হয়, কখন বা অন্যান্য প্রদেশের রাজকোষ হইতে অর্থভিক্ষা করিয়া বাঙ্গলা দেশের অভাবমোচন করিতে হয়। বাঙ্গলার এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া, আরঙ্গজীব এক নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন। এক জন মাত্র নবাবের হস্তে সৈন্যবল ও ধনবল থাকাতেই পদে পদে বিপদ উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি বাঙ্গলা দেশের জন্য দুই জন নবাব নিযুক্ত করিলেন। এক জন "নবাব নাজিম" হইয়া সৈন্যবলে দেশরক্ষা ও রাজদণ্ডে প্রজাশাসন করিবেন, এবং আর এক জন "নবাব দেওয়ান" হইয়া রাজকর সংগ্রহ করিয়া, উভয় নবাবের আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া দিবেন। এই কৌশল-নীতি অবলম্বন করিয়া আরঙ্গজীব আপন পৌত্র আজিমশ্বানকে "নবাব নাজিম" ও আপন বিশ্বস্ত অনুচর মুর্শিদ কুলীখাঁকে "নবাব দেওয়ান" করিয়া, ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন। এই উভয় নবাব ঢাকা নগরের রাজধানীতে থাকিয়া বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুলীখাঁ ব্রাহ্মণ-সন্তান; অতি অল্প বয়সে এক ধনাঢ্য মুসলমান তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত ও পারসী আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত করেন। ইসলাম ধর্ম্মে কুলীখাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রতিভা ও শিক্ষার বলে বাদশাহের নিকট কর্ম্মকুশল বীরপুরুষ বলিয়াই সমধিক পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল . রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কুলী খাঁ যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেই বাদশাহ

তাঁহাকে নবাব-দেওয়ান করিয়াছিলেন। মুসলমান হইলেও হিন্দুর প্রতি তাঁহার প্রাণের মধ্যে অজ্ঞাতসারে যে সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা কোনদিনই বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষা প্রতিভা ও কার্য্যতৎপরতার সমধিক সম্মান করিতেন, সুতরাং তাঁহার শাসনসময়ে প্রতিভাশালী কার্য্যকুশল হিন্দুদিগের পক্ষে পদোন্নতি লাভ করার কোনরূপ বাধা বা অসুবিধা ছিল না।

কুলী খাঁ বাঙ্গলাদেশে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রাজকোষের শোচনীয় অবস্থার মূলকারণ বুঝিতে পারিলেন। দিল্লীর দরবারের প্রিয়পাত্র মুসলমান অমাত্য ও সেনাপতিগণ বাদশাহদিগের মনস্তুষ্টি করিয়া সময়ে সময়ে বহুতর নিষ্কর "জায়গীর" পুরস্কার পাইতেন। তাঁহারা বাদশাহের মন্ত্রিসভার সহায়তায় বাঙ্গলাদেশের উর্ব্বর ভূমিগুলি জায়গীর লইতে পারিলে অন্য প্রদেশে জায়গীর লইতে স্বীকৃত হইতেন না। এইরূপে বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ স্থানই জায়গীরদারদিগের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট স্থানে যে সকল হিন্দু জমিদার বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই রাজকর দিতেন না; এবং সুযোগ বুঝিলে দিল্লীর অধীনতা পর্য্যন্তও অস্বীকার করিতেন। কুলী খাঁ সম্রাটের অনুমতি লইয়া মুসলমান জায়গীরদারদিগকে উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশে জায়গীর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বাঙ্গলার সমুদায় স্থান "সকর" করিয়া লইলেন, এবং প্রথম বৎসরেই বাদশাহের নিকট এক কোটি টাকা রাজকর পাঠাইয়া আরঙ্গজীবের সবিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গলার জমিদারদিগের পক্ষ হইতে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য নবাব-দরবারে এক এক জন মোক্তার রাখিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা নবাব-দরবারে নিজ নিজ প্রভুর পক্ষে প্রতিনিধিস্বরূপ সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতেন। ইংরাজদিগের সমসাময়িক কার্য্যবিবরণীতে লিখিত আছে যে, প্রধান প্রধান জমিদারগণ আপন আপন পদমর্য্যাদার অনুরূপ এক এক জন মোক্তার রাখিয়া রাজধানীর সহিত চিঠিপত্র চালাইতেন। *

* "It was the custom for the landholders of distinction and othe principal inhabitants to maintain in proportion to their rank an intercours with the ruling power, and in person or by Vakeel or agent to b in constant attendance at the seat of Government.—Fifth Report.

এই সকল মোক্তারদিগের বিদ্যাবুদ্ধি এবং কার্য্যতৎপরতার উপরেই বাঙ্গলার জমিদারদিগের মানসম্ভ্রম ও জমিদারী নির্ভর করিত ; সুতরাং যাঁহারা স্বয়ং নবাব-দরবারে বাস করিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেই মোক্তারি পদে নিযুক্ত করিতেন। এই কার্য্যে সর্ব্বদা প্রত্যুৎপন্নমতির প্রয়োজন হইত ; পারস্য ভাষায়, মুসলমান ও হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রে এবং হিসাব নিকাশের কূট প্রশ্নাদির মীমাংসা-কার্য্যে সমধিক অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেহ এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। মোক্তারগণ ঢাকায় বাস করিয়া কানন-গো দপ্তরে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতেন। এই কার্য্যে দুই জন কাননগো নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা নবাব-দেওয়ানের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করিয়া মোহর দস্তখত করিয়া দিলে তবে তাহা বাদশাহ গ্রহণ করিতেন ; সুতরাং নবাবগণ তাঁহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিয়া চলিতেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ নবাব হইয়া আসিলে পুঁঠিয়ার রাজার পক্ষ হইতে ঢাকায় এক জন মোক্তার নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। রঘুনন্দনের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভা দেখিয়া পুঁঠিয়ার রাজা তাঁহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় পাঠাইলেন। ইহাই নাটোর রাজবংশের ভবিষ্যৎ রাজ্যলাভের প্রথম সোপান। শুনা যায় যে, রঘুনন্দন এমন সহজে ও সুকৌশলে হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করিবার এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, কাননগো-দপ্তরে শীঘ্রই তিনি "নায়েব-কাননগো" পদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যে কার্য্যেই নিযুক্ত হউন না কেন, যখন তাঁহাদের প্রতিভা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তাঁহারাই সেই কার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। যিনি প্রভু, তিনিও নিজের বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা প্রতিভাশালী অধীনস্থ কর্ম্মচারীর বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কারণে অতি অল্পদিনের মধ্যে রঘুনন্দনের উপরেই সকল ভার ন্যস্ত হইয়া পড়িল ; তিনি নায়েব-কাননগো হইলেও কাননগো-দপ্তরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। এই কার্য্যে মান সম্ভ্রম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রঘুনন্দনের অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইল। তিনি ক্রমে নবাব-দরবারের এক জন ক্ষমতাশালী রাজকর্ম্মচারী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ঢাকার নবাবদিগের মধ্যে এক অভাবনীয় বিবাদের সূত্রপাত হওয়াতে রঘুনন্দনের ক্ষমতা চরমসীমায় আরোহণ করিল।

কুলীখাঁর ন্যায় এক জন হিন্দু ক্রীতদাসকে সামান্য সৈনিক-পদবী হইতে নবাব-দেওয়ানের উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া আরঙ্গজীব কখনও অনুতাপ করেন নাই, বরং বর্ষে বর্ষে বহু লক্ষ টাকা রাজকর পাইয়া তাঁহার উপর ক্রমেই বিশ্বাস স্থাপন করিতেছিলেন। কিন্তু সম্রাট-পৌত্র আজিমশ্বান্ এক জন নগণ্য সৈনিককে সহকারী নবাবের উচ্চ পদে আরোহণ করিতে দেখিয়া প্রথমে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; ক্রমে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে দেখিয়া বিরক্তি ঈর্ষ্যায় পরিণত হইতে লাগিল। মনের ভাব অধিক দিন গোপন রহিল না। প্রথমে একটু মনোমালিন্য, ক্রমে বাদানুবাদ, অবশেষে প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ হইল। আজিমশ্বান্ গোপনে কুলীখাঁকে হত্যা করিবার আয়োজন করিলেন। সেই চক্রান্ত শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল; ক্রমে বাদশাহের নিকট সে সংবাদ প্রেরিত হইল। আরঙ্গজীব আজিমশ্বানকে পাটনায় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া, মুর্শীদ কুলীখাঁর হিসাব নিকাশ তলব করিয়া পাঠাইলেন।

কুলীখাঁ হিসাব নিকাশ লইয়া স্বয়ং সম্রাটের নিকট গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অবস্থা বলিবার অবসর পাইবেন, এই চিন্তায় আজিমশ্বানের মুখ শুকাইয়া গেল; কিসে মুর্সিদ কুলীখাঁর যাওয়া রহিত হইতে পারে, সেই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। অবশেষে আজিমশ্বান্ স্থির করিলেন যে, যদি কাননগোদ্বয় নবাব-দেওয়ানের হিসাবে মোহর দস্তখত না করেন, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়। তিনি কাননগোদিগকে শাসন করিয়া দিলেন। আজিমশ্বান্ সম্রাটের পৌত্র, কালে তিনি বাদশাহ হইলেও হইতে পারেন; আর মুর্সিদ কুলীখাঁ আজ আছেন, কাল নাই; সুতরাং আজিমশ্বানের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কুলীখাঁর হিসাব নিকাশের কাগজে মোহর দস্তখত করা কাননগোদিগের সাহসে কুলাইল না। মুর্সিদ কুলীখাঁর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; যদি একজন কাননগোও মোহর দস্তখত না করেন, তবে সে কাগজে বাদশাহ দৃষ্টিপাত করিবেন না, এবং নিতান্ত অপদস্থ হইয়া তাঁহাকে নবাবীপদ ত্যাগ করিতে হইবে, এই চিন্তায় কুলীখাঁ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া নায়েব-কাননগো রঘুনন্দনের শরণাগত হইলেন।

রঘুনন্দনের চেষ্টায় এক জন মাত্র কাননগোর মোহর-দস্তখতযুক্ত হিসাব ও বহুতর উপঢৌকনদ্রব্য লইয়া কুলীখাঁ সম্রাটের নিকট গমন করিলেন।

সম্রাট তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধক্ষেত্রে, অর্থের তখন বড়ই অনাটন; কুলীখাঁও বহুতর অর্থ লইয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান; সুতরাং দুই জন কাননগো কেন মোহর দস্তখত করেন নাই, সে কথা জিজ্ঞাসার সময় হইয়া উঠিল না। বাদশাহ উপঢৌকনদ্রব্য ও রাজকর গ্রহণ করিয়া রাজপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ মূল্যবান্ রাজপরিচ্ছদ "খেলাত" দিয়া, কুলীখাঁকেই বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার একমাত্র নবাব করিয়া পাঠাইলেন। কুলীখাঁ আসিয়া মুর্সিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং উপকারী বন্ধু রঘুনন্দনকে আনাইয়া তাঁহাকে রায়-রাইয়ান ও দেওয়ান করিলেন। সেই হইতে প্রতিভার সঙ্গে ক্ষমতা আসিয়া মিলিত হইল,—তাহাই নাটোররাজবংশের রাজ্যলাভের মূলকারণ।

তৎকালের দেওয়ানই প্রকৃতপ্রস্তাবে নবাব ছিলেন, এবং তজ্জন্য দেওয়ানী-পদের মান সম্ভ্রম ও ক্ষমতা বড়ই অধিক ছিল। লোকে সহসা নবাব-দরবারে গমন করিতে পারিত না, সুতরাং অর্থী, প্রত্যর্থী, রাজা, জমিদার, সকলেই দেওয়ানের দরবারে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহার শুভদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিবিধ উপঢৌকনদ্রব্য "নজর" প্রদান করিতেন। রঘুনন্দন দেওয়ানী পদে আরোহণ করিয়া এই সকল মান সম্ভ্রম এবং উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন।

এই ঘটনার বর্ণনা করিতে গিয়া অধিকাংশ লেখকই বলিয়া গিয়াছেন যে, কাননগোর মোহর রঘুনন্দনের নিকটেই থাকিত, তিনি কাননগোর অজ্ঞাতসারে গোপনে সেই মোহর লইয়া নবাবের কৃত্রিম আয় ব্যয়ের কাগজে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ রায়-রাইয়ান ও দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। *

---

* "Raghunandana was originally employed as an apprentice or clerk in the canongoe's office. The Nawab, on one occasion, being desirous of submitting false returns of his revenue collections before the Mogal Emperor, was ofcourse obliged to tamper with the canongoe's papers; for some reason he does not appear to have been able to effect his purpose through the canongoe himself; but he had recourse to this apprentice Raghunandana; that person entered into the plot, and having abstracted the canongoe's seal was enabled to draw up fictitious papers for his employer duly stamped and sealed. As a reward for this service,

রঘুনন্দনের নবাব-দরবারে প্রভুত্ব ছিল, এবং সেই প্রভুত্বই যে রামজীবনের রাজ্যলাভের মূলকারণ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রভুত্বের মূল কি? ঢাকার ইতিহাসলেখক বিনা প্রমাণে রঘুনন্দনকে জালিয়াতি অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। বাস্তবিক মুর্শিদ কুলী খাঁ জাল হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জাল হিসাব প্রস্তুত করিবার আদৌ কোন কারণ ছিল না। বাঙ্গলাদেশে কত টাকা আয় হয়, কত টাকা ব্যয় হয়, বাদশাহেরা তাহার তত্ত্ব লইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না। রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গলাদেশের যে রাজস্ব নির্ণয় করেন, তাহাতে বার্ষিক এক কোটী টাকা বাদশাহের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সেই এক কোটী টাকা কোন বৎসরেই আদায় হইত না। মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্গলাদেশে আসিয়া প্রথম হইতেই এক কোটী টাকা রাজকর প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং কৃত্রিম হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করিবার আদৌ কোন আবশ্যকতা ছিল না। সেই হিসাবে প্রকাশ্যভাবে কাননগো দস্তখত মোহর করিতে স্বীকার না করার কারণ কি, ঢাকার ইতিহাসলেখক তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং কতকগুলি আনুমানিক প্রস্তাবের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় নাই।

সম্রাট মুর্শিদ কুলী খাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন; বরং তাঁহার উপর এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, আপন পৌত্রকেও তাঁহার জন্য পাটনায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সেই সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ সম্রাট কুলী খাঁকে বাঙ্গলার নবাব-দেওয়ান করিয়াছিলেন। কুলী খাঁ প্রথম বৎসর হইতেই এক কোটী টাকা হিসাবে রাজকর প্রদান করায় সম্রাটের আহ্লাদের সীমা ছিল না। এই সকল কথা জনশ্রুতি নহে,—ঐতিহাসিক সত্য। যদি আজিমশ্বানের সঙ্গে বিবাদ না হইত, তবে যে কাননগো মোহর দস্তখতে অস্বীকার করিতেন না, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। কাননগোর তখন উভয় সঙ্কটের

Raghunandana appears to have been favoured at the court of Moorshidabad and to have exercised considerable influence and it was through his good offices that Ramjiban succeeded in being nominated to the zamindary of Rajshahy"—History and Statistics of the Dacca Division, by E. M. Lewis. p. 201.

অবস্থা;—আজিমশ্বানের অনুরোধ অবহেলা করাও যেমন নিরাপদ নহে, কুলী খাঁর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করাও সেইরূপ সহজ নহে; এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কাননগো গোপনে কুলী খাঁর অনুরোধ রক্ষা করিয়া, প্রকাশ্যে আজিমশ্বানের নিকট তাহা অস্বীকার করিয়া, উভয় নবাবের নিকটেই "সরফরাজ" থাকিবার জন্য যে চেষ্টা করেন নাই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে বাঙ্গলাদেশ রীতিমত শাসন করিতে শৈথিল্য করায় বাদশাহ নবাবের উপর অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই রাজরোষ পরিহারের জন্য নবাব আয় ব্যয়ের এক কৃত্রিম হিসাব প্রস্তুত করাইয়া কাননগোকে তাহাতে মোহর দস্তখত করিতে অনুরোধ করেন; কাননগো অস্বীকার করায় নবাব রঘুনন্দনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। নবাবের অনুগ্রহলাভের এরূপ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া রঘুনন্দন সে প্রবল লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—নবাব যাহা বলিলেন, তিনি তাহাই করিলেন।" * কিশোরী বাবু রঘুনন্দনের মস্তকে কলঙ্কভার অর্পণ করিবার সময়ে যদি অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, "এই সময়ে বাঙ্গলাদেশ রীতিমত শাসন করিতে শৈথিল্য করায় বাদশাহ নবাবের উপর অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন"—এই কথা গুলির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। শাসনভার আজিমশ্বানের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহার জন্য বাদশাহ কুলী খাঁর উপর অসন্তুষ্ট হইবেন কেন; এবং তাহার জন্য কুলী খাঁ কৃত্রিম হিসাবই বা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইবেন কেন?

তৎকালে রঘুনন্দনের ন্যায় আর কেহ ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ ও অর্থনীতিকুশল রাজকর্মচারী ছিল না; সুতরাং বাঙ্গলাদেশের রাজস্ব-নির্ণয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, কুলী খাঁর ন্যায় প্রতিভাশালী নবাব যে রঘুনন্দনকেই দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা নাই। কেবলমাত্র প্রত্যুপকার করিবার জন্য যে নবাব তাঁহাকে দেওয়ানী-পদে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এ কালের বড়লোকেরাও যাহাকে ধরিয়া বড়লোক বলিয়া পরিচিত হন, তাহার কথা অল্পই স্মরণ করিয়া রাখেন; মুর্সিদ কুলী খাঁ সে কালের স্বাধীন নবাব হইয়া যে কেবলমাত্র উপকারী বন্ধু বলিয়াই রঘুনন্দনকে দেওয়ান করিয়াছিলেন, এবং রঘুনন্দন

* The Rajas of Rajshahi.

যে "জালিয়াতি" করিয়া তাহারই বিনিময়ে সেই উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে ঐতিহাসিক প্রমাণ আবশ্যক;—কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া রঘুনন্দনের উজ্জ্বল প্রতিভায় কলঙ্ক আরোপ করা সঙ্গত নহে।

ক্রমশঃ।

রসভঙ্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের এক মাস পরে মনোরঞ্জন সস্ত্রীক বরানগরের বাগানবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

খুব ভোর থাকিতে স্বামী স্ত্রীতে পাল্কীতে গিয়া উঠিল। পাল্কী তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। কল কারখানা জাহাজ জেটি সহরের হট্টগোল ছাড়িয়া পাল্কী যখন ফাঁকায় গিয়া পৌছিল, মনোরঞ্জন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ছবি আঁকা গ্রাম, নদীতীর, লতিকামণ্ডপচ্ছায়ে প্রচ্ছন্ন কুটীর, শিবের মন্দির, স্বচ্ছ নীলাকাশ, নদীর কুলু কুলু শব্দ—যেন স্বপ্নরাজ্য বলিয়া বোধ হইল। প্রকৃতি স্নেহময়ী মাতার ন্যায় অনশনক্ষুধিত হৃদয়ের মুখে অন্ন দিয়া যেন মনোরঞ্জনের হৃত মানসিক স্বাস্থ্যকে পুনরানয়ন করিলেন। বিবাহের এই এক মাস উৎসব আনন্দে, হাস্যরঙ্গকৌতুকতরঙ্গে প্রভা যেন সকলের সঙ্গে মিশিয়া ছিল, আজ সে মনোরঞ্জনের অতি নিকটস্থ করায়ত্ত বলিয়া মনে হইল। প্রবল উচ্ছ্বাসে মনোরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "সমস্ত জীবনটা যদি এই রকম সুখে ভাসিয়া যাওয়া যাইত।" প্রভা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "অর্থাৎ বল না কেন, পৃথিবীতে যদি ঝড় বৃষ্টি নামক পদার্থটা না থাকিত।"—মনোরঞ্জন কহিল, "তোমার সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি গহন অরণ্য মরণও আমার পক্ষে সুখ!" মনোরঞ্জন উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস সহকারে বলিতে লাগিল—"জান প্রভা, এত দিন আমি এই সংসারকে ঠিক মরুর মত দেখিতাম—তপ্ত বালুময় নীরস কঠিন বারিহীন তরুলতাহীন তৃণহীন অসীম প্রান্তর কেবল ধূ ধূ করিতেছে; তাহার মাঝে তৃষার্ত্ত আমি শুষ্ককণ্ঠে দগ্ধচরণে বাণবিদ্ধ হরিণের মত অস্থির হইয়া ছুটিয়া

বেড়াইয়াছি, কোথাও জল পাই নাই, কোথাও বসিবার ঠাঁই পাই নাই! কত কাঁদিয়াছি, কতবার মরণকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছি, কেহ আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করে নাই! প্রভা, প্রেমময়ী প্রেয়সি, তুমিই আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, আমাকে মুক্তি দিয়াছ, হতাশ্বাস মৃত জীবনকে ত্রাণ করিয়াছ! কতবার ভগবানের উপর অবিশ্বাস আসিয়াছিল, পাপ পুণ্য কথার কথা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কতবার বিপথে কুপথে যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, তুমিই আমাকে রক্ষা করিলে! প্রভা, আমি জীবনে কখনো কাহারও নিকট হইতে ভালবাসা পাই নাই, কখনো কাহাকেও ভালবাসি নাই, নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন রমণীর সংস্পর্শে কখনও আসি নাই—তুমিই আমার জীবনের স্পর্শমণি! কতবার এই পথ দিয়া গিয়াছি, কিন্তু আজিকার মত এমন সুখ কখনও পাই নাই!—”

কথা শেষ হইতে না হইতে পান্সী ঘাটে আসিয়া লাগিল। মনোরঞ্জন আগে নামিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া নামাইয়া দিল। প্রভা নূপুরনিক্বণে মল ঝম্ ঝম্ করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে যখন বাগানে প্রবেশ করিল, প্রস্তর-সোপানবাহী পরিষ্কার ছবির মত বাড়িটি, স্ফটিকস্বচ্ছবারিবর্ষী ফোয়ারা, বহু-বিস্তৃত পুষ্করিণী, আম্রতরুকুঞ্জ, সম্মুখে কূলপ্লাবিনী গঙ্গা, সকলেই যেন নীরব অব্যক্ত ভাষায় বাবুর নূতন গৃহিণীটিকে সমাদর করিয়া লইল। মনোরঞ্জনের আজ বাগানবাড়ী করা সার্থক মনে হইল।

দিন গুলা সুখে জলের মত বহিয়া যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভা বাপের বাড়ী হইতে তাহার ছেলেবেলাকার বুড়ী দাসী শঙ্করীকে শ্বশুরবাড়ীতে আনিয়াছিল। তাহার অসুখ হওয়াতে বাগানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে নাই। দাসীর অভাবে প্রভার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মনোরঞ্জন সকলকে দাসী খুঁজিতে বলিয়া দিল।

এক দিন সন্ধ্যায় দুই জনে বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বাগানের মালী আসিয়া খবর দিল, "মা ঠাকরুণ, এক জন দাসী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আপনি কি তাকে রাখবেন?" প্রভা তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিল।

দেখিতে গৌরবর্ণ। বয়স তেইশ চব্বিশ হইবে। পরণে লাল পেড়ে শাড়ী।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জটাবদ্ধ চুল। মুখে বসন্তের দাগ, সামনের দাঁত দুটি ভাঙ্গা। দেখিলেই মনে হয়, এক সময়ে দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল, অবস্থার ফেরে তাহার এমন দশা হইয়াছে। দাসীশ্রেণী অপেক্ষা তাহাকে অনেক উচ্চ বলিয়া মনে হয়; বেশ বুঝা যায়, দায়ে পড়িয়া তাহাকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" সে বলিল, "লক্ষ্মী।" "সব কাজ করতে পারবে ত?" "কেন পারব না? যা বলবেন তাই করব।" সেই দিন হইতেই লক্ষ্মী কাজে নিযুক্ত হইল।

নূতন দাসীটি কিছু অতিরিক্ত কৌতূহলপরবশ ছিল। সন্ধ্যায় বারান্দায় বসিয়া মনোরঞ্জন প্রভাতে যখন নানারূপ গল্প হইত, লক্ষ্মী দরজার আড়ালে থাকিয়া এক মনে সব শুনিত। একটু উচ্ছ্বাস হইলে মনোরঞ্জন প্রায়ই বলিত, "প্রভা! আমার জীবনে কখনো কাহাকেও এত ভালবাসি নাই।" লক্ষ্মী শুনিয়া মনে মনে খুব হাসিত। কখনো কখনো দুপুর বেলায় কৌচের উপর পা ছড়াইয়া দিয়া প্রভা শুইয়া শুইয়া বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িত, আর লক্ষ্মী নীচে বসিয়া পা টিপিয়া দিত। এক দিন প্রভা "মৃণালিনী" পড়িতেছে, লক্ষ্মী দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "বৌ ঠাকরুণ মৃণালিনী পড়চ? হেমচন্দ্র বড় নিষ্ঠুর না?" শুনিয়া প্রভা অবাক হইল। "তুই আবার বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়তে শিখলি কবে?" "হাঁ বৌ ঠাকরুণ, ছেলে বেলায় বাপ মা একটু লিখতে পড়তে শিখিয়েছিল, তাই বঙ্কিম বাবুর দু'একটা বই পড়েছি।" প্রভা বলিল, "তুই যে দেখচি আমাদের লিটারারী দাসী হলি!"

দুই মাস বাগানবাড়ীতে কাটিয়া গেল।

সে দিন সন্ধ্যার আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল; টিপি টিপি বৃষ্টিও পড়িতেছিল। ওপারের গাছ পালা ঘর বাড়ী ধূমাচ্ছন্ন ঝাপ্সা দেখাইতে-ছিল। বকুল গাছ হইতে টুপ্ টাপ্ করিয়া বারিসিক্ত ফুলগুলি মাটীতে পড়িতেছিল; তাহার গন্ধ ও জলের চঞ্চল ছলছল শব্দ মনের মধ্যে এক রকম নেশার ভাব গড়িয়া তুলিতেছিল। প্রভা মুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া, রঙীন কাপড় পরিয়া, খোঁপায় একটি মালা জড়াইয়া, খাটের উপর চুপ করিয়া শুইয়াছিল, লক্ষ্মী পদপ্রান্তে বসিয়া পা টিপিয়া দিতেছিল। মনোরঞ্জন সামনের ঘরে ডেস্কের কাছে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন। তখন বর্ষার অন্ধকারে, মেঘের গর্জ্জনে, বৃষ্টির শব্দে, তরঙ্গিত গঙ্গার কলোচ্ছ্বাসে প্রভার অন্তরে একটি

সুপ্ত মধুর স্নিগ্ধ সুন্দর আবেগের সঞ্চার হইতেছিল—সে হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আনন্দজলরেখাপ্লুত চক্ষে লক্ষীর নিকট আপন স্বামি-সৌভাগ্যগর্ব্ব উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করিতেছিল। সহসা লক্ষীর মুখে একটা উদ্দীপ্ত তীব্রতার ভাব দেখিয়া থামিল, মনে সন্দেহ হইল যে, এই মেঘমেদুর অন্ধকারে অবিরলবৃষ্টিপাতশব্দে লক্ষীরও কোনও সুখসৌভাগ্য-স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের কথা রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, লক্ষী, তুই কাহাকেও ভাল বাসিয়াছিলি, তোকে কেহ ভালবাসিয়াছিল ? লক্ষী স্ফুলিঙ্গবৎ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ঠিক তোমারি মত ভালবাসিয়াছিলাম, ঠিক তোমার মত ভালবাসা পাইয়াছিলাম।" শুনিয়া স্বামিসৌভাগ্যগর্ব্বিতা প্রভুপত্নী মনে মনে রাগিল—তাহার সহিত কাহারও তুলনা! বিশেষতঃ তাহার দাসী লক্ষীর! কিঞ্চিৎ উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম, শুনিই না!" লক্ষী অধর দংশন করিয়া কহিল, "তবে শোন!" হঠাৎ দশ দিকের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া একটা বজ্র ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

লক্ষী এক বার ঘরের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইল, যেখানে মনোরঞ্জন বসিয়াছিল, সেইখানে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর আঁচলের খোটায় চোকের কোণ মুছিয়া বলিতে লাগিল :—

"বৌ ঠাকৃরুণ, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমার আসল নাম মৃণালিনী। আমার বাপ মা এক সময়ে খুব সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। কলিকাতায় আমাদের বাড়ী। আমার যখন বয়স সাত বৎসর, তখন বাপ মা আমার বিবাহ দেন। বিবাহের এক বৎসর পরে আমার স্বামী কলেরা রোগে মারা পড়েন। আট বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া আমি গায়ের গয়না সব খুলিয়া ফেলিলাম, থান পরিতে আরম্ভ করিলাম, এক বেলা হবিষ্যি করিতাম, একাদশীর দিন নির্জ্জলা উপবাস দিতাম। বাপ মা অনেক সময় নিষেধ করিতেন, আমি শুনিতাম না। স্বামীর প্রতি আত্যন্তিক ভালবাসা বশতঃ যে এইরূপ করিতাম, তাহা নহে—আট বৎসরের মেয়ের আর এক বৎসরে কত ভালবাসা হইবে! লোকের দেখিয়া শুনিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে এইরূপ করিতাম। এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আমি শেষে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলাম।

"সত্য কথা বলিতে কি, যৌবনে পড়িয়া সময়ে সময়ে মনের ভাবান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় সকলে চুল বাঁধিয়া, রঙীন কাপড় পরিয়া, পায়ে আলতা মাখিয়া, গহনায় ভরিয়া, প্রিয়জনের অপেক্ষায় বসিয়া

থাকিতেন, আমার মনে মনে ভারি হিংসা হইত, জীবনটা নিতান্ত বিফল ব্যর্থ মনে হইত। পাছে এই ভাব আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে, আমি শেষে আর চুল বাঁধিতাম না, কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না, ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিতাম, সপ্তাহে এক দিন মাত্র স্নান করিতাম। যত প্রকার উপায়ে আপনাকে বিশ্রী কুশ্রী দেখাইতে পারে, তাহাই করিতে লাগিলাম।

"এই সময়ে আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় একজন কুটুম্ব আমাদের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই যাতায়াত করিতেন। গৌরবর্ণ, দেখিতে খুব লম্বা চওড়া, তখন সবে অল্প অল্প গোঁফের রেখা দিয়াছে মাত্র। তিনি আসিলেই বাড়ীতে তাস খেলিবার খুব ধুম পড়িয়া যাইত। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া খেলাইতে বসাইতেন, আমি প্রায় রোজই তাঁহার দলে থাকিতাম। খেলিবার সময় কথায় বার্ত্তায় দৃষ্টিতে ইঙ্গিতে আমার প্রতি তিনি এমন ভাব দেখাইতেন, আমি খেলা ভুলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অনেক সময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। শেষে আমার আর অনিচ্ছা রহিল না, ইচ্ছা করিয়াই আমি রোজ খেলিতে আসিতাম। তিনি না আসিলে আমার কেমন ভাল লাগিত না। ক্রমে সাজ সজ্জার দিকেও আমার দৃষ্টি পড়িল। বিকাল হইলে সাবান দিয়া মুখ ধুইতাম, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিতাম, পরিষ্কার কাপড় পরিতাম; সকল রকমে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"যখন চৈতন্য হইল, যখন বুঝিতে পারিলাম কোথায় যাইতেছি, তখন দেখিলাম, বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, ফিরিবার আর শক্তি নাই। নিস্তব্ধ রজনীতে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া অনেকবার সেই মুখ ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু যতই চেষ্টা করিতাম, ততই আরও যেন দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিত। এইরূপে মদনদেব আপনার বিশ্ববিজয়ী প্রভাব আমার উপর বিস্তার করিলেন।

"এক দিন দুপুর বেলায় একলা আমার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার নামে এক খানা চিঠি আসিল। চিঠিটা হাতে লইয়া গা যেন কাঁপিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া খামের উপরের লেখাটা দেখিতে লাগিলাম, তাহার পর কম্পিতহস্তে চিঠিটা খুলিয়া দেখি, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই,—সেই বাবুটির লেখা। এসেন্স-মাখান রঙীন চিঠির কাগজে মুক্তার মত অক্ষরে লেখা—কত প্রেম কত আক্ষেপ কত মিনতি কত কাতরতা কত সাধ্য সাধনা যদি দেখিতে। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রথমে আপনার এই সঙ্গীন অবস্থা ভাবিয়া আমার মনে বিভীষিকার উদয় হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই

আবার সে ভাব গিয়া এই অযত্নবর্দ্ধিত রূপরাশি লইয়া এক জন পুরুষের হৃদয়কে যে জয় করিতে পারিয়াছি, এই কারণে আপনাকে বড়ই সৌভাগ্যবতী মনে হইল; মনে মনে ভারি গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। চিঠিটা যে কত বার পড়িলাম, তাহার ঠিক নাই, আশ মিটাইয়া পড়িয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিলাম। তাহার আর জবাব দিলাম না।

"পর দিন আবার তিনি তাস খেলিতে আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। আমার তাঁহার কাছে যাইতে কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারও বোধ হয় আমার মত অবস্থা হইয়াছিল, কারণ সে দিন আর তিনি আমাকে ডাকিতে আমার ঘরে আসিলেন না। মাসীমা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলাম না। সমস্ত ক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া তাস খেলিলাম। তিনিও আমার সঙ্গে বড় একটা কথা কহিলেন না। তাস খেলা শেষ হইলে আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে চলিয়া গেলাম।

"প্রায় প্রতি সপ্তাহে দু'এক খানা করিয়া চিঠি আসিতে লাগিল।

"এক দিন সন্ধ্যার ছাতে বসিয়া আছি। বসিয়া বসিয়া নীচে রাস্তায় লোকের আনাগোনা একমনে দেখিতেছিলাম এবং ভাবিতেছিলাম, এই পথ দিয়া ত তিনি আসিবেন। দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাস্তার গ্যাশ জ্বালিয়া দিল, আকাশের কপালে তারকার টীপ্ এক একে ফুটিয়া উঠিল, চাঁদ দেখা দিল। আমি নিরাশ হইয়া একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। ছাই ভস্ম কত কথাই মনে আসিতেছিল! এমন সময়ে সেই বাবুর পরিবর্ত্তে তাঁহারি হাতের লেখা একখানি চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল। চিঠি খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব শব্দ হইতে লাগিল। চিঠিতে লেখা ছিল, "মৃণাল, আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমি খিড়কির দরজার কাছে থাকিব, তুমি অবশ্য আসিও নিরাশ করিও না।" কি, সমস্ত মান অপমান লজ্জা তুচ্ছ করিয়া বাপ মায়ের বুকে শেল বিঁধাইয়া, কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া কুলে কালি দিয়া মৃত স্বামীর অবমাননা করিয়া তোমার সঙ্গে অভিসারে যাইব! তুমি আমার কে! কখনই না! মাথায় রক্তের স্রোত কিন্ কিন্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া চিঠিগুলা বাক্স হইতে বাহির করিয়া একে একে সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। পাছে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাই রাত্রে বাহির হইবার যত প্রকার প্রতিবন্ধক

হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। আমার ননদ ও এক জন দাসীকে আমার সঙ্গে শুইতে বলিলাম। ঘরে আলো রাখিলাম। শুইবার সময় ভাল করিয়া সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

"নিস্তব্ধ রজনী। পৃথিবী নিদ্রিত। দক্ষিণের উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া মৃদু মন্দ বায়ু ও চাঁদের আলো ঘরে আসিতেছিল। এমন সুন্দর রজনীতে স্বামিহীনা আমি এক দিকে দাসী অন্য দিকে ননন্দাকে লইয়া চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া কপালের উপর হাতখানি রাখিয়া শুইয়াছিলাম। ঘুমের লেশমাত্রও নাই। জাগিয়া জাগিয়া কেবল স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। এমন সময়ে ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করিয়া এগারটা বাজিল, আমার বুকের মধ্যেও যেন ঢঙ ঢঙ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আর ত সময় নাই! সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আমার চক্ষের সম্মুখে কেবলি ভাসিতে লাগিল। হয় ত এতক্ষণ তিনি আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন! আমি বিধবা, আমার কে আছে! চিরজীবন ত আমাকে এইরূপ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে! দূর কর লোক লজ্জা মান অপমান ভয়! আমি আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিলাম, আলো নিবাইয়া দিলাম, পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া দরজা খুলিলাম; তাহার পর বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া একেবারে খিড়কীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। দূরে একটা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—দুজনায় তাহাতে গিয়া উঠিলাম। গাড়ী ঘড় ঘড় শব্দে চলিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে নির্ম্মল আকাশপটে আমার মৃত স্বামীর শেষ মুখ যেন জাগিয়া উঠিল। আমার মনে হইল যে, ঘড় ঘড় করিয়া তমসাচ্ছন্ন পৈশাচিক অট্টহাস্য প্রতিধ্বনিত পাপভূমি নরকপথে যাত্রা করিয়াছি। চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

"একটি ত্রিতলবাড়ীর সম্মুখে গাড়ী গিয়া থামিল।

"বাড়ীতে ঢুকিয়াই আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। পরিষ্কার বিছানা, ঝাড় লণ্ঠন কৌচ চৌকি দিয়া ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। দেয়ালে নগ্ন রমণীর সব চিত্র টাঙ্গান ছিল। কুলুঙ্গির উপর মদের বোতল ছিল। পাশের ঘর হইতে কোন মুসলমান রমণী উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছিল, আর তাহারি প্রেমাকাঙ্ক্ষী অনেক মুসলমান যুবক বিকৃতস্বরে বাহবা দিতেছিল। আমার স্থানটি ঠিক নরক বলিয়া বোধ হইল। ইহার অপেক্ষা মৃত্যুও শতগুণে ভাল সমস্ত রাত ধরিয়া কেবল কাঁদিলাম।

"সকালে মন আরও হুহু করিতে লাগিল। বাড়ীর জন্য আমি ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিলাম, বাপ মায়ের জন্য প্রাণ যেন কাঁদিতে লাগিল।

"মনের এই ভীষণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শেষে আমি মদ ধরিলাম। মাসখানেকের মধ্যে পাপ আমার নিকট অতিশয় সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইল।

"বাবুটি রোজ রাত্রে একবার করিয়া আসিতেন, আর ভোর হইলেই চলিয়া যাইতেন। সমস্ত দিনটা আমি সাজসজ্জা নিদ্রায় কাটাইয়া দিতাম। এসেন্স্‌ সাবান গহনা কাপড় যখন যাহা আমার দরকার হইত, বাবুটি তাহা দুই হাত ভরিয়া আমাকে দিতেন। বাবুটি সপ্তাহে এক দিন করিয়া রবিবারে আমাকে সঙ্গে লইয়া বাগানবাড়ীতে যাইতেন। এই রকম গঙ্গার ধারে প্রস্তরসোপানশোভী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী, সম্মুখে এই রকম প্রস্তর-মণ্ডিত জলের ফোয়ারা, এই রকম পুষ্করিণী, এই রকম নিবিড় আম্রতরু-কুঞ্জের সার;—ঘর এই রকম সাজান, দেয়ালে এই রকম বাঁধা ছবি, এই রকম মেহগিনির খাট, এই রকম ভেল্‌ভেটের কোচ, এই র— —"

এই সময়ে বাহিরে বৃষ্টির সঙ্গে খুব ঝড় উঠিল। লক্ষ্মী চোখ মুছিয়া বলিল, "বৌ ঠাক্‌রুণ, আজ আর থাক্‌।" প্রভা আগ্রহের সহিত বলিল, "না, তুই শেষ কর্‌।"

লক্ষ্মী বলিতে লাগিল—"বাবুটি শেষে আমাকে বাগানবাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। আমার জন্য অনেক দাস দাসী নিযুক্ত হইল, আমি রাণীর হালে এই রকম খাটে শুইয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম।

"মাস ছয়ের পরে এক দিন বাবু আর এক জন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া বাগানে আনিলেন। আমার ভারি রাগ হইল—বাবুর সাম্‌নেই আমি তাহাকে কথা শুনাইয়া দিলাম। বাবু সে দিন খুব মদ খাইয়াছিলেন। তিনি কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া আমার ঘাড় টিপিয়া ধরিলেন, তাহার পর ধাক্কা দিতে দিতে সিঁড়ির উপরে আমাকে সজোরে ফেলিয়া দিলেন—আমার নাক ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, সাম্‌নের দাঁত দুটি ভাঙ্গিয়া গেল। আমি বাড়ী হইতে রক্তাক্তকলেবরে বাহির হইয়া গেলাম। সেই অবধি আর সে-মুখো হই নাই—বৈরাগীর মত পথে পথে ফিরিয়াছি;—"

লক্ষ্মী হঠাৎ সবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। মাথার পরচুলা সজোরে টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া,

দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া মনোরঞ্জনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওগো, ঐ সেই বাবু, এই সে বাড়ী!" বলিয়াই সিঁড়ি দিয়া তড়্‌তড়্‌ করিয়া নামিয়া একেবারে ঝড়ের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া পড়িল। মনোরঞ্জন প্রভা অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চহিয়া রহিল।

সমস্ত রাত ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি হইল। মনোরঞ্জন প্রভা কেহই ঘুমাইল না।

পর দিন প্রাতেই মনোরঞ্জন বাগানবাড়ী ছাড়িয়া প্রভাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি।

মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠের হোমধেনুকে বাঁচাইবার জন্য আপনার জীবনদানে উদ্যত হইলে, মায়াসিংহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, একটা গরুর জন্য জীবন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমার প্রজাগণকে কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

দিলীপ দুই কথায় ইহার জবাব দিয়াছিলেন। প্রথম, আমি ক্ষত্রিয়; আর্ত্তত্রাণ আমার প্রধান ধর্ম্ম; দ্বিতীয়, আমি এক্ষণে পরাধীন; প্রাণপাতেও প্রভুর নিয়োগপালনে বাধ্য।

আজ কাল যাহাকে 'ইউটিলিটি' বলে, যাহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা Greatest good of the greatest number,—অধিক লোকের হিত, সেই অনুসারে ধরিলে, দিলীপের হিসাবে ভুল হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটা ভুয়া সেন্টিমেন্টের জন্য এতটা সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বিচারমূঢ়ত্বই দেখাইয়াছিলেন। গরুর জীবনের অপেক্ষা তাঁহার জীবনের মূল্য, বশিষ্ঠের নিকট না হউক, অন্ততঃ অবশিষ্ট সমগ্র সংসারের নিকট অনেক অধিক। তাহা বোধ হয় বশিষ্ঠকেও স্বীকার করিতে হইত।

দিলীপ ভাল বুঝেন নাই, কিন্তু তথাপি অদ্যাপি এই ইউটিলিটিতত্ত্বের জয়-জয়-কারের দিনেও এমন লোক অনেক দেখা যায় যে, কর্ত্তব্যনির্ণয়ের সময় ইউটিলিটির হিসাব না করিয়া সেন্টিমেন্টেরই বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

বস্তুতই এই প্রাচীনা বসুন্ধরায় অনেক মনুষ্যজাতি বহুদিন যাবৎ বাস করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে সত্য; তথাপি তাহার জীবনে কোন্ কাজটা করা উচিত, এবং কেনই বা করা উচিত, এই সাধারণ তত্ত্বের অদ্যাপি মীমাংসা হইল না।

তবে সমাজবিশেষে কতিপয় স্থলে মনুষ্যের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ শাস্ত্রের বিধান দ্বারা বিহিত হইয়াছে। এবং সেই বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করিবার, অথবা তাহার যুক্তিযুক্ততাবিষয়ে সন্দেহ স্থাপন করিবার অবকাশও আমাদের একবারে নাই। পরের গাছের আম পাড়িয়া খাইব কি না এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে এই শাস্ত্রে ব্যবস্থা দেয়, যদি ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ধরা পড়িলেই—। বলা বাহুল্য, এই শাস্ত্রের নাম পীনাল কোর্ড; এবং ইহা বিধিবদ্ধ থাকায়, অন্ততঃ কতকগুলা সাংসারিক কাজে কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য বিশেষ মাথাব্যথার দরকার হয় না।

কিন্তু পীনাল কোর্ডের মধ্যে নির্দ্দেশ নাই, এরূপ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্য মনুষ্যের সম্মুখে সদা সর্ব্বদা উপস্থিত হয়, সে স্থলে মানুষ কোন্ পথে যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া আকুল ও দিশাহারা হয়। পথের সংখ্যা এত অধিক, এবং বিশ্বাসী পথপ্রদর্শকের এত অভাব যে, পথিকের অবস্থা এ স্থলে শোচনীয়।

তবে এক সম্প্রদায় পথপ্রদর্শক এইরূপ আশ্বাস দেন যে, এরূপ স্থলেও মনুষ্যের এক উপায় আছে। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-নামধেয় আর একটা পীনাল কোর্ড খাড়া করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, এই কোর্ডের ব্যবস্থা অনুসারে চল, তবে মঙ্গল হইবে। ইহা মানিয়া চলিলে পুরস্কার, না মানিলে শাস্তি। কেন মানিব, এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না। পীনাল কোর্ডের ব্যবস্থা যেমন রাজশক্তি হইতে আসিয়াছে, ইহার ব্যবস্থাও সেইরূপ অপর কোন শক্তি হইতে আসিয়াছে, যাহার উপর তোমার কোন প্রভুত্ব নাই। কোনরূপ দ্বিধা ও দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিয়া চল, তোমার মঙ্গল হইবে।

এইরূপে কোন একটা শাস্ত্রবিশেষ মানিয়া চলিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয়; অন্ততঃ নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয় না, সুতরাং নিজের দায়িত্বের বোঝা হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্তি লাভ করা যায়, এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়ে

অন্তরাত্মা এইরূপ শাস্ত্রের শাসন সকল সময়ে মানিতে চাহে না; অনেক সময়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সকল সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মশাস্ত্র কতকগুলা কার্য্যকে পাপ ও কতকগুলাকে পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে; কিন্তু অনেক স্থলেই শুনা যায়, শাস্ত্রে শাস্ত্রে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভয়ানক মতভেদ। আবার যখন শুনা যায় যে, রবিবারে স্কুলে যাওয়াকে নরহত্যার সহিত সমান পর্য্যায়ে স্থান দিয়া শাস্ত্রবিশেষে উভয়ের জন্য সমান শাস্তির বিধান করিতেছে, তখন সেই ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহাচরণই কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া অন্তরের ভিতর একটা উৎকট অশান্তির আবির্ভাব হয়।

ফলে, মনুষ্যের অন্তর মধ্যে Conscience নামে একটা কি আছে, সে সকল সময়েই মনুষ্যের মনোমধ্যে অশান্তি জাগাইয়া রাখিতেছে। এই কন্সেন্সের দর্শনশাস্ত্রসঙ্গত অভিধান যাহাই হউক, চলিত বাঙ্গালাতে আমরা ইহাকে 'সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি' আখ্যা দিতে পারি। মানুষ যখন এদিকে যাইতে চায়, তখন এই প্রবৃত্তি উহাকে ওদিকে টানে। ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, লোকশাস্ত্র প্রভৃতি যাবদীয় পীনাল কোর্ড যখন মানুষকে এ পথে যাইতে বলে, তখন উহা অন্য পথ দেখাইয়া দেয়। বস্তুতই মনুষ্যের ঘরে ও বাহিরে কুত্রাপি শান্তি নাই। মনুষ্যের অন্তরের ভিতরেও এই একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সর্ব্বদা কলহে ব্যাপৃত রহিয়াছে; এবং অন্তরের বাহিরেও মানুষের অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু অনুরোধ ও উপদেশ ও ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা মানুষের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছে, উহা সকল অনুরোধ ও সকল উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ও সকল ভীতিপ্রদর্শন তাচ্ছীল্য করিয়া, অন্য মার্গ দেখইয়া দিতেছে।

মানুষ যখন নিজের প্রবৃত্তিসমূহের প্ররোচনায়, অথবা বন্ধুবর্গের উপদেশবাক্যে একটা গন্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, এমন সময়ে তাহার অন্তরতম প্রদেশের কোথা হইতে কাহার ধীর গম্ভীর স্বর নিক্রান্ত হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়। প্রবৃত্তির প্ররোচনা তখন আর তাহাকে চালাইতে পারে না; হিতৈষীর হিতবাণী তখন আর ভাল লাগে না; শাস্ত্রের শাসন তখন আর সম্মান পায় না; ইউটিলিটিতত্ত্ব বা অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বের ক্ষতিলাভ গণনা ও হিসাব নিকাশের তখন অবকাশ মিলে না।

মায়াসিংহ যখন দিলীপকে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গে ক্ষতিলাভগণনা ও হিসাব নিকাশের কথা আনিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে

দিলীপের সহজ সরল স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাঁহাকে সেই কদর্য্য ধার্ম্মিকতার প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এবং মনুষ্যের সৌভাগ্য যে, বিবিধ নীতি ও বিবিধ দর্শন ও বিবিধ শাস্ত্র যখন মায়াজাল বিস্তার করিয়া মনুষ্যের চক্ষুকে অন্ধীভূত করে, ও তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার সেই অকৃত্রিম, সরল, সুস্থ, বলিষ্ঠ, ধর্ম্মসংস্কারই তাহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের এই স্বাভাবিক সহজ-সংস্কার বা প্রবৃত্তি, জীবনসংগ্রামে মনুষ্যের এই একমাত্র অকপট সহায়, ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে? এ প্রশ্নের কি উত্তর নাই?

এই স্থানে মনুষ্যপ্রকৃতির একটু আলোচনা আবশ্যক। মনুষ্য স্বভাবতঃ সুখান্বেষী। সুখ শব্দের ও দুঃখ শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই। সুখ-শব্দে কি বুঝায় ও দুঃখ-শব্দে কি বুঝায়, তাহা সূক্ষ্ম বিশেষণ দ্বারা স্থির না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য স্বভাবতই সুখ অন্বেষণ করে, ও দুঃখ হইতে দূরে রহিতে চেষ্টা করে। ইহাতে মানুষের দোষ নাই। প্রকৃতি কর্ত্তৃক মনুষ্য ইহাতে নিয়োজিত। মনুষ্যের অপর ধর্ম্ম যাহাই হউক, জীবনরক্ষা করিয়া চলিতেই হইবে, ইহা তাহার প্রথম ধর্ম্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এবং জীবনরক্ষার জন্যই সে সুখের অন্বেষণ ও দুঃখের পরিহার করিয়া থাকে। যদি প্রকৃতির ব্যবস্থা অন্যরূপ হইত, যদি জীবন-রক্ষায় মনুষ্যের প্রবৃত্তি না থাকিত, যদি মনুষ্য সুখ ত্যাগ করিয়া স্বভাবের তাড়নায় দুঃখের প্রতি ধাবিত হইত, তাহা হইলে জগতের ইতিহাসে মনুষ্য-জাতিসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা বোধ হয় অস্তিত্বহীন হইত; অন্ততঃ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উৎপীড়ন হইতে পাঠকবর্গ অব্যাহতি পাইতেন, ইহা নিঃসংশয়ে ও অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অথবা তাহার সম্ভাবনাই বা কোথায়; কেন না, যাহা জীবনের অনুকূল, তাহারই নাম সুখ; যাহা জীবনের প্রতিকূল, তাহারই নাম দুঃখ। কাজেই যাহাকে জীবন ধরিতে হইবে, সে সুখসাধনে ও দুঃখপরিহারে বাধ্য। তাহার গত্যন্তর নাই। সময়ে সময়ে দেখা যায় বটে, সুখান্বেষণেই মনুষ্যের বিপদ ঘটে, তাহার জীবন বিপৎসঙ্কুল হয়; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে।

মানুষ মনুষ্যত্বলাভের পূর্ব্বেই বোধ করি জীবত্ব লাভ করিয়াছে। সংসার-মধ্যে মনুষ্য একটা জীব। তাহার জীবনরক্ষাবিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহি-য়াছে। এই প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহাকে এতদিন সংসারে টিকিতে হইত

না, ও পাপপুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া আমাদিগকেও তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। জীবনরক্ষাই তাহার প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম। অন্যান্য জীবের সহিত এই স্থলে তাহার সাধারণত্ব। জীবনরক্ষার অনুকূল পথে তাহাকে চলিতে হইবে, নতুবা তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না, প্রকৃতি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং প্রকৃতি এই জন্য তাহাকে সুখান্বেষী করিয়াছেন। কোন্ পথ জীবনের অনুকূল, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সকলের ক্ষমতা নাই; অথবা তাহা পদে পদে বিচার করিয়া জানিতে গেলে জীবন রক্ষা হয় না; জীবন-সমর এমনি ভয়ানক। সেই জন্য প্রকৃতিই তাহার কতকগুলি মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সেই মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকে।

সেই স্বভাবজাত মনোবৃত্তির নাম সুখান্বেষণপ্রবৃত্তি বা দুঃখপরিহারপ্রবৃত্তি। সে সেই প্রবৃত্তির বশে চলে বলিয়াই আজি পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব। সত্য বটে, এই সুখান্বেষণপ্রবৃত্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তাহাকে ঠিক পথে, জীবনের অনুকূল পথে, লইয়া যায় না। সে প্রকৃতির ব্যবস্থার দোষ। কিন্তু তাহার পক্ষে অন্য উপায় নাই। ভালই হউক আর মন্দই হউক, জীবন থাক আর নষ্টই হউক, সে সুখান্বেষণে বাধ্য। এবং সর্ব্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলেই সুখ জীবনের অনুকূল, দুঃখ জীবনের প্রতিকূল। সুতরাং জীব যে সুখ চাহে, ও জীবধর্ম্মা মনুষ্যও যে অন্য জীবের মত সুখান্বেষণ করে, ইহাতে মনুষ্যের দোষ নাই। ইহা প্রকৃতির বিধান। ইহাতে মঙ্গল; ইহা সত্যকথা;—ইহার অপলাপ করিও না।

মনুষ্য জীব ও সুখান্বেষী, প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ। এই পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। এক জীবের জীবন নষ্ট না করিলে অন্য জীবের জীবন রক্ষা হয় না; একের যাহাতে সুখ, অন্যের তাহাতে দুঃখ; অপরকে দুঃখ না দিলে নিজের সুখ নাই। ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থার উপর জগৎ সংসার প্রতিষ্ঠিত। আহার বিনা জীবন রক্ষা হয় না, এবং জীবের আহার জীব।

ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর, কিন্তু ইহার উপর তোমার আমার হাত নাই। প্রকৃতির ব্যবস্থার উপর তোমার আমার প্রভুত্ব নাই। জীবন রাখিতে হইবে, অথচ অন্যকে নাশ না করিলে জীবন থাকিবে না। জীবমাত্রের এই চেষ্টা, জীবমাত্রের এই দিকে গতি; ফলে ঘোর জীবন-সংগ্রাম। মূলে এই দ্বন্দ্ব; এবং এই দ্বন্দ্বের উপর সমগ্র জাগতিক ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত। জগৎ-ব্যাপারের আগা-

গোড়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্ব দেখা যায়, এই স্থলেই তাহার মূল। এইখান হইতেই ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তি। এইখানে স্বর্গ ও নরকের, ঈশ্বর ও শয়তানের কল্পনা।

মূলে দ্বন্দ্ব ; সংগ্রাম, বিবাদ, রক্তপাত ; অথচ ইহা নহিলেও যেন চলিত না। দ্বন্দ্ব হইতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব হইতে মৃত্যু, দ্বন্দ্ব হইতে পাপ। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-হীন, দুঃখহীন, মৃত্যুহীন, পাপহীন জগৎ কেমন হইত, তাহা ত কই কল্পনায় আসে না। কবির কল্পনায় হয় ত আসিতে পারে। দ্বন্দ্ব নাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মরণ নাই, পাপ নাই, সবই সুখ, সবই শক্তি, নিরবচ্ছিন্ন যৌবন, আর বসন্ত, আর মলয়-পবন ; কিন্তু সে কবি কেমন, তাহা আমরা বুঝি না। জরামরণহীন দুঃখদ্বন্দ্বহীন অস্তিত্বের সহিত নাস্তিত্বের কি প্রভেদ, আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব, সন্দেহ নাই।

প্রকৃতির এই অভিব্যক্তি, এই বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য, জীবনের এই উচ্ছ্বাস ও বিকাশ, সেই সনাতন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হইতেই ইহার জন্ম। মৃত্যু ছাড়িয়া জীবন নাই, দুঃখ ছাড়া সুখ নাই, পাপ ছাড়িয়া পুণ্য নাই, জগতের এই সর্ব্ব-প্রধান সত্য।

জীবনরক্ষার জন্য জীবে জীবে দ্বন্দ্ব, নখানখি, দন্তাদন্তি, রক্তারক্তি ; ফলে জীবমধ্যে অভিব্যক্তি, উচ্চের আবির্ভাব, নীচের তিরোভাব ; দুর্ব্বলের পরা-জয়, সবলের জয়। জীবন-সংগ্রাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। অভিব্যক্তি, বিকাশ, উন্নতি ;—সঙ্গে সঙ্গে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন উদ্দেশ্য, নূতন অশান্তি, নূতন দ্বন্দ্ব। জীবমধ্যে এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান, এবং জীবসমাজে মনুষ্যমধ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা।

এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বকোলাহলমধ্যে প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য দেখিতেছ? জীবের প্রতি দয়া? ব্যক্তি জীবনের রক্ষণপ্রয়াস?—বাতুলের কথা। জীবনরক্ষার উৎকট প্রয়াসে জীবগুলী ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে ; কিন্তু জীবনরক্ষা ত হয় না। সুখান্বেষণে প্রবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবমাত্রই ছুটিতেছে ; আপন জীবনরক্ষার জন্য ; পরের জীবনে দয়া করিবার তাহার অবসর নাই। কিন্তু সেই আপন জীবনই কি রক্ষা পায়? অভিব্যক্তি? উন্নতি? কাহার? ব্যক্তির নহে।—জাতির। জীবন-সংগ্রামে ব্যক্তিজীবনের জীবনব্যাপী প্রয়াসের চরম ফল মৃত্যু ;—মৃত্যুর চরম ফল জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়। ব্যক্তি যায়, জাতি থাকে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য জাতীয় অভিব্যক্তি, জাতীয় উন্নতি, ব্যক্তির জীবন

তাহার নিকট মূল্যহীন। ব্যক্তির জীবন খেলার পুতুল, ক্রীড়নক। ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃতি আপন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিয়া লয়—সে উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের নাশ, জাতীয়তার বিকাশ। মনুষ্যজাতি আজিও মহাদম্ভে পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের তীব্র ও উৎকট উত্তেজনা লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা। তুমি মরণের কুক্ষিতে বিস্মৃতিগর্ভে অন্তর্হিত হও, তোমাকে লইয়া প্রকৃতির আর কোন দরকার নাই। তোমার জীবনের যেটুকু কাজ, তাহা তোমা দ্বারা প্রকৃতি সাধিয়া লইয়াছে। তুমি যাও, অপরকে স্থান দাও। অন্তিমকালে ব্যক্তিমাত্রের প্রতি প্রকৃতির এই নির্ম্মম বাণী।

প্রকৃতির নিকট ব্যক্তির জীবন মূল্যহীন; জাতির অভ্যুদয় তাহার উদ্দেশ্য। তবে জাতির অভ্যুদয়সাধনের জন্য ব্যক্তিমাত্রকে কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখিয়া খাটাইয়া লইতে হয়; তাই প্রকৃতির প্ররোচনায় ব্যক্তিমাত্রই জীবন ধরিয়া খাটিতেছে। সে মনে করে, আমি আপন জীবনের উৎকর্ষের জন্য এত প্রয়াস এত যত্ন করিতেছি। কিন্তু হায় সে জানে না, কি বিষম প্রতারণায় সে প্রতারিত।

জীব প্রকৃতির তাড়নায় কাজ করে; তাহাতেই তাহার সুখলাভ। তাহাতেই তাহার জীবন কিছু দিনের জন্য রক্ষিত হয়; প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহার যত দিন বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক, তত দিন তাহার জীবন রক্ষিত হয়। কিছু কাল জাতীয় জীবন পুষ্টি পায়। সে জানে না, কি উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সে জীবিত রহিয়াছে। ক্ষুধার উত্তেজনায় ব্যাঘ্র ছাগশিশুর উপর লম্ফ দিয়া পড়ে; স্বভাবের উত্তেজনায় প্রকৃতির তাড়নায় সে এমন করে; এমন না করিয়া তাহার উপায় নাই। সে প্রবৃত্তির দাস; প্রকৃতি কর্ত্তৃক সে অন্ধভাবে ছাগহত্যায় নিয়োজিত। সে ক্রীড়াতে তাহার স্বাধীনতা নাই। তাহার নিজ জীবন ঐরূপে কিছু দিন ধরিয়া রক্ষা করিতে হইবে। কেন না, প্রকৃতির একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। যত দিন সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, সে ক্ষুধার উত্তেজনায় ছাগশিশু হত্যা করিয়া নিজ জীবন বর্দ্ধন করিতে থাকুক। আবার আততায়ী যখন ব্যাঘ্রশিশুকে আক্রমণ করে, তখন কুপিতা ব্যাঘ্রী তাহার উপর লাফ দেয়; তখন নিজ জীবনে জন্য তাহার মমতা থাকে না। এখানে ব্যাঘ্রীও সেইরূপ স্বাধীনতাবর্জ্জিত ক্রীড়নকমাত্র। তাহার প্রকৃতি তাহাকে সন্তানের জীবনের জন্য আত্মজীবনে মমত্বহীন করে,

সে স্বার্থান্বেষণে অবসর পায় না। ইহাতেই তাহার সুখ; শিশুর জীবন রাখিবার জন্য আপন জীবন দান করিতে তাহার সুখ। প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহাকে ঐরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন। সে প্রবৃত্তির অনুজ্ঞা-পালনে বাধ্য।

মনুষ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা। জীবমধ্যে মনুষ্যের স্থান সকলের উপরে, কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা বোধ করি সকলের অপেক্ষা শোচনীয়। এই অবস্থার শোচনীয়তাতেই তাহার মনুষ্যত্ব। ইতর জীব জীবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে; কিন্তু সে বোধ করি জানে না, তাহার সমস্ত চেষ্টার পরিণতি মৃত্যু। মনুষ্যও তাহার মতই জীবনযুদ্ধে নিরত; কিন্তু মনুষ্য জানে যে, মরণ অবশ্যম্ভাবী। ইতর জীব প্রবৃত্তির বশে কাজ করে; কিন্তু সেই কাজের ফল কি হইবে না হইবে, তাহা সে জানে না ও ভাবে না; তাহার জন্য সে দায়িত্বশূন্য। মনুষ্যও প্রবৃত্তির বশে কাজ করে; কিন্তু আপন কার্য্যের ফল আপন চোখে দেখিতে পায়; এবং সময়ে সময়ে সেই ভবিষ্যৎ ফল পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া বিচারশক্তি দ্বারা প্রবৃত্তির মুখ ফিরাইয়া লয়। ইতর জীবের রাস্তা একটা; মানুষের রাস্তা সাধারণতঃ অনেকগুলি। আপনার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে প্রবৃত্তিকে সংহত ও সংযত করিয়া রাস্তা পছন্দ করিয়া লইতে হয়। সেই দায়িত্ব তাহার স্কন্ধের উপর। মনুষ্য জীব; কিন্তু বুদ্ধিজীবী বিচারপরায়ণ দায়বান্ জীব।

এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের সহিত ইতর জীবের আর একটা প্রভেদ আছে। মনুষ্য শারীরিক বলে দুর্ব্বল। মানুষের নখে ও দাঁতে ধার নাই, ও মাংসপেশীতে জোর নাই। বুদ্ধিবৃত্তি জীবনসংগ্রামে মানুষের সহায়; কিন্তু কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবনধারণ সহজ কথা নহে। সেই জন্য মনুষ্যকে দল বাঁধিয়া থাকিতে হয়। মনুষ্য একা যাহা পারে না, দল বাঁধিয়া তাহা পারে। এই জন্য মনুষ্য-মধ্যে সমাজের উৎপত্তি। অন্যান্য কোন কোন জীবের মধ্যেও সমাজের অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়; কিন্তু অন্যত্র যাহার অঙ্কুর, এখানে তাহা পল্লবিত বৃক্ষ। প্রধানতঃ সমাজ বাঁধিয়া মনুষ্য জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; তাহার জীবত্ব পূর্ব্ব হইতেই ছিল; কিন্তু এই সামাজিকত্বের উৎপত্তির সহিত তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের আরম্ভ।

মনুষ্য জীব, কিন্তু বুদ্ধিজীবী, বিচারপরায়ণ সমাজবদ্ধ জীব। অন্য জীবের মতই মনুষ্য স্বার্থরক্ষার জন্য, অর্থাৎ জীবনরক্ষার জন্য নিযুক্ত; কিন্তু অধিকন্তু

মনুষ্য সমাজরক্ষণেও বাধ্য; কেন না, সমাজরক্ষা না হইলে তাহার জীবন-রক্ষা ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটা দ্বন্দ্ব পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু এইখানে আর একটা নূতন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব। কেন না, ব্যক্তিত্বরক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজন; তথাপি ব্যক্তির স্বার্থ সকল সময়ে সমাজের স্বার্থের সহিত এক নহে। সমাজ রাখিতে হইলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কতকটা সংহার করিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আপনার দিকে চাহিলে চলিবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দিন ছিল, যখন মনুষ্যের সহিত ইতর জীবের তেমন তফাত ছিল না; মনুষ্য যখন সমাজবদ্ধ জীবমধ্যে গণ্য হয় নাই, তখন তাহার আপনার সুখের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিলেই চলিত; তজ্জন্য প্রকৃতি তাহাকে যে সকল প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, সেই সকল প্রকৃতির আদেশে চলিলেই তাহার জীবনের কাজ সম্পাদিত হইত। কিন্তু একবার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলেই আর ঠিক্ সে অবস্থা থাকে না। মনুষ্যের জৈব প্রবৃত্তি-গুলি তাহাকে সমাজের বাহিরে আনিতে চায়; কিন্তু সমগ্র সামাজিক শক্তি তাহাকে সমাজের ভিতরে ধরিয়া রাখে। একটা বল তাহার আত্ম-জীবনকে কেন্দ্রে রাখিয়া কাজ করে; আর একটা বল তাহাকে সেই কেন্দ্র হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া অপরের দিকে আকর্ষণ করে। ব্যক্তিত্বের সহিত সামাজিকত্বের এইরূপ দ্বন্দ্ব। দুইটার মধ্যে এক রকম সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাকে চলিতে হয়। তাহার পা দুই নৌকায়; এবং দুই নৌকায় যতক্ষণ পা থাকে, জীবনটাও ততক্ষণ বড় সুখের হয় না।

এই সামঞ্জস্যরক্ষা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোটি পুরুষ হইতে সমাগত জীবসাধারণ জৈব প্রবৃত্তি সমুদয় তাহাকে আত্মসুখে ও স্বার্থসুখে প্রেরিত করে; সামাজিক শক্তিনিচয় তাহাকে অপরের দিকে ও পরার্থমুখে টানিয়া ধরে। জৈব প্রবৃত্তিগুলি প্রবল ও বেগবান্, কোটি কোটি বৎসরেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহারা মানুষের প্রাণের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে; তাহাদের প্ররোচনা অতিক্রম করিয়া চলা মানুষের পক্ষে সহজ নহে। এই প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক সংস্কার স্বরূপে জন্মাবধি মানুষকে চালিত করে; মানুষের ক্ষমতা নাই যে, ইহাদিগকে সকল সময়ে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখে। অথচ সমাজের জীবন ব্যক্তিজীবনের অপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ; সমাজের জন্য ব্যক্তিজীবনে স্বার্থসংহার নিতান্তই আবশ্যক। মানুষের জীবত্ব কতকাল হইল স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; তাহার তুলনায় তাহার সামাজিকত্ব আধুনিক ব্যাপার। এখনও

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহার সামাজিকত্বের অভিব্যক্তিতে হাত খেলাইবার অবসর পায় নাই। সামাজিকত্ব এখনও সম্পূর্ণভাবে পুষ্টিলাভ ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই। এইখানেই মনুষ্যজীবনের প্রধান সমস্যা। এইখানে মনুষ্যত্বের দায়িত্বের সূত্রপাত। এইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের ভিত্তিস্থাপন। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকত্ব, Individualism ও Socialism, লইয়া যে ঘোর কোলাহল মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে, এইখানেই তাহার আরম্ভ।

মনুষ্য কি পরিমাণে স্বতন্ত্র থাকিবে ও কি পরিমাণে পরতন্ত্র থাকিবে, তাহার মীমাংসা আবশ্যক, অথচ মীমাংসার কোন উপায় অদ্যাপি আবিষ্কার হয় নাই। প্রকৃতির সর্ব্বত্র যেমন বিধান, এখানেও সেইরূপ। দুই দিকে টানাটানি; বলে বলে শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষ; যে পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত জিতিয়া যায়। জীবনসমরে বাঘের জয় কি ছাগলের জয়, প্রকৃতি একবারে মীমাংসা করিয়া দেন না। সংসারক্ষেত্রে বাঘকে ও ছাগলকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা পুরুষপুরুষান্তর ধরিয়া মারামারি করিয়া মরুক। শেষ পর্য্যন্ত একের জয় হইবে, অথবা উভয়েই লোপ পাইলে, উভয়ের রক্তবীজ হইতে অন্য জীবের উদ্ভব হইবে। সেইরূপ স্বার্থের জয় কি পরার্থের জয়, ব্যক্তির জয় কি সমাজের জয়, প্রকৃতি কিছুই বলেন না। মনুষ্যত্বের বিকাশ আবশ্যক। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিত্বেরও অভিব্যক্তি আবশ্যক, সামাজিকত্বের অভিব্যক্তি আবশ্যক। ব্যক্তিত্ব সামাজিকত্বের সহিত সনাতন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত থাকুক, দ্বন্দ্বে ক্রমে উভয়েই স্ফূর্ত্তিলাভ করুক, পুষ্টিলাভ করুক, অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হউক। প্রকৃতির ব্যবস্থা সর্ব্বত্র এইরূপ।

জীবের স্বার্থ সুখ প্রবৃত্তিসমূহ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত; মনুষ্য সেই সকল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় চলে, অন্যান্য জীবের মতই চলে। তাহাদের প্ররোচনাতে চলিয়াই মনুষ্যের সুখ, স্বার্থসংহারে মনুষ্যের অসুখ। অথচ স্বার্থসংহার আবশ্যক। নতুবা সমাজ থাকে না; সমাজ না থাকিলে আবার দুর্ব্বল মানুষের জীবনও দুরন্ত সমরে ক্ষণেকের বেশী টিকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং স্বার্থসংহার আবশ্যক; কিন্তু স্বার্থসংহার মনুষ্যের জৈবপ্রবৃত্তির বিরোধী; স্বার্থসংহারে মনুষ্যের সুখ নাই। মানুষকে জোর করিয়া স্বার্থ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। অঙ্কুশাঘাতে ও কশাঘাতে মনুষ্যকে তাহার প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। এই নিবর্ত্তনপ্রণালীর নাম শাসন। রাজশাসন, লোকশাসন,

নীতির শাসন, ধর্ম্মশাসন, বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া, বিবিধ প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা মানুষকে শাসনে রাখিতে হইবে। কখন পুরস্কার, কখন তিরস্কার; কখন তাহার কামুকতার উত্তেজনা, কখন বা বিভীষিকার নির্য্যাতনা। রাজদণ্ডহস্তে রাজা বলিতেছেন, আমার আদেশে তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত কর, নতুবা বেত্রাঘাত, কারাবাস, প্রাণদণ্ড। সমাজপতি বলিতেছেন, আমার নিষেধ মানিয়া জীবনবৃত্তি নিয়মিত কর, নতুবা সামাজিক নির্য্যাতন, সমাজ হইতে নির্ব্বাসন। নীতি-প্রচারক বলিতেছেন, আমার কথা অনুসারে জীবনপ্রণালী সাজাইয়া লও, নতুবা তোমার ইহত্র পরত্র কুশল নাই। পুরোহিত থাকিয়া থাকিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেছেন, আমার আদেশের সম্মান সকলের আগে; নতুবা কুম্ভীপাক তোমার জন্য প্রস্তুত। প্রবৃত্তির উত্তেজনা স্বাভাবিক, তাহা না মানিলে নয়; সমাজের শাসন কৃত্রিম, কিন্তু তাহা না মানিলেও জীবন থাকে না। মানুষের মত দুঃখী জীব আর কোথায়?

স্বভাবের সহিত কৃত্রিমতার এইরূপ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে মনুষ্যজীবন সুখ দুঃখে একরূপে চলিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতিও এদিকে নিশ্চিন্ত থাকেন না। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি যেমন জাতিরক্ষার জন্য আবশ্যক, সামাজিকত্বের বিকাশও সেইরূপ জাতিরক্ষার জন্যই ততোধিক আবশ্যক। সেই জন্য কতক গুলা কৃত্রিম শক্তির হস্তে সামাজিকত্বের অভিব্যক্তির ভার দিয়া প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্য বুদ্ধিজীবী ও বিচারপরায়ণ জীব। সে অতীতের স্মৃতি রাখে, ভবিষ্যৎ গণিতে পারে। এক পার্শ্বে অতীতের অভিজ্ঞতা, অপর পার্শ্বে ভবিষ্যতের পুরোদর্শন। উভয়ের সাহায্য পাইয়া সে কর্ত্তব্য বিচার করিয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানিয়া চলিলে আশু সুখলাভ নিশ্চিত; কিন্তু সমাজের শাসন না মানিলে ভবিষ্যতে বিপদ। ভবিষ্যতের ভয়ের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনায় প্রতিফলিত হইয়া আশু সুখের প্রলোভনকে আচ্ছাদিত করে। মনুষ্য তখন প্রবৃত্তির পথ ছাড়িয়া নিবৃত্তিমার্গে চলিতে থাকে। কিন্তু এমন করিয়া কত দিন চলে? প্রবৃত্তির বেগ উৎকট বেগ; বর্ত্তমান সুখের প্রলোভন তীব্র। মনুষ্যকে পদে পদে পথভ্রান্ত হইয়া সমাজের নিকট লাঞ্ছিত তিরস্কৃত হইতে হয়, এবং আপন সর্ব্বনাশের সহকারে সমাজের সর্ব্বনাশও আসিয়া পড়ে। এরূপ বন্দোবস্তে চিরকাল চলে না। স্বভাবের সম্মুখে কৃত্রিমতাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া চিরকাল প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রকৃতি ধীরে ধীরে কাজ করেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

ব্যক্তির সহিত সমাজের বিরোধ; যে সমাজে ব্যক্তিত্ব যত উচ্ছৃঙ্খল, সে সমাজ সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। জীবে জীবে যেমন দ্বন্দ্ব, মনুষ্যে মনুষ্যেও তেমনি দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তিত্বের পুষ্টি। আবার সমাজের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব মনুষ্যের ইতিহাসের সহব্যাপী। ভিতরে যেমন জনে জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাহিরে তেমনি দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, সমাজে সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। কোন সমাজ দুর্ব্বল? যাহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব অধিক, সামাজিকত্ব যেখানে জন্মে নাই। কোন সমাজ সবল? যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সমবেত সমাজশক্তির করায়ত্ত। কাহার পরাজয়? যেখানে ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের প্রতিকূল, যেখানে ব্যক্তিজীবন আপনাকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিয়া থাকে। কাহার জয়? যেখানে ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের অনুকূল, যেখানে প্রবৃত্তি নিরঙ্কুশ নহে; যেখানে নিবৃত্তিধর্ম্ম প্রবৃত্তিধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত রাখে। দুর্ব্বলের পরাজয় ও লোপ, সবলের জয় ও স্ফূর্ত্তি। কালে স্বার্থপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ সংহত হইতে থাকে, জীবনের পরিধি প্রসার লাভ করে; জীবনের আয়তন বর্দ্ধমান হয়। নিবৃত্তি আসিয়া প্রবৃত্তির বেগ কমাইয়া দেয়। নিবৃত্তি প্রবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনে নিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়; নিবৃত্তি ক্রমশঃ কৃত্রিম সমাজশাসনের মুখাপেক্ষা পরিহার করিয়া স্বভাবের বলে বলীয়ান হয়। মনুষ্যের অন্তর মধ্যে প্রবৃত্তির পার্শ্বে নিবৃত্তি আসিয়া দেখা দেয়। যাহা আত্ম হইতে নিবৃত্তি, তাহারই নাম পরমুখে প্রবৃত্তি। আত্মমুখপ্রবৃত্তির পার্শ্বে এই নবোদ্গত পরমুখপ্রবৃত্তি আসিয়া দেখা দিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণে নূতন বলের সঞ্চার হয়। এত দিন মনুষ্যের ইতিহাস জীবের ইতিহাস; আজ হইতে মনুষ্যের ইতিহাস মনুষ্যের ইতিহাস। জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা, জগতের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ।

মনুষ্যের জৈব প্রবৃত্তি এত দিন তাহাকে স্বার্থসাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, তাহাতেই তাহার সুখ ছিল, তাহাতেই তাহার শান্তি ছিল। সমাজের কৃত্রিম শাসন জোর করিয়া ভয় দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া, তাহাকে শাসনে রাখিত, তাহার জীবনের গতি কতকটা পরমুখে লওয়াইত। আজ হইতে তাহার স্বভাবই তাহাকে পরমুখে চলিতে বলে। নূতন একটা প্রবৃত্তি তাহাকে পরের মুখে চালিত করিতে থাকে। এই নূতন প্রবৃত্তি, সমাজরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে কালসহকারে যাহার বিকাশ, ইহাকেই মানুষ প্রবৃত্তি বলিতে পারে; কেন না, মনুষ্য ভিন্ন ইতরজীবে ইহার অস্তিত্ব নাই।

মনুষ্যের ইহাতেই বিশেষত্ব। মনুষ্যত্বের ইহাই প্রধানতম অঙ্গ ও উপাদান, ইহারই নাম স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইংরাজীতে conscience। মনুষ্যের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কে আসিয়া নবাগত অপরিচিতের মত দেখা দেয়, মানুষ তাহাকে ভাল করিয়া যেন চেনে না; মানুষের কাছে সে যেন নূতন। স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিতে যখন সে ভিতর হইতে কথা কয়, মনুষ্য তখন স্তম্ভিত হয়; মনুষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মত তখন তাহার আদেশবাণী মানিয়া চলে। জৈব প্রবৃত্তি মনুষ্যকে আত্মসুখে যখন চালাইতে যায়, তখন সে সেই প্রবৃত্তির মুখে বল্গা ধরিয়া দাঁড়ায়, তাহার গতি রোধ করে, তাহার বেগ সংযত করে। সে নবাগত অপরিচিত, কিন্তু কৃত্রিমতাশূন্য; স্বভাব হইতে তাহার উৎপত্তি, সংসারের মলিন মৃত্তিকায় তাহার অঙ্গ গঠিত হয় নাই। মনুষ্য তাহাকে ভয় করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাকে ভক্তি করে, অবহেলে তাহাকে প্রেমের আলিঙ্গন দিতে শিক্ষা করে। মানবাত্মার প্রিয়তম সখা, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? এত দিন তোমার অদর্শনে মানবাত্মা যেন ব্যাকুল ছিল। তোমার সিংহাসনে তুমি দৃঢ় হইয়া আসন গ্রহণ কর। আত্মার সহিত তোমার প্রীতির বন্ধন যেন কখন বিচ্ছিন্ন না হয়। জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে বিশ্বাসী পথপ্রদর্শক তুমি, দুর্ব্বল মানুষ জীবকে পথ দেখাইয়া দাও, তোমার অনুজ্ঞা পালন করিয়া সে নিশ্চিন্ত ধন্য ও কৃতার্থ হউক। মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের মত মানবাত্মা এত দিন মিথ্যা প্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া এ দিকে ও দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজি কাল্পনিক আশা, কালি কাল্পনিক বিভীষিকা, তাহাকে মরুক্ষেত্রে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল। আজ সে বিশ্বাসী অনুগত আত্মীয় সহচর পাইয়াছে। আজ সে জীবনে শান্তি লাভ করিবে। আজ তাহার জীবনে দুঃখের রজনী পোহাইবে।

রাজশাসন ও লোকশাসন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র, মনুষ্যসমাজে কত কাল আধিপত্য করিয়াছে; জীবধর্ম্মী মনুষ্যের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য এত দিন তাহাদের আধিপত্যের প্রয়োজন ছিল। এখনও মনুষ্যসমাজ এমন অভিব্যক্ত হয় নাই, এখনও মনুষ্যপ্রকৃতি এমন পুষ্টিলাভ করে নাই যে, সেই সকল কৃত্রিম শাসনের, কাল্পনিক আশার ও কাল্পনিক বিভীষিকার প্রভুত্বের আর প্রয়োজন নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি মনুষ্যের প্রতি দয়াপরা; ব্যক্তিজীবনের প্রতি না হউন, জাতীয় জীবনের প্রতি সদয়া। কৃত্রিমতার স্থানে স্বভাবের প্রভুত্ব স্থান পাইবে। কল্পনার স্থানে সত্য

আসিয়া শোভা পাইবে। জৈব প্রবৃত্তি এত কাল মানুষকে চালাইয়াছে, এখন মানুষ প্রবৃত্তি মানুষকে চালাইবে। অন্তর মধ্যে উভয় প্রবৃত্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছু দিন ধরিয়া অনিবার্য্য। তত দিন ধরিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধ, পাপের সহিত পুণ্যের সমর। প্রকৃতির খেলায় এই দ্বন্দ্বের ফলে মানুষপ্রবৃত্তির বিকাশ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভ্যুদয় ও স্ফূর্ত্তিলাভ। প্রবৃত্তির আদেশপালনে সুখ। জৈব প্রবৃত্তির আদেশপালনে এত কাল মনুষ্যরূপী জীবেরও সুখ ছিল ; কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তির আদেশপালনেই কি সুখ জন্মিবে না ? মনুষ্য সুখান্বেষী রহুক, ক্ষতি নাই ; এত দিন স্বার্থসাধনে তাহার সুখ ছিল, এখন পরার্থসাধনেই তাহার অকৃত্রিম আনন্দ জন্মিবে।

এমন দিন কি মনুষ্যের অদৃষ্টে আসিবে না, যখন জীবধর্ম্ম ও মানুষ ধর্ম্ম পরস্পর সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে ? উভয়ে যখন মিশিয়া এক হইয়া যাইবে ? স্বার্থসাধনে যখন পরার্থে ব্যাঘাত পড়িবে না, পরার্থসাধনে যখন স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে ? মানুষ এখন যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বভাবের অঙ্কুশতাড়নায় আত্মসুখান্বেষণে রত থাকে, তখনও সেইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী হইয়া পরসুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। ব্যাঘ্রী যেমন স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া শিশু সন্তানের প্রাণের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুখলাভ করে, মানুষও তখন কেবল আপন শিশুর জন্য নহে, আপন পিতা বা ভ্রাতা বা বান্ধবের জন্য নহে, দূরতম-অপরিচিত মনুষ্যের হিতের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিবে। পরই তখন আপনার হইবে, আত্মপরে তখন বিভেদ থাকিবে না। সন্তান পিতামাতার অঙ্গীভূত, ফল যেমন বৃক্ষের অঙ্গীভূত। সন্তান পিতামাতার পক্ষে পর নহে, শাখাও যেমন বৃক্ষের অনাত্মীয় নহে। মনুষ্যসমাজ ছোট বড় যে যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সকলেই এক প্রকাণ্ড মানবজাতিরূপ মহাশ্বত্থের শাখাভূত অঙ্গমাত্র। আপন পর কোন বিভেদ নাই। পরার্থে ও স্বার্থে বিভেদ নাই। স্বার্থ পরার্থের অনুকূল, পরার্থ স্বার্থকে জাগ্রত করে। স্বার্থান্বেষণে সুখ ; পরার্থান্বেষণে কেনই বা দুঃখ হইবে ? প্রকৃতির খেলার শেষ হইবে না ; প্রকৃতির খেলার পরিণতি কোথায়, কে বলিতে পারে ?

যাহাতে সমাজের মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম ; তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্য বাধ্য। তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাভাবিক সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উপদেশ দেয়। সমাজের মঙ্গল কোন্ কাজে ? কে বলিয়া দিবে কোন্ কাজে ? এখানে মনুষ্যের বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস নাই। ক্ষতিলাভগণনা সহজ কথা নহে ;

সামাজিক গণিতশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করিতে এখনও অনেক সময় আবশ্যক। সমাজের মঙ্গলে ধর্ম্ম; এবং সমাজের মঙ্গলের অর্থ Greatest good of the greatest number, অধিক লোকের অধিক হিত। ইউটিলিটিতত্ব এই অর্থে ঠিক্। কিন্তু কোন্ কার্য্যে অধিক লোকের অধিক হিত, কে গণনা করিয়া নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে? বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস করিও না; বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করিও না। সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, মনুষ্য যাহা স্বভাবের নিকট পাইয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর কর; সে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। তাহার নির্দ্দেশে মন, অন্তঃশরীর, স্বাস্থ্য লাভ করিবে; জীবন বল লাভ করিবে। আপাততঃ মনে হইতে পারে, প্রকৃতি তোমার প্রতি নিষ্ঠুরা; কিন্তু তোমার যশঃশরীরে প্রকৃতি দয়াবতী। প্রকৃতি তোমার যশঃশরীর রক্ষা করিবেন। তুমি প্রকৃতির আদেশ পালন কর।

মহারাজ দিলীপ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিলেন; ইউটিলিটিতত্বে নির্ভর করিয়া ক্ষতিলাভগণনায় তিনি সাহসী হয়েন নাই। মায়াসিংহের নিকট তিনি বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু মনুষ্যের সমাজজীবন যত দিন অভিব্যক্তির অনুকূলে, তত দিন সুস্থ সবল আত্মা এইরূপ বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হইবে না।

কর্ণমর্দ্দনকাহিনী।

১

জানো না কি কদাচন মূঢ়, *
কর্ণ-বিমর্দ্দন-মর্ম্ম কি গূঢ়?
কর্ণ দিবাদ কি কারণ অজ্ঞ,
না যদি তা আকর্ষণ জন্য?
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদর-চিহ্ন;
তবু সাহিব যদি অঙ্গে স্বল্পে
টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে;
অন্তত নাসারক্ষার্থে সে
কাণমলা হয় গিলিতে হেসে।

২

বাবা! সে দশ ইঞ্চি প্রস্থে
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে—
শূকর-গো-মৃগ-মাংসে পুষ্ট—
(আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট?)
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,—
যা কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ;
হুজুর হুজুর বলি' জীবন মরণে
রব পড়ি ইন্দুবিনিন্দিত চরণে;
রহিও খুসি,—ঘুঁষি আসটা রাগে
মেরো না কো কেবল নাকে।

৩

ঐ ঘুঁষি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
ত্রিভুবন; শুনি শুধু ঝাঁ ঝাঁ শব্দ:
ও ঘুঁষি পড়িলে গণ্ডে জোরে
একেবারে মাথা ঘোরে;
কাণা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে;

---

* পজ্ঝটিকা ছন্দে পড়িতে হইবে। যথা,—'মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং' ইত্যাদি।

ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষ ;
পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পংক্তি ;
পড়িলে নাকে রক্তারক্তি ;
শুধু সে অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে
শ্রবণে ত প্রভু অমিয়া বর্ষে।

৪

বসিয়া বসিয়া নিজ-ঘর-মধ্যে,
লেখা সোজা গদ্যে পদ্যে ;
"সমুচিত তুলিয়া ঘুঁষি নিজ হস্তে—
"মারো বেগে সাহিব মস্তে।"
ভাবো না সে স্থানে একা,
লাগে, প্রথমত ভেবা চেকা ;
একে, বঙালি দুর্ব্বল-হস্ত,
তদুপরি ঘুঁষিটা ত অনভ্যস্ত ;
যখন পরাজয় খলু অনিবার্য্য
তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য্য ?

৫

মাখি তৈল ঘন কুঞ্চিত কেশে,
স্নানস্নিগ্ধ উদরটা ঠেসে
ডালে ভাতে করিয়া পূর্ণ,
দন্তে পানে করিয়া চূর্ণ ;
চাপ্‌কান্ পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হি পুরুষানুক্রম-ভৃত্য ;
নাকে কর্ণে চুপে চুপে,
রক্ষা করিয়া কোনোরূপে ;
সংসারেতে টিকিয়া আছি,
রহিনা—ঘুঁসি ফুঁসি কাছাকাছি।

৬

ওরা জেতা বিজিত হি মোরা ;
মোরা ভৃত্য প্রভু সব ওরা ;
মোরা চিঁ-চিঁ ওরা জোরালো ;
ওরা ফর্সা মোরা কালো ;
বিশীর্ণ দুর্ব্বল বঙালি অঙ্গে ?
সমর কি সাজে সাহিব সঙ্গে ?
যার কৃপাতে জীবন কাটে,
যার গুঁতাতে পীলা ফাটে,
রক্ষা নাহিক হইলে ক্রুদ্ধ,—
এমত সাহিব সঙ্গে যুদ্ধ।

৭

মোরে সর্ব্বে গালি ত দাও,
চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া চাহো ;
কহ কত বাণী লম্বা লম্বা ;—
সবাই কার্য্যে সমানই রম্ভা ;—
করেছ কে কে—বল সব শুদ্ধ
কয়টা সাহিব সঙ্গে যুদ্ধ ?
বজ্রপতন যে মুষ্ট্যাঘাতে,
অযুত বেয়নেট্ যৎপশ্চাতে,
দেখি তদীয় সু ভীষণ মূর্ত্তি
হইয়াছে ঘুঁসি তুলিতে স্ফূর্ত্তি ?

৮

আমি ত দেখি তু জগতে তরিতে,
ব্যগ্র নহে তবু কেহ ত মরিতে ;
সব জাতি যত্নে টিকিয়া আছে,
—প্রাণে ইচ্ছা আরো বাঁচে ;—
অর্থ উপার্জ্জে বিবিধ উপায়ে,
—থাকে টাকা আরো চাহে ;—
আমি কি একা সাহিব-ভৃত্য ?
মোরি কি আছে শুধু উঞ্চ্বৃত্ত ?
তবু যদি পারিনি সাহিব মার্ত্তে—
ছেড়িছি চাকরি—কয় জন পার্ত্তে ?

৯

আধ্যাত্মিক আহারে নিত্য
সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ ত চিত্ত,—
গরম কিসে হইবে এ রক্ত ?
নহিলে সাহিব মারা শক্ত ?
যদি বা রক্তটি হইল হি উষ্ণ,
ওঠে না এ বাহু অপুষ্ট।
ভাবি স্ত্রী ও সব সুতকন্যায়,
ভাবি ক্রিমিনল আইন অন্যায়,
ভাবি ক্ষীণ হি দুর্ব্বল হস্ত,
ভাবি হি নানা আপদ্‌গ্রস্ত,

১০

লইয়ে অভগ্ন দন্তে খাসা,
লইয়ে অক্ষত তিল-ফুল-নাসা,
সাহিব যুদ্ধে কে কে—পোঁজা,
—বিনাস বিদগ্ধ—অতিশয় সোজা,
সাহিব সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ,
মোর পরে সব হইও ক্রুদ্ধ ;
যুক্তি দিতে ও করিতে তর্ক,
স্বগৃহে বসিয়া সবাই পক্ক।
না হইলে সম সঙিন অবস্থা,
বাক্যে বীরত্ব,—ও অতি সস্তা।

যশোহরে শিকার।

সুহৃদ্বরেষু—

রা-মহাশয়ের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে জনকয়েক ভদ্রলোক আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত। পল্লীগ্রামে জীবনযাপন যে নিতান্ত দুর্বিবষহ ব্যাপার নহে, ইহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য আমরা নিতান্ত উৎসুক। রা-মহাশয় তাঁহার বহুযত্নসংগৃহীত বিদেশীয় বন্দুকগুলির ব্যবহার অতিথিদের বুঝাইয়া দিতেছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর কাপুরুষত্ব কলঙ্কের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরে অভ্যাগতের জঠরাগ্নির তাহাতে উপশম হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সন্দিহান হইতেছিলাম। এমন সময় সংবাদ আসিল, দুই ক্রোশ অন্তরে যশোহর ঝিনাইদহের পথে বিষুইখালি গ্রামের নিকট ব্যাঘ্র কর্তৃক এক জন আহত হইয়াছে। শিকারের সংবাদে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোক; কিন্তু আমার তুষারশীতল হৃদয়েও যেন একটু উত্তাপের সঞ্চার হইল। এ কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমার অধরপ্রান্তে একটু কৌতূহলদীপ্ত হাস্য দেখা দিবে। কিন্তু তোমার ভ্রমনিরাসের জন্য বলিয়া রাখি, শিকারের সময় নিতান্ত নির্জ্জীব হৃদয়েও একটু চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হয়, ভয়ত্রস্তের মনেও কথঞ্চিৎ সাহসের উদ্রেক হয়।

আগন্তুক ভদ্রলোকেরা শিকারে যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। ইতিপূর্ব্বে শিকারে ইঁহাদের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইতেছিল। এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহারাও যে শিকার করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু এই সংবাদপ্রাপ্তির পর আর তেমন ঔৎসুক্য দেখা গেল না! সুতরাং ব্যাঘ্র-শিকার সে দিবসের জন্য কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইল। ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যার সময় অক্ষতশরীরে কলিকাতায় যাইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্যাঘ্রের সংবাদ আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু কোনও নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেল না। তথাপি শীঘ্র শীঘ্র আহারাদিসমাপন করিয়া আমরা হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইলাম। রা-মহাশয়কে লইয়া "কাঞ্চনমালা" অগ্রসর হইল। তাঁহার পুত্র শ্রীমান প—ও স-বাবু "রণজিৎ সিংহের" উপর, আমিও অ-বাবু "বীরকুমারের" উপর। ইহা ব্যতীত "কমলকলি" "সেরজঙ্গ" ও "চপলা" আমাদের সঙ্গে চলিল। "রণজিৎ সিংহ" ও "সেরজঙ্গ"

বিশাল-শুভ্র-দন্তশালী। "বীরকুমার" আকারে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইলেও, মাখনাজাতীয় ও দন্তহীন। অনেক গুলি লোক বর্ষা হস্তে করিয়া পদব্রজে ইতিপূর্ব্বেই আমাদের অগ্রগামী হইয়াছিল।

রা-মহাশয়ের হস্তে প্যারাডক্স বন্দুক। আমাদের কাহারো কাহারো হস্তে বর্ষা ও টাঙ্গি। কিন্তু আত্মরক্ষার্থ শ্রীমান প-র হস্তের একনলা বন্দুকটি আমাদের বিশেষ ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। কি জানি যদি ব্যাঘ্র-শিকারের পরিবর্ত্তে মনুষ্য-শিকারই হইয়া যায়!

স্বল্পসলিলা বেগবতী পার হইয়া নলডাঙ্গার রাজাদিগের বহুপুরাতন দেব-মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলাম। নদীর অবস্থা ও দেবালয়ের অবস্থা সমতুল্য। নদী প্রায় শুষ্ক ও জলজলতায় পরিপূর্ণ; দেবালয় ভগ্ন ও মন্দিরচূড় বটবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন। নদীর আর সে বেগ নাই, মন্দিরেরও সে অভ্রভেদী চূড়া নাই। নয় দশটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপ সুধু প্রাচীন কালের লোকের দেবপ্রীতির কথা ঘোষণা করিতেছে মাত্র। যে তোরণদ্বারের উপর হইতে প্রভাতে সানাইয়ে ভৈরবীর আলাপ হইত, সেই বিচিত্র তোরণদ্বারের সামান্য ভগ্নাবশেষ মাত্র এখন বর্ত্তমান। মন্দিরগুলির গঠন সীতারাম রায়ের মন্দিরের ন্যায়, এবং মন্দিরস্থ ইষ্টকগুলির উপর মহাভারত ও রামায়ণের অনেক ঘটনা ক্ষোদিত। অধিকাংশ মন্দির ১৫০০ ও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। আধুনিক দু' একটি শুভ্র মন্দির যেন প্রাচীনের অবমাননা করিতেছে।

ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ও বাবু রামশঙ্কর সেন, এই নলডাঙ্গার রাজাদিগের আদিপুরুষ ও এই অতিপুরাতন মন্দিরগুলির নির্ম্মাতা সম্বন্ধে যে অলৌকিক গল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাবরাসুবা গ্রামে হলধর ভট্টাচার্য্য নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বিষ্ণুদাস হাজরা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং নলডাঙ্গার নিকট হাজরাহাটি নামক স্থানে বিজনে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

এক দিন নবাব বা ফৌজদার ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বেগবতী বাহিয়া যাইতেছিলেন। সন্ন্যাসীর কুটীরের নিকট আসিয়া তাঁহাদের খাদ্যের অপ্রতুল হইল। কিন্তু চতুর্দ্দিকে পাঁচ শত ক্রোশ ব্যাপিয়া সুধু ঘন বনানী।

লোকালয়ের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। নবাবের লোকেরা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অসীম যোগবলে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যেককে স্ব স্ব অভিলষিত দ্রব্য প্রদানে আনন্দিত করিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুদাসকে পাঁচখানি গ্রাম অর্পণ করিয়া যান। এই পঞ্চ গ্রাম হইতেই নলডাঙ্গার রাজাদিগের জমিদারীর সূত্রপাত হইল। কিন্তু এই যোগপ্রভাবশালী তপস্বীর গ্রামের কি দরকার, তাহা ভাল বুঝা যায় না।

যাহা হউক, কথিত আছে, যে যোগবলে নবাবের খাদ্য মিলিয়াছিল, সেই যোগবলে দারপরিগ্রহ না করিয়াও তাঁহার এক পুত্র লাভ হয়। পুত্রের নাম শ্রীমন্ত রায়। শ্রীমন্ত রায় স্বরূপপুরের আফগানদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগের ভূসম্পত্তি অধিকার করেন। এবং এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ মুরশিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে "রণবীর খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। দাউদখাঁর পরাজয়ের পর হইতে বাঙ্গালী জমিদারদিগের প্রভাবে আফগানেরা এই প্রকারে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইতেছিল। রণবীর খাঁও একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নদীতীরের সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্বের কথা যাউক। আমরা মধ্যাহ্নে ধীরে ধীরে দেবালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করিতেছিলাম। দেবালয়ের দক্ষিণে কালিকাদহ নামে একটি খাদ এই নিদারুণ বৎসরেও একবারে শুষ্ক হয় নাই। অদূরে বালকেরা ও পল্লীবধূরা দীর্ঘিকার স্নিগ্ধ জলে গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল। আমরা হস্তীদিগকে জলপান করাইয়া শিকারের উদ্দেশে চলিলাম। হস্তিসমূহ নদীগর্ভজাত জলজলতা ভক্ষণ করিতে করিতে মৃদুমন্থরগতিতে চলিতেছিল।

গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। কোন দিকে কোন প্রকার শস্যের নাম মাত্র নাই। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে উচ্চভূমিতে একখানি গ্রাম ছবির ন্যায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যে প্রতিভাত হইতেছিল। শীতকাল হইলেও গ্রামের নিম্নে বিলের ঈষৎ নীলাভ বারি নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতেছিল।

রৌদ্রের কিরণ প্রখর হইয়া আসিল। আমরা সোলার টুপিগুলি ভাল করিয়া টানিয়া দিলাম। ধুতি চাদরের উপর সোলার টুপি মাথায় দিতে দেখিলে তুমি বোধ হয় আমাদিগকে এক অদ্ভুত জীব বলিয়া বিবেচনা করিতে। কিন্তু ইহা ভিন্ন রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় ছিল না। মধ্যে

মধ্যে অ—বাবুর সহিত দু' একটি কথা কহিয়া চারি দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিলাম। বুঝিতে পার, আমাদের কথাবার্ত্তা কি লইয়া? সৃষ্টির আদি হইতে কবিরা যাহা লইয়া ব্যস্ত, সেই নিত্যনূতন অঙ্গনাদিগের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই সুন্দর প্রহেলিকার কি যুগযুগান্তে কখনও মীমাংসা হইবে?

রা—মহাশয় একটা ফুলগাছের নিকট আসিয়া বলিলেন, "পকেটে করিয়া ফুল আনিয়াছেন তো?" গত বৎসর দু' এক দিন যখন শিকারে গিয়াছিলাম, তখন শিকার অপেক্ষা রক্তবর্ণ ফুলগুলির উপর আমার বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইত।

পূর্ব্ব দিন যেখানে এক জন লোক আহত হইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইলে, অনেক লোক আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। খড়ের বনে আগুন দিবার সময় নিকটস্থ ঝোপ হইতে একটা বাঘ অতর্কিতভাবে কৃষকদিগের ভিতর লাফাইয়া পড়ে, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে এক জনকে আহত করিয়া খড় বনের ভিতর পলাইয়া যায়। লোকেরা বৃক্ষে উঠিয়া দূর হইতে ব্যাঘ্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এবং আশা করিতেছিল, রা—মহাশয় শীঘ্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শক্রনিপাত করিবেন। আজ তাহারা অত্যন্ত আপশোষ করিতে লাগিল।

এক জন বৃদ্ধ নমস্কার করিয়া বলিল, "কাল আমরা বাঘটাকে এক প্রকার ঘিরিয়া রাখিয়াছিলাম। চারি দিক হইতে লোকে দেখিতেছিল বাঘটা কোথায় যায়। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে আমরা নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিলাম।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন দিকে ফেউ ডাকিয়াছে, শুনিয়াছ কি?"

"রাত্রে ফেউ ডাকিয়াছিল। কিন্তু দুয়ার জানালা বন্ধ থাকায় বুঝিতে পারি নাই,—কোন দিক হইতে ডাকিয়াছে।"

প্রথম আমরা খড় বন খুঁজিলাম। কিন্তু মধ্যাহ্নে সেই অনাবৃত স্থানে ব্যাঘ্রের অবস্থিতি অসম্ভব। অ—বাবু রা—মহাশয়কে বলিলেন, "অদ্য সত্য সত্যই "Beating the bush!"

এই স্থানের ক্রোশার্দ্ধ দূরে নলডাঙ্গার নিম্নে প্রবাহিতা বেগবতী ঘুরিয়া আসিয়াছে। আমরা বেতসাচ্ছাদিত বেগবতীর তীর অন্বেষণ করিবার মনন করিলাম। কিন্তু বিশেষ আশা হইতেছিল না যে, ব্যাঘ্র মহাশয়ের সহিত অদ্য আমাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হইবে।

এক স্থানে বেগবতী শুষ্কপ্রায়। সেই স্থানে পুনর্ব্বার নদী পার হইতে হইল। নদীতীর প্রায় মনুষ্যের অগম্য। কবিরা বানীরকুঞ্জের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে আছে "যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।" কালিদাস বলিয়াছেন, "স্মরামি বানীরগৃহেষুসুপ্তঃ।" কিন্তু আমার বেত গাছের কথা মনে হইলেই ভয়ে গা শিহরিয়া উঠে। হস্তিযূথ যখন বিশাল বিক্রমে বেত বন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিল, আমরা তখন ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলাম। পরিধেয় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মস্তক হইতে টুপি খসিয়া পড়িল। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেও সুখ আছে। দার্শনিকেরা সত্য সত্যই বলিয়াছেন, জগতে অবিমিশ্রিত দুঃখও নাই, এবং অবিমিশ্রিত সুখও নাই। যখন মধ্যে মধ্যে অঙ্গনাদিগের সকৌতূহল স্নিগ্ধ দৃষ্টি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তখন ভাবিতেছিলাম, এই সুন্দর বসুন্ধরা মানবের আবাসযোগ্য বটে। যখন রমণী-কণ্ঠের অস্ফুট কাকলি, কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল,— মনে হইতেছিল, মানবজীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ নহে। পাঠ্যাবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গের কথিত ভাষা লইয়া পূর্ব্ববঙ্গাগত সহপাঠীদিগকে কত তীব্র উপহাস করিয়াছি। কিন্তু নারীকণ্ঠের সেই নূতন রকম বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়া মত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। বোধ হইতেছিল, যেন সে ভাষা আমাদের দেশের ভাষা অপেক্ষা শুনিতে অধিক মধুর ও সুমিষ্ট।

নদীতীর অতিক্রম করিয়া আমরা বিষুইখালি বাজারের নিকট পৌঁছিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ব্যর্থমনোরথ হইয়া আমরা প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছিলাম। রা—মহাশয় বলিলেন, "নিকটবর্ত্তী জলাশয় অন্বেষণ করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যাউক।"

জলাশয় সম্পূর্ণ শুষ্ক। পুষ্করিণীর গর্ভে নল ও বেতের গাছ। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে হস্তিসমূহ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমরা বুঝিলাম, এই বার তামাসা আরম্ভ হইবে।

শুষ্ক নিম্নভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ বেতবন কম্পিত হইল। "চপলা" বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমরা দৃঢ়ভাবে আসনে উপবিষ্ট হইলাম। রা—মহাশয়ের পশ্চাতে এক জন ভৃত্য টোটা লইয়া বসিয়াছিল। সে প্রথমে বাঘ দেখিয়া শিষ্ দিল। বাঘটা নিতান্ত ছোট নহে। সে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় সাগ্রহচিত্তে আমাদিগের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, আমরা কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া যাইবে। কাঞ্চনমালা নূতন হস্তিনী,

মাহুতের যথেষ্ট তাড়না সত্ত্বেও কোন প্রকারে ব্যাঘের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল না। এ অবস্থায় ব্যাঘ্রকে গুলি করা চলে না। হস্তীর পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ বিশেষ সুবিধাজনক নহে। শিকারের সময় হস্তীকে ব্যাঘ্রের দিকে মুখ করিয়া রাখাই ভাল। নতুবা বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

রা—মহাশয় অগত্যা "কাঞ্চনমালাকে" পরিত্যাগ করিয়া "কমলকলির" উপর আসিলেন। "কমলকলি" হস্তিনী হইলেও সুন্দর শিক্ষিতা ও শিকারের সময় সম্পূর্ণ নির্ভীকা। আমাদের হস্তিসমূহ ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ দিক হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্যাঘ্র হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে রা—মহাশয়ের হস্তিনীর বাম পার্শ্ব দিয়া পুষ্করিণীর উচ্চতীরের উপর উঠিয়া দুই তিন শত হস্ত দূরে এক ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইল। গুলি করিবার কোন অবসরই হইল না।

পুষ্করিণীর নিকট লোকারণ্য; এমন কি, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাঘ্র দেখিয়া কে কোথায় পলাইবে, দিশা পাইতেছিল না। আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও ছায়ার ন্যায় তাহারা আমাদিগের অনুসরণ করিতেছিল।

লতাগুল্মাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের দিকে আমরা অগ্রসর হইলাম। রা—মহাশয়ের হস্তিনী ঘুরিয়া আসিতেছিল। শ্রীমান প—র হস্তীর সম্মুখে ব্যাঘ্র হঠাৎ বাহির হইয়া এক বার পশ্চাতে বৃহৎ দন্তুর হস্তীর উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দার্শনিকের ন্যায় ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে পুষ্করিণীর ভিতর আশ্রয় লইল। বীরপ্রবর আলেকজান্দরকে এক জন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুকালে যাহার ত্রিহস্তপরিমিত ভূমি হইলেই যথেষ্ট হয়, তাহার এই সমগ্র ভূখণ্ড লাভ করিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল নদ নদী পার হইয়া আসিবার প্রয়োজন কি?" আমাদের হস্তিসমূহ লোক জন ও আড়ম্বর দেখিয়া বাঘের মনেও হয় ত এই প্রকার একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদিগকে নিরস্ত্র দেখিয়া বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে চলিয়া গেল।

আমারা শুষ্ক জলাশয়ের ভিতর পুনর্ব্বার অবতরণ করিলাম। কিন্তু ব্যাঘ্রের কোন চিহ্ন নাই। শুষ্ক ভূমিতে পদচিহ্নও দৃষ্ট হইল না। অন্ধকার হইতে অধিক বিলম্ব ছিল না। আমি বলিলাম, "পুষ্করণীর তীর এক বার অনুসন্ধান করিলে ভাল হইত। কিন্তু পুষ্করিণীর তীর হইতে বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া হস্তীগুলিকে উপরে লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। উচ্চভূমি হইতে ব্যাঘ্র হটাৎ হস্তীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। আমরা সমস্ত হস্তী লইয়া এক দিক দিয়া

তীরে উঠিলাম, এবং তীর হইতে জলাশয়গর্ভে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের মতলব বুঝিতে পারিয়া ব্যাঘ্র হঠাৎ পুষ্করিণীর উচ্চ ভূমি ত্যাগ করিয়া কয়েক শত হস্তে দূরে নদীতীরজাত নলবনের ভিতর প্রবেশ করিল। আমরা দ্রুতবেগে এই নূতন স্থল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম।

এই স্থানে নদীতে কিঞ্চিৎ জল আছে। কিন্তু জল পঙ্কিল ও জলজলতায় সমাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার তিমিরাবরণ সমস্ত জল ও স্থল ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। দুই একটি পক্ষী দলভ্রষ্ট হইয়া অতিদ্রুত পক্ষসঞ্চালনে অগ্রগামী সঙ্গীদিগকে ধরিবার জন্য আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। প্রকৃতি প্রায় নিস্তব্ধ ও শান্ত। শুধু আমাদের রক্তলোলুপ হৃদয়ে অশান্তি ও উদ্বেগ বিরাজ করিতেছিল।

আমরা ছয়টি হস্তী অর্দ্ধচক্রাকারে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। ব্যূহের সম্মুখে রা—মহাশয়ের হস্তী। হঠাৎ নলবন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কি যেন আমাদের সম্মুখে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। বন্দুকের শব্দ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বিরাট পরাক্রমে ব্যাঘ্র নদীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন বুঝিলাম, এই জন্তুর ক্ষুদ্র দেহে কি অসীম বল! যখন নদী পার হইল, বাঘটাকে পরিষ্কার দেখা গেল। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া যেন শক্তির স্ফুরণ হইতেছিল। অনেক বন্যজাতি ব্যাঘ্রের পূজা করিয়া থাকে; ইহা কি প্রকারান্তরে শক্তির পূজা নহে? যখন ব্যাঘ্র নদী পার হইতেছিল, রা—মহাশয় গুলি করিলেন। কিন্তু ব্যাঘ্রের অর্দ্ধ হস্ত দূরে গুলি জলের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আমাদের আশা হইতেছিল, রা—মহাশয় পুনর্ব্বার গুলি করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। নদী অল্পপরিসর; ব্যাঘ্র শীঘ্র নদীর অপর পারে নলবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। অ—বাবুর ইহাতে ভারি রাগ হইতেছিল। রা—মহাশয়কে একচোট খুব শুনাইয়া দিবেন,—মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন। কিন্তু রা—মহাশয় বলিলেন যে, সম্মুখে বাতাস থাকায় প্রথমবারের বন্দুকনির্গত ধূমে ব্যাঘ্রকে দেখিতে পান নাই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। দুই তিন বৎসর হইল, এক জন সাহেব রা—মহাশয়ের সহিত শিকারে গিয়াছিলেন। সে দিন বাঘটা একটু আহত হইয়া হস্তীগুলিকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, এবং হস্তীগুলির সম্মুখে ভীম গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল। মিষ্টার—অনবরত গুলি করিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তদশ গুলিতে ব্যাঘ্র বেচারী নিহত হইল। ইংরাজের এই প্রকার শিকার দেখিয়া সমাগত দর্শকেরা

একটু একটু হাসিতেছিল। দেশীয়ের বিদ্রূপ সাহেবের কি সহ্য হয়! সন্ধ্যার অন্ধকারে বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া আসিবার সময় রা—মহাশয়ের এক জন কর্ম্মচারী সিগারেটের ধূম পান করিয়া দিবসের ক্লান্তি দূর করিতেছিলেন। মিষ্টার হুকুম দিলেন, সিগারেট পরিত্যাগ কর। প্রভু জাতির সম্মুখে পদদলিত পরাধীন বাঙ্গালীর এত দূর বেয়াদবি! হায় বন্দুকে টোটা ভরা নাই! ব্যাঘ্রশিকারে কৃতিত্ব না থাকিলেও নিরীহ দেশীয়ের শিকারে যে শ্বেতকায়মাত্রেরই অধিকার ও ক্ষমতা আছে, তাহা হয় ত সেই মুহূর্ত্তেই প্রমাণিত হইয়া যাইত।

যেখানে ব্যাঘ্র পার হইল, সেখানে হস্তী লইয়া পার হওয়া সুকঠিন। জল অত্যন্ত অল্প ও নদীগর্ভ পঙ্কিল। পঙ্কে হস্তীর পা বসিয়া যাইতে পারে। নদীর ধার দিয়া প্রায় অর্দ্ধ পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া এক শুষ্ক স্থানে আমরা নদী পার হইলাম। সে সময় হস্তীর গতি শামুকের ন্যায় বোধ হইতেছিল। মাহুত অনবরত অঙ্কুশের আঘাত করিতেছিল, কিন্তু তবুও যেন সেই গজেন্দ্রগমনের কোনও পরিবর্ত্তন নাই! অ—বাবু উৎসাহে চীৎকার করিতেছিলেন।

প্রায় পনর মিনিট পরে ব্যাঘ্র যেখানে লুকাইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানেও নলবন। একটু খুঁজিতে না খুঁজিতে ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার ভীম বেগে নলবন ভেদ করিয়া নদীর উপর পড়িল। গোধূলির ঈষৎ আলো ও অন্ধকারের মধ্যে রা—মহাশয় আবার গুলি করিলেন। বুঝা গেল না, গুলি লাগিয়াছে কি না। কিন্তু ব্যাঘ্র অপর পারে উপস্থিত হইতে না হইতে রব উঠিল, ব্যাঘ্র পড়িয়াছে। আমাদের সহিত "কাবুলি" নামে একটা দেশী কুকুর গিয়াছিল। দেশী হইলেও তাহার সাহসের ন্যূনতা ছিল না। নদী পার হইয়া যেখানে বাঘ পড়িয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইয়া, বাঘ আগলাইয়া বসিয়া রহিল।

আমি সোলার টুপি ঘুরাইয়া বলিলাম, "Three cheers for রা—মহাশয়!" দেখিলাম, আমার বন্ধুটি একটি নলের পাঁপ কাটিতে ব্যস্ত। আমি বলিলাম, "ইহার দরকার কি?" তিনি বলিলেন, "কিছু পরে দেখিতে পাইবেন।"

ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া বক্ষে গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। আমরা যখন দেখিলাম, তখনও প্রাণবায়ু একবারে বহির্গত হয় নাই। কে বিদ্রূপচ্ছলে বলিল, "বাঘটা দাঁড়াইয়া উঠিতেছে।" অমনি বায়ুবিক্ষিপ্ত শীর্ণপত্রের ন্যায় সমাগত জনতা নিমেষে কোথায় মিশাইয়া গেল!

তাহার পর ব্যাঘ্রকে হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া আমরা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করি-

লাম। একটু শীত বোধ হওয়াতে গাত্রবস্ত্রে শরীর সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিলাম। সকলেই চিন্তানিমগ্ন, নীরব। আকাশ নক্ষত্রময়। আমরা নিস্তব্ধে মাঠের পর মাঠ পার হইতেছিলাম। কত কি মনে হইতেছিল। দেবালয়ের নিকট শঙ্খ ঘণ্টার রবে চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

অ—বাবু একটা খেজুর গাছের কাছে আসিয়া বলিলেন, "এইবার নলের উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।" তিনি বৃক্ষ হইতে একটা কলসী নামাইয়া রুমালে নলের মুখ ঢাকিয়া রস পান করিলেন, এবং আমাকেও কিঞ্চিৎ পান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

এইখানে আমার শিকারের বিবরণ শেষ হইল। তুমি যদি এখন জিজ্ঞাসা কর, আমার কি ভাল লাগে? পাড়া গাঁ, না সহর? আমি বলিব, and so the villa for me, not the city! যদিও "Beggars can scarcely be choosers."

যজ্ঞ ও আহার।

স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতৃস্তন্যপানে পরিপুষ্ট হয়। দেখা যায়, এই স্বাভাবিক নিয়ম মানবজাতির শৈশবাবস্থাতেও কার্য্য করিয়াছে; মানবজাতিও অতি শৈশবে প্রকৃতি-পালিত শিশু ছিল, প্রকৃতির স্তন্যরূপ ফলমূল আহার করিয়া জীবনধারণ করিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ক্রোড়ত্যাগ করিয়া মনুষ্য যতই স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে শিখিল, ততই তাহার অন্তর্নিহিত ধীশক্তিও ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। সভ্যতার সেই ঊষাকালে প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ ধরণীর প্রথম সন্তানদিগের হৃদয়ে না জানি কত নব নব ভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল। ইহা বৈদিক যুগেরও পূর্ব্বকালের কথা। এই আদিম কালেই সম্ভবতঃ অগ্নির সঙ্গে মানবের প্রথম পরিচয়। যখন বৃক্ষের শাখায় ঘর্ষণ লাগিয়া অরণ্য-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন মানবকে অন্তর্নিহিত ধীশক্তি ভিন্ন আর কে তাহার কারণ বুঝাইয়াছিল? কাষ্ঠে কাষ্ঠে বা প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণ দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ইহা মানব প্রথমে প্রকৃতি-পুস্তকপাঠে শিক্ষা করিয়াছিল।

ইহার পর বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগে মনুষ্য জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক উন্নত হইয়াছে; অন্ন প্রভৃতি কৃত্রিমরূপে পাক করিতে শিখিয়াছে; ঘৃত প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীরও আবিষ্কার করিয়াছে। এই যুগেই যজ্ঞের অভ্যুদয়। এই কালে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি লোকের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাগ যজ্ঞের প্রভাব সে সময়ে এত অধিক যে, শুভকর্ম্মমাত্রই যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত। তাই আমরা দেখিতে পাই, জগতের সর্ব্বাদিগ্রন্থ ঋগ্বেদে অগ্নিকে সকলের অগ্রে ঋষিরা সম্মান দিয়াছেন। এই যজ্ঞের কারণেই অগ্নিকে অগ্রণী করিয়া বেদের আরম্ভ।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্।

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূতরত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।" ইহাই ঋগ্বেদের সর্ব্ব-প্রথম ঋক; ইহার সর্ব্বপ্রথম শব্দটিও অগ্নি। 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি অগ্নিদৈবত সূক্তগুলিতে যে অগ্নিকে 'পুরোহিত', 'ঋত্বিক' ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যজ্ঞ হোম প্রভৃতির কারণে অগ্নি পূর্ব্ব-ঋষিদিগের স্তুতিভাজন হইয়াছিল। বৃষ্টি না হইলে শস্য হইবার উপায় নাই, এবং শস্য না হইলে যজ্ঞাদি সম্পন্ন হয় না, তাই দ্যুলোকস্থিত বৃষ্টির আহ্বানের জন্য অগ্নিই নিযুক্ত হইত। অগ্নিতে আহুতি দিলে যে তাহা বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়, ইহা ভারতের চিরন্তন সংস্কার। মনুও এই মতের পোষক হইয়া বলিতে-ছেন,—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

"অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সূর্য্যের উপস্থান হয়, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে শস্য জন্মে, এবং শস্য হইতে প্রজা উৎপাদিত হয়।" অগ্নি দ্বারা বৃষ্টি প্রভৃতি আহূত হইত বলিয়া বেদমন্ত্রে অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহা দ্যুলোকস্থিত ও যাহা দীপ্তিমান, তাহারই দেব-নামে অধিকার আছে। এই সূত্রে বোধ হয়, মেঘ সকলও—যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র,—দেব-শব্দের বাচ্য।

প্রাচীন কালে ঋষিদিগের নিকট অগ্নি পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় সমাদৃত হইত। একালে আমরা যেরূপ শ্রদ্ধাবশতঃ মাতৃভূমির প্রতি পুত্রোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গান বা কবিতার রচনা করি, সেইরূপ ঋষি কবিরাও প্রাচীন কালে অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের উপকারিতা স্মরণ করিয়া

শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাদের উদ্দেশে ছন্দোবদ্ধ সূক্তগুলির রচনা করিয়াছেন। বঙ্গের কবি ভাবের আবেগে যেমন 'বন্দে মাতরং' 'মাতাকে বন্দনা করি' বলিয়া ভারতমাতার বন্দনা গাহিতে পারিয়াছেন, ঋষি কবিও সেইরূপ ভাবের আবেগে 'অগ্নিমীলে' 'অগ্নিকে স্তুতি' করি বলিয়া অগ্নিস্তোত্র গাহিয়াছেন। কবিতা অধিকাংশ সময়ে প্রকৃতির রাজ্যে খেলা করিতে ভালবাসে, তাই বৈদিক কালেও ঋষি কবিরা অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতিকে অধিকাংশ সময়ে কবিতার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের কবিতায় চিরদিন পূর্ণোপমা রূপক প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। ভারতের গানে রাগকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা গায়কদিগের লক্ষ্য। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রাগ এবং ভাব আংশিকরূপে প্রবল হইয়া উঠে; পাশ্চাত্য কবিতাও রূপক এবং পূর্ণোপমার তত পক্ষপাতী নহে। এই সকল কারণে, ভাব ও ভাষার গুণে, বেদসূক্তের বর্ণিত বিষয়গুলি যেন মূর্ত্তিমান বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ঋষিদিগের গৃহে অধিকাংশ ক্রিয়াকর্ম্মই অগ্নির সহায়ে সুসম্পন্ন হইত; তাই অগ্নির আর একটি প্রাচীন নাম গৃহ্য। গোভিল বলেন, "গৃহাঃ পত্নী গৃহ্য এষো অগ্নির্ভবতীতি"—"পত্নীকে গৃহা এবং এই অগ্নিকে গৃহ্য বলা যায়।" গৃহ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি গৃহায় হিতঃ। মধুচ্ছন্দা ঋষি ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তটিতে কেমন সরল প্রাণে বলিতেছেন,—'সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে'—হে অগ্নি! মঙ্গলার্থে আমাদিগের নিকট সমবেত হও। কত প্রাচীন কাল হইতে যে ভারতবাসীরা অগ্নির উপকারিতা বুঝিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? পূর্ব্বোক্ত সূক্তেই মধুচ্ছন্দা বলিতেছেন,—

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।

অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন হইয়া আসিতেছেন, এবং নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন।

কিন্তু ঋষিরা অগ্নির প্রতি এত অধিক শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রকাশ করাতে অনেকে ভ্রমে পতিত হয়েন যে, তাঁহারা অগ্নি-পূজক ছিলেন। কিন্তু ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক জাতিকে যখন দেখি যে, তাঁহারা অগ্নিপূজক না হইয়াও, ঐ একই কারণে অগ্নির প্রতি অতিপ্রাচীন কাল হইতে শ্রদ্ধা সমর্পণ করিয়া আসিতেছেন, তখন এ ভ্রম দূর হইবারই কথা। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যদিগের ন্যায় পারসীকেরা ঈশ্বর বা উপাস্য দেবতা বলিয়া কখন অগ্নির পূজা করেন না; অগ্নিকে ঈশ্বরসৃষ্ট মঙ্গলজনক ও পবিত্র বস্তু বলিয়া সমাদর করেন,

এবং অগ্নিহোত্রদিগের ন্যায় গৃহে, দেবমন্দিরে, চির দিন অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকেন। জেন্দ ভাষার অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত আঁকেতিল দুপেরঁ (Anquetil Du Perron) পারসীকদিগের ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে বলিতেছেন, "পারসীকেরা প্রথমাবধি আজি পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত একেশ্বরের উপাসনা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহারা যে অগ্নি ও সূর্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহার জন্য এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না যে, তাহারা ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকে; কারণ, উহাদিগের প্রধান গুরু জোরোষ্টর উহাদিগকে উপাসনার সময় অগ্নি বা সূর্য্যের সম্মুখে ফিরিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের উপাসনার প্রার্থনাগুলি দেবদেব একেশ্বরেরই উদ্দেশে করা হয়, অগ্নি প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া নহে।" পারসীকেরা যে নিরবচ্ছিন্ন একেশ্বরের উপাসক, এ বিষয় ফর্ব্বস, সর উইলিয়ম আর্ডসলি, ডাক্তার হাইড প্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরাই একমত, এবং পারসীকেরা স্বয়ং ইহার জন্য গৌরব করিয়া থাকে। কোন পারসীক ঐতিহাসিক লিখিতেছেন, "Ask a parsse whether he is a worshipper of the sun or fire and he will emphatically answer—No! There is no doubt of their being monotheists; they tolarate no other worship but that of the supreme being." পারসীকেরা সূর্য্য এবং অগ্নিকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাহা কেবল সূর্য্য ও অগ্নি জগতের শুভকারী বলিয়া এবং পবিত্র তেজোমূর্ত্তি দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে স্মরণপথে আনয়ন করে বলিয়া। এই একই কারণে অগ্নির সম্মুখে ঈশ্বরোপাসনা পারসীকদিগের ন্যায় হিন্দুদিগেরও ধর্ম্মবিধি আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

গৃহেষু তৎসমং জপ্যং গোষ্ঠে শতগুণং ভবেৎ।
নদ্যাং শতসাহস্রন্তু অনন্তস্ত্বগ্নিসন্নিধৌ॥

গৃহে গায়ত্রী জপ করিলে যে ফল হয়, গোষ্ঠে করিলে তাহার শত গুণ ফল হয়, নদীতে জপ করিলে লক্ষ গুণ ফল, এবং অগ্নিসমীপে করিলে অনন্ত গুণ ফললাভ হয়। ব্যাস, শঙ্খ প্রভৃতি অনেক মুনিই অগ্নিসম্মুখে ঈশ্বরোপাসনা প্রশস্ত এবং সর্ব্বপাপনাশক বলিয়াছেন। এক্ষণে পাঠক দেখিলেন যে, সিন্ধুতীরবাসিগণ এবং পারসীকগণ উভয়েই পবিত্রতা, লোকোপকারিতা প্রভৃতি গুণের জন্য অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। *

* কেবল অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনবিষয়েই যে হিন্দু ও পারসীকে ঐক্য আছে, তাহা

অগ্নিকে যেমন ভারত সকল বিষয়ে অগ্রণী করিয়া চলিতেন, অগ্নিও তাহার প্রতিদানস্বরূপ ভারতকে সকল বিষয়ে সকলের অগ্রণী করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন এক অগ্নিই ভারতকে আলোকিত করিয়াছিল, বলিতে হইবে। অগ্নিসংস্পৃষ্ট যাগ যজ্ঞই যে প্রাচীনকালে সকল বিষয়েই ভারতের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, ভারতের ঐতিহাসিকমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। শ্রদ্ধাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"নানাবিধ যজ্ঞই প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল, এবং হিন্দুগণ নানাশাস্ত্রে যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞানলাভ করেন, তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠানমূলক। যজ্ঞসম্পাদনার্থ সূর্য্য চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। যজ্ঞে বিশুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে নিয়মগুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাঁহা হইতে 'দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা' এবং ব্যাকরণের উৎপত্তি, এবং যজ্ঞসম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইত, তাহারই নিয়মসমূহ হইতে জগতে জ্যামিতিশাস্ত্রের উৎপত্তি।"

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ, যাহা দেশে বিদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের বীজবপন করিয়াছে, তাহা যজ্ঞেরই ফলমাত্র; কারণ, যজ্ঞ হোম প্রভৃতি যে অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব, সেই অথর্ব্ববেদই আবার আয়ুর্ব্বেদের জন্মদাতা। প্রকৃত কথা এই যে, যজ্ঞের জন্য ঋষিদিগকে ঔষধি ও ফলমূল প্রভৃতি অরণ্য হইতে আহরণ করিয়া আনিতে হইত, এবং তাহারই ফলে নবনব ঔষধি ও ফলমূল প্রভৃতি

নহে; হিন্দুদিগের আচার প্রথার সহিত পারসীক আচার প্রথারও অনেকাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান। পারস্যের প্রাচীন জেন্দভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, এরূপ অন্য কোন বিদেশীয় ভাষার সহিত দেখা যায় না। এই সকল কারণে পারসীকেরা সিন্ধুতীরবাসী হিন্দুজাতির উপনিবেশ বা শাখাবিশেষ বলিয়াই বোধ হয়। জেন্দ শব্দটিই এই মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। ভাষাতত্ত্বের নিয়মালোচনা করিলে দেখা যায় যে, একটি শব্দ ভাষা হইতে ভাষান্তরে পরিভ্রমণকালে অক্ষররূপে পরিচ্ছদের কতক পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সময়ে শব্দাক্ষরগুলি নিজ নিজ পরিচিত অপর কতকগুলি অক্ষরকে আপনার স্থানে আহ্বান করে; যেমন, স জ হ, ইহারা পরস্পরের স্থানে পরস্পরকে আসন দিয়া থাকে। এই কারণে সপ্তাহ হপ্তাহ হইয়াছে, সংস্কৃত সোম শব্দ জেন্দ ভাষায় হোম হইয়াছে, এবং এই একই কারণে সংস্কৃত হরিদ্রা শব্দ পারস্য ভাষায় 'জরদ' এবং সংস্কৃত 'হোতা' জেন্দ ভাষায় জোতা আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রমাণে জেন্দ শব্দটি সিন্ধু শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। একদিকে সিন্ধু শব্দ হইতে যেমন হিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অন্যত্র জেন্দ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

আবিষ্কৃত হইয়া ঋষি-সভায় তাহাদিগের গুণাগুণও পরীক্ষিত হইয়া যাইত। তাই ভারতের আয়ুর্ব্বেদে আমরা যেমন ফলমূল প্রভৃতির প্রত্যেকটির গুণাগুণ বিশদরূপে জানিতে পারি, এমন আর কোনও বিদেশীয় গ্রন্থের দ্বারা জানিতে পারি না।

প্রাচীন কালে যজ্ঞ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল;—শ্রৌত ও গৃহ্য। তাহার মধ্যে গৃহ্য যজ্ঞ আবার তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত;—দৈনিক পঞ্চযজ্ঞ, বিবাহাদি সংস্কার যজ্ঞ ও পাক যজ্ঞ। দৈনিক পঞ্চযজ্ঞ প্রতিদিন আচরণ করা বিধি এবং সংস্কার যজ্ঞ উপবীত বিবাহাদি বিশেষ ক্রিয়াকর্ম্মে অনুষ্ঠান করা বিধি। পাকযজ্ঞগুলি পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্বদিনে এবং ঋতুতে ঋতুতে অনুষ্ঠেয়।

যজ্ঞ সেকালের ধর্ম্মসাধন ছিল; দেবতা, পিতৃ, অতিথি এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীদিগের পরিতৃপ্তির জন্য ঋষিদিগের সকল চেষ্টা। তাঁহারা ভাবিতেন যে, নিঃস্বার্থভাবে সকলকে পরিতৃপ্ত করিলে নিজে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হওয়া যায়, তাই তাঁহাদিগের নিয়ম ছিল, সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া অবশেষটুকু গৃহস্থেরা আহার করিবেন।

দেবানৃষীন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্গৃহস্থঃ শেষভুগ্‌ভবেৎ॥

অতএব দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ ও আহার, এই দুইটি কার্য্য, ঋষিপরিবারে সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় এক সূত্রে আবদ্ধ ছিল; এই কারণেই দেখিতে পাই, যজ্ঞের দ্বারা সূপশাস্ত্রেরও সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যে সকল মিষ্টান্ন ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হই, তাহাদিগের অনেকগুলিই যজ্ঞের কল্যাণে জন্মলাভ করিয়াছে। একালে যজ্ঞাদির বড় একটা প্রভুত্ব নাই, আহারই সর্ব্বতোভাবে যজ্ঞের স্থান অধিকার করিয়া শোভান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞীয় উপকরণগুলি এক্ষণে আহার্য্যের উপকরণে পরিণত।

যজ্ঞ কেবল এইরূপে যে ভারতেরই খাদ্যোন্নতির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, তাহা নয়; এমন কি, আমরা যে সকল বিদেশীয় খাদ্য এবং খাদ্যোপকরণ মুসলমান বা য়ুরোপীয় প্রতিভার ফল বলিয়া জানি, সে সকলেরও অনেকগুলি যজ্ঞমূলক। প্রাচীনকালে ভারতের যাগযজ্ঞই দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল; তাহা হইতেই সেই সকল দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে নব নব যজ্ঞীয় খাদ্যাদিও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এ সকল বিষয় ক্রমে প্রমাণসহকারে পাঠকের গোচর করিব।

প্রাচীনকালে যজ্ঞ ও আহার যে এক সূত্রে গ্রথিত ছিল, আহার শব্দটিও তাহার প্রমাণ। আহরণ শব্দ হইতেই আহার শব্দটি আসিয়াছে। আহরণ শব্দটি প্রকৃত যজ্ঞসম্পর্কীয় শব্দ; ইহা যজ্ঞ সম্বন্ধেই অধিক ব্যবহৃত হইত। সেকালে বনে বনে যজ্ঞের জন্য এবং যজ্ঞাবশেষ আহারের জন্য ফল মূল প্রভৃতি আহরণ করিয়া আনিতে হইত। একণে যদিও বনে বনে আহরণ করিয়া বেড়াইতে হয় না, কিন্তু একণেও বিনা আহরণে আহার্য্য লাভ করা সুকঠিন। ঋষিদিগের আহৃত বনজ শাক শবজিগুলি অধিকাংশ শবুজ রঙ্গের হইত বলিয়া শবুজ রংও 'হরিত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে;—আহরণ বা হরণ হইতেই হরিত শব্দের উৎপত্তি। আহরণ শব্দের সমগোষ্ঠীয় শব্দ আমরা য়ুরোপীয় ভাষাতেও দেখিতে পাই। ইংরাজী 'আরণ' (earn) শব্দটি সংস্কৃত আহরণ শব্দেরই বংশধর। ইংরাজী আরণ শব্দটি স্যাক্সন আরনিয়ান (earnian) বা জর্ম্মন আরন্‌টেন শব্দ হইতে আসিয়াছে; ইহার অর্থ শস্যাদি সংগ্রহ করা—আহরণ শব্দেরও ঐ একই অর্থ। শুদ্ধ আহার শব্দ নয়, আহারার্থ অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দেরই অনুরূপ শব্দ আমরা য়ুরোপীয় ভাষায় প্রাপ্ত হই। অনেকেই জানিতে পারেন, ভোজনার্থ অদ্‌ ধাতুর অনুরূপ শব্দ লাটিনে 'ইডো' (Edo) ইংরাজীতে ইট (Eat) স্যাক্সন ইটান (Etan) ইত্যাদি। সংস্কৃত অশন শব্দেরও তুল্য শব্দ আমরা জর্ম্মান ভাষায় এস্‌সেন্ (Essen) শব্দ পাই। এমন কি, যে 'ডিনার' (Dinner) শব্দের আমরা অনুবাদ করি, 'মধ্যাহ্নভোজন', সেই ডিনারকে জর্ম্মানরাও 'মধ্যাহ্নভোজন' বলে। ডিনারকে জর্ম্মন ভাষায় মিট্টাগস্ এস্‌সেন্ (Mittags essen) বলে; মিট্টাগস্ অর্থে মধ্যাহ্ন এবং এস্‌সেন্ অর্থে অশন বা ভোজন। অশন, অদন এবং আহরণ, এই শব্দ গুলি বৈদিক কাল হইতে সংস্কৃত ভাষার চলিয়া আসিতেছে। বেদমন্ত্র এবং বৈদিক গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতিতে বহু স্থলে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। গৃহ্যসূত্র 'সায়মাশ' ও 'প্রাতরাশ' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।* "নিষ্ঠিতে সায়মাশপ্রাতরাশেভূত মিক্তি প্রবাচয়েৎ।" প্রাতরাশ এবং সায়মাশ অনুষ্ঠিত হইলে পরে (ছাত্রগণকে) অধ্যয়ন করাইবে।

* আমরা প্রাতঃকালীন ভোজনকে প্রাতরাশ বলি, কিন্তু সায়ংকালীন ভোজনকে সান্ধ্য-ভোজন শব্দের দ্বারায় সচরাচর ব্যক্ত করি। কিন্তু বোধ হয়, সান্ধ্যভোজন অপেক্ষা বৈদিক সায়মাশ শব্দ ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়।

বাঘের ঘরে অতিথি।

আমি কার্য্যোপলক্ষে শ্রীনগর হইতে তিহরীর পথে যাইতেছিলাম। গাড়োয়া-লের রাজা শ্রীনগর হইতে তিহরী যাইবার যে রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছেন, সে পথের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রাজপথ শুনিয়া যাঁহারা কলিকাতা, দিল্লী, লাহোরের রাজপথের কথা মনে করিতেছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, সে রাজপথ এমন সুপ্রশস্ত যে, দুইটি মানুষ বিভিন্ন দিক হইতে আগত হইলে এক জনকে পর্ব্বতগাত্র ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে হয়; নতুবা অপর ব্যক্তির যাওয়া কষ্টকর। এই পথে এক দিন অপরাহ্নে আমি পথিক।

দুই প্রহরে এক বৃক্ষতলে অতিথি হইয়াছিলাম। সঙ্গে পর্ব্বতবাসী দৃঢ়কায় এক ব্রাহ্মণপ্রবর পথপ্রদর্শক ছিলেন; তিনি আমার একাধারে সব;—পাচক, ভৃত্য, পথপ্রদর্শক, কথার দোসর। সেই পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণের নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। দুই প্রহরে বৃক্ষতলে 'দাল আউর রুটি বানায়কে' মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করা গিয়াছিল; তাহার পর উভয়ে সেই বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ চারিটার সময় যাত্রা করা গেল।

এই স্থানে একটা কুসংস্কারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পাঠক-গণের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'হাঁচি টিকটিকি'র উপর অনেক বাক্যবাণ বর্ষিত হইয়া থাকে; এ সব জানিয়াও আমি তেমনি একটা ব্যাপারের কথা বলিতে যাইতেছি। যাত্রা করিবার জন্য যখন প্রস্তুত হইয়াছি, তখন প্রথমেই আমার হাতের লাঠিখানি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। এমন দৃঢ় সুন্দর যষ্টি, আমার পর্ব্বতভ্রমণের অদ্বিতীয় সহায়, আমার নিবিড় অরণ্যের একমাত্র সহচর, আমার সুখদুঃখের একমাত্র অবলম্বন, আমার সন্ন্যাসিজীবনের প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—কথা নাই, বার্ত্তা নাই, পৃথিবীর অন্যান্য প্রিয়তম চোরেরা যেমন এক এক জন এক এক দিন না বলিয়া না কহিয়া হৃদয় আঁধার করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তেমনি আমার এই অরণ্যবাসসহচর যষ্টিখণ্ডও অসময়ে এই বনপ্রান্তে আমাকে জবাব দিয়া বসিলেন। আমি কিছু অপ্রসন্ন হইলাম; কিন্তু নিরুপায়।

জীর্ণ বস্ত্রের মত যষ্টিখণ্ডদ্বয় পাহাড়ের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। কে জানে, হয় ত কোন্ দিন কোন পথিক আমার এই দেহটিকেও এমনই জীর্ণবস্ত্রের

মত পথের মধ্য হইতে সরাইয়া দিবে; তখন ত সেই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছিলাম।

পর্ব্বতপথে আর সমস্ত জিনিস না হইলেও চলে, কিন্তু হাতে একখানি লাঠি থাকা চাই। চড়াই উঠিবার সময় একখানি লাঠি তিনখানি পায়ের কার্য্য করে। কি করি, সঙ্গী পাহাড়ীর লাঠিখানি নিজে লইলাম, সে একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া চলনসই রকম একখানা লাঠি করিয়া লইল। সবে দুই তিন পা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে কি করিয়া বলিতে পারি না, আমার পায়ে কম্বল জড়াইয়া গেল, আর আমি একেবারে ভূমিসাৎ; এমন পড়িয়া গেলাম যে, যদি সে স্থান কোন একটা চড়াই বা উৎরাইয়ের মুখ হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার সন্ন্যাসযাত্রা শেষ হইয়া যাইত। সৌভাগ্য-ক্রমে স্থানটি তেমন উঁচু নীচু ছিল না; ততোধিক সৌভাগ্য যে, আমার পথপ্রদর্শক অতিনিকটেই ছিল; সে তাড়াতাড়ি আমাকে টানিয়া তুলিল। হাতে সামান্য একটু আঘাত লাগিয়াছিল; মাথাতেও লাগিয়াছিল, তাহা তখন তেমন বুঝিতে পারি নাই।

অকস্মাৎ লাঠি ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা অপেক্ষাও অকস্মাৎ আমার মত এক জন পর্ব্বতভ্রমণনিপুণ জোয়ান একেবারে 'পপাত ধরণীতলে' দেখিয়া পথ-প্রদর্শক এবেলা যাত্রা করিতে মহা আপত্তি করিয়া বসিল। এমন প্রবল দুইটি বাধা ঠেলিয়া এ অপরাহ্ণে যাওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আমি ইংরাজী পড়িয়াছি, বিজ্ঞানের ধার ধারি। সাহেবদের কলেজের ছাত্র, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের উন্নতিশীল যুবক; আমি এই পর্ব্বতের মধ্যে 'বাধা' মানিয়া কি ইংরাজী লেখাপড়ার মুখ হাসাইব? যদি কখন দেশে ফিরিয়া গিয়া এই গল্পটি করি, এমনই করিয়া একটি পাহাড়ীর কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া আমি একবেলা অকারণে গাছের তলায় অনাহারে পড়িয়া ছিলাম, তাহা হইলে আমার শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ যে আমাকে নিতান্ত বর্ব্বর মনে করিবেন? Huxley, Tyndal, Herbert Spencer প্রভৃতি পড়িবার কি এই ফল হইবে? এই রকম সাত পাঁচ ভাবিয়া সঙ্গীকে নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলাম; ও সব কিছুই নহে; এমন করিয়া চলা ফেরা করিলে চাই কি জীবনের অবশিষ্ট কয়টি দিন এই গাছের তলাতেই কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতই তাহাকে বুঝাই, সে সেই একই কথা বলে,—"দোনো বাধা ঠেল্‌কে জানা মুনাসিব নেহি।" শেষে আমি যখন কৃতনিশ্চয় হইলাম, তখন বেচারী আর কি করে?

"বাবুজীকা অদৃষ্টমে ভগবান্ বহুত কষ্ট লিখা",—এই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া, সে নিতান্ত অপ্রসন্নমনে আমার অনুগমন করিল, এবং ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমি কিন্তু বাধার কথা আর ভাবিলাম না।

সঙ্গীকে ধীরে ধীরে আসিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে চলা আমার পোষাইয়া উঠিল না। সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে কোথায় থাকিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। সে বলিল, "ঐ স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরে রাস্তার বাম পার্শ্বে একটা পাথরের ভাঙ্গা বাড়ী আছে; সেখানে দোকান আছে; সেখানেই আমরা আজ রাত্রিবাস করিব। সে দোকান ছাড়িয়া গেলে আর দশ মাইলের মধ্যে থাকিবার স্থান নাই।" আর রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, "বরাবর সিধা সড়ক"; সুতরাং পথপ্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে চলিবার আবশ্যকতা আর অনুভব করিলাম না; আমি ক্রমেই দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলাম, সঙ্গীও ক্রমে পশ্চাতে পড়িতে লাগিল।

সেই বেলা চারিটার সময়ে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছি; এখন সূর্য্য অস্ত যায় যায় হইল। রাস্তারও শেষে দেখি না, বাম পার্শ্বে সে পাথরের ভাঙ্গা বাড়ীও দেখি না; আর এত পথ চলিয়াছি, ইহার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর কি এক জন মানুষ কিছুই দেখিতে পাই নাই; বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সেই অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারই মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র সেই পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, কখনও বা একটু বেশী প্রশস্ত হইতেছে, কখনও বা অতি কষ্টে পথের রেখা বাহির করিতে হইতেছে। রাস্তার যে প্রকার গতিক দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, অনেক দিন তাহার অদৃষ্টে হয় হয় ত মনুষ্যের পদস্পর্শ ঘটে নাই।

খুব কম হইলেও দ্রুতপদে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল পথ চলিয়াছি; ইহার মধ্যেও কি পাঁচ মাইল পথ চলিতে পারি নাই? সন্ধ্যা আগত দেখিয়া এই কথাই বার বার মনে হইতে লাগিল। তাহা হইতেই পারে না। আমার মনে হইল, যে প্রকার তাড়াতাড়ি চলিয়াছি, তাহাতে পাঁচ মাইল কেন, পাঁচ ক্রোশ পথ আমি অতিক্রম করিয়াছি। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না, আমি এই জনহীন হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে পথ হারাইয়াছি। আর এখন স্বীকার করিতেই বা লজ্জা কি, তখন বার বার মনে হইতে লাগিল, 'বাধা' না মানিয়া আসিবার ফল ত হাতে হাতে ফলিল। দেশে আমাদের বাড়ীতে এক জন বহুকালের মুসলমান চাকর ছিল; সে যখন তখনই বলিত, 'যে না

মানে বাধা, সে বড় গাধা'; এই জঙ্গলের মধ্যে সেই কথা মনে হইল। বুঝিলাম, সঙ্গী পাহাড়ীর সেই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল, 'বাবুজীর' অদৃষ্টে ভগবান আজ অনেক কষ্ট লিখিয়াছেন।

এখন এই জনহীন নিবিড় অরণ্যে কি করি? যদি প্রাণ যায় তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ ত তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে! এই জঙ্গলের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি, আর রাত্রিকালে হিংস্রজন্তু আমাকে অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলুক, সংসারের উপর, জীবনের উপর হাজার বীতস্নেহ হইলেও, তাহা পারা যায় না; সুতরাং একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। সময় বুঝিয়া সন্ধ্যার আকাশে মেঘ উঠিল; একেই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বনের মধ্যে অন্ধকাররাশি এক এক স্থানে জমাট বাঁধিতেছিল, তাহার পর আকাশে মেঘ হওয়ায় তাহারা আরও ঘন হইতে লাগিল, আমারও বিপদ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের মেঘ, সবুর সয় না। এই আকাশ নির্ম্মল, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ পাহাড়ের কোন্ কোণে এক খণ্ড মেঘ চুপ করিয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, গাছ ভাঙ্গিল, পাতা উড়াইল, ধুলি কঙ্করে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; বৃষ্টি হইল, শিলাবৃষ্টি হইল; আবার দশ পনের মিনিটের পরেই যেমন হাসি মুখ, তেমনি। একে পথহারা, সঙ্গী কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই; তাহার পরে বেলা বারটার সময়ে যে দাল রুটী খাইয়াছিলাম, তাহা কখন হজম হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সন্ধ্যা আগত; ইহাতেও যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, সুতরাং এই অন্ধকারকে আরও ভীষণ করিবার জন্য আকাশে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি। মড় মড় করিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; প্রতিক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, এইবার একটা প্রকাণ্ড ডাল মাথার পড়িয়া আমাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবে। আমি একটা পাহাড়ের গায়ে চুপ করিয়া বসিলাম; সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই বৃষ্টি থামিয়া গেল, ঝড় কিন্তু শীঘ্র গেল না। বৃষ্টি অপেক্ষা ঝড়ই বেশী হইয়াছিল।

এ প্রকার স্থানে বসিয়া থাকিয়া কোনও ফলই নাই, ভাবিয়া, যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই ফিরিতে আরম্ভ করিলাম; মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলাম; যদি আমার চীৎকারধ্বনি সঙ্গীর অথবা অন্য কোন লোকের কর্ণে পৌঁছে, তাহা হইলেও এই অন্ধকার রাত্রে আমার আ-

মিলিতে পারে। কেহই কোন উত্তর দিল না, কেবল সেই ঘনান্ধকার নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আমার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়া গেল।

একটু অগ্রসর হইয়াই একটা বেশ পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান দিয়াই চলিয়া গিয়াছি, কিন্তু যাইবার সময়ে এদিকে তত লক্ষ্য করি নাই। এই স্থানে পর্ব্বতের গাত্র হইতে একটা নির্ঝর পতিত হইতেছে, এবং তাহারই পার্শ্বে একটা গুহা; অন্ধকারে যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, দেখিলাম, গুহাটি পরিষ্কার বটে। তবে এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বের ঝড়ে অনেকগুলি শুষ্কপত্র গুহার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। আরও দেখিলাম, গুহার বাহিরে অনতিদূরে বড় বড় তিন চারিটা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া আছে। অনেক কষ্টে সেই কাষ্ঠ কয়েকখানি গড়াইয়া গড়াইয়া গুহার মুখে আনিয়া বসাইলাম। তাহার পর গুহার মধ্যে যে শুষ্কপত্র ছিল, সমস্ত সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলির সম্মুখে স্তূপাকার করিলাম। আহার আর কি করিব, অঞ্জলি পূরিয়া নির্ঝরের জল পান করিলাম। তাহার পর দুইখানি ছোট ছোট 'চির' কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম; কিছুক্ষণ পরেই তাহা হইতে অগ্নি বাহির হইল। এতক্ষণ আমি গুহার মধ্যে প্রবেশ করি নাই; কারণ, বাহিরে যতটা অন্ধকার হইয়াছিল, গুহার মধ্যে অন্ধকার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যখন শুষ্ক পত্রে অগ্নি সংযোগ করিলাম, তখন দেখিলাম, গুহাটি নিতান্ত ছোট নহে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম, ইহা কোন হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান। আজ আমি তাহারই গৃহে অতিথি। উপায়ান্তর না দেখিয়া ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং বড় বড় কাঠগুলি এমন করিয়া গুহাদ্বারে সাজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলাম যে, বাহির হইতে সহজে আর কেহ ভিতরে আসিতে পারিবে না। বিশেষতঃ, গুহার মধ্যভাগ যেমন প্রশস্ত, প্রবেশদ্বার তেমন নহে। বড় একটা বাঘ কি ভালুক গুঁড়ি গুঁড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু ভিতরে আমি অনায়াসে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলাম। গুহা এই প্রকার সঙ্কীর্ণমুখ হওয়ায় আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল; কারণ, আমি যে আগুন জ্বালাইয়াছিলাম, তাহাতে সেই সঙ্কীর্ণ গুহাপথে আর কাহারও প্রবেশের যো ছিল না।

এই প্রকারে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, মনে নাই। হঠাৎ একটা শব্দে আমি চকিতের জাগিয়া উঠিলাম। আমি যে ঘুমাইয়াছিলাম, তাহা নহে; গুহার

মধ্যে কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া নিজের জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতেছিলাম। শব্দটি নির্ঝরের দিক হইতে আসিতেছে। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কোন জন্তু যেন জিহ্বা দ্বারা চক্ চক্ করিয়া জল খাইতেছে। তাহার অব্যবহিত পরেই দেখি, প্রকাণ্ডকায় একটা বাঘ গুহার সম্মুখে আসিয়া বসিল; বোধ করি, আগুন জ্বালিয়াছিলাম বলিয়া নিকটে আসিতে পারিল না; দূরে পশ্চাতের দুই খানি পায়ের উপরে বসিয়া একদৃষ্টে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাঘ্র মহাশয়ের দীন নয়ন দেখিয়াই বুঝিলাম, এ গৃহ তাঁহারই; আমি আজ তাঁহাকে বেদখল করিয়া জোর করিয়া তাঁহার রাজগৃহে অতিথি। এমন অতিথি সে তাহার ব্যাঘ্রজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কখনও দেখে নাই। তাহার মহান রাজশক্তির এমন অবমাননাও তাহার জীবনে কখনও হয় নাই। কিন্তু কি করে? আজ স্বয়ং ব্রহ্মা ক্ষুদ্র মানবের সহায়; নতুবা এতক্ষণ এমন নির্লজ্জ ক্ষীণকায় দুর্ব্বল অভ্যাগতের জন্য সে অতি বিজন স্থানে চির-আতিথ্যের বন্দোবস্ত করিত!

এই অন্ধকার রজনীতে সহরের মধ্যে তোমাকে যদি কেহ তোমার বাড়ী হইতে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া নিজে দখল করিয়া বসে, তাহা হইলে তুমি যে দুর্ব্বল বাঙ্গালী, তুমি কি অন্ততঃ তোমার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হস্তখানি একবারও মুষ্টিবদ্ধ কর না? ব্যাঘ্র বনের রাজা; সকলের মাথা খাইয়াছে বই নিজের মাথা কাহারও নিকট অবনত করে নাই। আজ এই গভীর নিশীথে, এই অন্ধকারে, তাহাকে গৃহচ্যুত করিয়া জঙ্গলে তাড়াইয়া দেওয়াটা সে সহজেই পরিপাক করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে এমন এক গর্জ্জন করিয়া দণ্ডায়মান হইল যে, আমার বোধ হইল, সে নিজের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য বুঝি এই অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করে! কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে মানুষের অপেক্ষা বুদ্ধিমান দেখিলাম। তুমি আমি হইলে এই ভদ্রাসন দখলের জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করিয়া শেষে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও তরুতলে রাত্রিযাপন করিতাম। ব্যাঘ্র মহাশয় সে প্রকার কিছু না করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হয় ত আগামী কল্য একবার এই অতিথির সঙ্গে বোঝা পড়া করিবার মতলব আঁটিতে আঁটিতে সে সমস্ত রাত্রি বনের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার পর দিন বেলা সাতটার সময়ে আসিয়া সে হয় ত দেখিয়াছিল যে, তাহার অতিথি প্রকৃতই অতিথি; দ্বিতীয়

তিথি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত নন। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত হয় ত সেই ব্যাঘ্র আকাশে মেঘ দেখিলেই আগে ছুটিয়া আসিয়া নিজ গৃহদ্বার জুড়িয়া বসে! কিন্তু সে পরীক্ষা করিতে যাইবার আর আমার অবকাশ ছিল না। এক রাত্রি বাঘের ঘরে অতিথি হইয়া আসিয়াছি। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাত্রে তোমার বাড়ী অতিথি হইতে গেলে তুমি তাড়াইয়া দিতে, কিন্তু বনের বাঘ সমস্ত রাত্রি নিজের বাসগৃহ ছাড়িয়া দিয়া অতিথি সেবা করিয়াছিল! কি স্বার্থত্যাগ!

ভূকম্পন-তত্ত্ব।

পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক রহস্যের মধ্যে ভূকম্পন একটি অতি গূঢ় রহস্য। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানেও ইহার সংঘটনকালের বিষয়ে কোন নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ভূকম্পনের সহিত পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু কি প্রকারে ঐ তাপ দ্বারা এরূপ ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হয়, এবং উক্ত তাপের প্রকৃতিই বা কি, এ সকল প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানবিশারদগণ আজও নিরুত্তর; যাঁহারা সাহস করিয়া এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই আন্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া থাকেন। বিদ্যুতের সহিত ভূকম্পনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সম্প্রতি কয়েকটি বিজ্ঞানবিদ্ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

যে সকল পণ্ডিত বিদ্যুৎকেই ভূকম্পনের মূল কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদ আজিও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং এই অনুমানের পোষক কোন যুক্তিও অদ্যাপি প্রদত্ত হয় নাই। আভ্যন্তরীণ-তাপবাদী পণ্ডিতগণের মতবাদই আজ কাল দার্শনিক সমাজে গ্রাহ্য; কিন্তু অদ্যাপি ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। বিরুদ্ধমতবাদী বৈজ্ঞানিকগণ নানা যুক্তি দ্বারা ইহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভূকম্পের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভবতঃ ভূপৃষ্ঠের অতিনিম্ন প্রদেশে বৃহদায়তন গহ্বর আছে। এই সকল গহ্বরে, ভূপৃষ্ঠস্থ জল কোন প্রকারে নীত হইলে, ভূমধ্যস্থ তাপ দ্বারা তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, কোন পদার্থ বাষ্পীভূত হইলেই তাহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়; এবং অনতিপ্রসর স্থানে আবদ্ধ বাষ্পে তাপ প্রদান করিলে, বাষ্প আরও অধিক স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করে। যদি

আবদ্ধ স্থান হইতে নির্গমের কোন পথ থাকে, তবে উত্তপ্ত বাষ্প সবলে তথা হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করে, নচেৎ আবদ্ধস্থান ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ছেলেদের রবার-নির্ম্মিত খেলনা ব্যোমযান লইয়া এ বিষয়ের বেশ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। উক্ত বাষ্পপূর্ণ খেলনায় ঈষৎ তাপ সংযোগ করিলে রবার গোলকটি স্ফীত হইতে দেখা যায়; কিন্তু একটু অধিক তাপ প্রয়োগ করিয়া মধ্যস্থ বাষ্প উত্তপ্ত করিলে সশব্দে রবারের আবরণটি বিদীর্ণ হইয়া যায়। বাষ্পীয় যন্ত্রাদিতে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই হঠাৎ বাষ্পনির্গমপথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায়, উক্ত প্রকারে পাত্র বিদীর্ণ হওয়াই বিপত্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ভূমধ্যস্থ আবদ্ধ বাষ্পরাশি উত্তপ্ত হইয়া অধিক স্থানে ব্যাপ্ত হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু স্থানাভাব-বশতঃ যথেচ্ছ প্রসার লাভ করিতে পারে না, কেবল গহ্বরপার্শ্বে ভয়ানক চাপ দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। ভূমধ্যস্থ গহ্বরে প্রায় ভূপৃষ্ঠাভিমুখী দুই একটি ছিদ্র থাকে। গহ্বরস্থ বাষ্পরাশি পূর্ব্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সেই সকল ছিদ্র অবলম্বন করিয়া ভূপৃষ্ঠাভিমুখে আসিতে আরম্ভ করে। অধিক উত্তপ্ত হইলে এই বাষ্পরাশি কখন কখন ভূস্তরের নানা বাধা অতিক্রম করিয়া ভূপৃষ্ঠের উপরে আসিয়া উপনীত হয়। ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ অবলম্বন করিয়া বাষ্প-রাশি ভূপৃষ্ঠস্থ হইবার সময়, ছিদ্রপার্শ্বস্থ ভূমিতে সবলে আঘাত করিতে থাকে। ইহারই ফলে ভূমি আন্দোলিত ও ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়। কখন কখন এই উত্তপ্ত বাষ্প ভূপৃষ্ঠস্থ হইবার পূর্ব্বে, কোন জলার্দ্র স্তরের সন্নিহিত হইবামাত্র শীতল হইয়া পুনরায় তরলাকার ধারণ করে; এই সকল স্থলে কেবল ভূকম্পন অনুভূত হইয়া থাকে, তথায় অগ্ন্যুদ্গমাদি অপর কোনও উপদ্রব দৃষ্ট হয় না।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, জগদীশ্বর জগতের প্রত্যেক কার্য্যই কোনও এক বিশেষ মঙ্গলের উদ্দেশ করিয়া থাকেন; মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে অকল্যাণ নাই। যদিও আমরা সর্ব্বাংশে এই মতের পক্ষপাতী নহি, তথাপি আপাততঃ অশুভ কার্য্য সকল যে কালে অশেষ কল্যাণের আকর হইয়া থাকে, তাহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। ভূকম্পের সর্ব্বধ্বংসী প্রাকৃতিক উপদ্রব হইতে অতি সুদূর ভবিষ্যতেও যে কোন লোকস্থিতিকর সুফল পাওয়া যাইতে পারে, এ কথা সহসা মনে হয় না। পম্পীনগরের ধ্বংসকাহিনী, লিস্‌বনের সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্পের বর্ণনা, এবং জাপানের সর্ব্বনাশের কথা শ্রবণ করিলে, এই সকল দৈব-উপদ্রব অমঙ্গলের মূর্ত্তিভেদ বলিয়াই মনে হয়। ভূতত্ত্ব-

বিদ্গণ দেখিয়াছেন, ভূকম্পন দ্বারা নিয়তই মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে। যদি সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত একবারও ভূমিকম্প না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর কোনও বৈচিত্র্য থাকিত না। এমন কি, মনুষ্যাদি জীবগণেরও সৃষ্টি হইত না। জল ভূভাগের পরম শত্রু; সমুদ্র, নদী ও বৃষ্টিজলের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, ভূ-ক্ষয় জলের এক প্রধান কার্য্য। যদি এই অপচয় কোনও প্রবল প্রতিকূলশক্তি দ্বারা প্রতিহত না হইত, তাহা হইলে নদী ও সমুদ্র সমস্ত ভূ-ভাগ গ্রাস করিয়া, কিয়ৎকালের মধ্যে উন্নত প্রদেশমাত্রই স্বল্পোন্নত সমতল চরভূমিতে পরিণত করিত। এবং পরে চরসংস্থান ব্যাহত হইয়া সাগরজলে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। সার্ জন্ হার্সেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন, জলের এই সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির প্রতিকূলে অন্য কোনও শক্তি নাই; কেবল ভূমিকম্প দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে। ভূমিকম্প দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভূপৃষ্ঠ উচ্চ বা নিম্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা কোন স্থান অসম্ভব উন্নত বা নিম্ন হয় না। সমুদ্রতীরবর্ত্তী যে ভূ-ভাগ ও নদীবহুল প্রদেশ জল দ্বারা অতি শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সকল প্রদেশেই আগ্নেয় পর্ব্বতাদি দ্বারা প্রায় ভূমিকম্প হইয়া স্থলভাগ আবশ্যকানুযায়ী উন্নত হইয়া পড়ে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের প্রসিদ্ধ ভূকম্পন, ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ; এই ভূকম্পন দ্বারা সমুদ্রতীরবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম সাগরগর্ভস্থ হইয়া যায়; কিন্তু উক্ত গ্রামের অনতিদূরে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও ২০ মাইল বিস্তৃত একটি ভূখণ্ড অকস্মাৎ অত্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে সাগরতরঙ্গের উপদ্রবে উক্ত প্রদেশের অনেক অংশ সমুদ্রে বিলীন হইয়াছিল; কিন্তু এই আকস্মিক ভূকম্পন দ্বারা সাগরের উপদ্রব এককালে তিরোহিত হইয়াছে।

প্রাচীন বা আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে ভূমিকম্পের কালগণনা করিবার কোন উপায় লিপিবদ্ধ নাই। সংঘটনসময়নিরূপণের কোনও নিয়ম পরিজ্ঞাত থাকিলে, জাপান ও ইটালি প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বসংহারক ভূমিকম্পের অনিষ্টকারিতার অনেক অংশে হ্রাস হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শতচিন্তাজর্জ্জরিত মানবের মন এক নূতন অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িত। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভূকম্পনে আমার সুবৃহৎ অট্টালিকা ভূতলশায়ী হইবে, এবং সম্ভবতঃ পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া ধনজনপূর্ণ মহানগরী উদরসাৎ করিবে, ইহা অপেক্ষা ভয়াবহ অশান্তিকর ভবিষ্যৎবাণী আর কি হইতে পারে? আধুনিক

বৈজ্ঞানিকগণ নানা উদ্বেগ-পীড়িত মানব-মনে আর এক অভিনব উৎকণ্ঠার সঞ্চার করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া, আজ কয়েক বৎসর হইতে ভূকম্পের কাল-গণনাপদ্ধতির আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রথমে ইটালি প্রভৃতি ভূকম্পনবহুল য়ুরোপীয় প্রদেশে পরীক্ষার সূচনা করেন; কিন্তু তথায় বহুচেষ্টাতেও ভূমিকম্পনের কাল-নিরূপণোপযোগী কোন সূত্র না পাইয়া, তাঁহারা ভূকম্পের কেন্দ্রস্থল জাপান-দ্বীপে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ আচার্য্য মিল্‌নি, গত বিশ বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া, এই বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণাদি করিয়াছিলেন, এবং অল্প দিন হইল, ভূকম্পনের কালনিরূপক এক যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ঝটিকা প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক উপদ্রবের সংঘটনকাল অধিক পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা বড় দুরূহ; এমন কি, আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞানের অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বায়ুমান যন্ত্রাদি দ্বারা যেমন ঝটিকাগমনের সম্ভাবনা সংঘটনকালের প্রায় অব্যবহিত পূর্ব্বে জানা যায়, তেমনই মিল্‌নি সাহেবের উল্লিখিত যন্ত্র দ্বারা ভূকম্পন-সম্ভাবনা কেবল দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে জানা গিয়া থাকে। ভূমিকম্প বাহ্যতঃ যেরূপ আকস্মিক ঘটনা বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা সেরূপ নহে। মিল্‌নি সাহেব বলেন, কোন স্থানে ভূমিকম্প হইবার প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠ অতি ধীরে ধীরে কম্পিত হইতে থাকে। এই স্পন্দন এত মৃদু যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু সাহেবের এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্র দ্বারা এই স্পন্দন উপলব্ধি করিয়া আশু ভূকম্পনের সম্ভাবনা জানা যায়। ভূকম্পনসূচক এই আদি-স্পন্দনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার উৎপত্তিস্থানে, অর্থাৎ ভাবী ভূকম্পনক্ষেত্রে, এই স্পন্দন অতি মৃদু ও ক্ষণস্থায়ী থাকে; এমন কি, পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারাও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। কিন্তু কেন্দ্র হইতে যত দূর দেশে যাওয়া যায়, স্পন্দন তত সুস্পষ্ট ও কালব্যাপী বলিয়া বোধ হয়। জাপানের কোন আসন্ন ভূকম্পনের আদি-স্পন্দন ইংলণ্ড হইতে যেরূপ স্পষ্ট অনুভূত হইবে, চীন হইতে সেরূপ হইবে না।

আচার্য্য মিল্‌নি জাপান হইতে ভূকম্পন সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ণিত নব তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, অধুনা ওয়াইট্‌ দ্বীপে এক পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় নানাবিধ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর নানা অংশের ভাবী ভূমিকম্পের

বিষয় গণনা করিয়া তত্তৎ দেশের অধিবাসীদের বিদ্যুৎযোগে জানাইয়াছেন। গত জুন ও আগষ্ট মাসে জাপানে যে মহা ভূকম্প হয়, মিল্‌নি সাহেব অনেক পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার যন্ত্রটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া, গণনার ফল প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক-সমাজই আচার্য্য মিল্‌নির এই নবাবিষ্কারে বিস্মিত হইয়াছেন। কেবল একটি নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাগারে স্পন্দন পরীক্ষা করিয়া সমগ্র ভূভাগের ভূকম্পনের কথা গণনা করা অতীব দুরূহ, এবং তাহা ভ্রমপূর্ণ হইবারও সম্ভাবনা আছে বিবেচনা করিয়া, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান-সভা ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন্ পৃথিবীর নানা অংশে পরীক্ষাগারস্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু পর্য্যবেক্ষণেও প্রশান্ত ও আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগরের তল-দেশের অবস্থা বিশেষ জানিতে পারেন নাই। সাগরতলশায়ী টেলিগ্রাফের তার প্রায়ই বিকল ও ছিন্ন হইতে দেখিয়া, সমুদ্রতল চঞ্চল ও ভূমিকম্পবহুল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। আচার্য্য মিল্‌নির এই বৃহৎ আবিষ্কার দ্বারা সমুদ্রের প্রকৃত অবস্থা ও সমুদ্রতলস্থ ভূকম্পনকেন্দ্র সকলের অবস্থান প্রভৃতি অতি সহজেই জানিবার সম্ভাবনা হইল, অনেকে এইরূপ আশা করিতেছেন।

লহ উপহার।

ধর ধর হৃদি-পুষ্প লহ উপহার।
আজি এ মধুর প্রাতে
মধুর প্রভাত-বাতে
কি শুভ সংবাদ আসে প্রেম-দেবতার।
গোপনে আগনে, নারি,
আর না রাখিতে পারি—
ছুটে কি আকুল শ্বাস সুখ-মলয়ার!
বুঝি দলে দলে ফুটে
পূর্ণতায় পড়ি লুটে,
টুটে পড়ে চারিধারে সর্ব্বস্ব আমার।
তুলিতে তুলিতে ফুলে
লহ গো আমারে তুলে—
গাঁথিয়া পর গো গলে প্রেম-ফুলহার।

ধর ধর হৃদি পুষ্প লহ উপহার।
তুমি স্বর্গ বনদেবী
ভ্রমিছ সমীর সেবি,
আমি মন্দাকিনী-কূল-নবীন-মন্দার!
জন্ম-জন্মান্তর ধরি
আশা স্মৃতি জড় করি
গড়িয়াছি তোমা লাগি স্বপন-সম্ভার।—
তুমি পরিমল-সুখে
তুলিয়া লইবে বুকে,
পবিত্র কৃতার্থ হব পরশে তোমার।
রাখ কিম্বা দল' পায়—
কিবা তায় আসে যায়,
তোমারি একান্ত আমি স্বতঃ উপহার।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

বিদ্রোহের কবিতা।

ফরাসী বিপ্লবের সমকালে, বায়রন, শেলী প্রভৃতি কবিগণ ইংরাজী সাহিত্যে যে বিদ্রোহের সুর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এখন তাহার আর বড় সাড়া পাওয়া যায় না। ইংরাজী কবিতায় আজ কাল টেনিসনের আধিপত্যই প্রবল। মৃত রাজকবি, বায়রণের উদ্দাম অশান্তিপূর্ণ শয়তানী সঙ্গীতকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শান্ত, সুশীতল, দার্শনিকোচিত সন্তোষ সহিষ্ণুতারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। বর্ষাসমাগমে নিদাঘ-তপ্ত প্রান্তরের ন্যায় ইংরাজী সাহিত্য এক্ষণে প্রায়শঃ শীতল ও সুখসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশে এই শয়তানী সুরের এখনও সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বায়রণের প্রেতাত্মা ব্রিটিশ-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কোনও কোনও বিদেশী কবির স্কন্ধে ভর দিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা এপ্রিল মাসের "কণ্টেম্পোরারী" পাঠে অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি জর্ম্মান্ সাহিত্যে তাঁহার কিঞ্চিৎ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে আর্নো হোল্‌জ্ নামক এক জন নবীন জার্ম্মান্ কবির কয়েক ছত্র অনুবাদ করিয়া, সেই উৎপাতের পরিচয় দিতেছি। "ধর্ম্মতত্ত্ব" নাম দিয়া কবি ভগবানের সহিত কতকটা এইরূপ চুক্তি করিতেছেন,—

শয়তানী সুর।

হে দয়াল বিভু! সরল সুজন!
শ্রীচরণে শুধু এই নিবেদন,—
দেহমাঝে মোর আছে যে জঠর
বিধিমতে তার লইও খবর!
প্রয়োজন মত দিও সেই পানি—
দুনিয়ার সেরা চিজ যারে মানি!
নাস্তিক তবে কোন্ বেটা হয়,
গোড়ের গোলাম রব দয়াময়!
প্রভাতে উঠিয়ে না পিয়ে চা'য়
গোটা বাইবেল করিব সায়!
দিব রবিবারে হইয়ে হাজির
গেলাস গেলাস অনুতাপ-নীর।
আর যাহা যাহা তোমার সাধন,
কিছুতে খেলাপ হবে না কখন।

বায়রণের ভূত ভিন্ন আর কোনও ভূতে এ সব কথা বলাইতে পারে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। সুতরাং যাঁহার পবিত্র স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ-পাঠক এই শয়তানী মায়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারই একটা অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি,—

"It is better to fight for the good than to rail at the ill."

জীবনচরিত।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

বোধ হয়, মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল অপেক্ষা কোন ইংরাজ মহিলাই জগতে অধিকতর প্রসিদ্ধ নহেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন, এ সংবাদে বোধ হয় অনেকে বিস্মিত হইবেন। নাইটিঙ্গেল এক্ষণে নির্জ্জনে ও সামাজিক সংস্রব হইতে দূরে বাস করিয়া থাকেন। "টেম্পেল ম্যাগাজিনে" মিসেস্ টুলি তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে অনেক অপরিজ্ঞাত নূতন কথা আছে; আমরা তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

মিস্ নাইটিঙ্গেল ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় এই জন্যই তিনি ফ্লোরেন্স নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম উইলিয়ম শোর নাইটিঙ্গেল;

পারিবারিক পরিচয় ও বাল্যভ্রমণ।

তিনি হ্যাম্পশায়রের এম্বিলি পার্ক ও ডার্ব্বিশায়রের লীহার্ষ্ট, এই উভয় সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন; নাইটিঙ্গেল তাঁহার পিতার কনিষ্ঠা কন্যা। অন্য উত্তরাধিকারীর সহিত একযোগে তাঁহার ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে একবার "এক্‌জামিনার" নামক পত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—"তিনি প্রতিভাশালিনী এবং উচ্চশিক্ষার ফলে অসাধারণ রমণী। প্রাচীন ভাষাসমূহে এবং অঙ্কশাস্ত্রের উচ্চ শাখা সকলে, সাধারণ শিল্প, বিজ্ঞান, এবং সাহিত্যে, তাহার জ্ঞান গভীর ও অসাধারণ। আধুনিক প্রায় সকল ভাষাই তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি য়ুরোপের সকল দেশে ভ্রমণ করিয়া য়ুরোপীয় জাতিসমূহের আচার ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। নাইল নদে এবং নাইল হইতে বহুদূরস্থ জলপ্রপাত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স অল্প, রমণীজনসুলভ সুন্দর মুখশ্রী; তিনি লোকপ্রিয়, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তদীয় ভদ্র ও নম্র ব্যবহারে ব্যক্তিমাত্রই মুগ্ধ হইয়া যান। সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি আছেন। কিন্তু নিজ গৃহে সুশিক্ষিত বহু আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইয়া স্নেহশীল মাতা পিতার আজ্ঞাপালনে তিনি সমধিক সুখানুভব করিয়া থাকেন।"

যে প্রতিভার গুণে তাঁহার নাম জগতে ধ্বনিত হইতেছে, তাহার লক্ষণ বাল্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল। "শুশ্রূষাকারিণীদের রাণী" নাইটিঙ্গেলের প্রথম রোগী এক বৃদ্ধ মেষপালকের

তাঁহার প্রথম রোগী।

কুকুর। এক দিন তিনি তাঁহার কোনও ধর্ম্মযাজক বন্ধুর সহিত অশ্বারোহণে এক পার্ব্বত্য পথ দিয়া নিকটস্থ অনাথাশ্রমে যাইতেছিলেন; ঐ ধর্ম্মযাজক নাইটিঙ্গেলের বিশেষ আগ্রহে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অনাথনিবাসস্থ রোগকাতর নিঃস্ব ব্যক্তিদের দেখিতে লইয়া যাইতেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, রজার নামক এক স্কচ্ মেষপালক অতি কষ্টে তাহার মেষপাল তাড়াইয়া আনিতেছে। সঙ্গে তাহার কুকুরটি নাই। দেখিলেন, কতকগুলি বালক একটি কুকুরকে প্রস্তর আঘাতে খঞ্জ করিয়া দিয়াছে। মেষপালক মনে করিয়াছিল যে, বালকেরা কুকুরটির পা ভাঙ্গিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে। এই বিশ্বাসে সে কুকুরটির প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় নাইটিঙ্গেল তথায় উপস্থিত হইয়া কুকুরের কি হইয়াছে, পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। পাখানি একেবারে ভাঙ্গে নাই, আহত হইয়াছে মাত্র, ইহা দেখিয়া, ধর্ম্মযাজক বন্ধুর পরামর্শে গরম সেঁক দিয়া মেষপালকের বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া তাহার পায়ে পটি বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি ঐ কুকুরটিকে সুস্থ করিয়া তাহার প্রভুর হস্তে দিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। এই ঘটনার পর, নিকটবর্ত্তী স্থানে যাহারই কোন জন্তুর পা কাটিত, ভাঙ্গিত, অথবা কোন অসুখ হইত, তাহারা মিস্ নাইটিঙ্গেলের নিকট চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দিত।

বিংশতি হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল তিনি লণ্ডন, ডব্লিন্ এবং এডিনবর্গের হাঁসপাতালগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শুশ্রূষার শিক্ষা-ক্ষেত্র।

নাইটিঙ্গেল ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের বড় হাঁসপাতালগুলির সহিত এই সকল হাঁসপাতালের অভাব প্রভৃতির তুলনা করিয়া একটি অভাব লক্ষ্য করিলেন যে, লণ্ডন, ডব্লিন্ প্রভৃতির চিকিৎসালয়ে সুশিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণী রমণীর বিশেষ অভাব। নাইটিঙ্গেলই প্রথমে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করেন যে, স্ত্রীজাতির শুশ্রূষাবিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি থাকিলেও,

শুশ্রূষাকার্য্যের প্রণালী বিশেষরূপে শিক্ষা করা আবশ্যক। ফরাসী ও ইটালীয় শুশ্রূষাকারিণী ভগিনীসম্প্রদায় আছে। এ বিষয়ে প্রটেষ্টাণ্ট ইংলণ্ড অনেক পশ্চাতে আছেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করিলেন। রাইন নদীর তীরবর্ত্তী কেইসারওয়ার্থ নগরে শুশ্রূষাকারিণী ভগ্নীগণের শিক্ষার জন্য প্রোটেষ্টাণ্টদের এক শিক্ষালয় ছিল। বিখ্যাত প্রদর্শনীর বৎসর তিনি সেই বহুদূরস্থ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় ঐ শুশ্রূষাকারিণী-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিছু দিন শুশ্রূষাপ্রণালী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পারিস নগরীর চিকিৎসালয়ে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শরীর অসুস্থ হওয়ায়, তিনি কিছুদিন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয় নিকেতন লিহষ্টে বাস করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু অনলসচিত্তে তাঁহার শিক্ষিত শুশ্রূষাপ্রণালী প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। লণ্ডন নগরের ৪৭ নং হার্লষ্ট্রীটে বৃদ্ধা অসহায় শিক্ষয়িত্রীগণের জন্য একটি আশ্রম ছিল। ঐ সময়ে সেই আশ্রমটি অর্থ ও সুব্যবস্থার অভাবে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেছিল। অসহায়া দরিদ্রা রমণীগণের শোচনীয় অবস্থাদর্শনে মিস্ নাইটিঙ্গেলের কোমল হৃদয় করুণায় কাতর হইয়া উঠিল। তিনি আর তাঁহার প্রিয় নিকেতনের আরামকক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। হার্লষ্ট্রীটের আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং প্রাণপণ চেষ্টায় আশ্রমটি সুপ্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অদ্যাবধি ঐ আশ্রমটি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ তাঁহার অবলম্বিত সুপ্রণালীক্রমে পরিচালিত হইতেছে। সেই সময়ে কোন মহিলা তাঁহার সহিত ঐ আশ্রমে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অশ্রান্ত পরিশ্রমের বিষয় এইরূপ বলেন, "তাঁহাকে হাঁসপাতালের নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত। শুশ্রূষাকারিণীদের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে, চিঠিপত্রের উত্তর এবং রোগীদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিতে এবং হিসাব রাখিতে হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এক জন পাকা গৃহিণীর কার্য্য হইতে এক জন দক্ষ হিসাব-রক্ষকের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে হইত।" এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমের ফলে পুনরায় তাঁহাকে স্বাস্থ্যের অনুরোধে লিহষ্টে বিশ্রামার্থ প্রতিগমন করিতে হইল।

সেবা।

মিসেস টুলি লিখিতেছেন, আমরা ক্রীমিয়ার যুদ্ধকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের সৈন্যগণকে বিশেষরূপে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। আহত সৈনিকগণের যাতনার সংবাদ শ্রবণে ইংলণ্ডের দয়াবতী রমণীগণের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সৈনিকগণের শুশ্রূষার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন সুশিক্ষিত সিড্‌নী হার্ব্বার্ট্ যুদ্ধবিভাগের কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসংখ্য মহিলাকে সাহায্যে অগ্রসর দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি মিস্ নাইটিঙ্গেলের শুশ্রূষাকার্য্যে আন্তরিক অনুরাগ ও অভিজ্ঞতার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহাকে মহিলাগণের অধিনায়িকার পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। মিস্ নাইটিঙ্গেলও যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সেই সময়েই তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। পরদিন প্রাতে মিস্ নাইটিঙ্গেল মিঃ হার্বার্টের এক পত্র পাইলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোদ্যতা শুশ্রূষাকারিণী সম্প্রদায়ের অধিনায়িকার পদ গ্রহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করুন। লেখিকা উপসংহারে বলিতেছেন, মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনেতিহাসের অবশিষ্টাংশ মানবজাতির স্মৃতির সাধারণ উত্তরাধিকারের এক অংশমাত্র। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

ক্রিমীয়ার যুদ্ধে
গমন।

সমালোচনা।

ষাট বৎসরে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বকাল ষাট বৎসর পুর্ণ হইতে চলিল। এই উপলক্ষে ইংরাজ রাজত্বের সর্ব্বত্র আনন্দোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইতেছে; ভারতবর্ষেও উৎসবের দুন্দুভি বাজিতেছে। তবে এখানে এ বৎসর অন্নহীন ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদে এ আনন্দকোলাহল লাকিয়া যাই-তেছে। তাই আমরা মহারাণীর স্মৃতিচিহ্নস্থাপনের প্রসঙ্গে মিষ্টার আনন্দমোহন বসুর কথার সমর্থন করিয়া বলি—যেন বৎসর বুঝিয়া কাজ করা হয়;—যাহাতে ভবিষ্যতে কোন উপকারের আশা আছে, যেন সেইরূপ কোন স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হয়। দুর্ভিক্ষের সাহায্য-সভায় বড় লাট সত্যই বলিয়াছিলেন,—'ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মহারাণীর রাজত্বের এই ষষ্টিতম বৎসরের স্মৃতির সহিত তাঁহার ভারতবাসী প্রজাদিগের এই দুঃখ দুর্দ্দশার ইতিহাস বিজড়িত থাকিবে।'

এই ষাট বৎসরে জগতের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা পুর্ব্বে করি-য়াছি। এখন আমরা Bengal Chamber of Commerceএ মিষ্টার প্লেফেয়ারের বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

বহির্বাণিজ্য।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যবিস্তারের বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। এখন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না যে, ১৮৩৭—৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আমদানী ও রপ্তানী মালের মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যা-দির মূল্য ধরিয়া ১৯½ কোটী টাকার অধিক ছিল না। ১৮৯৪—৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমদানী ও রপ্তানী মালের মূল্য—২০০½ কোটী টাকা। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আম-দানী মালের মূল্য ছিল ৫ কোটী টাকা, আর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাই দাঁড়াইয়াছে ৭৩½ কোটী। তখন রপ্তানী মালের মূল্য ছিল ১১½ কোটী, এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে ১০৯ কোটী।

কৃষি।

কিন্তু কেহ যেন ইহা না ভাবেন, আর কোন বিষয়ে উন্নতি হয় নাই। কৃষি ও কল কারখানার উন্নতিও অসাধারণ। এখন পথের সুবিধা হওয়াতে ভারতের দ্রব্য য়ুরোপের বাজারে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এখন দেশে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত, ধনসম্পত্তি নিরাপদ, ন্যায়বিচার সহজপ্রাপ্য;—এই সকল কারণে কৃষিকর্ম্মে কৃষকের মনোযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কৃষিকর্ম্মের প্রভূত উন্নতি হইতেছে। সভ্যতার বিস্তারের সহিত এ দেশে আবাদের উপযুক্ত নূতন নূতন বীজের চাষ হইতেছে, তাহাতে লাভও হইতেছে। ইহার মধ্যে তুলা, পাট, তিসি ও চার চাষই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চা ও তুলা।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে, আসাম অঞ্চলে চার চাষ চলে কি না, কেবল তাহার পরীক্ষা চলিতেছিল। এই বৎসর আসাম গবর্মেণ্টের বাগান হইতে প্রথম এ দেশের চার চালান বিলাতে যায়। সে বৎসর কেবল ছয় মণ চা পাঠান হয়, আবার তখন বিলাতে চার উপর পাউণ্ড প্রতি দুই শিলিং এক পেনি আম-দানী শুল্ক ছিল। তাহার পর হইতে, বিশেষ বিগত বিংশতি বৎসরে, চার চাষের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে। গত বৎসর এদেশে প্রায় ১৮৭৫০০০ মণ চা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রায় ৭ কোটী টাকা। এ উন্নতি ষাট বৎসরে হইয়াছে।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট এদেশীয় তুলার উন্নতিসাধনে চেষ্টিত হয়েন। আমেরিকা হইতে

দ্বাদশ জন দক্ষ তুলার চাষী আনিয়া তাহাদিগকে তুলার বীজ ও আবশ্যক সব সরঞ্জাম দেওয়া হয়। যদিও সে কল্পনা সফল হয় নাই, তথাপি ঐ সময় হইতেই এ দেশে তুলা ভাল হইতেছে। এখন তুলার চাষও খুব বাড়িতেছে। এখন বৎসরে প্রায় ১৫৪ লক্ষ মণ তুলা উৎপন্ন হয়; তাহার মূল্য প্রায় ২৪ কোটী টাকা।

পাট ও তিসি।

ষাট বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে অতি অল্প পাট উৎপন্ন হইত, তাহাতে গোটাকতক তন্ত্র চলিত। পাটের রপ্তানী কাজ তখন ছিল না। এখন বৎসরে প্রায় ২৮০ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইতেছে, তাহার মূল্য প্রায় ১৫ কোটী টাকা। মহারাণীর রাজত্ব-আরম্ভের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রথম ১০ বুশেল তিসি রপ্তানী হয়। এ দেশে যে তিসির চাষ হইতেছে, তাহা বিদেশে রপ্তানীর জন্য; দেশে ইহার ব্যবহার বড়ই বিরল। এখন ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় ১৩ কোটী টাকার বীজ রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে গোধূমের ব্যবসায় মহারাণীর রাজত্বারম্ভের অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে। তখন কেবল পঞ্জাবে ইহার চাষ হইত; ক্রমে য়ুরোপে ইহার রপ্তানী আরম্ভ হয়; এখন বৎসরে প্রায় ৬½ কোটী টাকার গোধূম রপ্তানী হয়।

এদেশে তুলার কল, পশমের কল, পাটের কল, কাগজের কল, মদের ভাঁটী, কয়লার খনি, লৌহের কারখানা, এ সবই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পরে স্থাপিত হইয়াছে। বাস্তবিক

কলকারখানা।

কলকারখানার এ উন্নতি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বৎসর এ দেশে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তাহার পর এখন মোটের উপর ১৪৪টি কাপড়ের কল চলিতেছে; সে সকলের মূলধন প্রায় ১৩½ কোটী টাকা। পাটের কল ইহার কিছু দিন পরেই সংস্থাপিত হয়। এখন পাটের কলের মূলধন প্রায় ৪ কোটী টাকা। মদের ভাঁটীর উৎপত্তি ও উন্নতি মহারাণীর রাজত্বারম্ভের পর। ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার কয়লার খনির কথা অল্প লোকই জানিত;—এখন ঐ সকল খনি এবং অন্যান্য স্থানের খনি হইতে বৎসরে কোটী টাকারও অধিক মূল্যের কয়লা উঠিতেছে।

এই সকল প্রধান ব্যবসায় ভিন্ন আরও নানা কারখানার কাজ চলিতেছে; নীলের কুঠী, ময়দার কল, তেলের কল, চিনির কল, সাবানের কল প্রভৃতি নানাবিধ কলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

এই সকল কারবারে কত টাকা খাটিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে; তবে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের যৌথ কারবারের হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ দেশে যৌথ কারবারে সাড়ে সাতাইশ কোটী টাকা খাটিতেছে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ব্যবসায়বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের কাজও বাড়িয়াছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বন্দর হইতে ৩৮৪৫ খানা জাহাজ ছাড়িয়াছিল; ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর ৫২৬৮ খানা জাহাজ ছাড়িয়াছে।

বাণিজ্য ছাড়িয়া দেশের শাসন ও অন্যান্য বিভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এখন সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য উন্নতি লক্ষিত হইবে; এই ষাট বৎসরের উন্নতি সর্ব্বদিকব্যাপিনী। ডাকঘরে

ডাকবিভাগ।

এখন বৎসরে ৩৯৪০ লক্ষ পত্র ও প্যাকেট বিলি হয়; টিকিট, মনি-অর্ডার ফি, রেজেষ্টারী ফি প্রভৃতিতে এখন গবর্মেণ্টের বাৎসরিক আয় প্রায় ১৬০ লক্ষ টাকা। মহারাণীর রাজত্বারম্ভের পূর্ব্বে ডাকবিভাগ ছিল না বলিলেই হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ডাকবিভাগে কেবল গবর্মেণ্টের চিটিপত্রই চলিত; লোক বুঝিয়াই কাহারও কাহারও চিঠিপত্র বিলি হইত। তখন ডাকটিকিটের ব্যবহার ছিল না; পত্র কিরূপ ভারি এবং কত দূর যাইবে, তাহা বুঝিয়া মাশুল লওয়া হইত। এক তোলা ওজনের পত্র কলিকাতা হইতে বোম্বাই পাঠাইতে এক টাকা ও কলিকাতা হইতে আগ্রায় পাঠাইতে

বার আনা লাগিত। এখন দেশমধ্যে সাড়ে উনিশ কোটী টাকার মনিঅর্ডার বিলি হয়। আর মহারাণীর রাজত্বের প্রথম বৎসর সমগ্র আমদানী রপ্তানীর মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে উনিশ কোটী টাকা। আবার ডাকঘরের সহিত সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ চলে। এখন সেভিংস্ ব্যাঙ্কে প্রায় আট কোটী টাকা জমা আছে।

মহারাণীর রাজত্বারম্ভের সময় টেলিগ্রাফও ছিল না। এ দেশে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত হয়। গত বৎসর এক টেলিগ্রাফের ৮৯½ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

ডাক ও টেলিগ্রাফে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; ইহাতে ভারতবাসী-দিগের অশেষ উপকার হইয়াছে।

মহারাণীর রাজত্বারম্ভের সময় এ দেশে গাড়ী, পাল্কী বা নৌকায় গমনাগমনের বন্দো-বস্ত ছিল; এই সকল বন্দোবস্তে গমনাগমন কিরূপ দীর্ঘকালসাপেক্ষ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এখন এ দেশে ১৯০০০ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। গত বৎসর ১৫৩০ লক্ষেরও অধিক লোক রেলপথে গতায়াত করিয়াছে; তদ্ভিন্ন মালের ত কথাই নাই। তাহা ভিন্ন নানা কোম্পানীর জাহাজ নানা নদী ও খালে গতায়াত করিতেছে। এক জন খ্যাতনামা লেখক বলিয়াছেন যে, ইংরাজ গবর্মেণ্ট যদি ভারতবাসীদিগকে আর কিছু না দিয়া থাকেন, তথাপি খালই তাঁহাদিগের দেশাধি-কারের সার্থকতা সপ্রমাণ করিবে ও তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। খাল-কাটায় গত বৎসর যে শস্য জন্মিয়াছে, তাহার মূল্য ৩৬½ কোটী টাকা। এখন ভারতবর্ষে প্রায় ৩৩২৮০ মাইল খাল কাটা হইয়াছে, তাহাতে ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৩৭ কোটী টাকা।

গমনাগমন।

বিবিধ।

দীর্ঘজীবন-লাভের উপায়।

মিসেস এমিল ক্রফোর্ট, "ইয়ংম্যান" নামক পত্রে দীর্ঘজীবন-লাভের উপায় সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি তদীয় বন্ধু, পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য ইয়র্কশায়ার-নিবাসী, লক্ষপতি সার্ আইজ্যাক হোল্ডেনের স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধীয় বিবরণমাত্র। সার্ আই-জ্যাকের বয়স এখন প্রায় নব্বই বৎসর। ছয় বৎসর অতীত হইল, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ৮৩ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু উল্লেখ করিয়া, শোকসন্তপ্ত-চিত্তে বলিয়া থাকেন যে, "আমার পত্নীর এত অল্প বয়সে অকালমৃত্যুর একমাত্র কারণ, তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার বিধির প্রতি অমনোযোগ।" সার আইজাক আশা করেন যে, স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাধীন থাকিয়া এক শত বিশ বৎসর বাঁচিতে পারিবেন। সার্ আইজ্যাক যৌবনের প্রারম্ভে জন ওয়েস্লির আহারের ব্যবস্থা ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যাবলীর আশ্চর্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালনে আস্থাবান হন।

ওয়েস্লির শারীরিক কর্ম্মপটুতা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি প্রত্যূষে চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ করিতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থায় সর্ব্বদাই অশ্বপৃষ্ঠে অথবা শকটারোহণে ইংলণ্ড, ওয়েল্স, আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ডের মধ্যে ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণকালে অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিতেন না; কিন্তু যেখানেই বিশ্রাম করিবার জন্য অল্পক্ষণ থাকিতেন, সেইখানেই ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তিনি খাদ্য ও পানীয়বিষয়ক পরিমিতাচার তাঁহার অদম্য কার্য্যপটুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। প্রৌঢ়াবস্থায় এবং বৃদ্ধদশায় তিনি অল্প মাংস এবং তদপেক্ষা অল্প রুটি আহার করিতেন। ফল ও অগ্নিপক্ব সব্জী তাঁহার প্রিয় আহার্য্য ছিল। স্বাস্থ্যতত্ত্ব-

বিদ্‌গণের মধ্যে ওয়েস্‌লি প্রথমে উপলব্ধি করেন যে, গোধূমে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ফস্‌ফেট্‌স অব লাইম আছে। তাহা বালক, যুবা ও অনধিকবয়স্কা সন্তানবতী রমণীদিগের পক্ষে উপকারী; কিন্তু বৃদ্ধের আয়ুনাশক। কারণ, ফস্‌ফেটের প্রভাবে অস্থি ঘন ও গুরু, এবং মাংসপেশীসমূহ কঠিন হইয়া রক্তস্থালী ও রক্তবাহী ধমনীসমূহ বদ্ধ হইয়া আইসে। এই বিবরণ পাঠ করিয়া সার্ আইজাক আহারকালে অত্যল্প পরিমাণে রুটি ও বহুলপরিমাণে ফলমূল ব্যবহার করিতেন। শীতকালে তাঁহার কক্ষাভ্যন্তরস্থ বায়ু, গ্রীষ্মকালীন বহির্বায়ুর ন্যায় সুখসেব্য করিয়া রাখা হয়। তিনি অল্প উত্তাপ পছন্দ করিলেন।

কমলালেবু সার্ আইজ্যাকের অত্যন্ত প্রিয়। রুটির পরিবর্ত্তে তিনি নানাবিধ ফল ব্যবহার করেন। প্রত্যেক বার আহারের সময় হয় ত একখানি বিস্কুট খাইয়া থাকেন। যখন তিনি মাংস খান, তখন আর কোন দ্রব্য আহার করেন না। তিনি একেবারে মদ্য পান করেন না। হাউস অব্ কমন্স সভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুইন এনির প্রাসাদে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে, তিনি এক দিনমাত্র এক গ্লাস হুইস্কির সহিত গরম জল পান করিয়াছিলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর একটি লেবু কিম্বা এক থোলো আঙ্গুর খাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রধান খাদ্যের মধ্যে রোষ্ট, আপেল ও দুগ্ধ। তাহার সহিত অম্লনিবারণের উদ্দেশে অত্যল্পপরিমাণ বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা মিশ্রিত করা হয়। তিনি আহারকালে পান করেন না। এজন্য তাঁহাকে ভক্ষ্য বস্তু অধিকবার চর্ব্বণ করিতে হয়। জন ওয়েস্‌লির স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলির সহিত তিনি বিখ্যাত ফরাসী স্বাস্থ্যবিৎ ফ্লোরেন্সের নিয়মগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। ফ্লোরেন্স বিশ্বাস করেন, মানবের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল এক শত বিশ বৎসর।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বামাবোধিনী : চৈত্র। "বামাবোধিনীর" আকার বাড়িয়াছে, অনেকটা শ্রী ফিরিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় যদি আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আর একটু অবহিত হন, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 'বামাবোধিনী' পূর্ণ থাকে—কিন্তু প্রায়ই প্রবন্ধো[illegible] বক্তব্য বিষয় ভাল করিয়া বলা হয় না। বিষয়নির্ব্বাচনেও কেবল প্রকারের বৈচিত্র্য, উপ[illegible]যোগিতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টি দেখা যায় না।—বর্ষীয়সী 'বামাবোধিনী'র উপদেশে আদ[illegible] এ দেশের অনেক উপকার হইয়াছে;—কিন্তু এখনও আমরা অনেক আশা করি। কা[illegible] অগ্রসর হইতেছে; এখন সেই চৌত্রিশ বৎসরের পুরাতন প্রণালীতে বদ্ধ না থাকিয়া 'বামা[illegible]বোধিনীর' কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত করা কর্ত্তব্য মনে করি। স্ত্রীজাতির অধিকার, উন্নতি, আশ[illegible] আকাঙ্ক্ষা, কর্ত্তব্য প্রভৃতি লইয়া জগৎ জুড়িয়া যে কোলাহল পড়িয়াছে, 'বামাবোধিনী[illegible] পুরাতন মন্দিরে তাহার যেন প্রবেশাধিকার নাই! বাঙ্গলার বিদুষী মহিলারা বঙ্গ সাহি[illegible]ত্যের বিবিধ মাসিকে দেখা দেন, কিন্তু বৃদ্ধা বামাবোধিনীর শবজীর্ণ ক্ষেত্রে ত তাঁহাদে[illegible] দেখিতে পাই না। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "নারীচরিত—উভয়ভারতী" প্রবন্ধটি সুপাঠ্য[illegible] কিন্তু মোটে চারি পৃষ্ঠা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। "মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবনের কয়ে[illegible] কথা" অনেক মহিলার চিত্তরঞ্জন করিবে। কিন্তু লেখক হাতের কাছে যাহা পাইয়াছে[illegible] কেবল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একটু অন্বেষণ করিলে আরও অনেক মনোজ্ঞ গ[illegible] সংকলন করিতে পারিতেন।

দাসী। ফেব্রুয়ারী। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠের "চম্পা" বিগত চৈত্রমাসের "ভারতী[illegible]

প্রকাশিত হইয়াছে; আমরা গত বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি, চৈত্রের "ভারতী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই এই 'চস্‌মা'ই 'দাসীর' আশ্রয় পাইয়াছিল। আমরা মিলাইয়া দেখিলাম, উভয় প্রবন্ধ সম্পূর্ণ অভিন্ন; স্থানে স্থানে কেবল দুই চারিটি শব্দের বৈলক্ষণ্য আছে; তাহা বোধ করি, সম্পাদকীয় সংশোধনের ফল! 'এক মুরগী দুই বার জবাই' করা কেন, তাহা কে বলিবে? "স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ" শ্রীযুত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তীর রচনা; ইহা জীবনচরিত নহে, একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র; উপকরণের দৈন্যবশতঃ জীবনচরিতের হিসাবে রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে; এবং চরিতবিষয়ক সন্দর্ভে যেরূপ চরিত্র-বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম সমালোচনার আশা করা যায়,—ক্ষমতার অভাবে লেখক সে বিষয়েও বিফল হইয়াছেন। "সাধনার" শোক বিস্মৃত না হইতেই "দাসীর শেষ কথা"য়, দাসীর অপমৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি শুনিতেছি—"দাসী" আবার শীঘ্র দেখা দিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, নবজীবনে "দাসীর" সাধু সঙ্কল্প সফল হউক।

পূর্ণিমা। চৈত্র। এই সংখ্যায় পূর্ণিমার চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হইল। যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "সিপাহী-বিদ্রোহের কাহিনী" উল্লেখযোগ্য।

সখা ও সাথী। ফাল্গুন ও চৈত্র। এই সংখ্যায় "সখা ও সাথীর" ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। "সখা ও সাথীর আশানুরূপ উন্নতি দেখিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব। দুঃখের বিষয় যে, এখনও তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে না। আশা করি, নববর্ষে "সখা ও সাথীকে" আরও সজীব ও সুন্দর দেখিব। "শীকার" প্রবন্ধটি পাকা হাতের লেখা;—ইহাতে ছেলেদের শিক্ষা ও প্রীতি উভয়ের সংস্থান আছে। "দিল্লী" প্রবন্ধটিও মন্দ নহে। "বাদলায় বিপদ" একটি সচিত্র পদ্য,—রচনায় বিশেষ নিপুণতার পরিচয় নাই, কিন্তু ছবি খানি সুন্দর;—পাঠকগণের প্রীতিবিধান করিবে। দুর্ভিক্ষ প্রবন্ধটি সময়োচিত হইয়াছে। তাহার প্রতি সম্পাদক মহাশয়ের আরও দৃষ্টি থাকা উচিত।

মুকুল। চৈত্র। এই সংখ্যায় মুকুলের দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হইল। "বঙ্গবন্ধু—উইলিয়ম করী" প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ মিশনারী কেরী সাহেবের একখানি ছবি আছে, এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বিবৃত হইয়াছে। "সমুদ্র-যাত্রা" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও শিক্ষাপ্রদ। এই প্রবন্ধে চারিখানি ছবি আছে। "সাধের ছবি" একটি রহস্য-কবিতা;—ইহাতেও চারিখানি ছবি। কবিতাটি ভাল হয় নাই। প্রথমে "মুকুলে" যেমন উৎসাহ ও উদ্যমের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত, এখন যেন তাহার অভাব হইয়াছে। আশা করি, এ অবসাদ অতিক্রম করিয়া মুকুল উত্তরোত্তর অধিকতর বিকাশ লাভ করিবে।

হিন্দু পত্রিকা।—পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। এই যুক্ত-সংখ্যায় হিন্দু পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিল। "হিন্দু পত্রিকা" এত দিন মাসিক ছিল, অতঃপর দ্বৈমাসিক-রূপে প্রকাশিত হইবে। "হিন্দু পত্রিকায়" অনুবাদের সংখ্যাই অধিক; মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। আর সাময়িক ধর্ম্মালোচনার বিষয়ে "হিন্দুপত্রিকার" অতিশয় ঔদাসীন্য। বিবেকানন্দ স্বামীর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে বঙ্গের পত্র ও পত্রিকায় বিষম কোলাহল শোনা গিয়াছিল। বিবেকানন্দ স্বামীর বেদান্তপ্রচারসম্বন্ধে "হিন্দু পত্রিকা" নীরব থাকিলে ভাল হইত। স্বামীজীর বেদান্ত কি,—তাঁহার উদার মতবাদ সমীচীন কি না;—প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের, হিন্দু আচার ব্যবহারের সহিত স্বামীজির মতবাদের যে বিরোধ আপাতত প্রতীয়মান হয়,—তাহা সত্যই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ কি না,—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা "হিন্দু পত্রিকার" ন্যায় হিন্দুধর্ম্মবিষয়িণী পত্রিকারই কর্ত্তব্য। এক সঙ্গে নানা গ্রন্থের অনুবাদ অল্প মাত্রায় না দিয়া ক্রমে ক্রমে গ্রন্থবিশেষের পর্য্যাপ্ত অনুবাদ দিলে মন্দ হয় না।

৭৭

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

দীর্ঘতমা ঋষির দেশ কাল এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই। তাঁহার জন্মস্থান ও আবির্ভাবকালের নিরূপণপক্ষে তাঁহার স্বকীয় রচনায় কোনও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে এক জন প্রাচীন ঋষি, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূক্ত সকল বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত হইয়াছিল। রচনাকারী ঋষিরা কেহ বা অন্যের অপেক্ষায় প্রাচীন, কেহ বা অন্যের অপেক্ষায় নবীন। ঋগ্বেদের প্রারম্ভেই যে মধুচ্ছন্দা ঋষির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তিনি আপন রচনায় আপনাকে এক জন নবীন ঋষি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—এবং আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণেরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মধুচ্ছন্দার তুলনায়, দীর্ঘতমাকে এক জন প্রাচীন ঋষি বলা যাইতে পারে ; তাহার কারণ যথাক্রমে বিবৃত হইবে।

কিন্তু যদিও তাঁহার নিজ রচনায় তাঁহার সময় নিরূপণ করিবার কোন প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না,—তথাপি ইতরার পুত্র মহিদাস ঋষি, যিনি ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাকর্ত্তা, তিনি সেই অভাবের পূরণ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ব্রাহ্মণে তিনি সুস্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—

"এতেন হ বৈ ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ দীর্ঘতমা মামতেয়ো ভরতং দৌষ্মন্তিম্ অভিষিষেচ। তস্মাদ্ উ ভরতো দৌষন্তিঃ সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীয়ায়।"

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ; ৮ম পঞ্চিকা ; ২৩।

মহিদাস, মহাভিষেক নামক বৈদিক ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া, পূর্ব্বকালের কয়েক জন বিখ্যাত চক্রবর্ত্তী রাজাদের মহাভিষেককালে কোন কোন ঋষি দ্বারা উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই বলিতে গিয়া লিখিতেছেন যে,—"দুষ্মন্তের পুত্র ভরত যখন সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, তখন মমতার পুত্র দীর্ঘতমা এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা তদীয় অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাই সেই দুষ্মন্তপুত্র ভরত সমুদায় ভূমণ্ডল জয় করিয়া পরিভ্রমণ করেন।"

আমাদের জাতীয় কবি কালিদাস যাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের রচনা করিয়াছেন, তিনিই উপরি-উক্ত 'সর্ব্বদমন' ভরত। যাঁহার নামে আমাদের দেশ অদ্যাপি ভারতবর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তিনিই উল্লিখিত ভরত। যযাতি রাজার পঞ্চম পুত্র পুরুর বংশে

দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। ভরতবংশের এক শাখাই ইতিহাসে 'পৌরব' বলিয়া বিখ্যাত। প্রথমে হস্তিনা নগরে, এবং পরে হস্তিনা নগর গঙ্গাস্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে প্রয়াগের নিকটে কৌশাম্বী নগরে, এই পৌরবেরা বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের কোনও কোনও রাজা অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় এই বংশের এক জন বিখ্যাত রাজা। যিনি এই বিখ্যাত ভরতবংশের আদিপুরুষ, সেই দুষ্মন্তপুত্র ভরত এবং উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা ঋষি একই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। উভয়েই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

"যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি পুরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, বৎস! গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল। তুমি এই ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হইলে; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজ জাতিমাত্র শাসন করিবে।" (১) মহাভারতের এই বিবরণে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, পৌরবেরা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। এই স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা স্বীয় রাজ্য হইতে নির্গত হইয়া দিগ্বিজয় করিতেন, এবং পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশের যযাতিবংশীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিতেন। দুষ্মন্তপুত্র ভরত এইরূপ এক জন দিগ্বিজয়ী পৌরব নরপতি ছিলেন।

এক্ষণে দীর্ঘতমার সময় নির্ণয় করিতে হইলে, পুরুবংশের রাজত্বকালের সময় নির্ণয় করা আবশ্যক। এই বংশের এক প্রকার বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশে, এবং অপর দুই প্রকার বিবরণ মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৪।৯৫ অধ্যায়ে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিবিধ বিবরণের কিয়ৎপরিমাণে ঐক্য এবং কিয়ৎপরিমাণে অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

ফলতঃ, এই সমুদয় বিবরণেই একমতে প্রকাশ পাওয়া যায় যে, কালক্রমে পুরুবংশ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পুরুবংশ ও পঞ্চালবংশ ইতিহাসে অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই দুই বংশের বিবাদ কলহেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হয়।

বহু শাখায় বিভক্ত হওয়াতে পুরুবংশে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ নরপতি প্রাদু-

(১) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত; আদিপর্ব্ব; ৮৭ অধ্যায়।

ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু বংশাবলীতে সেই সকল নামের যে ঘোরতর অনৈক্য লক্ষিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের ধারাবাহিক বিবরণ সঙ্কলন করা এক্ষণে এক-প্রকার অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অনৈক্যের মধ্যেও যেরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়, তাহাতে কয়েক জন রাজাকে ঐতিহাসিক রাজা স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। পুরুবংশীয় যে ভরত রাজার নামে অদ্যাপিও আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি যে এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সমুদয় বংশতালিকাতেই ভরতের পিতার নাম দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পিতার নাম ঈলিন বা ইলিন। ঈলিনের পিতার নাম তংসু; তংসুর পিতার নাম মতিনার বা রন্তিনার। যখন অনেকগুলি অনৈক্যের মধ্যে এইরূপ বংশবিবরণ সর্ব্বতোভাবে একই প্রকার দৃষ্ট হয়, তখন এই কয়েক জন রাজাকেই ঐতিহাসিক রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ফলতঃ, পুরুবংশের যে কয়েকটি বংশতালিকা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ের তালিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। উক্ত বংশবলী এইরূপ,—
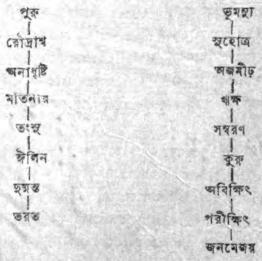
পরে দৃষ্ট হইবে যে, এই বংশাবলী-অনুসারে ষোড়শ রাজা পরীক্ষিত কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কুরুবংশের রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিবরণ অনু-সারে পঞ্চপাণ্ডবের উপাখ্যান নিরবচ্ছিন্ন কল্পিত উপন্যাসমাত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান "মহাভারত" নামে যে বিপুল উপন্যাস-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহার স্থানে স্থানে প্রকৃত ইতিহাসের আভাষ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, ইহার অধিকাংশ কথাই কাল্পনিক।

উল্লিখিত বংশতালিকাতে অজমীঢ় নামে যে রাজার নাম শ্রুত হওয়া যায়, তিনিও এক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, এবং কেহ কেহ তাঁহাকে পঞ্চালবংশ ও কুশিকবংশের আদিপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই কুশিকবংশে মহর্ষি বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার বংশাবলীর যেরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাই অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। তদনুসারে পুরূরবা রাজার দুই পুত্র, আয়ু ও অমাবসু। আয়ু হইতে পুরুবংশের উৎপত্তি, এবং অমাবসু হইতে কুশিকবংশের উৎপত্তি। আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র পুরু; অর্থাৎ, পুরু আয়ুর প্রপৌত্র। অপর দিকে অমাবসুর পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র সুহোত্র; তাহাতে পুরু ও সুহোত্র একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। সুহোত্র হইতে নবম পুরুষে প্রসিদ্ধ ঋষি বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। এক এক পুরুষে ত্রিশ বৎসর করিয়া ধরিলে, পুরুর রাজ্যাধিরোহণের ২৭০ বৎসর পরে বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্রের সময়ে পঞ্চালবংশীয় সুদাস রাজা, পুরুবংশীয় সম্বরণ এবং ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ ঋষি বিদ্যমান ছিলেন। উপরোক্ত বংশতালিকা-অনুসারে পুরু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষে সম্বরণ রাজার উৎপত্তি। ২৭০ বৎসরে ত্রয়োদশ রাজার রাজত্ব বেশ সুসঙ্গত বিবেচনা হয়। এই কারণেও এই প্রাচীন বংশতালিকার প্রতি সবিশেষ আস্থা জন্মে।

তাহার পর দেখা যায় যে, সম্বরণের পুত্র কুরু, কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, এবং অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিত। সম্বরণের সমকালীন ঋষি বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরের পুত্র দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ। তাহাতে সম্বরণের পৌত্রের সময়ে এবং বশিষ্ঠের প্রপৌত্রের সময়ে কুরুক্ষেত্রের সমর ঘটিয়াছিল, দেখা যায়। অপর আর এক দিকে বশিষ্ঠের সমকালীন রাজা সুদাস, তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমক, তৎপুত্র পৃষৎ, তৎপুত্র দ্রুপদ। তাহাতে সুদাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্রুপদের সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, জানা যায়। এক দিকে তিন পুরুষ, এক দিকে পাঁচ পুরুষ, একই নিরূপিত সময়ের মধ্যে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব কথা নহে।

বশিষ্ঠের রচিত ঋক্‌সূক্তে সুদাস রাজার অনেক বিবরণ জানা যায়। বিষ্ণু-

পুরাণ অনুসারে সুদাসের পিতার নাম চ্যবন, পিতামহের নাম মিত্রয়ু, প্রপিতামহের নাম দিবোদাস। বশিষ্ঠের রচনায় সুদাসের পিতার নাম পিজবন। চ্যবন ও পিজবন একই নামের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং বশিষ্ঠের রচনায় দিবোদাসকে সুদাসের এক জন পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। তাহাতে দিবোদাস হইতে দ্রুপদ পর্য্যন্ত পঞ্চালবংশের বিবরণ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পাইতে পারে।

বংশাবলীতে পুরুবংশীয় যে রাজার নাম তংসু বলিয়া এক্ষণে লিখিত হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃত নাম বশিষ্ঠের ঋক্‌সূক্ত অনুসারে তৃৎসু। ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা কখনও বা "তৃৎসবঃ" কখনও বা "ভরতাঃ" বলিয়া বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছেন। অপিচ, বশিষ্ঠের রচনায় প্রকাশ যে, এই তৃৎসুগণ সর্ব্বপ্রথমে সুদাস রাজার মিত্র ছিলেন ; কিন্তু কোনও কারণে সুদাসের সহিত তাঁহাদের কলহ ঘটে, এবং তাঁহারা সুদাস কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আপনাদের ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এইরূপ ভরতবংশের প্রাধান্য লুপ্তপ্রায় হইলে, তাঁহারা বশিষ্ঠকে আপনাদের পৌরোহিত্যে বরণ করেন, এবং তৎপরে তাঁহাদের পুনর্ব্বার প্রভাবৃদ্ধি হইয়াছিল। বেদোক্ত এই বিবরণ মহাভারতের আদি পর্ব্বের উক্ত ৯৪ অধ্যায়ে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

"ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ। তিনি রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল, এবং অন্যান্য বিষয়েরও বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্ন হইয়া উঠিল। শত শত লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল। এবং অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে লোক সকল শঙ্কা পাইতে লাগিল। এই সময়ে পঞ্চালরাজ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজা সম্বরণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর রাজা সম্বরণ ভীত হইয়া পুত্র কলত্র অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী এক নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে বাস করিলেন। সেই নিকুঞ্জ নদীতট অবধি পর্ব্বতসমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহারা বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। এক দিবস ভগবান বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। ভারতেরা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া পরম যত্নে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ দান করিলেন, এবং অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। মুনিবর আসনে উপবিষ্ট হইলে রাজা প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্! আপনাকে আমাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে হইবেক। আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি। মহর্ষি বশিষ্ঠ তথাস্তু বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিলেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।" (১)

(১) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ; ৯৪ অধ্যায় ; আদিপর্ব্ব।

এই বিবরণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এবং বশিষ্ঠের ঋক্‌সূক্ত সকলের অর্থ অনেক স্থানে এই বিবরণ দ্বারা পরিস্ফুত হয়। সুদাস রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে বশিষ্ঠই তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ যজ্ঞে অশ্বরক্ষার ভার বিশ্বামিত্রের জ্ঞাতিগণের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সুদাসের রাজসভায় বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু এই দুই মহর্ষির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ ঘোরতর শত্রুতা জন্মিয়াছিল, ইহা উভয়েরই রচনায় প্রকাশ পায়। বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের নানা প্রকার অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি রাক্ষস, তিনি মন্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক লোকের প্রাণ সংহার করেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল অপবাদ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য বশিষ্ঠ যে একটি ঋক্‌সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বোধ হয়, এই সকল কারণেই জাতক্রোধ হইয়া বশিষ্ঠ ঋষি শেষদশায় ভরতবংশীয়গণের সহিত সিন্ধুতীরে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পরাভূত ভরতবংশীয়েরা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজয় করেন, এবং তাঁহাকে তদীয় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ হইতে বঞ্চিত করেন। ইহা হইতেই কুরুক্ষেত্রের মহা সমর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এবং এই জ্ঞাতিকলহে কুরুবংশ ও পঞ্চালবংশ উভয়েই প্রায় নির্মূল হইলে, কুরুবংশীয় পরীক্ষিত হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং বহুকাল তাঁহার বংশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে রাজত্ব করে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় নির্ণয়ের পক্ষে বিষ্ণুপুরাণে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে নন্দাভিষেকের ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, জানা যায়; এবং ৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দাভিষেক ধরিলে, ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল পাওয়া যায়। তৎপূর্ব্বে দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ ত্রিশ বৎসর, পরাশর ত্রিশ বৎসর, এবং শক্তি ত্রিশ বৎসর,—এই তিন পুরুষে ১২০ বৎসর লইয়া খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৫৬০ বৎসরে বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখা যায়, এবং ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা মোটামুটি অনুমান করিতে পারা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে পুরুরাজাকে ধরিলে, খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৮০০ বৎসরে পুরুরাজা বিদ্যমান ছিলেন, বিবেচনা হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, দুষ্মন্তপুত্র ভরতরাজা এবং তাঁহার সমকালীন দীর্ঘতমা ঋষি কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন? উপরে যে বংশতালিকা প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হই-

আছে, তদনুসারে ভরতের পরবর্ত্তী ৫ম রাজা সম্বরণের সময় বশিষ্ঠ ঋষি বিদ্যমান ছিলেন, প্রকাশ পায়। এই পাঁচ জন রাজার রাজত্বকাল, মনুষ্যজীবনের সচরাচর এক এক পুরুষের, কয় পুরুষের কাল ব্যাপিয়া ছিল, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। বশিষ্ঠ হইতে দীর্ঘতমা ও ভরত সম্ভবতঃ ন্যূনাধিক ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ স্থূল অনুমান করা যাইতে পারে, এবং খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৫৯০ বৎসরে বশিষ্ঠের কাল গণনা করিলে, খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৬৯০ বৎসরে দীর্ঘতমা ও ভরত বিদ্যমান ছিলেন, বিবেচনা হয়।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, এরূপ গণনা কেবল একটি স্থূল অনুমানমাত্র। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে আমাদিগকে অগত্যা এইরূপ স্থূল অনুমানের উপরেই আপাততঃ নির্ভর করিতে হইবেক। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দীর্ঘতমা ঋষির রচনার যে অংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, তৎকালে কোনও একটি নদীর ধারে ধারে দীর্ঘতমার যজমানগণ আপনাদের উপনিবেশ বিস্তার করিতেছিলেন। ঐ নদী হয় গঙ্গা, না হয় যমুনা, ইহাই বিবেচনা হয়। তদীয় রচনাতে প্রকাশ যে, বশিষ্ঠ ঋষির সময়েও তৃৎসুগণ, অর্থাৎ যে ক্ষত্রিয়বংশে মহারাজ ভরত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ক্ষত্রিয়গণ, যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী জনপদ সকলে বসবাস করিতেন। অতএব বিবেচনা হয়, গঙ্গা বা যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী কোন স্থানেই মহারাজাধিরাজ ভরত এবং মহর্ষি দীর্ঘতমা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বেদ, মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণ, এই সকল গ্রন্থে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের যে সকল বিবরণ কিয়ৎপরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহারই অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে, দীর্ঘতমা ঋষি বশিষ্ঠ ঋষি অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। কোনও কোনও আধুনিক বেদপাঠীগণের বিবেচনায় দীর্ঘতমা ঋষি বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শেষকালীন ঋষি বলিয়া পরিগণিত; এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। উহা যে অসার, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক বিবরণ সকলের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। প্রবন্ধটি ইহারই মধ্যে দীর্ঘ হইয়া পড়িল। দীর্ঘতমাকে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া গণ্য করিবার আরও যে সকল কারণ আছে, এবং দীর্ঘতমার সময়ে বেদবিজ্ঞানের অবস্থা কিরূপ ছিল, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বুড়ী।

—

শীতকাল। রাত্রি দুইটা। সমস্ত দিনের এবং অর্দ্ধেক রাত্রের হট্টগোলের পর কলিকাতা সহরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। এখনও দুই হাত অন্তর গ্যাসের আলো, এবং মাঝে মাঝে দুই একখানি গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, তাহার অকাতর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। রাস্তায় পাহারাওয়ালা রকের উপর বসিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ঢুলিতেছে। তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত আর কিছু নয়, হঠাৎ ইন্‌স্পেক্টর বাবুর ভীমমূর্ত্তিসন্দর্শনের ভয়ে। দুই একখানা খাবারের দোকান এখনও খোলা আছে। তাহার সম্মুখে বুভুক্ষু রাস্তার কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া কাঙালের মত ফিরিতেছে। এমন সময়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ফুটপাত দিয়া একটি বৃদ্ধা দাসী সর্ব্বাঙ্গ শালে জড়াইয়া এক বৎসরের একটি ছোট মেয়েকে কোলে লইয়া আস্তে আস্তে চলিতেছিল। আর মাঝে মাঝে বলিতেছিল, "ভগবান শীগ্গির শীগ্গির আরাম করে দাও!" বৃদ্ধা যখন আমহার্ষ্টসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এক জন পাহারাওয়ালা তাহাকে চোর ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "বুড্ডি, এৎনা রাতমে কেয়া লেকে কিধার যাতা?" বুড়ী বলিল, "বাবা, আমি চোর নই, এই আমার মনিব শ্যামবাবুর মেয়েটির বড় অসুখ, ডাক্তার বলেছে ভোরের হাওয়া খেলে তার সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে, তাই তাকে নিয়ে হাওয়া খাওয়াতে এসেছি।" পাহারাওয়ালা বলিল, "কেয়া তুম্ পাগলী হ্যায়, আবিতো দো বাজা হোগা।" বুড়ী বলিল, "বাবা, জ্যোৎস্নার জন্যা দেখে সময় ঠাওরাতে পারি নি।" বলিয়া মেয়েটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া "কাই ও কি কর্‌লুম" বলিতে বলিতে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। বাড়ী গিয়া মা বাপের অজ্ঞাতসারে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আপনিও পাশে শুইল।

সেই দিন ভোরের দিকে মেয়েটির জ্বর বাড়িয়া গেল, অন্য দিন অপেক্ষা কিছু বেশী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বুড়ী সভয়ে মেয়েটির গায়ে হাত দিয়া যখন দেখিল যে, গা আগুনের মত তাতিয়াছে, তখন তাহার সেই কঙ্কালসার দেহের সমস্ত রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। তাহাকে কোলে করিয়া সে এক-বার বসে, একবার ঘরময় পায়চালী করিয়া বেড়ায়, মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, পাখা করে, মুখে কপালে গায়ে বারবার হাত দিয়া দেখে, এতক্ষণে যদি জ্বর

একটু কমিয়া থাকে। কিন্তু জ্বর আর কমিল না। সকাল হইলে বুড়ী মেয়েটিকে তার মায়ের কাছে রাখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে নিকটস্থ ঠাকুরবাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের চরণামৃত আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর মায়ের কোল হইতে লইয়া মেয়েটিকে কোলে করিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

ডাক্তার আসিলে বুড়ী অতি কাতর ক্রন্দনস্বরে বলিল, "বাবা, আমার দোষেই মেয়েটির জ্বর বেড়েছে। বুড়ী মানুষ চোখে দেখ্‌তে পাইনে, ভোর ভেবে রাত দুটোর সময় মেয়েকে রাস্তায় নিয়ে বেরিয়েছিলুম। ডাক্তার মশায়, আপনার পায়ে পড়ি, মেয়েটিকে ভাল করে দাও, ভগবান আপনার ভাল করবেন!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার কহিলেন, "দূর পাগলী কাঁদিস কেন, কি হয়েচে?" ডাক্তারের সান্ত্বনায় বুড়ীর কান্না আরও বাড়িল। সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইল।

সে দিন বুড়ীকে কেহ কিছু খাওয়াইতে পারিল না।

বুড়ী অনেক কালের পুরাণো লোক। মেয়ের মা হেমাঙ্গিনীকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এখন তাহার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া তাহার মেয়েটিকে আবার মানুষ করিতেছে। সন্তানের মুখ দেখিতে হেমাঙ্গিনীর বরাবর বড় সাধ ছিল। যদি বা অনেক কষ্টে সে সাধ মিটিল, একটি মেয়ে হইল, সে আবার অদৃষ্টক্রমে জন্মরুগ্না। হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রাত জাগিয়া শরীর খাটাইয়া বুড়ী মেয়েটিকে মানুষ করিতেছে। মেয়েটির প্রতি তাহার এত দূর স্নেহপক্ষপাত ছিল যে, তাহার জন্য অন্য শিশুর কাপড় কিম্বা দুধ যখন যাহা আবশ্যক হইত কাড়িয়া লইয়া আসিত, কিন্তু অন্য কেহ যদি আবশ্যকবশতঃ বুড়ীর আদরের মেয়েটির কিছু লইতে আসিত, অমনি সে ব্যাঘ্রিনীর মত তাহাকে খাইতে যাইত।

মেয়েটির জ্বর কিন্তু কিছুতেই কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বুড়ী তাহার সঞ্চিত মাহিনার টাকা হইতে একটি সোনার মাদুলি গড়াইয়া তাহার মধ্যে ঔষধ পুরিয়া মেয়েটির হাতে বাঁধিয়া দিল। বিকাল বেলায় ডাক্তার আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন যে, টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে;—তিনি মাথায় বরফ দিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী কাঁদিতে লাগিল। বুড়ী সজলনয়নে শুষ্ক হস্তে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিসনে মা, শীগ্গিরই ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তার যা বল্‌চে তাই কর মা!" বলিয়া বাহিরে আসিয়া দুই গণ্ড ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনের উদ্বেগে অনাহারে অনিদ্রায় বুড়ীর বুকের পাঁজরে শেষে এমনি ব্যাথা ধরিল যে, তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। শুইয়া শুইয়া সে কেবলই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি রাখিত। "ওগো ওগো মেয়েটা ভিজেতে পড়ে আছে, উঠিয়ে নাও!" "ওগো মেয়েটার কিধে পেয়েছে, খেতে দাও।" "ওগো মেয়েটাকে একটু বাতাস কর।" চব্বিশ ঘণ্টাই এইরূপ চীৎকার করিত। কিছু দিনের জন্ত নূতন দাসী আনিবার কথা যদি হেমাঙ্গিনী বলিত, অমনি সে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া একেবারে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া খুকীকে কোলে করিয়া বসিত। "না গো না, নতুন দাসী আনতে হবে না, আমিই সব কাজ করতে পারব।" আর কেহ যে অসুখের সময় মেয়ের সেবা করিবে, বুড়ীর প্রাণে তাহা সহ্য হইত না।

ক্রমে মেয়েটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিল। সেদিন দুপুর রাতে মেয়েটি সজোরে মাথা চালাইতে লাগিল, তাহার চোখ দুটা উল্টাইয়া আসিল, দাঁতে দাঁতে লাগিতে লাগিল। ডাক্তারের জন্ত লোক পাঠান হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন গতিক মন্দ—বাঁচান দুরূহ। অন্ত কোন ঔষধ নাই, চোখে মুখে মাথায় বরফ ঘষিয়া দিতে বলিয়া ডাক্তার অল্পক্ষণ পরে চলিয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী বারাণ্ডায় লুটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বুড়ী মেয়েকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাথায় মুখে কম্পিতহস্তে বরফ ঘষিয়া দিতে লাগিল।

কিছুতেই কিছু হইল না। ভোর চারিটার সময় বুড়ীর কোলে মেয়েটি মারা গেল। "ওগো আমার সোনা, ওগো আমার ধন, ওগো তুই কোথা গেলিরে, আমার দোষে এমন হলরে—ওরে ফিরে আয়রে, আমি কেমন করে বাঁচব!" বলিয়া চীৎকারস্বরে বুড়ী কাঁদিতে লাগিল। মেয়েটিকে সে কোন মতেই কোল হইতে ছাড়িবে না, সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টে তাহার দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইল।

তিন দিন বুড়ী জলস্পর্শও করিল না, কেবলই কাঁদে। চতুর্থ দিনে সকলে মিলিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া তাহাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দিল। দুই চারি দিন পরে বুড়ীর একটু জ্বর দেখা দিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই জ্বর ঘোর বিকারে দাঁড়াইল। প্রলাপে সে কেবলই বকিত, "ওরে আমার দোষে গেলিরে", অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়া অনেক করিয়া সে যাত্রা বুড়ী রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু তাহার সেই মনের আগুন কোন মতে নিবিল না।

জ্বর হইতে উঠিয়া মুণ্ডিত মস্তক, লোল চর্ম্ম, শ্বেত ওষ্ঠ, পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ, অস্থিপঞ্জরসার ক্ষীণ দেহ লইয়া বুড়ী যখন হেমাঙ্গিনীর ঘরে প্রবেশ করিল, তখন উদ্বেলিত শোকাশ্রুধারায় দু'জনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু ধ্বনি প্রতিধ্বনির ন্যায় হেমাঙ্গিনী বুড়ীর শোকাশ্রু আর থামে না। হেমাঙ্গিনীর স্বামী দেখিলেন, দু'জনে কাছাকাছি থাকিলে কখনও কাহারও শোকের লাঘব হইবার সম্ভাবনা নাই, উপরন্তু উভয়েরই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট হানি হইবার সম্ভাবনা। ভাবিয়া চিন্তিয়া হেমাঙ্গিনীর স্বামী স্থির করিলেন, বুড়ীকে চার টাকা করিয়া পেন্‌সন্ দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। বুড়ী শুনিয়া হেমাঙ্গিনীকে ফেলিয়া কোন মতেই বাড়ী যাইতে রাজি হইল না। বাবু অনেক করিয়া বুঝাইয়া শুঝাইয়া কিছু দিন পরে চিঠি দিয়া আবার তাহাকে ডাকাইয়া আনিবেন বলিয়া, তাহাকে বাড়ী যাইতে সম্মত করাইলেন।

শরীরে যখন একটু বল পাইল, বুড়ী বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। যাইবার আগের দিন রাত্রে তাহার জিনিস পত্তর গুলো একটা পুঁটলি করিয়া বাঁধিল, গলার সোনার হারটি খুলিয়া হেমাঙ্গিনীকে দিল। ভোর চারিটার সময় উঠিয়া হেমাঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী হইতে বাহির হইল।

আম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সেই পথ। সহর নিস্তব্ধ। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। কাঁধে পুঁটলী লইয়া, "মাগো কি হোল গো!" বলিতে বলিতে অসহ বেদনাভার লইয়া বুড়ী ফুট্‌পাতের উপর দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। থানাহাউসের কাছে যখন আসিল, সেই পূর্ব্বপরিচিত পাহারাওয়ালাটা তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুড্‌ঢি আজ ফের্ কেয়া লেকে কাঁহা যাতা?" বুড়ী বলিল, "বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার সেই শ্যামবাবুর মেয়েটি মারা গেছে, আমি চোর নই বটে, কিন্তু আমি খুনী, আমার দোষেই সে মারা গেছে, আমাকে ধরিয়া তোমাদের জেলে দাও!" বলিয়া অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া বসিয়া পড়িল। পাহারাওয়ালা অনেক সান্ত্বনা দিয়া অনেক বুঝাইয়া তাহাকে উঠাইল, এবং সঙ্গে করিয়া খানিক দূর রাখিয়া আসিল। সে আস্তে আস্তে শিয়ালদাহ অভিমুখে চলিতে লাগিল। টিকিট্ কিনিয়া ছয়টার ট্রেনে বাড়ী রওনা হইল।

এক মাস পরে খবর আসিল, বুড়ী দেশে জ্বরবিকারে মারা গিয়াছে।

ঐতিহাসিক অর্ম্মে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, ইতিহাসপাঠকের নিকট তাহা অতীব প্রীতিপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সৌভাগ্য-চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়া ব্রিটিশ গৌরব-সূর্য্যোদয়ের সূচনা হইয়াছিল। সেই সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে অন্যান্য ইউরোপীয় তারকারাজি আভাহীন হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ না করিলে ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যপ্রতিষ্ঠার মূল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় কিরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে আপনাদিগের অমোঘ ক্ষমতার বিস্তার করিতেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ সাগরের তরঙ্গলহরী বিক্ষোভিত করিয়া কিরূপে বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে সেই মহীয়সী শক্তির অভাবনীয় ক্রীড়া আরব্ধ হয়, তাহা জানিতে হইলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করা কর্ত্তব্য। সেই ঘটনামালা দুই জন ঐতিহাসিক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তন্মধ্যে এক জন দেশীয়, আর এক জন বিদেশীয়। এই দুই জনই তৎকালীন অনেক ঘটনার সময় বর্ত্তমান ছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাদের কথারই উল্লেখ করিলাম। সত্য বটে, আরও দুই চারি জন কোন কোন ঘটনার সময় উপস্থিত থাকিয়া নিজ নিজ পুস্তকে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ প্রকৃত ইতিহাস নহে, কতকগুলি ঘটনার সঙ্কলনমাত্র; সুতরাং আমরা তাঁহাদের গণনায় আনিতেছি না। পূর্ব্বকথিত ঐতিহাসিকদ্বয় তদানীন্তন প্রায় সমস্ত ঘটনা ঐতিহাসিক ভাবে বিন্যাস করিয়াছেন; দুই একটি ঘটনা তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত ঐতিহাসিক বলিয়া আমরা এ স্থলে তাঁহাদেরই উল্লেখ করিতেছি। উক্ত দেশীয় গ্রন্থকারের নাম সৈয়দ গোলাম হোসেন, ও তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম সায়র মুতাক্ষরীণ। মুতাক্ষরীণ একখানি বিস্তৃত ফারসী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র ভারতবর্ষের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গোলাম হোসেনের গ্রন্থে সমগ্র ভারতের বিবরণ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার বাঙ্গলার বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশ্বাস্য। কারণ, তিনি বঙ্গদেশে উপস্থিত থাকিয়া অনেক ঘটনার বিষয় উত্তমরূপে অবগত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঐতিহাসিক এক জন ইংরাজ;—তাঁহার নাম রবার্ট

অর্‌মে। অর্‌মেও তৎকালীন ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেন; সুতরাং তাঁহার দাক্ষিণাত্যের বিবরণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাই অনেকপরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য। অর্‌মের বাঙ্গলার বিবরণ হইতেও অনেক নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারা যায়। ফলতঃ, এই দুই জনের গ্রন্থ আলোচনা না করিলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। যদিও তাঁহাদের গ্রন্থ একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে, তথাপি এরূপ বিস্তৃতভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিবরণ অন্য কোন গ্রন্থ হইতে জানা যায় না। যাঁহারা ইতিহাসচর্চ্চার জন্য সেই সমস্ত ঘটনামালা গ্রথিত করিয়াছেন, সাধারণে তাঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ জানা আবশ্যক। এই জন্য আমরা তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেশীয় গ্রন্থকার গোলাম হোসেনের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশীয় ঐতিহাসিক রবার্ট অর্‌মের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টা পাইব।

রবার্ট অর্‌মের জন্মস্থান ভারতবর্ষ; তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের আঞ্জেঙ্গা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার জন্ম হয়। অর্‌মের পিতা আঞ্জেঙ্গায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সার্জ্জনের কার্য্য করিতেন। দিন দিন যখন পুত্রের বয়স বাড়িতে লাগিল, তখন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতা বিশেষরূপ উদ্যোগী হইলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে ইংরাজসন্তানগণের সুশিক্ষার তাদৃশ উপায় ছিল না; অগত্যা অর্‌মের পিতা পুত্রকে অল্প বয়সেই ইংলণ্ডে পাঠাইতে বাধ্য হন। অর্‌মে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়া হ্যারো স্কুলে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন। তথায় ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কোন এক একাডেমীতে বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ের শিক্ষায় নিযুক্ত হন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন সিভিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা হওয়ায়, তাঁহার বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তির আবশ্যক হয়। বাল্যকাল হইতে অর্‌মের নানারূপ গবেষণায় মনোযোগ ছিল; ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনায় তিনি বিশেষরূপ আমোদ পাইতেন। এরূপ লোকের পক্ষে বাণিজ্যসংক্রান্ত শুষ্ক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কত দূর কষ্টকর, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কাজেই সে বিষয়ের আলোচনা তাঁহার নিকট ভাল লাগিত না। কিন্তু তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অভিলাষী ছিলেন, তাহার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উক্ত বিষয়ের

শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। অর্‌মে একাডেমীতে পাঠ সমাপন করিয়া, ১৭৪৪ অথবা ৪৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর অধীনে এক কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে সময়ে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার নিবারণের জন্ত আপনার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, এবং যে সময়ে ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিকগণ গোপনে বঙ্গরাজ্যে আপনাদের ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা পাইতেছিলেন, সেই সময়ে অর্‌মে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া এ দেশের রাজনৈতিক জ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহাকে আর একবার ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে হয়। এই সময়ে রবার্ট ক্লাইবও তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন। ক্লাইবের সহিত অর্‌মের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েরই নাম রবার্ট হওয়ায়, দুই জনে সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। অর্‌মে প্রায় তিন বৎসর ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার মান্দ্রাজে উপনীত হন। এই সময়ে তিনি মান্দ্রাজ কাউন্সিলের চতুর্থ সভ্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে অর্‌মে এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে সিরাজ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সংবাদ মান্দ্রাজে উপস্থিত হয়। নবাবের সহিত যুদ্ধার্থ কাহাকে পাঠান হইবে, এই বিষয় লইয়া মান্দ্রাজ কাউন্সিলে বিষম তর্ক বিতর্কের ধুম পড়িয়া যায়। অবশেষে ক্লাইবের কথা উঠিলে, অর্‌মে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন, এবং তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় ক্লাইব মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গলায় প্রেরিত হন। কর্ণাট যুদ্ধে যখন সমস্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেই সময়ে মান্দ্রাজ কাউন্সিলের সভ্যেরা কঠিন কঠিন সামরিক সমস্তার নির্ণয়ের জন্ত দিবারাত্র আপনাদিগের মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতেন। অর্‌মে ১৭৫৫ হইতে ৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত মহাযুদ্ধের অনেক সমস্তার মীমাংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কমিসারী জেনেরালের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে আলেকজাণ্ডার ডালরিম্পলের সহিত অর্‌মের অত্যন্ত প্রণয় হয়। ডালরিম্পল মান্দ্রাজে অণ্ডারষ্টোরকীপারের কার্য্য করিতেন, এবং তিনি জলপথসম্বন্ধীয় জরিপ ও অন্যান্ত বিবরণে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ডালরিম্পলের সহিত প্রণয় হওয়ায় অর্‌মে তাঁহাকে ডেপুটী একাউন্টাণ্টের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে অর্‌মে মান্দ্রাজ হইতে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে গমন করেন। এই সময় হইতেই তিনি ইতিহাসের আলোচনায় অবহিত হন, এবং বাল্যকাল হইতে যে বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ আনন্দিত হইতেন, এক্ষণে অবসর পাইয়া তাহা লইয়াই সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অর্‌মের ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে, তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "ভারতে ব্রিটিশ জাতির সামরিক বৃত্তান্ত" * প্রকাশিত হয়। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য ও কয়েক বৎসরের বাঙ্গলার বিবরণে এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ। অর্‌মের গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে ভারতে মুসলমান-বিজয়ের একটি বিবরণ প্রদত্ত হয়, কিন্তু তাহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। প্রথম খণ্ডে ১৭৪৫ হইতে ১৭৫৬ পর্য্যন্ত করমণ্ডল যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। প্রথমে কর্ণাট রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্ণাটের বিবিধ বিষয়, বিশেষতঃ ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সংঘর্ষণের বিবরণ, উক্ত খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাঙ্গলায় সিরাজ উদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ও মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি, এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত করমণ্ডল যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে বাঙ্গলার একটি সাধারণ বিবরণ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ ও ইংরাজের সংঘর্ষণ, সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ ও মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় ইংরাজ সৈন্য প্রেরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া অরমে আবার দাক্ষিণাত্যের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজগণ কর্ত্তৃক কলিকাতার পুনরধিকার, সিরাজ উদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ ও মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলার বিবরণ ও ১৭৫৭ হইতে ১৭৬১ পর্য্যন্ত দাক্ষিণা-

* A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan.

ত্যের বিবরণে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে একচতুর্থাংশেরও ন্যূন অংশ বাঙ্গলার বিবরণে পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে বাঙ্গলার বিবরণের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই; সুতরাং বলিতে গেলে, অর্মের গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যেরই প্রকৃত ইতিহাস। তবে বাঙ্গলার ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধেও তিনি যাহা লিখিয়াছেন, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় তাহাও নিতান্ত মন্দ নহে। তাঁহার কর্ণাটযুদ্ধের বিবরণ অনেক পরিমাণে সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া নিরপেক্ষভাবে লিখিত। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে অর্মে তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডের উপাদানসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ডিরেক্টারগণ তাঁহার ইতিহাস আলোচনার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বেতনে কোম্পানীর ঐতিহাসিকের পদে নিযুক্ত করেন। কর্ণাটযুদ্ধসম্বন্ধীয় ফরাসীদিগের বিবরণ অবগত হইবার জন্য অর্মেকে ফ্রান্সে গমন করিতে হইয়াছিল। তথায় তিনি বুসীর সহিত পরিচিত হন। বুসী অর্মের প্রথম খণ্ডে কর্ণাটযুদ্ধের বিবরণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অর্মের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে নিজ পল্লীভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান, এবং তাঁহার ইতিহাসের উপাদানের জন্য অনেক কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া দেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁহার তৃতীয় খণ্ড কেবল মানচিত্রে পরিপূর্ণ। তাহাতে ৩৫ খানি মানচিত্র আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থান, নগর ও যুদ্ধের মানচিত্র। প্রথম মানচিত্রখানি সমগ্র ভারতবর্ষের। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার দুইখানি ও ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার একখানি মানচিত্র ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। মেজর রেনেলের কৃত দিল্লীর পূর্ব্বপার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহের একখানি মানচিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রেনেল অর্মের গ্রন্থের জন্যই উক্ত মানচিত্রখানি অঙ্কিত করেন। উপবিভাগ সহিত বাঙ্গলা ও বিহারের একখানি মানচিত্রও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে অর্মে Fragments নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে দেশীয়গণের শাসনপ্রণালী ও ইউরোপীয়গণ কর্তৃক রাজ্যস্থাপনের নানা প্রকার ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ লিখিবার সময় তাঁহাকে পর্টুগীজ ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়। কারণ, প্রধান প্রধান পর্টুগীজ গ্রন্থকার ভারত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে না পারিলে, তাঁহার উক্ত গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। তিনি সেই সমস্ত গ্রন্থ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া নিজ গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত

হন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ অনেক নূতন নূতন প্রীতিপ্রদ ঘটনায় পরিপূর্ণ। যাঁহারা ...ঙ্কমচন্দ্রের "রাজসিংহ" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, রাজ-সিংহের প্রভাবে সাহানসাহা আরঙ্গজেব বাদসাহকে কেমন নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, এবং উদিপুরী প্রভৃতি তাঁহার বেগমগণ রাজপুতগণের হস্তে রন্ধ্রপথে কিরূপে বন্দিনী হইয়াছিলেন। অর্‌মেই তাঁহার গ্রন্থে প্রথমে এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করেন। রাণা রাজসিংহ দাম্ভিক আরঙ্গজেবকে সৎসাহসের পরিচায়ক যে পত্রখানি প্রথমে লিখিয়াছিলেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ পত্র অর্‌মেই ইউ-রোপে প্রকাশ করেন। কিন্তু অর্‌মে ভ্রমক্রমে এই পত্র যশোবন্ত সিংহের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক অপ্রকাশিত ঘটনায় তাঁহার গ্রন্থ পরিপূর্ণ। ফলতঃ, অর্‌মের দুইখানি গ্রন্থই ঐতিহাসিকগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ক্রমাগত সাহিত্য ও ইতিহাসের আলোচনায় অর্‌মের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, তাঁহাকে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া এলিং নামক স্থানে যাইতে হয়। এলিংএ গমন করিয়াও তিনি সুস্থ হইতে পারেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত শরীর দুর্ব্বল হওয়ায়, দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী দিবসে ত্রিসপ্ততি বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যে ইতিহাস-আলোচনা তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ ছিল, তাহাই ক্রমে তাঁহার শরীরপাতের কারণ হইয়া উঠে। যাহা হউক, তাঁহার ইতিহাস আলোচনার ফলে যে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে, তাহা চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে। অর্‌মে প্রকৃতরূপে বিবাহিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা ভালরূপ জানা যায় না। তবে তিনি তাঁহার কোন বিশিষ্ট বন্ধুকে পত্র দ্বারা স্বীয় বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিয়া যান। উক্ত পত্র তাঁহার উপদেশানুসারে তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রদত্ত হইয়াছিল। ডিরেক্টারগণ উক্ত পত্রানুসারে অর্‌মের বিধবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অর্‌মের কোন সন্তান ছিল কি না, তাহা বলা যায় না।

অর্‌মে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিলেন। এই জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বিবরণ জানিতে হইলে, অর্‌মের ন্যায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকের গ্রন্থ আলোচনাই কর্ত্তব্য। যদিও তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে একদেশদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে, তথাপি তিনি সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকৃত বিবরণও অবগত হওয়া যায়।

আজ কাল বাঙ্গালায় ইতিহাসচর্চ্চার সূত্রপাত হইতেছে, এবং অনেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের অনুশীলনে বিশেষরূপ মনোযোগী হইয়াছেন। সেই জন্ত আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর এক জন প্রধান ঐতিহাসিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম।

জাপানের প্রথম উপন্যাস।

"কোজিকি" জাপান দেশের প্রথম সাহিত্য। ইহা ৭১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অষ্টম কিম্বা নবম শতাব্দীতে জাপান সাহিত্যে পদ্য ব্যতীত কোন প্রশংসাযোগ্য গদ্য প্রকাশিত হয় নাই। দশম শতাব্দীতে কতকগুলি উপন্যাস গদ্যে প্রকাশিত হওয়ায় জাপানী ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হয়। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে আমাদের আলোচ্য "টেক্‌টোরি" বা কাঠুরিয়ার গল্পই সর্ব্বপ্রথম। এই পুস্তকের পর হইতেই জাপান সাহিত্যের গতি নূতন দিকে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জাপানী সমালোচকগণ, রচনার পারিপাট্যে ও ঘটনার বিচিত্রতায় "গেঞ্জিত মনোপটরি"কে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। হতভাগ্য কাঠুরিয়ার গল্পে তাঁহাদিগের তাদৃশ আস্থা দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিম ভূখণ্ডে "গেঞ্জিত মনোপটরি"র বিশেষ আদর নাই। উহাতে প্রেমকাহিনীর এতই প্রাচুর্য্য যে, তাহা কোন মতেই সুখপাঠ্য নহে।

কেহ কেহ "টেক্‌টোরির" রচয়িতাকেও প্রতিভাহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। টেক্‌টোরির গল্পের অধিকাংশ উপকরণই চীন ও ভারত হইতে সংগৃহীত, তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার। কিন্তু, দশম শতাব্দীতেও কোজিকির কতকগুলি গীত ভিন্ন জাপানদেশীয় পুরাতন গল্প বা উপন্যাসের অধিকাংশই চীন উপকরণে গঠিত। কাঠুরিয়ার কথা জাপানের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহার কোমল ভাষা ও সরল শোকোচ্ছ্বাস জাপানের নিজস্ব।

কাঠুরিয়ার কথা কোন ধার্ম্মিক বৌদ্ধের লেখনীপ্রসূত। ভক্তি ও তাহার ফল ইহাতে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নায়িকা চিরকৌমারব্রতাবলম্বিনী ছিলেন। নায়কের অভিলাষ, কন্যার পিতার অনুমোদিত হইলেও, কন্যার হৃদয়ে

স্থান পায় নাই। গ্রন্থ মধ্যে পাঁচটি রাজপুত্রের যে উপাখ্যান আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

জাপানী কাঠুরিয়া।

পুরাকালে "সহুগি নো মিয়াকো" নামে কোন বৃদ্ধ কাঠুরিয়া পর্ব্বতপার্শ্বে বাঁশ কাটিয়া দিনপাত করিত। এক দিন এক খণ্ড কর্ত্তিত বংশ হইতে সহসা আলোক বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল; কাঠুরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, আলোক আর কিছু নহে,—অতিক্ষুদ্রকায়া অপরিসীমরূপলাবণ্যসম্পন্না একটি বালিকা বনস্থলী আলোকিত করিতেছে। সে মনে মনে চিন্তা করিতে-লাগিল যে, এই বংশদণ্ডমধ্যস্থ ক্ষুদ্র জীবটি আমারই। এই মনে করিয়া সে সেই ক্ষুদ্র বালিকাকে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল, এবং তাহার স্ত্রীকে লালন-পালন করিতে দিল।

এই কন্যাপ্রাপ্তির পর হইতেই কাঠুরিয়া প্রত্যহ স্বর্ণাদি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; এবং অনতিবিলম্বে এক জন ধনাঢ্য হইয়া উঠিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন মাসের মধ্যে কন্যাটি পূর্ণযৌবনসম্পন্না হইয়া উঠিল। তাহার কেশরাশি গুচ্ছাকারে মস্তকের উপর সজ্জিত * করিয়া দেওয়া হইল। কন্যাটি অনূঢ়া রহিল। তাহার অঙ্গের জ্যোতিতে বাটী সর্ব্বদাই আলো-কিত থাকিত; বৃদ্ধের ভবন হইতে বিষাদরেখা অন্তর্হিত হইল। বৃদ্ধ কন্যার নাম রাখিলেন "কস্তয়া।"

কস্তয়ার রূপলাবণ্যের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে, বিখ্যাত ও ধনাঢ্য যুবকগণ তাহার প্রণয়প্রার্থী হইয়া আসিলেন। বহু দিন অবস্থানের পর কন্যাপক্ষ হইতে কোন কথা না পাওয়ায় ভগ্নমনোরথ হইয়া সকলে ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিলেন। কেবল পাঁচ জন রাজপুত্র দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, ঐ পঞ্চ রাজপুত্র বৃদ্ধকে আহ্বান করিয়া একে একে কন্যার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, কুমারী তাঁহার ঔরসজাতা নহেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে কন্যা বা[illegible] নহেন। এইরূপে নিরাশ হইয়া সকলে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। কি[illegible]

---

* পুরাকালে কেশরাশি স্কন্ধের উভয় পার্শ্বে পড়িয়া থাকিত। কন্যা ত্রয়োদশ কি[illegible] চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে উপনীত না হইলে সজ্জিত করা হইত না।

কন্তয়া-রূপ রত্নপ্রাপ্তির আশা তাঁহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইল না। বৃদ্ধও রাজকুমারদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এক দিন কন্তয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি ঐ পঞ্চ রাজপুত্রের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না? বিবাহ যে সমাজ ও লোকনীতির উন্নতিসাধক, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। কন্তয়া তদুত্তরে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার বাক্য অবহেলা করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যে রাজপুত্রকে তিনি বিবাহ করিবেন, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা করা আবশ্যক। বৃদ্ধও কন্তার বাক্যে সম্মত হইয়া এক দিন রাজকুমারগণকে স্বীয় ভবনে আহ্বান করিলেন।

রাত্রিসমাগমে রাজপুত্রগণ নানাবিধ নৃত্যগীতে "কন্তয়াকে" পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ইত্যবসরে তথায় আগমন করিয়া বলিলেন যে, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তিনি আমার কন্তার পাণিগ্রহণে অধিকারী হইবেন। রাজপুত্রগণ তাহাতে সম্মত হইলে, কন্তয়া বৃদ্ধ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া বলিলেন,

"তেনরিক্" * রাজ্যে বুদ্ধদেবের প্রস্তরনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র পাছে। প্রথম রাজপুত্র "ইষিযুকুরি" উহাই আমাকে আনিয়া দিন।

পূর্ব্ব মহাসাগরের উপকূলে "হোরাই" পর্ব্বতশৃঙ্গে, রৌপ্যমূল, স্বর্ণস্কন্ধ ও সুন্দর শ্বেত ফলে সুশোভিত বৃক্ষ আছে। ইহারই একটি শাখা দ্বিতীয় রাজপুত্র "কুরানোচি" আমাকে আনিয়া দিন।

"মোরোকেরি" দেশে এক প্রকার অগ্নিশৌচ মূষিকের লোমে পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়। তৃতীয় রাজপুত্র "দৈনাগোঁ" উহাই আমাকে আনিয়া দিন।

পক্ষবিশিষ্ট নাগবিশেষের মস্তকে এক প্রকার ইন্দ্রধনুলাঞ্ছিত মণি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্থ রাজকুমার "চিউনাগোঁ" উহাই আমাকে আনিয়া দিন।

বিস্তৃত সমুদ্রকূল হইতে তালচঞ্চু পক্ষী কখনও কখনও এই দেশে মুক্তা [illegible]ইয়া আসে;—পঞ্চম রাজপুত্র "ইযাধিপ" উহাই আমাকে আনিয়া দিন।

প্রথম রাজপুত্রের কথা।

[illegible]থম রাজপুত্র মনে মনে চিন্তা করিলেন, সামান্ত ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রের [illegible]মিত্ত দশ সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করা অবিবেচকের কর্ম্ম। বিশেষ এইরূপ কষ্ট[illegible]কার করিলেও, তাহা পাইব কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এই

* উত্তর ভারতবর্ষের নামান্তরমাত্র। চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ "সিন্ধু" রাজ্যকে ঐ নামে [illegible]হিত করে।

চিন্তা করিয়া তিনি সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি "তেনযিকু" যাত্রা করিলেন; কিন্তু "যামাতো" দেশে তিন বৎসর লুক্কায়িত ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। পরে "তোকিয়" পার্ব্বত্য মঠে বিনজুরু মন্দিরে বহু দিনের পুরাতন মসীবর্ণ এক ভিক্ষাপাত্র প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ পাত্র বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বসনে আচ্ছাদিত করিয়া কন্তয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। কন্তয়া দেখিলেন, পাত্র হইতে বিন্দুমাত্র আলোক বিকীর্ণ হইতেছে না, এবং তজ্জন্য কৃত্রিম বিবেচনা করিয়া পাত্রটি প্রত্যর্পণ করিলেন।

দ্বিতীয় রাজপুত্রের কথা।

দ্বিতীয় রাজপুত্র চতুর। তিনি জনসমাজে প্রকাশ করিলেন যে, স্কুকুষি দেশে স্নান করিতে গমন করিতেছেন। কতিপয় বিশেষ বন্ধুর সহিত তিনি ননিওয়া যাত্রা করিলেন। তথায় তিন দিন মাত্র বাস করিয়া পুনরায় গোপনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কারিকরের দ্বারা কন্তয়া-বর্ণিত বৃক্ষের শাখাসদৃশ একটি মণিমুক্তাময় শাখা নির্ম্মাণ করাইয়া পুনরায় ননিওয়ায় প্রতিগমন করিলেন। তথায় তাঁহার বন্ধুবর্গ ও অমাত্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং স্বীয় রাজভবনে গমন না করিয়া প্রথমেই বৃদ্ধের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কন্তয়ার নিকট উক্ত বৃক্ষশাখা আনীত হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বৃদ্ধ মণিমুক্তাদি-খচিত বৃক্ষশাখাটি অকৃত্রিম স্থির করিয়া কন্যাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন, এবং অঙ্গীকার পালন করিতে অনুরোধ করিলেন। কন্তয়া এই সকল কথা শুনিয়া মৌনবতী রহিলেন, এবং পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন, "আমি জানিতাম ইহা দুষ্প্রাপ্য।" এ দিকে রাজপুত্রও কন্তয়া-লাভবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া কি প্রকারে নির্ভীকচিত্তে দুস্তর সমুদ্রে ভাসমান হইয়াছিলেন, কি প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভিন্ন বিপদসঙ্কুল স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঈশ্বরকৃপায় "হোঁরাই" পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিরূপে স্বর্গীয় দূতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিরূপে ঐ পর্ব্বতপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা বর্ণে প্রবহমানা গিরিনদী দর্শন করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে তদুপরিস্থিত মণিমাণিক্যাদিখচিত সেতুর পার্শ্বে অভিলষিত বৃক্ষ দর্শন করিয়া একটি শাখা ভগ্ন করিয়াছিলেন, সানন্দে তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ ছয় জন লোক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল যে, তাহারা সহস্র দিবস ধরিয়া ঐ শাখাটি মণিমাণিক্য দিয়া

সজ্জিত করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি কোন পুরস্কার পায় নাই। বৃদ্ধ ও রাজপুত্র তাঁহাদের কথা শুনিয়া মলিন হইয়া গেলেন। কন্যরা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং বৃক্ষশাখাটি রাজকুমারকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজপুত্র দুঃখে ও লজ্জায় রাজ্যত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার বন্ধু ও অমাত্যবর্গ কেহই তাঁহার সন্ধান পান নাই।

তৃতীয় রাজপুত্রের কথা।

তৃতীয় রাজপুত্র অত্যন্ত ধনবান ছিলেন। এই সময়ে মোরাকোবি রাজ্য হইতে কোন বণিক এই রাজ্যে আসিয়াছিল। তৃতীয় রাজপুত্র "সদাইথিন" তাঁহাকে মোরোকোবি হইতে মূষিকলোমনির্ম্মিত অগ্নিশৌচ পরিচ্ছদ আনয়ন করিতে আদেশ দেন। বণিক স্বীকৃত হইলে স্বর্ণাদি দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। মোরোকোবি রাজ্য হইতে ঐ জাহাজ প্রত্যাগত হইলে সদাইথিন সংবাদ পাইয়া লোক প্রেরণ করিলেন, এবং উপযুক্ত মূল্যে ঐ পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেন, এবং পরিচ্ছদটি দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদসহকারে বৃদ্ধের ভবনে লইয়া আসিলেন। পরিচ্ছদটি কন্যরার নিকট অর্পিত হইল; কন্যরা পরিচ্ছদের অকৃত্রিমতা পরীক্ষার নিমিত্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে চাহিলেন। রাজপুত্র সম্মত হইলে উহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু এককালে ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন সদাইথিন হতাশাস হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তিনি লজ্জায় আর কখনও স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হন নাই।

চতুর্থ রাজপুত্রের কথা।

চতুর্থ রাজকুমার এক দিন সমস্ত অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া পক্ষবিশিষ্ট নাগবিশেষের মস্তকের মণি আনয়ন করিবার আদেশ দিলেন। অনুচরবর্গ রাজার এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব আদেশ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং অশেষ প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইলেন। রাজকুমার তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পাথেয়স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া অনুচরগণকে নাগমণির অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন।

অনুচরবর্গ রাজার এইরূপ আদেশে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া লব্ধ ধন আপনারা বিভাগ করিয়া লইল, এবং রাজাকে পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনা করিতে করিতে যথেচ্ছ গমন করিল।

এদিকে রাজপুত্র স্বীয় রাজভবন কন্যরার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া ইচ্ছানু-

রূপ সজ্জিত করিতে লাগিলেন, এবং বাটী হইতে অন্যান্য রমণীগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ক্রমে এক বৎসর অতীতপ্রায় হইল, অথচ তাঁহার অনুচরবর্গের কোন সংবাদ না পাইয়া রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ননিওয়া যাত্রা করিলেন। তথায় তাহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া স্বয়ং মণি আনিবার আশায় যাত্রা করিলেন। অর্ণবপোত কূল হইতে বহুদূর গমন করিলে দৈব-বশতঃ এক দিন অত্যন্ত প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এবং ভীষণশব্দে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। কর্ণধার ও রাজকুমার উভয়ে অত্যন্ত ভীত হইলেন। প্রবল বাত্যায় অর্ণবপোত ক্রমশঃ কোন অপরিচিত হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ স্থানে নীত হইবে, এই আশঙ্কায় উভয়েই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সমুদ্ররাজ নাগই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এই মনে করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হঠাৎ প্রবল ঝঞ্ঝা প্রশমিত হইল, এবং অনুকূল বায়ু-বশে অর্ণবপোত ক্রমশঃ স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হইল। চতুর্থ দিবসে তাঁহারা হারিমা মিত্ররাজ্যে উপনীত হইলেন। তথাকার রাজা অতি কষ্টে দেইমার্গোকে পোত হইতে তুলিয়া আনিলেন। দেইমার্গো অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া গৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন, এবং কস্তয়ার কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

পঞ্চম রাজকুমারের কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কস্তয়ার রূপলাবণ্যের কথা তথাকার রাজপ্রাসাদে প্রচারিত হইল। রাজা অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরস্থ এক রমণীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে কস্তয়ার দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। তৎপরে অধিরাজ বৃদ্ধকে আহ্বান করিয়া নানা প্রলোভনে তাহাকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কস্তয়াকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে এক দিন মৃগয়াচ্ছলে যাত্রা করিয়া তিনি বৃদ্ধের ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহটি স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ রহিয়াছে। কস্তয়াকে দেখিতে পাইয়া রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করাতে কস্তয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু রাজার কাতরোক্তিতে পুনরায় দেহ ধারণ করিলেন। কস্তয়া রাজার প্রণয়িনী হইতে অস্বীকার করিলে, রাজা বিফলমনোরথ হইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইল। কস্তয়া সহসা এক দিন চন্দ্র দর্শন করিয়া মলিন হইয়া উঠিলেন। সেই দিবস হইতে প্রত্যহ চন্দ্র দর্শন করিয়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তম মাস গত হইলে কস্তয়া এতই দুর্ব্বল ও মলিন হইলেন যে, বৃদ্ধ ও তাঁহার পরিচারিকাগণ ক্রমশঃ ভীত হইতে

লাগিলেন। অষ্টম মাসের সমাগমে যখন চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হইলেন, কস্তুরা তখন অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা বারম্বার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিলেন যে, বার বার চেষ্টা করিয়াও আমি দুঃখের কারণ বলিতে পারি নাই। চন্দ্ররাজ্যে আমার বাস। অভিশপ্ত হইয়া এতকাল আমি এ গৃহে বাস করিতেছি। এক্ষণে আমার সময় আগতপ্রায়। আগামী পূর্ণিমায় চন্দ্রলোক হইতে কতিপয় দূত আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে।

রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কস্তুরাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সহস্র যোদ্ধা প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল, এবং বৃদ্ধ স্বয়ং কস্তুরার গৃহদ্বারে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাত্রি বিগত হইলে স্বর্গীয় বিভায় গৃহ আলোকিত হইল, এবং মেঘারোহণে কতিপয় দেবদূত স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। সৈন্যগণ ভয়ে স্তম্ভিত হইল; কাহারও শরত্যাগে সামর্থ্য রহিল না।

প্রধান স্বর্গীয় দূত কস্তুরাকে আহ্বান করিবামাত্র সহসা গৃহদ্বার আপনি উন্মুক্ত হইল, এবং কস্তুরা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বৃদ্ধকে নানা প্রকারে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই মস্তক উত্তোলন করিলেন না। তৎপরে রাজাকে একখানি পত্র লিখিয়া এবং স্বর্গীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, কস্তুরা বিমানারোহণে অমরধামে যাত্রা করিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

কবিতাকুঞ্জ।

শিশু। *

[স্বর্গীয়া প্রমীলানাগ রচিত।]

হৃদয়ে পাষাণরাশি সরাইয়া সুকোমল করে,
কে তুই নির্ঝরধারা ঢেলে দিলি হৃদয় উপরে;
অন্ধকার জীবনের সরাইয়া গাঢ় তমোরাশি,
উষার আলোক প্রাণে কে তুইরে জাগাইলি
আসি?
চারু দুটি স্নেহকরে জড়াইয়া স্নেহহীন প্রাণ,
কে তুই দিয়েছ প্রাণে খুলে দিলি এ নিরুদ্ধ
প্রাণ?
চাহিনি সংসারপানে, নিরাকুল বিতৃষ্ণা তাহার,
তুই আধ "মা মা" ব'লে সংসারেতে বাঁধিলি
আমায়।
কি দিয়ে, কি হাসি দিয়ে হাসালি এ বিশুষ্ক
জীবন,
কি বলে বাঁধিলি তুই এ আমার উদাসীন মন?
ওই ক্ষুদ্র মুখে তোর স্বরগের চারু ছবিখানি,
প্রশস্ত ললাট ওই দেখাইছে প্রতিভার খনি,
সুন্দর চাহনি চারু, চারুমুখে সোহাগের হাসি,
নবনীত রুচি তনু, কেবলিরে কেন ভালবাসি?
কবে কোন দিন কোথা দুখময় হতাশ জীবনে
ফুটিলি নক্ষত্র তুই হৃদয়ের আঁধার গগনে!

বঙ্গের কবিতা।

১

আর তোর সাজে না মা! ধূলায় শয়ন;—
হৃদয়ে প্রতিভা লীন,
আঁখি দু'টি জ্যোতিহীন,
মলিন বসন হায়! বিষণ্ণ আনন;—
আর তোর সাজে না মা! ধূলায় শয়ন।

২

শুভক্ষণে বিদ্যাপতি জন্ম দিলা তোরে;
বক্ষেতে লইয়া তুলি,
সুমধুর ব্রজবুলি
আধ-ভাষে শুনাইলা শৈশব-শ্রবণে,—
অক্ষয় অমিয়-বীণা থুইলা চরণে।

৩

গাইল বৈষ্ণব কবি সঙ্গীতে নিপুণ;
সাধক ভারত পরে
(নামে যাঁর সুধা ঝরে)
রাম-প্রসাদের টীকা দিয়া তোর ভালে
বেঁধে দিলা পা-দু'খানি নূপুরের তালে।

৪

শত কবি শত সাজে তোরে সাজাইল।
স্বর্গ হ'তে অবশেষে
মধুমাসে মধু এসে
গাঁথিয়া নূতন মালা মথিয়া বিমান
সঞ্জীবনী সুধা তোরে করাইল পান।

৫

তাহারি পশ্চাতে নব বিদ্যুতের প্রায়
উদাস্ত-তামসী নাশি,
দীপ্ত হেমচন্দ্র আসি'
গলে তোর হেমহার করিল অর্পণ,
মাতাইল তীব্র বহ্নি করি' বরিষণ।

৬

নবীন নবীন পরে করিল প্রবেশ,—
উল্লাসে অধীর হ'য়ে
নবীন ভূষণ ল'য়ে
ললিত বিভঙ্গে তোরে রঙ্গে সাজাইল,
হর্ষের তরঙ্গ প্রাণে প্রাণে নাচাইল।

৭

উদিল নূতন যুগ কবিত্ব-জগতে;—
বিহ্বল বিহারী কবি
আঁকিল নূতন ছবি,
মধুর মঙ্গল-গান করিয়া সৃজন,—
দেখাইল সারদার সৌন্দর্য্য কেমন।

৮

আজি পুনঃ নব রবি প্রভাত-গগনে!
একবার দেখ চেয়ে
আনন্দে দিগন্ত ছেয়ে
ছুটিছে অনন্তে কত সঙ্গীত মহান,
ভাসায়ে নাচায়ে বঙ্গ-নরনারী-প্রাণ!

৯

আর তোর সাজে না মা! ধূলায় শয়ন;—
এবার ঘুচাব লাজ,
হের মা! পেতেছি আজ,
সপ্ত কোটি বুকে তোর স্বর্ণ-সিংহাসন;—
আর তোর সাজে না মা! ধূলায় শয়ন।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

লও গো বিদায়।

[গান।]

ওহে হৃদি মন্দির-বাসী!
আজি লও গো বিদায়;
যদি দীর্ঘ সহবাসে, চঞ্চল হৃদি পাশে,
মম প্রেমকুসুমসঞ্চিত ফুলমালা ম্লান হয়ে যায়।

তোমার নয়নে তিলেকও যদি হই পুরাতন,
আহা এমন সুধাসিন্ধু যদি কমে যায় একবিন্দু,
তোমার আনন-ইন্দু নিতি দরশে, নিতি পরশে।
আজি লও গো বিদায়।

আমি তিক্ত বিরহ করিব পান আকুল মিলন তিয়াষে;
যদি সুখ-পীযূষ করি পান হয় সুখ-পিপাসা অবসান,
যদি দেবতারে করি বলিদান মন-মন্দিরে!
আজি লও গো বিদায়।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

নিকটে চেয়োনা আর।

দূরে সে রয়েছে ; তারে নিকটে চেয়োনা আর।
মুছে ফেল আঁখি পরে আকুল নয়ন-ধার।
দূরে যে কেবলি শোভা,
মানস-লোচন-লোভা,
কাছে এলে শত ত্রুটি চখে পড়ে অনিবার ;
দূরে সে রয়েছে ; তারে নিকটে চেয়োনা আর।
দূরে যে কেবলি আলো—
সে ত দূরে থাকা ভালো
কাছে এলে মনে হবে, হেথা হোথা অন্ধকার।
দূরে সে রয়েছে ; তারে নিকটে চেয়োনা আর!

দূরে সে রয়েছে ; তারে নিকটে চেয়োনা আর!
মুছে ফেল আঁখি পরে আকুল নয়ন-ধার।
দুয়ের ব্যবধান
হয়ে গেলে অবসান
কল্পনা, বাস্তব, ছুয়ে হয়ে গেলে একাকার,
শত ত্রুটি, শত দোষ চখে পড়ে বারবার।
দূরের আলোক লাগি
মধুরিমা উঠে জাগি
কল্পনার স্বর্ণ বর্ণে উজলিত চারি ধার।
নিকটে রবে না তাহা ; মুছ তবে আঁখি-ধার।

দূরে সে রয়েছে ; তারে নিকটে চেয়োনা আর।
মুছে ফেল আঁখি পরে আকুল নয়ন-ধার।
কল্পনা আলোক দিয়া,
উজলিয়া থাক হিয়া,
বিরহ বেদনা নহে, বিরহ সুখের সার ;
বিরহে হৃদয় ভরা, মধুর স্মৃতিতে তার।
বিরহের ব্যবধানে,
প্রণয় ফুটুক প্রাণে,
মাধুরী উঠুক জাগি, বিরহের পরপার।
দূরে সে রয়েছে ; তারে নিকটে চেয়োনা আর।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

এ প্রেমের।

সখি, এ প্রেমের নাহি অন্ত নাহি কূল,
বোঝাবার নয় সখি, দেখাবার নয়!
কে জানে একই বৃন্তে কেন দুটি ফুল,
ফুটিয়া উঠিয়া একি সঙ্গে বাঁধা রয়!
সখি, এ প্রেমের নাহি "কেন" বা "কেমনে,"
জানি শুধু তুমি বই নাহি গো ভুবনে!
আমার এ বিশ্ব বাঁধা ঐ দুটি চরণে,
তুমি ছাড়া আর কিছু নাহি গো স্মরণে!
নীরদ সলিলে ভাসে, বায়ু হাহা করে,
তারি সাথে শুধু দুটি আঁখি মনে পড়ে!
এ নহে গো স্বপ্ন শুধু নিমেষের ভুল,
এ যে মর্ম্মে বিজড়িত অন্তরাত্মাময়!
সখি, এ প্রেমের নাহি অন্ত নাহি কূল,
বোঝাবার নয় সখি, দেখাবার নয়!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমালয়।

কত যুগ গেছে চলে কত মন্বন্তর।
জগতের কাহারেও ভ্রূক্ষেপ না করি,
এমনি নীরবে আছ কত কাল ধরি
শুভ্রশির অদ্রিরাজ-হে হিমাচল!
দেখিলে মহান ওই প্রশান্ত মুরতি
দূর হয় একেবারে মানবের দম্ভ,
স্ফীত অহঙ্কার যত ; ধরণীর মাঝে
তোমার উন্নত শির সর্ব্বোচ্চ বিরাজে ;
দাঁড়াইলে তব কোলে বিশ্বের আরতি-
ধ্বনি শুনিবারে পায় মানব-অন্তর ;
সৃষ্টির প্রথম আদিযুগ হ'তে তুমি,
যোগী ঋষি দেবতার সেই পুণ্যভূমি,
ইন্দ্র-বজ্র বক্ষে সহি বিরাট অটল
ধরে আছ ধরণীরে এক চির-স্তম্ভ।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মীরার প্রার্থনা।

১

রাজ্য ভোগ সুখ ধন পরিজন
ঘুচায়ে সকল জঞ্জাল,
আইনু যুগল শীতল চরণে,
হে বন্ধু আমার নন্দদুলাল!

২

রতন-হার আমি ফেলেছি দূরে,
গেঁথেছি বন-ফুল-মাল ;
কৃপা করি দিব বাসনা মনে,
হে বন্ধু আমার নন্দদুলাল।

৩

ক্ষম মহারাজ, দাসীরে তোমার,
মিনতি করযোড় করি,
চারিদিকে আমি না হেরি কিছু
বিনে সে আমার বনোয়ারী!

৪

গগনে শশী শোভে, চৌদিকে তার
বেড়িয়া নক্ষত্র মাল,
আরতি করে তব, চন্দ্রমা তারা
হে বন্ধু আমার নন্দদুলাল!

৫

কুসুমে মনোলোভা শোভা হে নাথ,
সরসে বিকাশে উতপল,
হৃদয়-সরসী-মাঝে সাজিছে—
হে বন্ধু তোমার পদ-কমল।

৬

প্রফুল্ল বনরাজি, শীতল ছায়া,
বহে গন্ধবহ মন্দ,
শীতল সুখদ মধুর গন্ধ হে,
তোমার চরণ-মকরন্দ।

৭

নীল-নীরা ভানু-কুমারী যমুনা,
বহিছে কল কল স্বনে,
তটচুম্বনছলে সোহাগে মিলেছে,
হে বন্ধু, তোমার দুটি চরণে।

৮

ছত্র ধরে তরু তমাল তোমার,
হে রাজ-রাজেশ্বর, হৃদয়েশ্বর!
ফল ভার লয়ে' নমিত তরু—
বলে হে, "উপহার ধরহে ধর।"

৯

কদম্ব উঠে ফুটি যমুনাতটে হে,
পুলকে রোমাঞ্চিত অঙ্গ,
শ্রীকর পরশি করিবে চয়ন
পাবে বলে তোমার সঙ্গ।

১০

গন্ধবহ মন্দ বীজন করে
কুসুম সুগন্ধি চামর,
ভ্রমর গুণ গুণ গাহিছে গুণ,
হে বন্ধু, আমার নন্দকিশোর!

১১

রূপ তব গগন ভুবন ভরা,
দিলে হে মোর দুটি আঁখি,
নয়ন-ভরা রূপে ভরে না প্রাণ হে,
বাসনা হৃদয় ভরে দেখি।

১২

মীরা যমুনা-জলে যাবে মিশে,
ধুইবে চরণ দু'খানি,
মীরা পবন সনে মিশিয়া যাবে
দিবে হে সুগন্ধ উপহার আনি।

১৩

মীরা বকুল হয়ে ফুটিবে বিটপে
কেশপাশে দিবে শোভা,
মীরা ধূলি হয়ে রবে চরণতলে হে—
হে বন্ধু আমার মনোলোভা!

শ্রীসরলাবালা সরকার।

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

নূতন বায়বশক্তি।

বায়ুর শক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। মনুষ্যজাতি আদিম অসভ্য অবস্থা হইতেই এই শক্তির সহিত বিশেষ পরিচিত। বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে প্রধানতঃ একমাত্র বায়ব শক্তি দ্বারা জাহাজ ও নৌকাদি চালিত হইত; আজ কাল যন্ত্র-বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতি সত্ত্বেও, সমুদ্রযানাদির পরিচালনে বায়বশক্তির উপযোগিতার হ্রাস হয় নাই। বরং আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে উক্ত শক্তি জলযানাদির পরিচালনে যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইতেছে। অন্য

দিন হইল, ট্রিপ্‌লার নামক জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানবিদ্‌ বায়ুর এক নূতন শক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন ;—এই শক্তি দ্বারা যানাদি চালাইবার ব্যবস্থা হইলে, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

কয়েক বৎসর হইল, আমেরিকার এক বৃহৎ হোটেল হঠাৎ অগ্নিসাৎ হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে উত্তপ্ত রুদ্ধ বায়ুর কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, ট্রিপ্‌লার সাহেব বায়ুর নূতন শক্তির আবিষ্কারে নিযুক্ত হন। গত দশ বৎসর নানাবিধ অনুসন্ধান করিয়া, সম্প্রতি তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জলীয়-বাষ্পের পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা যন্ত্রাদিপরিচালন সম্ভবপর কি না,—এই বিষয় লইয়া ট্রিপ্‌লার প্রথমতঃ অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। কিন্তু এই প্রকার বায়ু দ্বারা যন্ত্রপরিচালনের কোন সুবিধা না দেখিয়া, অন্য কোন প্রকারে বায়ুর শক্তি যন্ত্রাদিতে প্রয়োগ করিবার উপায়-উদ্ভাবনে চেষ্টিত হন। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—যে সকল পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বাষ্পাকারে থাকে, তাহাতে উপযুক্ত চাপ দিলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে শীতল করিলে, প্রায় অধিকাংশ বাষ্পীয় পদার্থ, তরলাকারে পরিণত করা যায়। যে সকল পদার্থের তরলাবস্থা প্রাচীন রসায়নবিদ্‌গণ কল্পনাও করেন নাই, উন্নত যন্ত্রসাহায্যে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় সেই প্রকার অনেক বাষ্প তরলাবস্থায় নীত হইয়াছে ; অল্প দিন হইল, কয়েকটি রসায়নবিদ্‌ বায়ু ও অঙ্গারক বাষ্পের তরলতা সম্পাদন করিয়াছেন। ট্রিপ্‌লার উক্ত তরলীভূত বায়ুর শক্তি দ্বারা যন্ত্রাদি চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তরল করিতে হইলে বায়ু অত্যন্ত শীতল করা আবশ্যক ; গলিত বরফ অপেক্ষাও ৩৪০ অংশ পরিমাণে শীতল করিলে, বায়ু তরল হইতে আরম্ভ হয়, এবং অতি অল্প তাপ দিলেই, ইহা সহসা প্রসারিত হইয়া সাধারণ বায়ুর আকার প্রাপ্ত হয়।—ট্রিপ্‌লার বলেন, তরল বায়ু সহসা বাষ্পাকারে পরিণত হইবার সময় যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা অনায়াসে যন্ত্রাদিপরিচালনে নিযুক্ত হইতে পারে। এই কথা প্রচারিত হইলে, প্রথমতঃ য়ুরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেন, ট্রিপ্‌লারের অনুমান কিছুতেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না ; এবং অত্যল্প পরিমাণে তরল বায়ু প্রস্তুত করিতে যেরূপ যে পরিমাণ শ্রম ও অর্থব্যয় আবশ্যক, তাহা হিসাব করিয়া, এই নবাবিষ্কৃত বায়বশক্তি যে কোন ক্রমেই আধুনিক যন্ত্রাদিতে বাষ্পশক্তির স্থান অধিকার করিতে পারে না, তাহা স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

প্রবীণ বৈজ্ঞানিকগণের এই নিরুৎসাহে ট্রিপ্‌লার অণুমাত্র ভগ্নোদ্যম বা বিচলিত হন নাই। স্বল্পব্যয়ে তরল বায়ু প্রস্তুতের এক উপায় উদ্ভাবনের জন্য ইনি বরং দ্বিগুণ উৎসাহসহকারে পরীক্ষা আরম্ভ করেন ; এবং অল্প দিন হইল, প্রচুর তরল বায়ু উৎপাদনকারী একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণকে বিস্মিত করিয়াছেন। আধুনিক বাষ্পীয় যন্ত্রাদিতে বাষ্পের অতিশয় অপচয় হইয়া থাকে ; অনেক সময়েই ব্যবহৃত বাষ্প দ্বারা পুনরায় যন্ত্রপরিচালনের বিশেষ কোনও সহায়তা হয় না,—বাষ্পোৎপাদক জল উত্তপ্ত ও অগ্নি উদ্দীপন করাইয়া, ব্যবহৃত বাষ্প প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ; বাষ্পীয়যানাদির যন্ত্রে এই সামান্য সুবিধাটিও পাওয়া যায় না। ট্রিপ্‌লার বলেন, তাঁহার কল্পিত যন্ত্রে প্রযুক্ত শক্তির অণুমাত্রও অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন তরলপদার্থ বাষ্পীভূত হইবার ইহা সন্নিহিত পদার্থ হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া সেগুলিকে শীতল করিয়া তোলে, কিন্তু ইহা দ্বারা বাষ্পের তাপবৃদ্ধি হয় না, কেবল তরল পদার্থটিকে অবস্থান্তরিত করিতেই উক্ত তাপ ব্যয়িত হইয়া থাকে।—তরল বা কঠিন পদার্থমাত্রেরই এইটি সাধারণ ধর্ম্ম। জল কিয়ৎকাল বায়ুতে উন্মুক্ত রাখিলে বাষ্পীভূত হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত পদার্থ হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শীতল করে,—এই জন্য শরীরের কোন স্থান জলসিক্ত করিয়া

বায়ুতে উন্মুক্ত-রাখিলে, শীতল বলিয়া বোধ হয়। ট্রিপ্‌লারের যন্ত্রে তরল বায়ু বাষ্পীভূত হইবার সময় উল্লিখিত কারণে সন্নিহিত বায়ু হইতে এত অধিক তাপ সংগৃহীত হয় যে, পার্শ্বস্থ বায়ু স্বতঃই তরল হইয়া যন্ত্রপরিচালনে পুনঃপ্রয়োগের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে। এই সকল দেখিয়া সাহেব আশা করিতেছেন যে, বাষ্পীয় যন্ত্রে যে প্রকার অবিচ্ছিন্নভাবে বাষ্প প্রয়োগ করিতে হয়, এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রে তরলবায়ুপ্রয়োগের সেরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে না। এই যন্ত্রের প্রচলনের জন্য, ট্রিপ্‌লার ইতিমধ্যেই এক কারখানা স্থাপন করিয়াছেন;—প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণ কিন্তু আজও ইহার সফলতাসম্বন্ধে সন্দিহান রহিয়াছেন।

উল্কাপিণ্ড।

মেঘহীন পরিষ্কার রাত্রে প্রায়ই উল্কাপাত দৃষ্ট হয়। যদিও দেখিলে বোধ হয়, উল্কা সকল অনন্ত-নক্ষত্র-রাশি হইতে পড়িতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা নক্ষত্র নয়। আকাশের ক্ষীণ-জ্যোতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি গ্রহরাজ সূর্য্য অপেক্ষাও বৃহত্তর; কিন্তু উল্কা সকল অতি ক্ষুদ্র জড়-পিণ্ড মাত্র। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ভূপৃষ্ঠপতিত অনেক উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার পরিমাণ অনেক সময়েই কয়েক মণের অধিক হয় না; উল্কাপিণ্ডের গঠনোপাদানে কোন অজ্ঞাত পদার্থ দৃষ্ট হয় না। অনেক স্থলেই দেখা যায়, এ গুলি নানাপ্রকার পার্থিব পদার্থে গঠিত। পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ যে প্রকার এক নির্দ্দিষ্ট পথে এবং নির্দ্দিষ্ট গতিতে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এই উল্কাপিণ্ড সকলও সেই প্রকার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহারা গ্রহগণের ন্যায় একাকী সূর্য্য পরিভ্রমণ করে না। অসংখ্যক উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট গতিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে উল্কাময় পথ নির্ম্মাণ করিয়া পরিভ্রমণ করে; এই প্রকারে সৌরজগতস্থ অসংখ্য উল্কাপিণ্ড নানা দলে বিভক্ত হইয়া, প্রত্যেকে বিসদৃশ পথ অবলম্বন করিয়া, সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন পূর্ব্ববর্ণিত উল্কাপথ সকল ভিন্ন করিয়া বা তাহার নিকট দিয়া গমন করে, তখন পার্থিব আকর্ষণবশে নিকটবর্ত্তী উল্কাপিণ্ড সকল পৃথিবীতে পতিত হয়। সৌরজগতে এত অধিকসংখ্যক উল্কাপথ আছে যে, পৃথিবী নিয়তই কোন এক উল্কাদলের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কতকগুলিকে কুক্ষিগত করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতিদিন প্রায় ত্রিশকোটী উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয়, কিন্তু ইহার অর্দ্ধেকেরও অধিক ক্ষুদ্রতাবশতঃ মানবচক্ষুর গোচর হয় না। উল্কাপিণ্ড সকল যে প্রকার জ্যোতিষ্মান্ দেখায়, ভূপতিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা সেরূপ উজ্জ্বল থাকে না, এবং গ্রহ উপগ্রহ যেমন প্রতিফলিত সৌরালোকে উজ্জ্বল দেখায়, ইহাদের উজ্জ্বলতা তদ্রূপও নহে। পৃথিবীর আকর্ষণে অতিবেগে ধরাপৃষ্ঠে পড়িবার পূর্ব্বে আকাশস্থ বায়ুর সংঘর্ষণে ইহারা উত্তপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; এই ঘর্ষণজাত তাপ এত অধিক যে, অধিকাংশ স্থলে ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড সকল বাষ্পীভূত হইয়া পথিমধ্যে বিলীন হইয়া যায়; বৃহদায়তন পিণ্ড সকল দগ্ধ হইতে হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। অনেক সময় পতনশীল উল্কার পথে যে ক্ষীণজ্যোতি আলোকরেখা দেখা যায়, তাহা জলন্তপিণ্ড-জাত প্রদীপ্ত বাষ্প ব্যতীত আর কিছু নহে। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, উল্কাপিণ্ড সকল আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ ক্রোশ, এবং কখনও ২৫ ক্রোশ বেগে পৃথিবীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং ভূপৃষ্ঠের ৬০ হইতে দশ ক্রোশের মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

পৃথিবীতে প্রতিদিন বা প্রতি ঋতুতে সমপরিমাণ উল্কাপাত হয় না। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পৃথিবী একটি সুবিস্তৃত উল্কাপথ ভিন্ন করিয়া পরিভ্রমণ করেন, এজন্য বৎসরের অন্যান্য

সময় অপেক্ষা ঐ সময়েই অধিক উল্কাপাত দৃষ্ট হয়। আজ কয়েক বৎসর হইল, বঙ্গদেশে যে বিস্ময়জনক উল্কাবৃষ্টি দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বোক্তপথচারী উল্কারাশি দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল, জ্যোতির্বিদ্গণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন। এই উল্কাপথ প্রায় দশ হাজার ক্রোশ বিস্তৃত। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবী সেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে চলিয়া যখন উক্ত উল্কাপথে উপনীত হয়, তখন উল্কারাশি প্রতি মিনিটে প্রায় ১৩৮০ ক্রোশ বেগে আকাশমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া, ধরাপৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে।* পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, আগামী ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পূর্ব্বের ন্যায় আবার উল্কাবৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

নূতন বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

বিজ্ঞান-জগতে রেঁংগেণের (Rontgen) বিখ্যাত আবিষ্কার ও শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসুর অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা পুরাতন না হইতেই, তদপেক্ষা বিস্ময়কর আর এক আবিষ্কারের কথা শুনা যাইতেছে। যখন প্রথমে তারযোগে বার্ত্তাবহ যন্ত্রে শতযোজনদূরস্থিত স্থানের সংবাদ মুহূর্ত্তে আসিতে লাগিল, তখন কল্পনাও ভাবিতে পারে নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে আর এক অদ্ভুত ও সুলভ উপায়ে বার্ত্তাবহন কার্য্য সাধিত হইবে। ইটালিবাসী মার্কনি নামক এক জন দ্বাবিংশবর্ষীয় ইংরাজ যুবক, তারহীন বার্ত্তাবহযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারমাত্রই প্রায় অকস্মাৎ পরিজ্ঞাত হইতে দেখা যায়; এ সকলের মূলে যে পরম্পরাগত শিক্ষা এবং আবিষ্কর্ত্তার সূক্ষ্ম দর্শন বর্ত্তমান নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না; কিন্তু প্রায়ই বৈজ্ঞানিকগণ বিষয়ান্তরের অনুসন্ধানকালে অপরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূত্র পাইয়া, তাহার অবলম্বনে পরিশেষে কোনও মহৎ আবিষ্কার সাধন করিয়া থাকেন; প্রাচীন বিজ্ঞানাচার্য্য নিউটন্ ও আধুনিক বিখ্যাত যন্ত্রবিদ্ এডিসনের অনেক প্রসিদ্ধ আবিষ্কার ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কনির এই বিস্ময়কর আবিষ্কারও সহসা হইয়া পড়ে; তিনি এক দিবস আচার্য্য হার্জের আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে এক মাইল দূরে এক স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতেছিলেন; এই উভয় স্থানের মধ্যে এক অনতিউচ্চ বিস্তৃত পর্ব্বত ব্যবহিত ছিল, হার্জের আবিষ্কৃত বার্ত্তাবহ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক তারের আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু উভয় স্থানের মধ্যে উচ্চভূমি বা পর্ব্বতাদির ন্যায় বিস্তৃত বাধা থাকিলে, তড়িৎ-তরঙ্গ সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারে না। এজন্য মার্কনি পর্ব্বতের উপর দিয়া সংবাদপ্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষাকালে পর্ব্বতের অতি নিম্ন প্রদেশে হার্জ-নির্ম্মিতসংবাদ গ্রহণের একটি যন্ত্র ছিল; মার্কনি সাহেব সংবাদ গ্রহণকালে পর্ব্বতমূলস্থ সেই যন্ত্রটি সহসা প্রেরিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সহিত কম্পিত হইতে দেখিয়া, সিদ্ধান্ত করেন, নিশ্চয়ই এটি কোন অপরিজ্ঞাত বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা আন্দোলিত হইতেছে পরে নানাবিধ গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর এই নূতন বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য্য ও শক্তি সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়া, সম্প্রতি তিনি তাহার সাহায্যে এক তারহীন বার্ত্তাবহযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

এই যন্ত্রের কার্য্য অতীব বিস্ময়জনক। ইহাতে সাধারণ বার্ত্তাবহযন্ত্রের ন্যায় তারের আবশ্যক হয় না, এবং যে কোন সংবাদগ্রহণোপযোগী যন্ত্র থাকিলে ইহা দ্বারা সুদূরস্থ সংবাদ-প্রেরণ করা যাইতে পারে, যোজনব্যাপী পর্ব্বতমালা বা সুবিশাল মহা সমুদ্র সংবাদ প্রেরণের কোন অন্তরায় হয় না; কেবল দূরত্ব অনুসারে যন্ত্রের শক্তি বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। মার্কনি

---

* ধূমকেতু ও উল্কাপথের ছেদ-বিন্দুর নিকটবর্ত্তী পিণ্ড সকল সূর্য্যের সান্নিধ্যবশতঃ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২৭ মাইল বেগে পৃথিবীর অভিমুখে গমন করে।

হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, একবার লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে লণ্ডন ও নিউইয়র্ক সহরের মধ্যে সংবাদপ্রেরণের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারে। এই নবাবিষ্কার দ্বারা সম্ভবতঃ আধুনিক যুদ্ধপ্রথার বিপ্লব সাধিত হইবে; মার্কনি বলেন, এই যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুগণের সমরপোতের বারুদের ভাণ্ডারে অনায়াসে অগ্নিসংযোগ করা যাইতে পারে। বারুদের সহিত অনেক সময় লৌহখণ্ডাদি মিশ্রিত থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা বহুদূর হইতে বারুদস্থ ধাতুখণ্ডে ইচ্ছামত বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, এবং বিদ্যুতের তাপে বারুদ প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণের যুদ্ধজাহাজ মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিতে পারে। মার্কনি সাহেব দেড় মাইল দূরস্থিত এক বারুদস্তূপে এই প্রকারে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন। যাহা হউক, মার্কনির কথা সত্য হইলে, যুদ্ধকার্য্যে বারুদ যে ক্রমে অব্যবহার্য্য ও পরিত্যক্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জমা কামেন্ তুমারী।

শিরোনামে পাঠকের বিভীষিকা-উৎপাদনের ভয়ে প্রথমেই বলা ভাল, বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বঙ্গের জমিদারী প্রথা। এই জমিদারী প্রথার দোষ গুণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন। আপাততঃ, দেশের ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বা জমিদার ও প্রজার স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে ব্যবহারবিদের বিবাদাস্পদ বিষয়ের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এ ক্ষেত্রে দোষগুণের সমালোচনাও আমরা করিব না। মোটের উপর ধরিতে গেলে বিজাতীয় শাসনে বর্ত্তমান জমিদারী প্রথা যে প্রভূত কল্যাণকরী, অর্থনীতির সাধারণ সূত্রজ্ঞেরাও তাহা স্বীকার করিবেন। এই জমীদারী প্রথার উৎপত্তি ও বিবৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জমিদারী প্রথার মূল অন্বেষণে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনুসংহিতায় দেখা যায়;—

> গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
> বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥ (মনু। ৭। ১১৫)

"রাজা দেশের সুশাসন জন্য গ্রামাধিপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিবেন।" পরবর্ত্তী শ্লোকে গ্রামে চৌর্য্যাদিনিবারণে অক্ষম হইলে, গ্রামপতি দশাধিপতিকে, দশপতি শতাধিপকে, ইত্যাদি ক্রমে জানাইবেন; অর্থাৎ, রাজকীয় কার্য্যে উচ্চাধিপের আদেশের অপেক্ষা করিবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। পরে ইহাদের বৃত্তি সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিদিন প্রজাগণ রাজাকে যে অন্নপানাদি দিবে, তাহা গ্রামাধিপের প্রাপ্য। পদের তারতম্য অনুসারে জীবিকার জন্য ভূমি-

প্রাপ্তিরও বিধান আছে; দশপতি দুইখানি হলপ্রবাহোপযোগী ভূমি, বিংশতীশ পাঁচখানি, শতপতি একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ও সহস্রপতি বৃহৎ গ্রাম পাইবেন (মনু; সপ্তম অধ্যায়; ১১৮) ইহা হইতে অনুমিত হইবে, ভূসম্পত্তিবিষয়ক সমস্ত ব্যবস্থাই ইহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাষ্ট্র দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, বলা যাইতে পারে। এক্ষণে মুসলমান অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলায় এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ছিল, দেখিতে হইবে। প্রিন্সেস প্রমুখ মহোদয়গণের প্রকাশিত সেনবংশীয় ভূপতিগণের তাম্রশাসনপত্রে লিখিত আছে:—"সমুপগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্র রাজামত্য......বিদিত মস্ত (বা—মতমস্ত) ভবতাং" (১) অর্থাৎ, উপস্থিত রাজ রাজন্য রাজ্ঞী...প্রভৃতি আপনারা জ্ঞাত হউন (যে আমি এই ভূমি অমুককে দান করিলাম)। এক্ষণে উক্ত গ্রামপতিগণকে পরবর্ত্তী কালের মণ্ডলের পিতামহস্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেও, শতপতি, সহস্রপতি প্রভৃতি হইতে এইরূপ ক্ষুদ্র রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কথিত রাজন্যগণের অনেকেই অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাধীন রাজগণের বংশধর, কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাচীন স্বাধীন রাজগণের আবার এই দেশপতিগণ হইতেই উৎপত্তি। পূর্ব্বকালে সমগ্র ভারতেই এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই প্রাদেশিক ক্ষুদ্র রাজগণ যখন এক জন পরাক্রান্ত নৃপতি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া তাঁহার শাসনাধীনে আসিতেন, তখন তাঁহারা কোথাও বা বিজেতা রাজার করদ হইয়া পড়িতেন, কোথাও বা কেবল অধীনতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন। বিজেতা রাজা চক্রবর্ত্তী বা মণ্ডলেশ্বর নামে পরিচিত হইতেন। বিজিত ক্ষুদ্র রাজগণের উচ্ছেদ হিন্দুধর্ম্ম বা স্বভাবের অনুমোদিত নহে। ইহা সুযুক্তিরও বিরোধী; সেই জন্যই বিচার ও রাজকর আদায় প্রভৃতি কার্য্য এইরূপ বিজিত ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণের হস্তে ছিল। পরবর্ত্তী পাঠান নৃপতিগণও এই শ্রেণীর ভূম্যধিকারিবর্গকে বিতাড়িত করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন নাই। স্থলবিশেষে আবার ঐরূপ উচ্ছেদ একেবারে অসম্ভব ছিল। জেতা পাঠানগণ দেশীয়গণের তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য, সুতরাং নিজ শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রায় সর্ব্বদাই যোদ্ধৃবেশে রাজধানীর সমীপস্থ প্রদেশেই আবদ্ধ থাকিতে হইত। প্রতাপবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই দূরস্থ প্রদেশে বাস বা রীতিমত অধিকারবৃদ্ধির

---

(১) Journal As. Society—vols vii, LXV.

সুবিধা বহুকাল ঘটিয়া উঠে নাই। সেই জন্য প্রাচীন রাজগণকে আংশিকরূপে শাসনাধীনে আনিয়া তাঁহাদের দ্বারাই রাজস্ব আদান প্রভৃতির সুবিধা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ আয়ত্ত ভূভাগে কথঞ্চিৎ কোন হিন্দু ভূম্যধিকারীর নিঃসন্তান পরলোক হইলে সুবিধামত মুসলমান জায়গীরদার প্রবেশ করান হইতেছিল মাত্র। অনেক স্থলে মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে হিন্দু জমিদারই বিচারবিতরণ ও রাজস্ব আদায় প্রভৃতি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে এ কালে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে মুসলমান রাজ, বা তাঁহার জায়গীরদার কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজার প্রাপ্য অংশ সময়ে পৌঁছাইয়া দিলেই হিন্দু ভূস্বামীর নিষ্কৃতি;—ইহাও সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হইত না; সে কথা আমরা পরে বলিব।

এই সময়ে বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ সম্ভব, প্রাচীন কাল হইতেই রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামিগণ 'ভৌমিক' নামে অভিহিত হইতেন। ভাষা কথায় ইহাঁদিগকে 'ভুইয়াঁ' বলিত। কিম্বদন্তী এই যে, সমগ্র বঙ্গ এককালে বার ভুঁইয়ার মুলুক বলিয়া পরিচিত ছিল। কেহ কেহ বলেন,—ভাগীরথী ও পদ্মাদির মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার ব-দ্বীপ-ভাগেই "দ্বাদশ ভৌমিক" নামে খ্যাত ভূস্বামিগণ বর্ত্তমান ছিলেন। (১) কিন্তু এরূপ অনুমানের বিশেষ কোন কারণ নাই। বৌটন বাউস্ সাহেব বলেন, (২) "আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ দ্বাদশ জন্ ভুঁইয়ার অধীন ছিল; তন্মধ্যে পাঁচ জন দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন।" ডাঃ ওয়াইজ্ বলেন, (৩) "মুসলমান ইতিহাসের একস্থানের উল্লেখ ও কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, এই ভৌমিকগণ অন্তনিরপেক্ষ অর্দ্ধস্বাধীন ভূস্বামী ছিলেন। ইহারা উত্তরাধিকারক্রমে ভূসম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেন। ইহাদের সৈন্য, রণতরী,—কাহারও বা দুর্গাদি ছিল। অনেকাংশে তাঁহারা জায়গীরদার ও চাকলাদারগণের সদৃশ ছিলেন। তাঁহাদের অধীনে চৌধুরীগণ। ওয়াইজ পাঁচ জন ভৌমিকের বিবরণ দিয়াছেন। কেহ কেহ দ্বাদশ ভৌমিকের নামও করিয়াছেন,—কিন্তু সেগুলি সমসাময়িক নহে, সুতরাং তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অনেকে আবার আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদারপ্রধানগণকেই ভৌমিক বলিয়াছেন। যাহা হউক, এই ভৌমিক বা হিন্দু

(১) Col. wilford. Asiatic Researches vol xiv. p. 451.
(২) Dissertations—Boughton Bouse.
(৩) Journal As. Society, Vol XLIII, pp 197—214.

জমিদারগণ যে মুসলমানদের অধীনে অর্দ্ধস্বাধীন করদমাত্র ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, সার জর্জ ক্যাম্বেল্ প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণের মত এই যে, যখন মুসলমানের প্রবল প্রতাপ, সে সময়ে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামীর অস্তিত্বই ছিল না। রাজকীয় ক্ষমতার হ্রাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের উৎপত্তি—এই তাঁহাদের মত; অরাজক অবস্থায় দিল্লীশ্বরের প্রতাপ যখন নামে মাত্র বর্ত্তমান ছিল, সেই সময়ে আবার প্রাচীন হিন্দু-প্রথামত সামান্ত সামান্ত ভূস্বামীর উদয় হয়;—এই সমস্ত রাজগণ ও সামন্তবর্গ হইতে বর্ত্তমান জমিদারের উৎপত্তি। মুসলমান আমলের রাজস্ব-আদায়কারী ক্রোরী প্রভৃতি কর্ম্মচারী হইতে পরবর্ত্তী জমিদারশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, অনেকে এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) এই শ্রেণীর লেখক তার্কিকগণের ভ্রম এই যে, তাঁহারা অন্ত দেশের বা ভারতবর্ষের অন্তান্ত ভাগের মুসলমানী বন্দোবস্তের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ প্রয়ো[illegible]রিতে চান। বাঙ্গলায় মুসলমান রাজ পূর্ব্বপ্রথারই অনুসরণ করেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা ভিন্ন গত্যন্তরও ছিল না।

দেশীয় ইতিহাসে সম্রাট্ আলাউদ্দীন ও ফিরোজ শাহার রাজ্যকালে জমিদারী বন্দোবস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময়ে জমিদারগণকে 'চৌধুরী' নামেই পরিচিত দেখিয়া অনুমান হয়, প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজগণ তখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খ্যাতনামা সের শাহ, রাজ্যের অন্তান্ত প্রদেশের ন্তায় বাঙ্গলায় রাজস্ব-বন্দোবস্তে সুশৃঙ্খলাস্থাপনের জন্ত প্রতি পরগণায় এক এক জন রাজকীয় আমিন, শীকদার, কারকুণ প্রভৃতি নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই এ দেশের ভূমি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় মুসলমানরাজ সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তার্পণ করেন, দেখা যায়। যাহাতে চৌধুরী, মণ্ডল বা রাজকীয় আমিন প্রভৃতি প্রজার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে না পারেন, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। রাজপথে বা নিজ নিজ অধিকারমধ্যে চুরী, রাহাজানী প্রভৃতি নিবারণ জন্ত এই সময় হইতেই প্রথম জমিদারগণকে মুসলমানরাজের নিকট জবাব্দিহী করিতে হইল। (২) স্বনামখ্যাত আদর্শ নৃপতি আকবর শাহের সময় হইতে বঙ্গের জমিদারী বন্দোবস্তের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই বাঙ্গলায়

---

(১) Campbels' Cobden Club essay, &c.

(২) Tarikhi Firojshahi and Shershahi in Elliot's History of India.—Vols III. IV.

দিল্লীশ্বরের প্রতাপ বদ্ধমূল হয়; সুতরাং জমিদারগণের সহিত তখন হইতেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কানুনগো ও ক্রোরী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা জমিদারবর্গের একাধিপত্যের সঙ্কোচও এই সময় হইতে আরব্ধ। সুপ্রসিদ্ধ আইন-আকবরীপ্রণেতা মহাত্মা আবুল ফজল লিখিয়াছেন, বঙ্গের জমিদারগণ প্রায়ই কায়স্থ। তাঁহাদের সৈন্যবল দেখিয়া তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সহজেই অনুমিত হয়। (১) এই সময়ের অন্বর্থনামা, বঙ্গজকায়স্থকুলগৌরব, 'যশোর-নগরধাম' মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙ্গলায় কে না জানে? এই-রূপ রাজা ও ভৌমিক ভিন্ন, আসাম, ত্রিপুরা, কুচবেহার, বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন রাজগণের বিবরণও পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ বা পরবর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধপরাজিত হইয়া আধুনিক করদ বা মিত্ররাজ্যের ন্যায় আংশিকভাবে মোগল শাসনের অধীন হন; কেহ বা এতই বলশালী ছিলেন যে, তাঁহারা কখনই সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কোথাও বা বহিঃশত্রুর আগমন হইতে প্রত্যন্ত দেশ রক্ষার জন্য ইহাদের এই স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া মুসলমানরাজ উচিত বোধ করেন নাই। আভ্যন্তরীণ কোন কোন রাজাও স্বীয় বাহুবলে সময়ে সময়ে স্বাধীন ব্যবহার আরম্ভ করিতেন। এইরূপ অর্দ্ধস্বাধীন রাজবর্গের স্বকীয় দরবার ছিল, সৈন্যবল বা সৈন্যসংগ্রহ করিবার ক্ষমতাও প্রচুর ছিল। রাজ্যমধ্যে প্রজাবর্গের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার, ইহারা স্বয়ং, বা নিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা, নির্ব্বাহ করিতেন। এবং হিন্দুস্বভাবসুলভ ব্যবহার অনুসারে, এই সমস্ত অধিকারই তাঁহারা উত্তরাধিকারক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেন। এ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গেল, তাহাতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, উল্লিখিত বঙ্গীয় জমিদারবর্গের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করা বড় সহজ নহে। ইহাদের মধ্যে নানা শ্রেণীর ক্রমবিভাগ, স্বত্ব ও স্বাধীনতা দেখা যায়। পার্ব্বতীয় বা দূরস্থ প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজগণ মুসলমানের সৈন্যবলে ত্রস্ত হইয়া সময়ে যৎকিঞ্চিৎ কর, কোথাও বা উপহারমাত্র প্রদান করিতেন। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজারা বা সীমান্তরক্ষক সামন্তেরা নিজ নিজ সাহস ও বিক্রম অনুসারে দেয় রাজস্ব যথাসাধ্য অল্প করিবার প্রয়াস পাইতেন। কেবল আভ্যন্তরীণ সামান্য ভূম্যধিকারবর্গই নিয়মের অধীন ছিলেন। কিন্তু ইহাদেরও একালের 'মহারাজা' অপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গ কখনই প্রকৃতপ্রস্তাবে মুসলমানে-

(১) Anie Akbar: Vol II. Col. Jarret.

শাসনাধীন হয় নাই। মুসলমান অধিকারস্থাপনের শত বর্ষ মধ্যেই (চতুর্দ্দশ শতাব্দী) বঙ্গীয় মুসলমান নৃপতিগণ দিল্লীর অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন। তখনও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজ বংশধর বিরাজ করিতেছিলেন। সুতরাং সে সময়ে প্রত্যন্ত ও আভ্যন্তরীণ সামন্ত ও রাজগণের সহিত সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া রাজ্যশাসন মুসলমানরাজের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ও দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য, ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতাই সম্পূর্ণ কার্য্যকর হইত। অধিকন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একবংশীয় মুসলমান রাজগণের সিংহাসনে স্থির থাকিবার অবকাশ ঘটে নাই। ক্রমাগত বিপ্লবের কালে দেশীয় অধীন রাজগণের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা ছিল না। এইরূপ বিপ্লবের অবকাশেই একবার উত্তরাঞ্চলের রাজা গণেশ (কংস ?) যবনের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে সক্ষম হন। কিন্তু নানা কারণে (বকল সাহেবের মত সমীচীন হউক বা না হউক) হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির সমবেত চেষ্টা বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং এ হিন্দু-অভ্যুত্থান অচিরেই ধূলিসাৎ হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ মোগল পাঠানের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়ে; এখন দুই দলই দেশীয় জমিদারগণের সাহায্যলাভের জন্য লালায়িত। সুতরাং এই সুযোগে ইহাদের পুনরুত্থানের কিছু সুবিধাই হইল, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের মত কেহ কেহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেও, মোগল সম্রাটের বিপুল বলের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সেই সামান্য চেষ্টা বিফল হইল। অধিকন্তু মোগলকুলতিলক আদর্শ নৃপতি আকবর শাহ হিন্দু সেনাপতিগণের সাহায্যেই দেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং জমিদারবর্গের প্রতিকূলশক্তি দিল্লীশ্বরের প্রভাব ও কৌশলজালে সংযত হইয়া রহিল। এই সমস্ত কারণেই অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙ্গলায় রাজস্ব-বন্দোবস্ত সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হয় নাই। জমি-মাপের ত কথাই নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী কাগজ দেখিয়া যে 'আসল জমা-তুমারী' প্রস্তুত হয়, সে অনুসারেও রাজস্ব আদায় হয় নাই। চারি শত বর্ষের পর আবার দিল্লীশ্বরের জয়পতাকা উড়িল বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশ মোগলের অধীন হইল না। জমিদারগণ সুবিধা পাইলেই গলবদ্ধ রজ্জু উন্মোচন করিবার অবসর ত্যাগ করিতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গভূমি সর্ব্বদাই অন্তর্জাতীয় বিরোধে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। পরাজিত পাঠানগণ পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বারম্বার প্রয়াস পাইতে লাগিল; মগ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর হস্ত

হইতেও দেশ সর্ব্বথা নিরাপদ ছিল না। এই অবকাশে প্রত্যন্ত সামন্তগণের কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্র জমিদারগণও সময়ে সময়ে আবদার আপত্তি আরম্ভ করিতেন; মোগল শাসনকর্ত্তাদিগকে সর্ব্বদাই ত্রস্ত থাকিতে হইত। অতঃপর সাজাহানের শেষ দশায় তাঁহার কৃতী পুত্রগণ সিংহাসন লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। তখন সাসুজা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা; সুতরাং এই গৃহবিবাদের তরঙ্গ এখানেও প্রসারিত হইয়াছিল।

আরঙ্গজেব ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার পর সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই একটা শৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বকীয় কূটনীতির পরিচালনায় আরঙ্গজেব যখন যুগব্যাপী দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধে পিতৃপিতামহের সঞ্চিত প্রচুর অর্থ সহ সমীচীন রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শিরা পর্য্যন্ত শোষণ করিতেছিলেন, সেই সুযোগে প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির সর্ব্বত্রই বিদ্রোহ বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। বর্দ্ধমানের এক জন সামান্য তালুকদার শোভা সিংহ বঙ্গে বিদ্রোহের নায়ক;—অতি কষ্টে বিদ্রোহ দমিত হইল; কিন্তু দেখা গেল, সর্ব্বত্রই অশান্তি ও অব্যবস্থা বিদ্যমান। এই জন্যই আরঙ্গজেব সুবিখ্যাত রাজস্বতত্ত্বজ্ঞ মুর্শিদ কুলী খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া, ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় পাঠান। আকবরের সময় হইতেই রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রভৃতির জন্য সুবাদারের সহকারীরূপে দেওয়ান-নিয়োগের প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। (১) কূটনীতিজ্ঞ আরঙ্গজেব এই দুইটি পদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করিয়া পরস্পরের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে সংযত করার ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্ব্বে নিজ পৌত্র আজিমশ্বানকে শান্তিস্থাপন জন্য সুবাদার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এক্ষণে সুব্যবস্থা জন্য মুর্শিদ কুলী প্রেরিত হইলেন। এই মহাত্মা দাক্ষিণাত্যনিবাসী কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বংশধর। বাল্যে মুসলমান বণিকের ক্রীতদাসরূপে পারস্যদেশে লালিত হন; পরে দেশে প্রত্যাগত হইয়া নিজ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে হায়দরাবাদের দেওয়ানী পদে উন্নীত হন। রাজস্ববিষয়ে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা নিবন্ধন ইনি অচিরেই গুণগ্রাহী আরঙ্গজেবের অনুরাগভাজন হয়েন। বঙ্গে আসিলে সাহজাদা আজিমশ্বান নূতন দেওয়ানের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইলেন।

(১) সাধারণতঃ অনেকের সংস্কার এই যে, বাঙ্গলা অধিকারের পর রাজা তোডর মল্ল অন্য প্রদেশের মত এখানেও জরিপ করিয়া জমাবন্দী প্রস্তুত করেন। কিন্তু এটি ভ্রমমাত্র। আইন-আকবরীতে এ বিষয়ের পরিষ্কার উল্লেখ না থাকাই এই ভ্রমের কারণ।

প্রবাদ এই যে, মুর্শিদের প্রাণবধের জন্ত কয়েক জন সৈনিক পুরুষ যুবরাজের ইঙ্গিতে পথিমধ্যে বেতনপ্রার্থনাচ্ছলে হাঙ্গামা উপস্থিত করে। (১) যাহা হউক, অতঃপর ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁ আপন অফিস ঢাকা হইতে উঠাইয়া মুকসুদাবাদে লইয়া আসেন;—পরে তাঁহার নাম-অনুসারে নগরের নাম মুর্শিদাবাদ হয়। মুর্শিদাবাদ বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত; এখান হইতে চতুর্দ্দিকের বন্দোবস্ত ও তত্বাবধানের বিশেষ সুবিধা; এই জন্ত প্রধান প্রধান জমিদার ও কানুনগোগণের পরামর্শে তিনি এই স্থানটিই মনোনীত করেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বঙ্গের রাজস্ব বন্দোবস্তেও এতদিন বড়ই গোল ছিল। একে ত বঙ্গভূমি অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর, রাজধানী হইতে বহুদূরে বলিয়া ভাল লোকে দিল্লী হইতে এ অঞ্চলে আসিতেই স্বীকৃত হইতেন না, তাহাতে আবার এইরূপ অশাসিত বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশই জায়গীরদারগণের মধ্যে বিভক্ত ছিল, এজন্ত সরকারী রাজস্ব এতই অল্প হইয়া পড়ে যে, অন্ত সুবা হইতে টাকা আনিয়া এখানে সৈন্তাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। এই সমস্ত কারণেই কুলীখাঁর স্তায় এক জন সুবিজ্ঞ রাজস্বসচিবের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তিনিও আশানুরূপ ফল দেখাইয়াছিলেন।

রাজা টোডর মল্লের সুবিখ্যাত বন্দোবস্তে বঙ্গভূমি (উড়িষ্যা ব্যতীত) ১৯টি সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে যে আসল জমা তুমারী প্রস্তুত হয়, তাহাতে সমগ্র রাজস্ব (জায়গীর সমেত) ১০৬৯৩১৫২ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। বাদশাহ সাজেহানের রাজ্যকালে উত্তরপূর্ব্বের কয়টি প্রত্যন্ত প্রদেশ আংশিকভাবে মোগলের আয়ত্ত হয়, উড়িষ্যার বন্দোবস্তও এ সময়েই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছিল; তজ্জন্ত শাহ সুজার শাসনকালে উড়িষ্যা সমেত বর্দ্ধিতায়তন বাঙ্গলার রাজস্ব ১৩১১১৫৯০৭ টাকা স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই টাকা অনেক পরিমাণে কাগজেই ছিল, কোন কালেই সমস্ত আদায় হয় নাই। মুর্শিদ কুলী খাঁ পূর্ব্ব ব্যবস্থার আমূল সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রথম দেও-

---

(১) এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অনেক কারণ আছে, এখানে তাহার সমালোচনা অসম্ভব। যে পারসী গ্রন্থ হইতে রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থকার ও ষ্টুয়ার্ট এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নানা সময়ের প্রবাদ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এক জন দেওয়ানের নগদী সৈন্তের হস্তে প্রাণনাশের কথা ইংরেজ দপ্তরের কাগজে আছে। তিনি কিছু দিনের জন্ত মুর্শিদ কুলীর স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন।—Wilson's annals of the British in Bengal.

রাণী আমলে, তিনি বাঙ্গলার রাজস্বসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ অথচ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী আমিনগণকে প্রত্যেক পরগণার রাজস্ব আদায় করিবার জন্য নিয়োজিত করেন। কিন্তু ইহাতেও ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হন নাই। রীতিমত জরিপ জমাবন্দী করিবার প্রয়োজন, কিন্তু দেশের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং তিনি নিজেও তখন দেওয়ানমাত্র। সুতরাং প্রথমে দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুবাদার ও দেওয়ানী পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই বাদসাহের সম্মতিক্রমে, সুবাদারের ও প্রধান কর্ম্মচারী দুই এক জনের ভিন্ন সকলের অপর সমস্ত জায়গীর ভূমি বাঙ্গলা হইতে উড়িষ্যায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রান্তদেশস্থ জমিদারগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ অধিকারে অশাসিত ভূভাগের সম্পূর্ণ বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, এ সকল স্থানের রাজস্বের ভাগ্যে যাহাই হউক, অন্ততঃ একটা হিসাব পাইয়া অবস্থা জ্ঞাত হইবেন। আভ্যন্তরীণ জমিদারবর্গের মধ্যে যাঁহারা এই বন্দোবস্তে সম্পূর্ণ উৎসাহপ্রকাশ ও সাহায্য করিলেন, তাঁহাদিগকে ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার দিয়া সরকার হইতে সহকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া সেই বন্দোবস্তের সাহায্য করিলেন। যে সমস্ত জমিদার অনায়ত্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে কৌশলে কিছু দিনের জন্য মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্থানে বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ হিন্দু বা মুসলমান আমিন নিযুক্ত করিয়া, সমগ্র ভূভাগে এককালে নূতন বন্দোবস্ত করিবার উপায় বিধান করিলেন। জমিদারবর্গ উপস্থিত থাকিলে এ কার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন, এ জন্যই এই কঠোর ব্যবস্থা। জমিদারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য আপাততঃ নান্‌কর (ভরণ-পোষণার্থ দত্ত) জমি দেওয়া হইল। প্রত্যেক মহাল জরিপ করিয়া রীতিমত জমাবন্দী কাগজ প্রস্তুত হইল। প্রজাবর্গের অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে জমি পত্তনের ব্যবস্থা হইল। দরিদ্র প্রজাগণকে তাগাবী অর্থসাহায্য দিয়া ভূমির উৎকর্ষসাধন চলিতে লাগিল।

এইরূপে অত্যল্পকালেই সমস্ত বন্দোবস্ত সুস্থির হইয়া গেলে, অবাধ্য জমিদারগণকে ব্যবহারের ইতরবিশেষ অনুসারে ক্রমশঃ স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। কাহারও জমিদারীর আয়তন বর্দ্ধিত হইল; মৃত বা নিতান্ত অসাধ্যশাসন ধূর্ত্ত জমিদারগণকে উৎখাত করিয়া তাঁহাদের স্থানে নূতন লোকের সহিত বন্দোবস্ত হইল। এই অভিনব জমিদারশ্রেণীর অনেকেই হয়

সরকারী কর্ম্মচারী—নব বর্দ্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এই শ্রেণীর উৎপত্তি অবশ্য পূর্ব্বাবধিই হইয়া আসিতেছিল। দুই চারি জন ইংরেজ লেখক যে এই সময়েই নূতন জমিদারশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত অনুমানমাত্র। (১) মুর্শিদ কুলী খাঁ নিজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ইচ্ছামত জমিদারগণকে উৎখাত করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা ধৃষ্টতামাত্র। যাহা হউক, পরে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

মুর্শিদ কুলী খাঁ এইরূপে সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া যে কাগজ প্রস্তুত করান, তাহার নাম "জমা কামেল্ তুমারী"। এই পাকা বন্দোবস্তই পরবর্ত্তী জমিদারী বন্দোবস্ত সকলের ভিত্তিস্বরূপ। রাজা তোড়র মল্লের আসল জমা তুমারীতে বাঙ্গলা ১৯টি সরকার বা জেলায় বিভক্ত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে তেরটি চাকলা বা বিভাগে সমস্ত দেশ পুনর্বিভক্ত হইল। ইহার মধ্যে চাকলা হিজলী ও বন্দর বালেশ্বর, উড়িষ্যা হইতে গৃহীত। সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও ভূষণা, এই পাঁচটি পদ্মার পশ্চিমভাগে, এবং অবশিষ্ট আকবর-নগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কারাবাড়ী, জাহাঙ্গীর-নগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট ও ইস্লামাবাদ (চট্টগ্রাম), এই ছয়টি পদ্মার উত্তর ও পূর্ব্বপার্শ্বে। সরকার ও পরগণাগুলির পূর্ব্ব নামই ঠিক থাকিল, এবং এইরূপে সমগ্র বঙ্গে ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় ১৪২৮৮১৮৬ টাকা সদর জমা নির্দ্দিষ্ট হইল। এখানে দেখা উচিত, অধিকারবৃদ্ধির জন্যই এই রাজস্ববৃদ্ধি; নতুবা পূর্ব্বের সহিত তুলনায় জমিদারবর্গের দেয় রাজস্ব বর্দ্ধিত হয় নাই। তবে এই সময় হইতে সমগ্র রাজস্ব কাগজেই শেষ না হইয়া প্রকৃতপক্ষে যাহাতে আদায় পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা হইল। মনে রাখা উচিত, এ সময়ে জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রজার দেয় রাজস্বের যথেচ্ছবৃদ্ধির উপায় ছিল না। পরগণা কানুনগোগণের কাগজে প্রত্যেক পরগণার হার নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই বন্দোবস্ত শেষ হইলে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্তে যে এহতিমামবন্দী প্রস্তুত হয়, এবং যাহা ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাং ১১৩৫ সালে) সুজাউদ্দীনের সময়ে পাকা হয়, কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট সাহেব ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজস্ববিষয়ক বিবরণীতে তাহার বিবরণ দিয়াছেন। গ্রাণ্ট মহোদয় রাজস্ব-সম্বন্ধীয় কাগজপত্র সদর কানুনগোগণের দপ্তর হইতে তাঁহাদের কর্ম্মচারি-

(১) Phillip's Land Tenure—P. 128—29.

গণের সাহায্যে প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে খ্যাতনামা ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সাহেবও ঐ উপায়ে কাগজ পাইয়া নিজ রাজস্ববিষয়ক মন্তব্য লেখেন। সার জন শোর মহোদয়ও এ সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণীর প্রধান আলোচ্য বিষয়ের ঐক্য আছে। (১) সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক। আমরা এই সকল অবলম্বনে সংক্ষেপে প্রধান জমিদারী কয়টির উল্লেখ করিব। জমিদার বংশগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাসবর্ণন বর্ত্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। সংক্ষেপে ইহাদের পূর্ব্ব বিবরণ দিয়া, কুলী খাঁর বন্দোবস্তেরই সবিশেষ উল্লেখ করা হইবে।

এ পর্য্যন্ত মুসলমান শাসনকালে জমিদারী প্রথার যে ইতিহাস বর্ণিত হইল, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, বঙ্গের জমিদারগণকে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রাচীন স্বাধীন ও করদ রাজগণ;—যাঁহারা মুসলমান শাসনের চূড়ান্ত বৃদ্ধির দশায় কোথাও স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে, কোথাও বা আংশিক অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিতেন। প্রত্যন্ত প্রদেশেই ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহারা অধীন হইয়াও স্বরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তে স্বাধীন রাজার মতই ব্যবহার করিতেন।

২। হিন্দু বা মুসলমান সামন্তগণ;—যাঁহারা বিপ্লবের অবস্থায় সুবিধা পাইয়া কোন স্থানে স্থায়িভাবে দখল করিতেন। মুসলমানরাজও ভয়মৈত্রতায় তাঁহাদিগকে বড় বেশী নাড়াচাড়া দিতেন না। ইহারাও প্রথম শ্রেণীর রাজগণের ন্যায় স্বকীয় অধিকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই থাকিতেন। প্রতাপশালী রাজার রাজত্বকালে রীতিমত রাজকর আদায় দিতেন, এবং সুবিধা পাইলেই অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনের অবসর ছাড়িতেন না।

৩। রাজস্ব-আদায়কারী আমিলগণ;—যাঁহারা মুসলমান অধীনে দুই এক পুরুষ কোথাও সাধারণ জমিদারগণের নিকট, কোথাও কোন নাবালক বা মৃত জমিদারের অধিকারে রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্বীয় ক্ষমতার বিস্তার বা অপব্যবহার দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূস্বামিগণের সদৃশ হইয়া উঠিতেন। সুবিধা পাইলেই হিসাবে গোল করা, বা অন্যের জমিদারী সুবিধামত বেনামী প্রভৃতি উপায়ে হস্তগত করা, এই সমস্ত উপায় ইহাদের অস্ত্র ছিল। ইহারা উপবেশন করিবার সুবিধা পাইলে শয়নে শেষ করিতেন।

(১) Fifth Report and Harrington's Analysis.

৪। অর্থশালী ব্যক্তিগণ ;—যাঁহারা বেওয়ারিস মৃত বা ক্রমাগত রাজস্ব আদায় দানে অশক্ত জমিদারগণের জমিদারী অনেক সময়ে ইজারায় আরম্ভ করিয়া শেষে স্থায়িভাবে জমিদার হইতেন। বিদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর কারণ ভিন্ন কথায় কথায় উচ্ছেদ, বা জমিদারী নিলামের সভ্য ব্যবস্থা সেকালে প্রচলিত ছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই চারি শ্রেণীর জমিদারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সহজেই দৃষ্ট হইবে। অনেক ইংরেজ লেখক সমস্ত জমিদারেরই সাধারণ উৎপত্তির একটা কল্পিত কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সাধারণ নিয়ম সর্ব্বথা অন্ধভাবে চালাইলে যে গোল হয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সনন্দ লইবার প্রথা দেখিয়া অনেকে রাজকীয় সনন্দই জমিদারের স্বত্বের ভিত্তিস্বরূপ, এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিব। এক্ষণে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গলার দুই চারিটি প্রধান জমিদারীর উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

বর্দ্ধমান ;—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে আবু রায় নামক এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে বঙ্গে আসিয়া বর্দ্ধমানের চৌধুরীণ পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্র বাবু রায় (কৃষ্ণবাবু) বর্দ্ধমান পরগণা ও সমীপবর্ত্তী তিনখানি মহালের জমিদারী পাইয়াছিলেন। এই বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম ; তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়ের সময়েই পূর্ব্বকথিত চিতোর সর্দ্দার তালুকদার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান জমিদারী লুণ্ঠনে অগ্রসর হন। জনৈক অশান্ত আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিলে, সমবেত বিদ্রোহী সৈন্য সদলবলে বর্দ্ধমান আক্রমণ করে (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে)। অসমসাহসিক রাজা কৃষ্ণরাম বিদ্রোহিগণের সহিত সম্মুখসমরে তাঁহার সামান্য সৈন্যদল সহ পর্য্যস্ত ও স্বয়ং নিহত হন। বিদ্রোহীরা রাজবাটী অধিকার করিয়া রাজপরিবারের অনেককে বন্দী করিল। রাজপুত্র জগৎরাম অনন্যোপায় হইয়া ঢাকার সুবাদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে উল্লিখিত আছে, জগৎরাম এই সময়ে স্ত্রীবেশে পলাইয়া প্রথমে কৃষ্ণনগর-রাজের শরণাপন্ন হন। সুবিখ্যাত 'বিদ্যাসুন্দরের' অমর কবির সমসাময়িক কোন রাজ সভাসদ্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই এই ক্ষিতীশবংশাবলীর রচনা করেন। সুতরাং প্রতিবন্দীর বৈঠকের গাল-গল্প প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। সে যাহা হউক, বর্দ্ধমান ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ,

অনতিবিলম্বেই বিদ্রোহী সৈন্যের করকবলিত হইল। শোভা সিংহ বর্দ্ধমান-রাজকুমারী বীরবালার পবিত্র অঙ্গে পাপহস্ত অর্পণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। অতঃপর রহিমের অধীনে বিদ্রোহী সৈন্য মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও রাজমহল পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অর্থশালী বণিকবর্গের পুষ্পোপচারে সমৃদ্ধ নগর কাশিমবাজারে আর তাহাদের পদধূলি পড়িল না। সুবাদার ইব্রাহিম বিদ্রোহদমনে অশক্ত হইয়া পদচ্যুত হইলেন, কিন্তু তাঁহার দেশত্যাগের পূর্ব্বেই তাঁহার অন্বর্থনামা পুত্র জবরদস্ত খাঁ মুর্শিদাবাদের নিকটে রহিমকে পর্য্যুদস্ত করেন। সাহজাদা আজিমশ্বান বঙ্গে আসিয়া আপন পিতৃপুণ্যে ভাগ্যে ভাগ্যে বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইলেন। এখন জগৎরাম পৈতৃক জমিদারীর সহিত বিদ্রোহী তালুকদারের অধিকৃত ভূসম্পত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কৃষ্ণরামের জমিদারী শত পরগণামাত্রে সীমাবদ্ধ ছিল; মুর্শিদ কুলী খাঁর বর্ত্তমান বন্দোবস্তে, জগৎরামের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে বর্দ্ধমান চাকলার অধিকাংশ, হুগলীর মধ্যে ভুরস্থট ও মুর্শিদাবাদে মনোহরসাহী প্রভৃতি প্রধান জমিদারীর অধিকারী দেখা যায়। ইহার অধিকাংশ ভূভাগই শস্যসমৃদ্ধির জন্য সুবিখ্যাত ছিল, সুতরাং এই অবধি বর্দ্ধমানই বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান জমিদারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। এই বন্দোবস্তে সমুদয়ে ৫৭ পরগণায় ২০৪৭৫০৬ টাকা সদরজমা নির্দ্দিষ্ট হয়। [১১৭৮ সালের খৃষ্টাব্দে ১৭৭২ কোম্পানীর বন্দোবস্তে ৭৫ পরগণায় বর্দ্ধমানের রাজস্ব ৪৩২৮৫০৯ টাকা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ইহাতে সহজেই অনুমিত হইবে; অবশ্য বিপ্লবের সময়ে বাড়িতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল।]

রাজসাহী—(বা নাটোর জমিদারী);—মুর্শিদাবাদের উত্তরপশ্চিমাংশে আধুনিক পাকুড়ের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বতন সরকার উদুম্বর (উদনার) মধ্যস্থিত রাজসাহী পরগণাই আদিম রাজসাহী। (১) মুর্শিদ কুলী খাঁর রাজ্যকালে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ভূস্বামিবংশীয় রাজা উদয়নারায়ণ রাজসাহীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য নবাব সরকার হইতে গোলাম মহম্মদ ও কালী জমাদার নামক দুই জন সেনানী দুই শত পদাতিক সহ নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা প্রাপ্য বেতনের দাওয়া প্রভৃতি ছল করিয়া বিদ্রোহী হয়। নবাব প্রকৃত কারণ নির্ণয় না

(১) Bevarige—The Rajas of Rajshahi—proceedings of the Asiatic Society, January, 1893.

করিয়াই উপস্থিত বিদ্রোহদমন করিবার জন্ত লাহরী মল্ল নামক হিন্দু সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। নাটোর-বংশের স্থাপয়িতা সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন এই বিদ্রোহদমনে সাহায্য করেন, এইরূপ প্রবাদ। (১) আবার ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে লাহরী মল্লের সহযোগী কৃষ্ণনগররাজ বীরপ্রবর রঘুরামের হস্তে গোলাম মহম্মদ হত হন, এইরূপ লিখিত আছে। যাহা হউক, কথিত আছে,—রাজা উদয়নারায়ণ এই গোলযোগে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকায় নবাব তদীয় বিস্তীর্ণ জমিদারী আপন প্রিয় রাজস্বসচিব ও বিশ্বস্ত অনুচর, রাজা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন (১৭১৩ খৃষ্টাব্দে)। রঘুনন্দন কামদেবনামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান—পুঁঠিয়ার সুবিখ্যাত রাজা দর্পনারায়ণের অনুগ্রহে কিরূপে তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন, সে কথা আমরা স্থানান্তরে সংক্ষেপে বলিয়াছি। (২) কুলীখাঁর সুনয়নে পড়িবার পরেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বনগাছী নামক ক্ষুদ্র মহাল জমিদারী পান। পরে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রাণী সর্ব্বাণীর নিঃসন্তান লোকান্তরের পর বিস্তীর্ণ ভাতুড়িয়া জমিদারীও প্রাপ্ত হন। রঘুনন্দন নিজ কার্য্যদক্ষতায় গুণগ্রাহী মুর্শিদ কুলীর এতই শ্রদ্ধাভাজন হন যে, তিনি ভূষণার সুবিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের উচ্ছেদ সাধনের পর তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীরও সিংহযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর যশোহর অঞ্চলের টুনকি স্বরূপপুরের দুই জন মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হইয়া নবাবের ষাট হাজার টাকা রাজস্ব লুণ্ঠন করে—ইহাদের বিনাশের পর এই জমিদারীও রঘুনন্দনী মেলে মিলিয়া যায়। প্রবাদ এই যে, বিদ্রোহী জমিদারদ্বয়ের ও সীতারামের দমন-সময়ে রঘুনন্দন বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি রাজকর্ম্মচারী বলিয়া এই সমগ্র জমিদারীই ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। প্রধান জমিদারী কয়টির যে সনন্দ কয়খানি এক্ষণে নাটোর রাজধানীতে আছে,—তাহার তারিখ ১১২৯ হিঃ (১৭১৭ খৃষ্টাব্দ)। জমিদারী সনন্দ প্রভৃতির কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার অভিলাষ আছে। (৩) এই অবধি রাজসাহী জমিদারী আয়তনে সর্ব্বপ্রধান জমিদারী হইয়া উঠে; ইহার তদানীন্তন পরিমাণ বার

---

(১) Sir John Shore's Report in Harnigton's Analysis.

(২) নাটোর রাজবাটীর সনন্দের প্রতিলিপিগুলি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৩) সাহিত্য—মাঘ ও ফাল্গুন—১৩০২।

হাজার বর্গ মাইলেরও অধিক ছিল ;—অর্থাৎ, চাকলা মুর্শিদাবাদ, ঘোড়াঘাট ও মহম্মদাবাদের অধিকাংশ, বর্ত্তমান রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর প্রায় সমস্তই এবং রঙ্গপুরের অর্দ্ধাংশ, তখন এই জমিদারীর অন্তর্ভূত ছিল। নানা কারণে দেয় রাজকরও অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। সর্ব্বসমেত ১৩৯ পরগণায় এই বন্দোবস্তে ইহার সদর জমা মোট ১৬৯৬০৮৭ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোম্পানীর বন্দোবস্তে দেয় রাজস্ব দ্বিগুণেরও অধিক হয়।

নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর জমিদারী ;—স্বনামখ্যাত ভবানন্দ মজুমদার এই সুবিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে ইনি ১৬০৬ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে উখড়া প্রভৃতি বিংশত্যধিক পরগণায় জমিদারী পান। ভবানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা রঘুরাম মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এক জন সুপ্রসিদ্ধ বীরপুরুষ, রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে ইহার অভিযানের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এ প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও বক্ষ্যমাণ বন্দবস্তে ইহার জমিদারীর আয়তন যে বর্দ্ধিত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সময়ে কৃষ্ণনগর জমিদারীর সর্ব্বসমেত ৭০ পরগণার দেয় রাজস্ব ৫৯৪৮৪৬ টাকা হইয়াছিল। কোম্পানীর বন্দোবস্তে ইহার গতিও অন্যের মতই হয়। দুই চারিটি লাভশূন্য মহাল দ্বারা আয়তনে বর্দ্ধিত হইলেও, বর্দ্ধিত রাজস্বের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (বাং ১১৭২ সালে দেয় রাজস্ব ১০৯৭৫৫৫ টাকা হইয়া উঠে।) খ্যাতনামা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রঘুরামের পুত্র ; তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগর রাজ্যের চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধি, জমিদারীর আয়তন ৮৫ পরগণা হইয়া উঠে। জমিদারী অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, নদীয়া-সমাজপতি বলিয়া কৃষ্ণনগর রাজ্যের সম্মান চিরকালই অন্য কাহারও অপেক্ষা অল্প ছিল না।

দিনাজপুর বা হাবেলী সরকার পিঞ্জরা ;—আকবর সাহের রাজত্বের শেষভাগে বিষ্ণুদত্তনামা জনৈক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কানুনগো নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুরে বাস করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত চৌধুরী সাজাহানের রাজ্যকালে সাহ সুজার বিশেষ প্রীতিভাজন হন ও দিনাজপুর জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। তাঁহার দৌহিত্রবংশীয়েরা দিনাজপুরের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজোপাধি এবং বাদসাহের নিকট বিশিষ্ট সম্মানাদি প্রাপ্ত হন। মুর্শিদকুলী খাঁর এই বন্দোবস্তসময়ে রাজা রামনাথ বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এক জন সুবিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। জমিদারীর সুব্যবস্থা করিয়া ইনি প্রচুর

অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য প্রবাদ আছে, প্রাচীন বাগরাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রস্বামী ও পুত্রচতুষ্টয়ের গল্পের মত তাঁহার অর্থ মৃত্তিকা হইতেই উঠে। নিজ জমিদারীর আভ্যন্তরীণ সমস্ত বন্দোবস্ত ও বিচার প্রভৃতির ভার ইঁহার হস্তে স্থায়িভাবেই প্রদত্ত হয়। ইঁহার সুব্যবস্থাগুণে দিনাজপুর জমিদারী পূর্ব্বপ্রথামত আমিন বা ক্রোক সাজোয়ানের হস্তে কখনও পড়ে নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ অনেক সময়ে ইঁহার নিকট ঋণস্বরূপ অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেন, ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে ৮৯ পরগণার ইহার সদর মালগুজারী ৪৬৯৬৪ টাকা ছিল। ইংরেজী আমলে দ্বিগুণে উঠিয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ নিয়মের এখানে ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

উল্লিখিত চারিটি প্রধান জমিদারীর প্রত্যেকেরই মুসলমানী আমলে উৎপত্তি এবং ইহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট ও ত্রিপুরার প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নিকট বাদশাহী পেসকশ্ স্বরূপ সামান্য কিছু গ্রহণ করা হইত। তাঁহারা আবার ভাল ভাল খেলাৎ ও পুরস্কার পাইতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের স্বাধীন ব্যবহারই ছিল, কুলী খাঁর পূর্ব্বে তাঁহারা ভাল করিয়া মুসলমানের আয়ত্তই হন নাই। ত্রিপুরা এই সময়েই প্রথমে কথঞ্চিৎ শাসনে আইসে। রুকনপুর কানুনগোই জমিদারী, ইউসুফপুর বা যশোহর জমিদারী, ফতে সিংহ, পুঁটিয়া, মহম্মদসাহী, ইত্রাকপুর, এই ছয়টি প্রধান জমিদারী। অতঃপর উল্লেখযোগ্য এই কয়টিও এ আমলে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। সমস্তই হিন্দু জমিদার। ইহা ভিন্ন শ্রীহট্ট, বালেশ্বর, তমলুক, জলামুঠা, মুজামুঠা, (মহিষাদল প্রভৃতি) কাঁকজোল (রাজমহল) ইত্যাদি স্থানের জায়গীর ভিন্ন সমস্ত ভূভাগ, পূর্ণিয়ার অধিকাংশ, ঢাকার অনেক ক্ষুদ্র মজকুরী জমিদারী হিন্দু জমিদারগণেরই অধীন ছিল। বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে একমাত্র বীরভূমিতে প্রাচীন মুসলমানবংশীয় জমিদার দেখা যায়; অন্যত্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদারের সংখ্যাও অতি অল্প। মোটের মাথায় এক আনা রকম মুসলমান জমিদারের অধীনে দেখা যায়। এই জমিদারী বন্দোবস্তই মুর্শিদকুলী খাঁর কীর্ত্তি, আবার ইহাতেই তাঁহার কলঙ্ক-প্রবাদ। কঠোর হস্তে রাজকর আদায়ই তাঁহার কলঙ্কের প্রধান কারণ। কয় জন কঠোর স্বভাব লোক সংসারে যশোলাভ করিয়াছেন?

দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট ?

দুর্ভিক্ষই বল আর অন্নকষ্টই বল, আমাদের পক্ষে উভয়েরই ফল সমান,— অপমৃত্যু! আমরা কৃষিব্যবসায়ী শ্রমজীবী দুর্ব্বল জাতি; দিনান্তে নিতান্ত পক্ষে একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিলে, কয় দিন বাঁচিব? সেই অন্ন— দরিদ্রের দিনান্তের মুষ্টিভিক্ষা,—তাহাও আর সহজে মিলিতেছে না!

দেশে আর অন্ন নাই! ধনধান্যভরা বসুন্ধরা এবার অনুর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে; আকাশে মেঘ নাই, নদনদীতে জলপ্লাবন নাই, পৌষের পার্ব্বণদিনেও কৃষাণের গৃহপ্রাঙ্গন 'হায়! হায়!' করিতেছে।

দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব! যে দেশ "ধরিত্রীর রত্নভাণ্ডার" বলিয়া চির-পরিচিত, সে দেশ যে দিনে দিনে এত দূর কাঙ্গাল হইয়া পড়িবে, তাহা কে জানিত? আমরা কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি—সে কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই! রাজা প্রজা সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আমরা দুর্ভিক্ষের জন্যই এমন কাঙ্গাল হইয়া পড়িলাম, অথবা আমরা কাঙ্গাল বলিয়াই দুর্ভিক্ষ আমাদের কণ্ঠলগ্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এ দেশে আজকাল যে চাঁদে চাঁদেই দুর্ভিক্ষ হইতেছে, সে বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ নাই!

সে বার দুর্ভিক্ষের প্রকোপে উড়িষ্যা উৎসন্ন হইয়া গেল, তাহার কয়েক বৎসর পরেই বিহারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, আরও কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে মাদ্রাজে কালের চিতা জ্বলিয়া উঠিল, বাঙ্গলা কঙ্কালসার হইয়া পড়িল,—ইহাই আমাদের অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস! এবার আবার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম—আসমুদ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!

সেকালেও দুর্ভিক্ষ ছিল; কিন্তু এমন চাঁদে চাঁদে দুর্ভিক্ষ ছিল না। "দুর্ভিক্ষমরণং স্মরণং চিরায়ুঃ"—ইহাই সেকালের পুরাতন প্রবাদ। তখন কালে ভদ্রে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও, দুর্ভিক্ষাবসানে আবার শস্য সুলভ হইত। গত শতাব্দীতে শস্য এতই সুলভ ছিল যে, ইংরাজেরাও অতি যৎসামান্য বেতনে এ দেশে কুঠিয়ালের গুদামসরকারী করিতেন। * এখন আর সে দিন নাই! তখন যাহাকে দুর্ভিক্ষ বলিত, তাহাই এখনকার নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে।

* Long's Selections from the Records of the Govt. of India.

শায়েস্তা খাঁ ও যশোবন্ত সিংহের আমলে টাকায় আট মন চাউল বিকাইত, * তাহা এখন আট সেরে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই পুরাতন ব্যাধির ন্যায় অন্নকষ্ট আমাদের অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই ধারাবাহিক অন্নকষ্টের ইতিহাস রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। রোগের মূল নির্ণয় করাই রোগবিমোচনের প্রথম সোপান। এই নিত্য দুর্ভিক্ষরোগের মূল কোথায়?

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শতাব্দীর ইতিহাস তিন অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায় কোম্পানীর স্বাধীন শাসন; দ্বিতীয় অধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের তুমুল তরঙ্গ; তৃতীয় অধ্যায় ভারতেশ্বরীর সাক্ষাৎ শাসন।

যৎকিঞ্চিৎ লাভের লোভেই কোম্পানী বাহাদুর এ দেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে এ দেশের রাজসিংহাসন কুড়াইয়া পাইয়া যথাসাধ্য শাসন ও শোষণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে গিয়া সিপাহী বিদ্রোহে কোম্পানীর স্বাধীন শাসন উঠিয়া গেল। শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কোম্পানীর রাজ্যের ইতিহাস অশিক্ষিত বাল্যজীবনের ইতিহাসের ন্যায় অনেক শৈশবসুলভ চপলতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দেশে এত শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা ছিল না, দস্যু তস্করের অভাব ছিল না, যুদ্ধ বিদ্রোহের বিরাম ছিল না, দেশে দেশে লৌহবর্ত্ম সুবিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু তথাপি সেই অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সাধারণতঃ টাকায় একমণ চাউল মিলিত।

সিপাহী বিদ্রোহে অল্প দিনের জন্য ভারতবর্ষের কিয়দংশে তুমুল কোলাহল উত্থিত হয়; কিন্তু সেই কোলাহলের অবসানেও লোকে আবার টাকায় এক মণ চাউল পাইয়াছিল।

বিদ্রোহের অবসানে ভারতবর্ষে গৌরবমণ্ডিত নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে; শিক্ষার অরুণ-জ্যোতি ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়াছে, সুশাসনের শাণিত খরসানে দস্যু তস্কর নিরস্ত হইয়াছে, লোকের ধন মান এবং জীবন সম্পূর্ণরূপে আপদমুক্ত হইয়া সংসারসুখ সুলভ করিয়া তুলিয়াছে; সকলই হইয়াছে; কিন্তু হায়! তথাপি কি অদৃষ্টবিড়ম্বনা! এই গৌরবোজ্জ্বল নবযুগে পদার্পণ করিয়াই এ দেশ জরাগলিত কলেবরে দিন দিন যেন অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

---

* Stewart's History of Bengal.

আজ ভারতেশ্বরীর ষষ্টিসাম্বৎসরিকতম মহামহোৎসবের দিনেও আমাদিগের এই করুণ ক্রন্দন!

শান্তির সুখশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিয়াও ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্য দূর হইতেছে না কেন, তাহা সত্য সত্যই সবিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা এখন ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে ঢাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিয়াছে; যেখানে দশ জন সম্মিলিত হইতেছেন, সেখানেই কেবল এই কথার আলোচনা হইতেছে; পার্লিয়ামেণ্টের উৎসাহী সভ্য, ভারতশাসনভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য রাজপুরুষবর্গ, জ্ঞানী মানী ধনী, কত লোকে ইহার জন্য কত ভাবে মস্তিককণ্ডুয়ন করিতেছেন। কিন্তু হায়! আজিও ইহার মীমাংসা হইল না, আবার দুর্ভিক্ষ!

এবারকার দুর্ভিক্ষের কথা ধরিও না। দুর্ভিক্ষ দৈববিড়ম্বনা বলিয়া যাহাদের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস, আজ তাহারা অভাবে পড়িয়া অদৃষ্টকে শতধিক্কার দিয়া কপালে করাঘাত করিতেছে, কিন্তু দুই মুষ্টি অন্ন সঞ্চয় করিতে পারিলে ইহারাই আবার সমস্ত দুঃখ দৈন্য ভুলিয়া গিয়া পিতার শ্রাদ্ধে, কন্যার বিবাহে, শ্যালিকার শুভ সাধভক্ষণে আশাতিরিক্ত অবস্থাতিরিক্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য করিয়া সহাস্যমুখে ঋণজালে জড়িত হইতে ইতস্ততঃ করিবে না!

এবারকার দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যাকুল হইও না; সময় থাকিতে ভারতেশ্বরীর সিংহাসনতলে ক্ষুধার্ত্তের করুণ আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, মাতা অন্নপূর্ণার ন্যায় অভয়বাণী শুনাইয়াছেন, দাসানুদাসেরা অবশ্যই প্রাণপণে প্রজা রক্ষা করিতে ত্রুটি করিবে না। আর তাহারা উদাসীন হইলেই কি ইংলণ্ডের নরনারী আমাদিগকে সহসা লীলাসম্বরণ করিবার অবসর দান করিতে পারে? ইংরাজ অধ্যবসায়শীল স্বার্থরসজ্ঞ বুদ্ধিমান জীব; আমরাই যে ইংরাজ ব্যবসায়ীর পণ্যবীথিকার প্রধান "পাইকের", তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে; তাহারা এমন সরল খরিদদারকে সহজে মরিতে দিয়া আপন পদে আপনি কুঠারাঘাত করিবে না। আমরা না হয় মরিলাম! কিন্তু আমরা মরিলে যে ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইবে, তাঁতযন্ত্রে আরশুলা বাসা বাঁধিবে! অতএব ইংলণ্ডের ধনকুবেরদিগের কল্যাণ হউক,—তাঁহারা যেরূপ মুক্তহস্তে স্বার্থরক্ষার সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সহজে মরিব না। *

* "The Indian Famine Fund has now reached £ 180,000. The cities of Leeds, Bradford, and Birmingham have subscribed £ 2500, £ 1000, and £ 4000 respectively. Lloyds have given £ 3210 and the Oregun,

কিন্তু এমন করিয়া কয় দিন চলিবে? জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া কয় দিন সংসার চালাইব? "ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ",—ইহাই শাস্ত্র-সম্মত উপদেশ। ভিক্ষায় কাহারও কুলায় না, আমাদিগেরও কুলাইবে না; ত্রিশ কোটী নরনারীকে নিত্য ভিক্ষা দিয়া কে কয় দিন বাঁচাইতে পারে?

ভারতবর্ষ যেরূপ সুবিস্তৃত মহাদেশ, ইহার জনসংখ্যা যেরূপ ছিল, কোটী কোটী ভারতবাসী যেরূপ দীন দরিদ্র, তাহাতে নিত্য দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে, ধনকুবের ইংরাজমণ্ডলী চিরদিন দয়া বাৎসল্যে এ দেশের অন্নক্লেশ বিমোচন করিতে পারিবেন না। ভারতভাগ্যবিধাতৃগণের অপরাধ নাই; তাঁহারা যেমন বুঝিতেছেন, সেইরূপ মন্তব্যলিপিতে রাজ-দপ্তর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন। তথাপি ভারতবাসীর অন্নকষ্ট বিদূরিত হইতেছে না! সুতরাং রোগের মূল নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে মহাত্মা জন্ ব্রাইটের উক্তি * স্মরণ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে, এবং রাজপুরুষেরা এ পর্য্যন্তও যাহা কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে।

সে ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় "উড়িষ্যার অন্নকষ্ট!" দুর্ভিক্ষ না বলিয়া অন্নকষ্টই বলিলাম; কারণ, অনেকেই সে সময়ে "অন্নকষ্ট" বলিয়া উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বাক্‌চাতুরীবলে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। স্যর সিসিল বীডন্ তখন বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা; তিনি ক্ষুধার্ত্ত উড়িষ্যাবাসীর হাহাকার উপেক্ষা করিলেন, যথাসময়ে সংবাদ পাইয়াও "দুর্ভিক্ষ নহে, অন্নকষ্ট মাত্র" এই বলিয়া ধুয়া ধরিলেন, স্থানীয় রাজপুরুষেরা তাহাই প্রাণপণে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে গ্রীষ্মকাল কাটিয়া গেল; বর্ষার তরল তরঙ্গে নদনদী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, মুষলধারায় বারিবর্ষণ হইয়া পথ ঘাট

Gold Company £ 1525. The Executive committee of the Manchester Fannise Fund, of which Sir Frank Forbes Adam is Chairman, have collected £ 25,000—The Englishman.

* I must say that it is my belief that if a country be found possessing a most fertile soil, and capable of bearing every variety of production and that notwithstanding, the people are in a state of extreme destitution and suffering, the chances are there is some fundamental erro in the Government of that country.—John Bright.

কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া তুলিল, উড়িষ্যার গমনাগমনপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। যখন ক্ষুধার্ত্ত উড়িষ্যাবাসী সত্য সত্যই বনে জঙ্গলে নদীতীরে সমুদ্রসৈকতে গৃহপ্রাঙ্গনে হাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তখন দুর্ভিক্ষের অস্তিত্বে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তখন আর প্রজারক্ষা করা সহজ হইল না; সরকারী দপ্তরেই প্রকাশ আছে যে, সেবার দশ লক্ষ উড়িয়া অনাহারে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

উড়িয়া মরিল, কিন্তু এই অমঙ্গল হইতেই মঙ্গলবীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। অপমৃত্যুর শোকসন্তাপে ভারতরাজপ্রতিনিধি সিমলাশৈলবিহারী স্যার জন লরেন্স বিচলিত হইলেন, অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইল। ভারতরাজপ্রতিনিধি স্যার জন লরেন্স, ভারতরাষ্ট্রসচিব লর্ড ক্রানবোরন্ এবং সমিতির সভ্য স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের কৃপায়, উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের বহুব্যয়সাধ্য সুবৃহৎ ইতিহাস সঙ্কলিত হইল।

কিছু দিন পরে বিহারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। লর্ড নর্থব্রুক্ তখন ভারতরাজপ্রতিনিধি; তিনি উড়িষ্যার অপমৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া সূচনাতেই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, বিহারে মহা দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়াছে। ডিউক অব্ আরগাইল তখন ভারতের রাষ্ট্রসচিব; তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন;—"যত ব্যয়বাহুল্য হয় হউক, অন্নাভাবে কাহারও যেন অপমৃত্যু সংঘটিত না হয়।" স্যার রিচার্ড টেম্পল সাহেবের কল্যাণে বিহারে সাড়ে ছয় কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গেল, কিন্তু দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল না! লোকে উপহাস করিতে লাগিল;—যাহারা উড়িষ্যার হাহাকারে কর্ণপাত না করিয়া লোকের অপমৃত্যুর পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল, তাহারাই বিহারে অর্থের অপব্যয় করিল বলিয়া চারি দিকে টিট্‌কারী পড়িতে লাগিল;—গবর্মেণ্ট সদুদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিয়াও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন

ইহার পর যখন মাক্রাজে কালের চিতা জলিয়া উঠিল, তখন গভর্মেণ্ট বড়ই সাবধানে সতর্ক দৃষ্টিতে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে—অতি ধীরে—সুবিহিত সতর্ক দৃষ্টিতে,—সুমন্থর মৃদুমন্দ গতিতে—দুর্ভিক্ষনিবারণের আয়োজন হইতে লাগিল। লোকে তত দিন দুঃখ ক্লেশ বহন করিতে পারিল না; তাহারা রোগে শোকে অনাহারে হাহাকারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল!

ভারত দুর্ভিক্ষের এই সকল বিড়ম্বনা বিদূরিত করিবার জন্য এক 'রয়াল

কমিশনের' সৃষ্টি হয়; তাহার কল্যাণে এখন দুর্ভিক্ষের বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে;—দুর্ভিক্ষের সূচনায়, দুর্ভিক্ষের সময়ে, দুর্ভিক্ষাবসানে, কখন কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এই রাজবিধি সমালোচনা করিবার উপযুক্ত অবসর শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। এখন কেবল ইহাই বুঝিতেছি যে, 'দুর্ভিক্ষ' সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে বলিয়া রাজপুরুষেরাও বুঝিয়াছেন, নচেৎ তাঁহারা দুর্ভিক্ষের জন্য রাজবিধি সঙ্কলন করিতেন না।

রাজপুরুষদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রমসঙ্কুল নহে;—ভারতবর্ষ যেরূপ বহুবিস্তৃত মহাদেশ, এ দেশে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি শস্যনাশের হেতু সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। এ দেশে প্রতি বৎসরেই কোন না কোন্ প্রদেশে শস্যহানি-জনিত অন্নক্লেশ সমুপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং দুর্ভিক্ষনিবারণের স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি করিবার জন্য গভর্মেণ্ট নূতন রাজকর সংস্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। লোকে বুঝিল না,—অনেকে অনেকরূপ কটু কাটব্য করিতে লাগিল, কেহ কেহ গভর্মেণ্টের সাধু সঙ্কল্পের প্রতিবাদ করিয়া লর্ড লিটনকে বিরক্ত করিয়া তুলিল; লোকের কিরূপ কুসংস্কার, তাহারা ভাবিল যে, গভর্মেণ্ট হয় ত দুর্ভিক্ষের ধুয়া ধরিয়া টেক্স বসাইয়া অন্য কার্য্যে তাহার অপব্যয় করিয়া ফেলিবেন। গভর্মেণ্ট এই অমূলক আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য প্রকাশ্যে মন্তব্যলিপি প্রচার করিয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন:—

"The sole justification for the increased taxation which has just been imposed upon the people of India for the purpose of ensuring this Empire against the worst calamities of future famine, so far as an insurance can now be practically provided, is the *pledge* we have given *that a sum not less than a million and a half sterling*, which exceeds the amount of the additional contributions obtained from the people for this purpose, *shall be annually applied to it.*"*

সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে, ১৮৭৮—৭৯ হইতে ১৮৯৩—৯৪ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসরে প্রায় ১৭৪২৯৫৯২ টাকা দুর্ভিক্ষ-তহবিলে সংগৃহীত হইয়াছে। লর্ড লিটনের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা অনুসারে বৎসরে দেড় কোটি টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে পৃথক রাখিবার কথা ছিল। সুতরাং এই ষোল বৎসরে অবশ্যই ২৪ কোটি টাকা দুর্ভিক্ষ-তহবিলে জমা পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বাজার দরে বৎসরে ২৪০০০০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ-তহবিলে জমা হওয়া উচিত। তন্মধ্যে

* Minute of Lord Lytton, 12th March, 1878.

১৬০০০০০০ টাকা মাত্র গভর্মেণ্ট বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষনিবারণোদ্দেশে ব্যয় করার কথা শুনা যাইতেছে;—অবশিষ্ট টাকা কি হইল?

হিসাব লইবার চেষ্টা করা বৃথা। তহবিলের টাকা তহবিলেই থাকুক, আর অন্য কোন অবশ্যপ্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাক, এ সময়ে তাহার আলোচনা করিয়া বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তহবিলে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত থাকিলেই বা কি হইত? দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে টাকায় তাহার গতিরোধ করা যায় না;—আয়োজন অনুষ্ঠান করিতে করিতেই কত লোক মানবলীলা সম্বরণ করে। যখন দুর্ভিক্ষ-তহবিলের সৃষ্টি হয় নাই, তখনও লোক মরিয়াছে; এখন যে দুর্ভিক্ষ তহবিল আছে, দুর্ভিক্ষের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এ দেশে এবং বিলাতে চাঁদা উঠিতেছে, এখনও লোক মরিতেছে! দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে সাময়িক অর্থভাণ্ডার লইয়া দুর্ভিক্ষে প্রজা রক্ষা করা অসম্ভব।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান;—অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই কৃষক। অনেকের ধারণা এই যে, আমাদের কষ্টসঞ্চিত শস্যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,—কেবল সেই জন্যই আমরা প্রচুর শস্যোৎপাদন করিয়াও দু' বেলা দু' মুঠা ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করিতে পারি না; স্বাধীন বাণিজ্যের ছলনা করিয়া বিলাতের লোকে বীজধান্যও তুলিয়া লইয়া যায়। সরকারী কাগজপত্রে কিন্তু ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের ধান্য এবং গোধূমের আদর ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, বিলাতের লোকে আর তাহা পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহে ক্রয় করিতেছে না; আমেরিকার কৃষককুল আমাদিগকে কৃষিব্যবসায়ে পরাজিত করিয়াছে। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের শস্য দেশেই অধিক পরিমাণে পড়িয়া থাকিতেছে; * কিন্তু তথাপি অন্নকষ্ট দূর হইতেছে না কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, দেশের লোকের বিলাস-বাসনা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা অর্থোপার্জ্জনের আশায় খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে নীল, পাট প্রভৃতির আবাদে শস্যক্ষেত্র নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। নীল এবং পাটের চাষের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক খাল, বিল, "পয়স্থ" হইয়া ধানের আবাদও ক্রমে বহুবিস্তৃত হইতেছে; সুতরাং আমাদের অন্নকষ্টের মূল কোথায়?

কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই যে, লোকসংখ্যা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে;

---

* এ দেশের চাউল এবং গমের রপ্তানি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ক্রমেই কম হইতেছে; আমেরিকার গম ভারতবর্ষের গমের দর মাটি করিয়া দিয়াছে।

দেশের ধনধান্যে এখন আর দেশের লোকের উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ইংলণ্ডের ধনধান্যে কি ইংলণ্ডের লোকের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে? তবে তাহারা দুর্ভিক্ষে জীবন্মৃত হয় না কেন?

জাতীয় ধনের অবনতি, জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের অধোগতি, দেশীয় লোকের নানারূপ ভ্রম, কুসংস্কার এবং জড়তাই কি আমাদের এইরূপ ধারাবাহিক অন্নক্লেশের যথার্থ কারণ নহে?

শিল্প বাণিজ্যেই জাতীয় ধনের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে জাতির শিল্প বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, তাহারা স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিয়া দেশ বিদেশের ফল শস্য আপন দেশে বহন করিয়া আনিতেছে; স্বদেশে শস্যহানি হইলেও, দুর্ভিক্ষ তাহাদের নিকট ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিতেছে না।

গত বর্ষে আমাদের দেশে ন্যূনাধিক ১১৬৯৪৯০০০ বিঘা ধানের আবাদ হইয়াছিল; পাটের আবাদ ৬৮১৪৮০০ বিঘায় বেশী হয় নাই। এই ১১৬৯৪৯০০০ বিঘায় যদি আশানুরূপ ধান ফলিত, এবং কৃষাণের গৃহস্থালীতে কিঞ্চিৎ মজুদ থাকিত, তবে আর বিগত হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষতিতে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত না। কিন্তু যে দেশের কৃষিকার্য্য নদীর জল এবং আকাশের বর্ষণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সে দেশে এরূপ শস্যহানি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে; ধানের আবাদ শতগুণ বর্দ্ধিত হইলেও বাঙ্গালীর অন্নকষ্ট ঘুচিতে পারে না।

ধানের দাম চড়িয়াছে, লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, শ্রমজীবীদিগের আয় পূর্ব্বের ন্যায় সমানই রহিয়া গিয়াছে;—এরূপ অবস্থায় সামান্য অন্নকষ্টেই লোকের জীবননাশের সম্ভাবনা। কাজেই বাঙ্গালী কাঁদিতেছে,—দু' দিন পরে কাঁদিতে কাঁদিতে দলে দলে জীবনবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইবে!

রূপার দাম কমিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের টাকা আর ষোল আনা নাই, বিদেশের লোকে তাহার ১৩½ পেনীর অধিক মূল্য নির্দ্দেশ করে না। অথচ আমাদিগকে পরিধানের বস্ত্র, রোগের ঔষধ, সন্ধ্যাদীপের দিয়াশলাই কাঠি পর্য্যন্তও বিদেশের কাছে ক্রয় করিতে হয়। এই সকল কারণে আমাদের আয়ের অধিকাংশ ভাগই বিদেশে চলিয়া গিয়া জীবনধারণের জন্য যৎসামান্যমাত্র হাতে থাকে; বাজার মন্দা থাকিলে তাহাতে এক সন্ধ্যার আহার সংগ্রহ হয়; বাজার চড়িয়া গেলে হাহাকার করিতে হয়।

মামলা মোকদ্দমা না করিয়া সংসার চলে না ;—মামলা মোকদ্দমার খরচ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। বিচারক্রয় করিতে গিয়াও আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। যে দিক দিয়া দেখ,—খরচের অঙ্ক বাড়িয়া চলিতেছে, টাকার মূল্য হ্রাস পাইতেছে, আয়ের পথ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে ; সুতরাং দুর্ভিক্ষ আমাদের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে ;—আমরা তাহাকে ছাড়াইতে চাহিলে কি হইবে ? সে আমাদিগকে ছাড়িবে কেন ?

এই নিত্য দুর্ভিক্ষ রোগ দূর করিবার কি কোন সদুপায় নাই ? উপায় চিন্তা করিতে বসিলেই বলি,—গভর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই দূর হইতে পারে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে কি ইহা দূর হইতে পারে না ? আমরা যদি হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি, এবং গভর্মেণ্ট একাকী দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন ফল হইতে পারে না ;—আবার আমরা যদি প্রাণপণ চেষ্টা করি, অথচ গভর্মেণ্ট কিছুই সহায়তা না করেন, তাহা হইলেও কিছুই ফল হইতে পারে না।

জাতীয় ধনবৃদ্ধির জন্য শিল্প বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করাই দুর্ভিক্ষ নিবারণের একমাত্র প্রকৃত সদুপায়। কিন্তু ইহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই সহায়তা আবশ্যক। দেশের শিল্পবাণিজ্য যাহাতে বিদ্ধস্ত না হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি-লাভ করে, তৎকল্পে রাজবিধির সহায়তা চাই। আবার দেশের চিরাগত কুসংস্কার কুরীতি প্রবল হইয়া যাহাতে শিল্পবাণিজ্যের গতিরোধ না করে, তৎকল্পে আমাদিগেরও প্রাণপণ চেষ্টার আবশ্যক।

শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে 'অসভ্য জাপানের' ন্যায় 'সুসভ্য ভারতবাসীকেও' দেশবিদেশে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে। আমরা ঘরে পড়িয়া মরিব, সময়ে অসময়ে গভর্মেণ্টকে লক্ষ্য করিয়া কটুকাটব্য কহিব, কিন্তু সমুদ্রযাত্রা—সর্ব্বনাশ! সাধ্যসত্ত্বে কাহাকেও তাহাতে উৎসাহ-দান করা দূরে থাকুক, পারি ত তাহাকে বিবিধবিধানে নির্য্যাতন করিয়া 'আদর্শপূর্ণ মনুষ্যের লীলাভূমি' আর্য্যাবর্ত্তে বাঁধিয়া রাখিয়া দুর্ভিক্ষে অনাহারে সদলবলে জীবন বিসর্জ্জন করিব! আমাদিগের নিত্য দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদ করিবে কে ?

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ন্যানসেনের মেরুভ্রমণ।

সুমেরু প্রদেশ আবিষ্কার চেষ্টায় গমনের জন্ত ন্যানসেনের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত,—সভ্য জগতে আজ তাঁহার অতুল প্রশংসা। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যে দেশের সর্ব্বপ্রধান কবি মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দেশের পাঠকগণ কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে, কেবল ইংরাজী সংস্করণের জন্ত ন্যানসেন দশ সহস্র পাউণ্ড পাইয়াছেন। সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্ত কতকগুলি প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার জীবনী ও কার্য্যের কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। *

মেরু প্রদেশ চিরদিন অজ্ঞেয় রহস্তে পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। অনন্তপ্রসারিত অমলধবল তুষারবসনাবৃত সেই প্রদেশ, জগতের আদিকাল হইতে এক প্রাণহীন মহাস্বপ্নে অভিভূত ছিল,—সেখানে মানবের পদধূল আপনার কলঙ্কচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—সেই তুষারশয়নে শয়ন করিয়া সুমেরু তাহার যুগব্যাপী মহাস্বপ্নে ব্যাপৃত ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া কেহ সে স্বপ্ন ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে নাই। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত, মানবের জ্ঞানপিপাসা আরও বর্দ্ধিত হইতেছে; তাই অজ্ঞেয় রাজ্যের সীমাও অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে প্রকৃতির তুষার-মন্দির সুমেরু ভিন্ন সর্ব্বত্র মানবের বুদ্ধি অব্যাহতভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল। কেবল মেরু প্রদেশে তুষার ও জলমটিকায় সমাচ্ছন্ন রহস্ত অজ্ঞেয় রহিয়া গেল—মেরু প্রদেশে ভ্রমণকারীদিগের সকল চেষ্টা বিফল হইল, সেখানে জ্ঞানপিপাসু ভ্রমণকারীদিগের শ্মশান স্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু এত দিনে ন্যানসেন প্রমাণ করিয়াছেন যে, সুমেরু-ভ্রমণ অসাধ্যসাধন নহে।

মেরু প্রদেশ।

ন্যানসেনের জীবনচরিতের ইংরাজী অনুবাদক মিষ্টার আর্চার তাঁহার নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনসম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া তিনিই এখন বলিতেছেন যে, পূর্ব্বদৃষ্টি, কৌশল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকিলে, মেরুপ্রদেশভ্রমণ ডোভার প্রণালী অতিক্রম অপেক্ষা অধিক সঙ্কটসঙ্কুল নহে।

ন্যানসেন।

ন্যানসেন বংশ চিরদিনই অসমসাহসী, দুঃসাহসিক কার্য্যপ্রিয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ন্যানসেন বংশের এক জন রুশ সম্রাটের জন্ত শ্বেত সাগরের উপকূলভাগ পরিদর্শন করেন। তৎপরবর্ত্তীগণ স্বদেশের বিপদসঙ্কুল রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। ন্যানসেনের পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রক্ষণশীল ও সেকেলে ধরণের লোক ছিলেন। তিনি বালকদিগকে কোনরূপে বিলাসী হইতে দেন নাই। সন্তানগণ নিজ খরচ বাবদে অল্প যাহা কিছু পাইত, তাহাদিগকে তাহার আবার পুরা হিসাব দাখিল করিতে হইত।

ন্যানসেনের বাল্যজীবন গ্রেট ফ্রোয়েনে অতিবাহিত হইয়াছিল। সেখানে সেই তুষাররাশি দেখিয়াই বালক ন্যানসেনের হৃদয়ে প্রথম দিগন্তভ্রমণস্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্রিশ্চিয়ানার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ন্যানসেন সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, কিন্তু প্রাণিতত্ত্বশিক্ষার জন্ত তিনি সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক কলেটের পরামর্শানুসারে পিতার অনুমতি লইয়া ন্যানসেন প্রথম মেরু প্রদেশে যাত্রা করেন। মেরু প্রদেশের প্রথমদর্শনবর্ণনা আমরা ন্যানসেনের ডায়েরী হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা নরওয়ে হইতে ক্রমাগত সাত দিন উত্তরাভিমুখে চলিলাম। উত্তর

প্রথম যাত্রা।

তখন সাগরসলিলে বহুসংখ্যক তরী ভাসিতেছিল ; সেই সকল তরণী আবার সাগরসমীর-সেবী জনগণে পূর্ণ ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী সকল তখন সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। সহসা মুহূর্ত্তমধ্যে ভয়াতুর জনগণ সহ সেই মর্ম্মরবিনির্ম্মিত শোভন-দৃশ্য জেটি কোন্ অতলের তলে নিমজ্জিত হইয়া গেল! ঘূর্ণা-ধর্ত্তে পড়িয়া তরণীগুলিও সেই জলমধ্যে নিমজ্জিত হইল! সে সকল মৃতদেহের একটিও ভাসিয়া উঠে নাই। ভগ্ন তরণী সকলের এক খণ্ড কাষ্ঠও আর দেখা গেল না ; পূর্ব্বে যেখানে টেগাস নদীর জল ত্রিশ ফিট মাত্র গভীর ছিল, ভূমিকম্পের পর সেখানে জল ছয় শত ফিট গভীর হইল। আর সেই নদীগর্ভে, কোন্ শব্দহীন, আলোকহীন, বায়ুহীন, প্রাণহীন অতলে, লিসবনের সহস্র সহস্র হতভাগ্য অধিবাসী সমাহিত হইয়া রহিল।

সিন্ধুনক্রে।

ধর্ম্মান্ধ লিসবনবাসীরা বিধর্ম্মীদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য যে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছিল, সিন্ধুসলিলোচ্ছ্বাসে তাহা নির্ব্বাপিত হইল, এবং সেই দ্বাদশ জন নিরপরাধ বিধর্ম্মী সেই ভীষণ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু তখনও বুঝি পাষাণপ্রাণ ধ্বংসদেবতার মনের আক্রোশ মিটে নাই,—সহরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। গৃহে গৃহে গার্হস্থ্য কার্য্যের জন্য যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহার উপর গৃহের বহু দ্রব্য পড়িয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ; গির্জ্জায় গির্জ্জায় যে সকল মোমবাতি স্নিগ্ধালোক বিস্তার করিতেছিল, সেগুলি হইতেও অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। গৃহের যে দুই এক জন অধিবাসী রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের তখন আর আত্মরক্ষা করিবার বা দস্যুদিগকে বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না ; তাই এই অবসরে দস্যুদল গৃহে গৃহে আগুন লাগাইতে লাগিল ; সহরে ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—আর বহু হতভাগ্যের অর্দ্ধদগ্ধ দেহ সেই ভীষণ দৃশ্যের ভীষণ-ভাব আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

অগ্নিকাণ্ড।

ভূকম্পনকালে একজন ইংরাজ লিসবনে ছিলেন ;—কম্পনকালে তিনি নৌকায় ছিলেন। কম্পনানুভব করিয়া তিনি তখনই তীরে আসেন। সিন্ধুসলিল সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি একটা পাহাড়ে গিয়া উঠেন। সেখান হইতে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, ক্রোধাকুল সিন্ধু সফেন আবেগে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি অনুমান করেন যে, সহরে যে ষাট সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, সাগরতীরে তীরবদ্ধ নৌকাসমূহেও প্রায় ছয় সহস্র মানব লোকান্তরিত হইয়াছিল। ... মত ভীষণ ভূমিকম্প জগতের ইতিহাসে আর দৃষ্ট হয় না।

শেষ কথা।

...গী সাহিত্য।

...সাহিত্য।

...মিসেস্ অলিফ্যাণ্ট।

... ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিবার সময় পরিশ্রমহীন ... অলিফ্যাণ্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। হায়! ইতিমধ্যে ... পাঠকগণকে তাঁহা ও তাঁহার গ্রন্থসমূহের কিছু সংবাদ ...

তাঁহার সমসাময়িক লেখক ও লেখিকাদিগের মধ্যে মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুস্তক বোধ করি আর কেহই লেখেন নাই। রচনাপ্রাচুর্য্য সকল সময় রচনাপারিপাট্যের পরিচায়ক না হইলেও, তাহা যে ক্ষমতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্কট, ডুমা, ব্যালজাক, সকলেরই এই রচনাপ্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। একখানি উপন্যাস রচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহাদিগের আবার এক বা একাধিক উপন্যাসের উপাদান স্থির থাকিত। সকল উপন্যাস সমান উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় না হইলেও, সকলগুলিতেই লেখকের প্রতিভা আপনার জ্যোতিঃ-বিস্তার করিয়া, সেগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের উপন্যাসরাশিসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার সকল উপন্যাসই সুখপাঠ্য হইত। তাঁহার প্রতিভা, শ্রান্তি কাহাকে বলে, তাহা জানিত না। অতি অল্প বয়সে তিনি পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন; তাহার পর যৌবনে দাম্পত্য-জীবনে এবং বার্দ্ধক্যে জননীজীবনেও তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। মিসেস্ অলিফ্যাণ্ট তাঁহার পুস্তকসমূহে নানা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, নানা কথার আলোচনা করিয়াছেন, নানা চিত্র দেখাইয়াছেন।

রচনাপ্রাচুর্য্য।

তাঁহার রচনাস্তূপের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমেই মনে হয়, তিনি কেমন করিয়া এতগুলি পুস্তকে আপনার রচনামাধুরী প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাসের প্লট অর্থাৎ গল্পাংশে বিশেষ কিছুই নাই; বাস্তবিক তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকে একটা সুগঠিত প্লটও নাই—আছে কেবল কোন গার্হস্থ্য বা মনস্তত্বঘটিত ঘটনার চারি দিকে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা। তাঁহার রচনা পাঠ করিলে মনে হয় যে, তিনি যে মহিলা, মিসেস্ অলিফ্যাণ্ট সে কথা কখনও ভুলেন নাই। দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ডে, এমন কি, এ দেশেও অনেক মহিলালেখক এই টুকুই বিস্মৃত হইয়া যান। তবে সংসারের বিষয়ে জ্ঞানে এবং চরিত্রের চিত্রণে তাঁহার সমকক্ষের সংখ্যা বাস্তবিকই বিরল; সেই সকল ক্ষমতার সহিত শুচিতার মধুর সন্নিবেশই তাঁহার সাফল্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ।

সাফল্য।

মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের রচনাসমূহকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহার প্রথম ভাগ অবশ্য তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা। ১৮৪৯ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সে সকলই এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। তখন তাঁহার প্রতি-

রচনার প্রথমাংশ।

উজ্জ্বলরূপে হইয়া উঠিতেছে। সেই সকল পুস্তকে

হওয়া যায়। কিন্তু তখন লেখিকা নূতন ব্রতী, তখনও

তাই সেই সকল পুস্তকে অনেক স্থানে কুআদর্শনের

চরিত্রগুলিও প্রায় একই ছাঁচে ঢালা। সেই পবিত্রচিত্ত

বলিষ্ঠ যুবক, এই সকলই তখন তাঁহার পুস্তকে পবিত্র

মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের প্রথম বয়সে রচিত উপন্যাসগু

দক্ষ শিল্পীর করচাতুর্য্য লক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু

বিরচিত কোনও পুস্তকে তাহা নাই। তখন সংসার লেখি

আপনার আবরণ উন্মোচন করিয়াছে, তাই সে সকল

তখন কুমারী মার্গারেট উইলসন আপনার চারিদিকে গার্হ

চিত্রিত করিবার অবসর পাইতেন।

আমরা মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের রচনাসমূহকে যে তিন

রচনার দ্বিতীয় অংশ।

দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ, তাঁহার বিবাহের পর কুমারীজীবনের অবসানের সহিত, অর্থাৎ দাম্পত্যজীবনের আরম্ভেই জীবনের যে প্রকৃত পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইতেই রচনার এই দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ। কুমারীজীবনে তাঁহার নিকট জগতের যে অংশ অপরিচিত ছিল, এখন তিনি তাহার সহিত পরিচিত হইলেন। তবে যে আনন্দ, যে আশা লইয়া তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে আনন্দ বুঝি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল, সে আশা বুঝি হৃদয়েই বিলীন হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহ যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহার প্রবল সন্তানস্নেহ তদীয় চরিত্রের একটি প্রধান পরিলক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু এ বিবাহ বোধ করি বিশেষ সফলও হয় নাই; কারণ, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহাকে লণ্ডনে পুস্তক রচনা করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার এই সময়ের রচনায় অসহিষ্ণুতা ও তীব্রতা বড় পরিস্ফুট। পুরুষের সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরুষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দূর হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়সিংহাসনচ্যুত, ভগ্নদেহ, বিকলাঙ্গ দেবমূর্ত্তি সকল তখন তাঁহার পদপ্রান্তে ধূলিবিলুণ্ঠিত। দাম্পত্য মনোমালিন্যে তিনি তখন বিবাহের প্রতি বিরক্ত। তখন তিনি দেখিয়াছেন যে, প্রকাশকগণ স্বার্থান্ধ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত। তাঁহার তদানীন্তন রচনায় আর স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তের সে মধুর গ্রাম্যজীবনের চিত্র দেখিতে পাই না, তাঁহার হৃদয়ে তখন বিষাদের ঘন ছায়া ব্যাপ্ত। আমরা দেখিতে পাই, এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল তাঁহার যুবকযুবতীসম্বন্ধীয় মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই; ডিজ্রেলির মত তিনি তরুণবয়স্কের আত্মত্যাগে তখনও বিশ্বাস করেন। তাঁহার তৎকালে লিখিত উপন্যাসগুলি তরুণবয়স্কের প্রশংসায় ও অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক পুরুষের প্রতি বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। কাজেই অধিকবয়স্ক পুরুষের নিকট এ সকল উপন্যাস বিশেষ উপাদেয় হইবে না। এই সকল পুস্তকে রচনার বিকাশ লক্ষিত হয়; কারণ, তখন লেখিকা প্রকৃত শিল্পকৌশলশালিনী হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল পুস্তকে যেখানে তিনি তরুণবয়স্ক চরিত্রের অঙ্কন বা স্বভাববর্ণন ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেখানে আর তাঁহার প্রথম বয়সের রচনাসমূহের মাধুরী পরিলক্ষিত হয় না।

রচনার তৃতীয় অংশ।

মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের রচনাসমূহের দ্বিতীয় ভাগে যে তীব্রতা ও বিষাদপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, তাঁহার মত মহৎ ও উদারহৃদয় মহিলার হৃদয়ে কখনও সেরূপ ভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাহার উপর সাহিত্যসেবার সম্পদসৌভাগ্যেও তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। শেষে তাঁহাকে আর প্রকাশকদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইত না। প্রকাশকেরাই তাঁহার পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য লালায়িত হইত। কাজেই তাঁহার তীব্রতা কোমলতায় পর্য্যবসিত হইল, চঞ্চলতা গম্ভীরতায় পরিণত হইল, বিষাদ আনন্দে নিমগ্ন হইল। বিশেষতঃ, এখন তাঁহার সংসারের অভিজ্ঞতাও বর্দ্ধিত হইয়াছে; সেই পরিপক্ব অভিজ্ঞতা ও কোমলতা হইতে যে সকল পুস্তক রচিত হইতে লাগিল, সে সকল পুস্তক যে উপাদেয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহার অনেক পুস্তকের আলোচ্য বিষয় পুরাতন, এবং তাঁহার পুস্তকে বিশেষ চিত্তাকর্ষক কোনও ঘটনার অভাব, তথাপি সে সকল পুস্তক অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও শিল্পসৌন্দর্য্যময়। ইহাই মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের বিশেষত্ব।

প্রবন্ধাদি।

কেবল উপন্যাসরচনাতেই মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের বিপুল প্রতিভা পর্য্যবসিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। "ব্ল্যাকউডে" তিনি নানা বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ধর্ম্ম্বিক, বৈজ্ঞানিক বিষয় ভিন্ন প্রায় অন্য সকল বিষয়েই তিনি কিছু লিখিতে পারিতেন। তিনি সহজেই অতি দুর্ব্বোধ

বিষয় সকল বুঝিয়া বিশদভাবে সে সমুদয় বুঝাইতে পারিতেন। কেবল তিনি পোষাক সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সেইখানিই আশানুরূপ হয় নাই। তিনি কয়খানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। উপকরণপ্রাচুর্য্য এবং সূক্ষ্ম সমালোচনায় সেগুলি জীবনচরিত-রচনার আদর্শ, এ কথা বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না।

ইহা ভিন্ন তিনি ড্যান্টে এবং সারভ্যান্টিস্, এই দুই জন লেখকের যে দুইখানি সমালোচনা প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার সমালোচনাশক্তি, দূরদর্শন ও গভীর জ্ঞান দেখিয়া, সমালোচকগণ সত্য সত্যই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।

রমণীর প্রতিভা যে পুরুষের প্রতিভা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, রমণীর শিক্ষালাভের ক্ষমতার অভাব নাই, মিসেস্ হেনরী উড্, মিসেস্ অলিফ্যান্ট, মিসেস্ হাম্ফ্রী ওয়ার্ড প্রভৃতি মনীষা-সম্পন্ন মহিলাগণই তাহার দৃষ্টান্ত। আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস যে, রমণীগণ উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, আপনার ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকার প্রাপ্ত হইলে, আমাদিগের গার্হস্থ্য জীবনে সুখের শত উৎস উৎসারিত হইবে।

স্ত্রীজাতির সাহিত্য-ব্যবসায়।

অনলস লেখিকা মিসেস্ টুলি, মে মাসের "টেম্পল্ ম্যাগাজিন" পত্রে ডেলিনিউস, ট্রুথ ও নিউইয়র্ক ট্রিবিউনের প্যারিসস্থ সংবাদদাত্রী মিসেস্ ক্রফোর্ডের বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিখিয়াছেন। মিসেস্ টুলি কথোপকথনকালে মিসেস্ ক্রফোর্ডকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি সাহিত্যোপজীবিগণের মধ্যে বিশেষ গণনীয়া, এবং সংবাদপত্র-সাহিত্যে উচ্চ পদবী অধিকার করিয়াছেন। মহিলাগণের সংবাদপত্রের লেখিকারূপে উপার্জ্জন কি আপনি উত্তম উপজীবিকা বলিয়া মনে করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মিসেস ক্রফোর্ড বলেন, যে সকল মহিলা জীবনের প্রারম্ভে সংবাদপত্রের লেখিকারূপে জীবনযাত্রার পথ স্থির করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, এবং যাঁহাদের অদম্য অধ্যবসায়ের অভাব, তাঁহাদিগকে উপজীবিকার জন্য এই পথ অবলম্বন করিতে আমি কখন উপদেশ দিতে পারি না। কারণ, ঐ দুইটি গুণ এ পথে অপরিহার্য্য। তাঁহাদের বিশেষ সহনগুণ থাকা আবশ্যক। কারণ, সময়ে তাহারও পরীক্ষা আবশ্যক হয়। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক বোধশক্তি পুরুষ অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক, এজন্য তাঁহারা সংবাদপত্রের কার্য্যে বিশেষ উপযুক্ত। এই কার্য্যে সিদ্ধি-লাভ, অভিজ্ঞ ও নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টির প্রতি নির্ভর করে। বাল্য বয়সে চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঐ বিদ্যার চর্চ্চার জন্য বহু বৎসর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছি। আমার বিশ্বাস যে, চিত্রবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা আকৃতি ও বর্ণের যথাযথ স্বরূপ-নির্ণয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। তাহারই ফলে আমি সংবাদপত্রলেখকগণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়াছি। এই কারণেই আমি কোন বিষয় বা অবস্থান বুঝিয়া লইতে পারি। উত্তম রচনা করিতে হইলে সুকুমার শিল্পচর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন। ইহা সকলে ততটা বুঝিতে পারেন না। যে সকল রমণী সাহিত্য-সংসারে উচ্চপদলাভের অভিলাষিণী, আমি তাঁহাদিগকে চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা রাখিতে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণে চিত্রাঙ্কন করিতে উপদেশ দিয়া থাকি। কোনও ঘটনামূলক চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে যেরূপ কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন, গদ্যরচনাকালেও কল্পনাশক্তি তদ্রূপ আবশ্যক। সুকুমার শিল্প এবং সাহিত্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মিসেস টুলি পুনরায় প্রশ্ন করেন যে,

লণ্ডনের স্থায় অল্প দিনের মধ্যে পারিস নগরীতেও কি মহিলাগণ অধিকসংখ্যায় সংবাদ-পত্রলেখিকার ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মিসেস্ ক্রফোর্ড বলেন, পারিসেও অনেক মহিলা এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন যথার্থ, কিন্তু আমি বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা এই ব্যবসায়ের বিশেষ সুনাম রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যেরূপ ঘৃণিত উপায়ে তাঁহারা এই পথে চলিয়াছেন, তাহা শুনিলে ঘৃণায় ও দুঃখে মৃতকল্প হইতে হয়। যাঁহারা চিত্রবিদ্যা উপজীবিকারূপে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলিতে হয়। যদিও আমায় বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না যে, পারিসে এমন সংবাদপত্রলেখিকা এবং চিত্রকরীও আছেন, যাঁহাদের সুনাম সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হয় না, তথাপি আমি সম্ভপ্তচিত্তে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই দুইটি উপজীবিকাই অনেক রমণীর ব্যভিচারের আবরণ পরিচ্ছদরূপে ব্যবহৃত হইয়া কলুষিত হইতেছে। যদি এই ভাবেই চলে, তাহা হইলে পারিসে সংবাদ-পত্রলেখিকার ব্যবসায় কচিৎ সম্মানের বলিয়া আদৃত হইবে।

জীবনবৃত্ত।

পারস্যের শাহ।

মিষ্টার ফ্রেসার প্রভৃতি তিন জন সাহেব দ্বিচক্র যানে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। মিষ্টার ফ্রেসার পারস্যের রাজধানী তিহারাণ হইতে মে মাসের "ইংলিশ্ ইলাষ্ট্রেটেড্ ম্যাগাজিনে" বর্ত্তমান পারস্যাধিপতির বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পারস্যাধিপতির নাম মজাফর উদ্দীন শাহ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তি। তিনি অধিকাংশ সময় পর্ব্বতসমূহে মৃগয়াবিহার, অথবা ইংলণ্ডের ধীবর ও নাবিকদিগের স্থায় পশমের মোটা একটা জ্যাকেট ও সূতি পাজামা পরিধান করিয়া স্বীয় উদ্যানে সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; কিম্বা ফটোগ্রাফ তুলিয়া থাকেন। শাহ অত্যন্ত দুর্ব্বলপ্রকৃতি; কিন্তু দ্বিচক্ররথচারী পত্রপ্রেরককে তাঁহার প্রাসাদমধ্যস্থ কোষাগার-পরিদর্শনের অনুমতিদানে তাঁহাকে ভীত বা চঞ্চল বোধ হয় নাই। মিষ্টার ফ্রেসার বলেন, তিনি ময়ূর-সিংহাসন দেখিয়াছেন। ময়ূর-সিংহাসনের মূল্য বিশ লক্ষ হইতে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড অনুমিত হইয়া থাকে। ভূতপূর্ব্ব শাহের সময়ে প্রস্তুত এক সুবর্ণময় রত্নখচিত ভূমণ্ডলের গ্লোব কোষাগারে রক্ষিত আছে। ৭৫ পাউণ্ড খাঁটি সোণা ও ৫১ হাজার খণ্ড বহুমূল্য রত্নে ঐ "গ্লোব" নির্ম্মিত হইয়াছে। মরকতমণি সন্নিবিষ্ট করিয়া সাগর, এবং উজ্জ্বল মণি দ্বারা পারস্য, এসেথিষ্ট রত্নে ভারতবর্ষ, রক্তবর্ণ মণিখণ্ডে আফ্রিকা ও হীরকখণ্ডের সংযোগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চিত্রিত হইয়াছে।

পারস্যের শাহ তুর্কজাতীয়। কিন্তু কনষ্টান্টিনোপলের বিখ্যাত গুপ্তহত্যাব্যাপারে তাঁহার সহানুভূতি নাই। শাহের পিতা প্রতি রাত্রে দুই বোতল পোর্ট মদিরা সেবন করিতেন; কিন্তু ইনি মদ্য স্পর্শও করেন না। শাহ সর্ব্বসাধারণের বিশেষ প্রিয় নহেন। ইহার কৌতুকাবহ কারণ এই যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পারস্যাধিপতিরা যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রজা-সাধারণের পীড়ন করিতেন, বর্ত্তমান শাহ তাহা করেন না।

মিষ্টার ফ্রেসার শাহের দৈনিক কার্য্যপ্রণালীর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনার পর এক টুকরা পারস্যদেশজাত পাতলা রুটি আহার ও এক গ্লাস মিষ্ট চা মাত্র পান করেন। প্রায় বেলা ৮ টার সময় মন্ত্রিবর্গ তাঁহার নিকট রাজ-

শাহের প্রাত্যহিক জীবন যাপন।

কার্য্য লইয়া উপস্থিত হন। বেশের পারিপাট্য অথবা পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। ঘরের মধ্যে চট্ চট্ শব্দে চটি জুতা পায়ে পায়চারী করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রবাদ যে, তিনি স্নানাদি করেন না, বড়ই অপরিষ্কার; এজন্য তাঁহার প্রথমা পত্নী সর্ব্বদাই অনুযোগ করিতেন, এই কারণে শাহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। মন্ত্রিবর্গ উপস্থিত হইলে তিনি বহুসংখ্যক চিঠি লিখিয়া থাকেন; রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় চিঠিপত্র শুনিয়া থাকেন, প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করেন, এবং রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইয়া থাকেন। এই কার্য্যে অবিরামে ছয় ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হয়। তাহার পর তিনি মধ্যাহ্নভোজনে বসেন। সমস্ত আহার্য্য অত্যন্ত সাবধানে প্রস্তুত হয়। যাহাতে খাদ্যের সহিত বিষাদি মিশ্রিত হইয়া প্রাণনাশের আশঙ্কা না থাকে, এজন্য ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় এক জন রাজপুত্রের প্রতি ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার অর্পিত আছে। রন্ধনশালা হইতে শাহের আহারকক্ষে লইয়া যাইবার সময় খাদ্যপূর্ণ প্রত্যেক পাত্র শীলমোহর করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ভোজনকালে শাহের সমক্ষে শীলমোহর ভাঙ্গা হয়। রাজদরবারের নিয়মানুসারে শাহ একাকী ভোজন করেন। পূর্ব্বে তিনি ঘরের মেজেয় বসিতেন, এবং একখানি বড় থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইত। তিহারাণে আসিবার পর হইতে তিনি গদীতে বসিয়া এক ফুট উচ্চ এক টেবিলে আহার-পাত্র রাখিয়া ভোজনে সম্মত হয়েন। প্রথমে তাঁহার টেবিল ছিটের কাপড় দিয়া আবৃত হইত। সাদা কাপড় টেবিলে পাতিলে খুব ভাল দেখাইবে, এই কথা বলায়, তিনি তাহাতে সম্মত হয়েন; এখন তিনি টেবিলে সাদা কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ ষাট প্রকারের খাদ্যসামগ্রী টেবিলে সাজাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পারস্যাধিপতি দুই তিন প্রকার মাত্র আহার করিয়া থাকেন। প্রথমে তিনি পোলাও এবং তাহার সঙ্গে ছোট একটি মুর্গী, কিম্বা দুই খণ্ড পাতলা রুটির মধ্যস্থ পুরের মত এক টুকরা ভেড়ার মাংস আহার করেন; তাহার পর সিরাপে ভিজান "সিট্রন ফল" খান। সিট্রন ফল পারস্যের সর্ব্বসাধারণের সচরাচর খাদ্য। ছুরী কাঁটা পারস্যের শাহের নিতান্ত অপরিচিত। সর্ব্ববিধ আহার হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মজ্জা তাঁহার বিশেষ প্রিয় খাদ্য। আহারকালে তাঁহাকে ইউরোপীয় সংবাদপত্র শুনান হয়। প্রধানতঃ ফরাসী সংবাদপত্রই অধিক পঠিত হয়। তিনি ইউরোপীয় রাজনীতির বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। পারস্যের শাসনবিষয়ক কথোপকথনকালে প্রায়ই বলেন, "আজ এইরূপ ঘটনায় ইংলণ্ডের রাণী কি করিতেন?" আহারান্তে শাহ এক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যান। নিদ্রাভঙ্গের পর কয়েক গ্লাস চা পান করিয়া ছোট টেলিগ্রাফ যন্ত্র লইয়া ক্রীড়াসুখ অনুভব করেন; অথবা মন্ত্রিবর্গের সহিত তাস খেলিয়া থাকেন। তাস খেলিবার সময় তাঁহারা জয়ী না হন, এজন্য মন্ত্রিগণ বিশেষ সাবধানে থাকেন। বাগানের চারা গাছগুলি এখানে সেখানে নাড়ানাড়ি করিয়া বসান ও ফটোগ্রাফ তোলা, তাঁহার অন্যতম অবসরবিনোদনের কার্য্য; মিষ্টার ফ্রেসর বলেন, তিনি পারস্যাধিপতির স্বহস্তে গৃহীত কতকগুলি ফটো দেখিয়াছেন, সেগুলি বাস্তবিকই খুব চমৎকার। নানাবিধ বেশ ও অবস্থার ফটোগ্রাফ শাহের এক প্রকার বাতিকের মত। এমন কি, তিনি শয্যাশায়ী অবস্থার ফটো তুলাইয়াছেন। তিনি শাহের এক ফটো দেখিয়াছেন, ঐ ফটোতে শাহ কষ্টরাক্ষ এতদ্দেশীয় সৈনিক-পরিচ্ছদ পরিহিত। ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদে শোভিত তাঁহার ফটোও দেখিয়াছেন। তাঁহার বাটটি মাত্র পত্নী আছেন, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ মিতাচারী! তাঁহার চারি পুত্র, এবং তেইশটি কন্যা। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাহের অন্তঃপুরে এক হাজার সাত শত বিশটি পত্নী ছিলেন। বর্ত্তমান শাহের চিকিৎসক এক জন ইংরাজ। সমুদ্রপীড়ার ভয়ে তিনি ইউরোপে যাইতে ভীত হয়েন, কিন্তু ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক।

বিবিধ।

ভারতীয় ইন্দ্রজাল।

সম্প্রতি "বর্ডারল্যাণ্ড" পত্রে কোনও লেখক এই ইন্দ্রজালরহস্য বিবৃত করিয়াছেন।—"ভারতবর্ষে আমি অনেক ফকির ও ঐন্দ্রজালিকের সহিত আলাপ করিয়াছি, তাহাদিগের কার্য্যকলাপ

প্রথম পরিচয়।

পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, এমন কি, তাহাদের কৃত ইন্দ্রজালের রহস্যভেদ করিয়া বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। আমি শুনিলাম, সিমলা শৈলে এক জন অপরিমিতধনশালী, বিদ্বান জহরী আছেন;—সাধারণ লোকে বলে যে, তিনি মুসারই মত;—এমন কি, মুসার অপেক্ষাও বিপুলক্ষমতাশালী। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি সিমলা যাইবার সঙ্কল্প করি।

"আমার এক বন্ধু—বেঙ্গল লান্সার্স সৈন্য দলের এক জন কাপ্তেন—অসুস্থ হইয়া সিমলায় গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম—তথায় আমার বন্ধু গুর্খা সেনাদলের এক জন ডাক্তার বাস করিতেন। সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশের শোভাময় দৃশ্যের মধ্যে শান্ত সন্ধ্যায় যখন কয় বন্ধুতে বসিয়া চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গৃহে ধূম্রলোকের সৃষ্টি করিতেছিলাম, তখন আমি জেকবের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম;—জানিলাম, সিমলায় জেকবকে জানে না, এমন লোক নাই। আমি জেকবের সহিত পরিচিত হইবার বাসনা বিজ্ঞাপিত করিলে বন্ধু বলিলেন যে, আমি যে দুই চারি দিন সিমলায় থাকিব, তাহার মধ্যে জেকবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। সুহৃদ্ ডাক্তারের কথার ভাবে বোধ হইল, তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, আমি জেকবের সহিত আলাপ করি।

"জেকবের বাঙ্গলো আমাদের বাঙ্গলো হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আমি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জেকবের ভৃত্য জানাইল যে,—মনিব বাড়ীতে নাই, কোথায় গিয়াছেন, তিন দিন পরে গৃহে ফিরিবেন; আমি কার্ড রাখিয়া বলিয়া আসিলাম যে, আমি আবার আসিব; কেবল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি এত দূর আসিয়াছি। আমি কার্ডে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিয়া আসিলাম। পরে জানিয়াছিলাম যে, জেকব আমার সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"তিন দিন পরে প্রভাতে অশ্বারোহণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি, জেকব আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। আমার সুহৃদ্ বন্ধুর কাছে ইহা বড় ভাল বোধ হইল না। যাহা হউক, আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেকবের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তখন আরও তিন জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সুপরিচিত এক জন সেনাধ্যক্ষ। জেকব আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আহারান্তে গল্প করিতে করিতে আমি ফকিরদিগের যে সকল ভেল্কি দেখিয়াছিলাম, সেই সকলের কথা বলিতে লাগিলাম। আমি যখন মানবদেহে তরবারি বিদ্ধ করিবার

তরবারির আঘাত।

কথা বলিলাম, তখন জেকব হাসিয়া বলিলেন, 'সে অতি সামান্য ব্যাপার। আপনি উঠিয়া দাঁড়ান।' আমি দাঁড়াইলাম। তখন কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত বহুমূল্য মণিরত্নখচিত তরবারিখানি লইয়া তিনি সেখানি আমার বক্ষের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'বসাইয়া দিব কি?' তাঁহার উপর আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, তাই আমি বলিলাম, 'অবশ্য দিবেন।' তখন তিনি আমার বক্ষের অস্থির দিক্ দিয়ে সেই তরবারিফলক বসাইয়া দিলেন; আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার দেহে তরবারির

শীতল হৃদয়ই প্রবেশ করিতেছে ; কিছুমাত্র বেদনা বোধ হইল না—কেবল বোধ হইতে লাগিল, যেন আমি শীতল জল পান করিয়াছি। তরবারির অগ্রভাগ আমার পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া কক্ষের দারুময় প্রাচীরে বসিয়া গেল। তখন তরবারি ত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে জেকব বলিলেন, 'আপনাকে কিরূপে দেখাইতেছে জানেন ?—যেন পিন্ দিয়া কর্কে বিদ্ধ প্রজাপতি।' কোন কোন অতিথিও আমাকে বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করিলেন না। অল্পক্ষণ পরেই জেকব তরবারি তুলিয়া লইলেন। আমি বিমর্ষভাবে আমার ছিন্ন কোটের দিকে চাহিলাম। জেকব বলিলেন, 'ভয় নাই, সব ঠিক হইয়া যাইবে।' আমরা অদ্ভুত ভেকি দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম ;—তাহার পর চাহিয়া দেখি, কোটে ছিদ্রমাত্র নাই।

"ইহার পর জেকব বলিলেন, 'আপনারা কেহ যে যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, সেই যুদ্ধের বিবরণ বিবৃত করুন।' সেরূপ বৃত্তান্ত আমরা সকলেই বিবৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু আত্মপ্রশংসা করিতে হয় বলিয়া সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। শেষে আমাদিগের সেনাধ্যক্ষ বন্ধু ব্যালাক্লাভার সঙ্কটশঙ্কিল যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অসীম সাহসী সৈনিকেরই মত ওজস্বিনী ভাষায় তিনি সে কথা বলিতে লাগিলেন, আর মুগ্ধ হইয়া জেকব সেই কথা শুনিতে লাগিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র দণ্ড বাহির করিয়া জেকব তাহা প্রাচীরের দিকে ঘুরাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কক্ষপ্রাচীরপার্শ্বে ঘনপীতাভ নীল কুজ্ঝটিকাবরণ অপসৃত হইয়া গেল ; আমাদের নয়নসমক্ষে সাব্রিবদ্ধ লাইটব্রিগেড সেনাদলের চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা সেনাদলকে তীব্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া যাইতে দেখিলাম, আমরা রণভেরীর উত্তেজক গভীর নাদ শুনিতে পাইলাম,—আমরা সেনাদলকে নিহত দেখিলাম। বাস্তবিক ব্যালাক্লাভার যুদ্ধক্ষেত্রের সকল ঘটনারই পুনরভিনয় হইল। আমরা দেখিলাম, সেনাগণ অতুলনীয় সাহসের সহিত শত্রুর কামান আক্রমণ করিল, সেগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফিরিল। সেই প্রত্যাবর্ত্তনকারী সেনাগণের মধ্যে আমরা আমাদিগের বন্ধু সেনাধ্যক্ষকে চিনিতে পারিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে বোধ হইল, যেন সেই মুষ্টিমেয় সেনা শত্রুসেনাসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। আমাদের বন্ধু অতি কষ্টে দুই জন শত্রুসেনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন ; কিন্তু তৃতীয় জনকে আক্রমণকালে, তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। কোনরূপে উঠিয়া তিনি একটি আরোহিশূন্য অশ্ব ধরিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া শত্রুদলের গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া ইংরাজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। জেকব আর একবার দণ্ড ঘুরাইলেন—মুহূর্ত্তমধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল।

"আমরা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। তাহার পর আমরা আর এক জনের বর্ণিত বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলাম। সকল দেখিতে পাইব জানিয়া আমাদিগের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাস্তবিকও আমরা যাহা শুনিলাম, তদপেক্ষা অধিক দেখিলাম ; কারণ বন্ধু আত্মবৃত্তান্ত অধিকারকালে আপনার বীরত্বের কথায় একেবারেই উল্লেখ করেন নাই। দুই জন ভীমকায় সিপাহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন, জেকবের কৃপায় আমরা তাহা দেখিতে পাইলাম।

অতীত চিত্র।

ঘটনা চিরন্তন।

"অতিথিদিগের মধ্যে কেহ কেহ জেকবকে অতীত ঘটনার পুনরভিনয়রহস্যের কথা বলিতে বলিলেন। জেকব বলিলেন যে, ঘটনার বিলোপ হয় না—ঘটনা চিরস্থায়িনী। তিনি বলিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত সকল ঘটনাই উক্ত আকাশালোকে বর্তমান ;—আম

ও ক্ষমতা থাকিলে সে সকল পুনরায় দেখান অত্যন্ত সহজ। ফনোগ্রাফ যন্ত্র হইতে মানবের কণ্ঠস্বর শুনান যেমন সহজ, তারকালোক হইতে অতীত অধ্যায় ঘটনা সকলের প্রদর্শনও তেমনই সহজ।

"জেকব আমাদিগকে তাঁহার উদ্যানে যাইতে বলিলেন—আমরা স্বীকৃত হইলাম। উদ্যানমধ্যে লক্ষ্য করিলাম—একটি মনোরম সরোবর। আমরা গল্প ও চুরুট লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম,—এমন সময় জেকব যাঁহার সহিত গল্প করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, 'জেকব জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবেন।'

সলিলোপরি ভ্রমণ।

জেকব অনায়াসে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিলেন;—আমরা দেখিতে পাইলাম, স্বচ্ছ জলমধ্যে মীনগণ এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া জেকবের পদতল হইতে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। জেকব সরোবর পার হইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার জুতার তলা পরীক্ষা করিলাম—যেন তিনি সিক্ত ভূমির উপর ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। জেকব বলিলেন, 'ইহা অতি সহজসাধ্য। যে বাতাসে উড়িতে পারে, সে জলের উপর হাঁটিতেও পারে। যাহা হউক, এইবার আমি যাহা দেখাইব, তাহাতে প্রকৃত ক্ষমতার আবশ্যক।'

"ঐন্দ্রজালিক দণ্ড লইয়া জেকব মস্তকের উপর ঘুরাইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ প্রজাপতি দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তুষারপাতের মত চারিদিকে যেন প্রজাপতির বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদের হ্যাটে, কোটে, সর্ব্বত্র প্রজাপতি বসিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। আমাদের হাসিতে জেকব কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, 'ওঃ! আপনারা হাসিতেছেন—এ সকলে আর কাজ নাই।' তিনি আবার দণ্ড ঘুরাইলেন, প্রজাপতির পাল কোথায় চলিয়া গেল। আমরা গৃহে আসিলাম।

প্রজাপতির পাল।

"জেকব স্বয়ং যোগী [illegible]হেন। তবে তিনি যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং যোগবলেই এই সকল বিস্ময়ক[illegible] দেখাইয়া দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করেন। তাঁহার ক্ষমতা দেখিলে সত্য সত্যই বিস্মিত [illegible]া থাকা যায় না।"

উল্কা।

১। যে সকল ক্ষুদ্র স্বপ্রভ পদার্থকে রাত্রিকালে পুনঃ পুনঃ নভোমণ্ডলে অতিবেগে নানা দিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়, এবং দেখিতে দেখিতে অবিলম্বে অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া পড়ে, সেই সকল পদার্থকে উল্কা বা খধূপ বলে। নিরভ্র স্বচ্ছ রজনীতে উদীক্ষণ করিলে বোধ হয়, নভোমণ্ডল হইতে একটি সমুজ্জ্বল তারা হঠাৎ খসিয়া পড়িল; নিঃশব্দে একদিকে সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, এবং ক্ষণমধ্যে লয় পাইল। অনিত্য পার্থিব সুখে বীতভৃষ্ণ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উল্কাপাতে দেহীর লোকান্তরগমনরূপ আধিদৈবিক ব্যাপার জ্ঞান করেন; বিরহবিধুর যুবকযুবতীগণ কাতরহৃদয়ে উল্কার আলোকে দয়িতের শুভাশুভ পাঠ করেন; কবি দেখেন যে, নন্দনকাননজাত কুসুমরাজির উজ্জ্বলদল বাতাহত হইয়া সুরলোক প্রধূপিত করিতেছে; অথবা বৈজয়ন্তের দীপাবলিখলিত দগ্ধশাস্ত

নিপতিত হইতেছে ; জ্যোতিষী জানেন, এ আলোকপিণ্ড তারা নহে, জীবাত্মা নহে, এ ফুলদল নহে, বাতির গুল নহে ; ইহা এক কণা, জগতের এক পরমাণু ; কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল ? রোজ রোজ এ হাউই কে ছোঁড়ে ?

২। উল্কা-সংখ্যা।—এই ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর পদার্থগুলি আকারে যেমন ক্ষুদ্র, সংখ্যায় তেমনই বহুল। অন্তরীক্ষে যে কত কোটী কোটী খধূপ পর্য্যটন করিতেছে, তাহা সংখ্যাবাচক শব্দসহায়ে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ গুলির আকার যেমন ভিন্ন ভিন্ন, পরিমাণও তেমনই নানা প্রকার ; কতক উল্কা সের-পরিমিত ; কতক উল্কা মন-পরিমিত ; কোন কোনটা ছটাকের বেশী নহে ; আবার কোনটি মৃৎকণা মাত্র। গ্রহরাজের এমনই মাহাত্ম্য যে, এইরূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থসমূহকে পারিবারিক স্নেহরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে স্বীয় মঙ্গলময় করজাল বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজ করিতে কুণ্ঠিত নহেন ! কি রবিকিরণে ভাসমান রেণু, কি প্রতাপান্বিত বিশাল বার্হস্পত্য মণ্ডল, সকলেই কেপ্‌লারের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সাবিত্রমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছে। স্বল্পকায়ত্ব ও সুদূরত্ব প্রযুক্ত এই জ্যোতিষ্কগুলি দূরবীক্ষণের আয়ত্ব হয় না।

৩। উল্কাপাত-দর্শন।—এই সকল ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ আকল্প সূর্য্যের চারিদিকে প্রচণ্ডবেগে অপ্রতিহতভাবে ঘুরিতেছে ; ঘুরি[illegible] ঘুরিতে কালবশে যখন পৃথিবীর নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন ভূবায়ুর ঊর্দ্ধ[illegible]র প্রবিষ্ট হইবামাত্র মহা অনিষ্ট উপস্থিত হয়। ঊর্দ্ধতম বায়ুস্তর য[illegible]রোনাস্তি তরল, তথাপি জলগত রাইফেলের গুলির ন্যায় অতিবেগবিশিষ্ট [illegible] ভূবায়ুতে সমাগত হইয়া হঠাৎ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় ; উল্কা বায়ুমণ্ডল দিয়া গমন করিতে করিতে সংঘর্ষণবশতঃ উষ্ণ হইয়া পড়ে ; অনন্তর লোহিত-তপ্ত, তাহার পর শুক্ল-তপ্ত এবং পরিশেষে বাষ্পীভূত হইয়া গগনমণ্ডল আলোকিত করে, এবং আমরা ১০০।২০০ মাইল নীচে থাকিয়া বলি, ঐ দেখ, তারা খসিয়া পড়িল ! উল্কা যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন উহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে কুড়ি মাইল। ভূপৃষ্ঠে এত বেগ অসম্ভব ; অচিরে বায়ু কর্ত্তৃক ইহার প্রতিরোধ হয়। শূন্যপথে এরূপ বেগের কোনও ব্যাঘাত নাই।

৪। উল্কাপাতের কাল।—বৎসরের মধ্যে এমন রাত্রি নাই, যাহাতে উল্‌কাপাত না হয়। নির্ম্মল রজনীতে প্রতি ঘণ্টায় ৫।৭ উল্‌কাপাত দেখা যায়। প্রথম রাত্রিতে খুব কম পড়ে, দুপর রাত্রিতে মাঝামাঝি, শেষ রাত্রিতে খুব বেশী। আবার মাস হিসাবে দেখা যায় যে, জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেশী বেশী,

এবং জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত কম কম পড়ে। এবং মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধে অধিক উল্‌কাপাত দেখা যায়।

৫। তাপবাদ।—উক্ত তারাবাজির ন্যায় খধূপদর্শন, রাসায়নিক ব্যাপার ভিন্ন তাপোৎপত্তির উদাহরণস্থল। কেবল সংঘর্ষণে এতাদৃশ তাপের উৎপত্তি, এবং সেই তাপজনিত এতাদৃশ প্রদীপ্ত উল্লাসের উৎপত্তি,—বিশ্বাসের অভূমি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মনে রাখা চাহি যে, রাইফেলগুলির বেগ অপেক্ষা উল্কার বেগ শতগুণে অধিক; এবং সংঘর্ষণজনিত যে তাপের উৎপত্তি, তাহা বেগের বর্গের অনুপাতী। অতএব উল্কা যখন ভূবায়ু ভেদ করিয়া প্রধাবিত হয়, তখন কেবল সংঘর্ষণ প্রযুক্ত উহার তাপ রাইফেলগুলির তাপ অপেক্ষা লক্ষগুণে অধিক হয়। সংঘর্ষণজনিত গুলি যে দশ ডিগ্রী পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, তাহা অত্যুক্তি নহে; অতএব ভূবায়ু দিয়া উল্কার গমনকালে যে অতি অদ্ভুত তাপের উৎপত্তি হয়, তাহার অংশমাত্র হইলে উহাকে ক্ষণমধ্যে বাষ্পীভূত করিতে পারে।

৬। উল্কার উচ্চতা ইত্যাদি।—কোন ত্রিভুজের ভূমি ও ভূমিসংলগ্ন কোণদ্বয় জানা থাকিলে, তাহার বাহুদ্বয় ও শীর্ষকোণ হইতে ভূমির অন্তর ইত্যাদি জানা যায়। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে যথোচিত দূরস্থিত স্থানদ্বয় হইতে যুগপৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ভূপৃষ্ঠ হইতে উল্কার উচ্চতা, তাহার গম্যমান পথের দৈর্ঘ্য, এবং গতির বেগ নিরূপণ করা যায়। উল্কাগুলি হারাহারি ৭৪ মাইলের উপর থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং হারাহারি ৫০ মাইলের উপর আসিলে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। তাহাদিগের দৃশ্যমান পথের পরিমাণ ৪২ মাইল। উজ্জ্বলতর উল্কাগণের গতির বেগ ভূপৃষ্ঠ সম্বন্ধে প্রতি সেকেণ্ডে ২৯ মাইল।

১৮৬৯ অব্দের ৬ই নবেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের দক্ষিণে একটি অপূর্ব্ব বহ্নিবর্ত্তুল দেখা গিয়াছিল। যখন দেখা গেল, তখন উহার উচ্চ ৯০ মাইল, যখন নিবিল, তখন ২৭ মাইল উচ্চতে; ৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ১৭০ মাইল চলিয়াছিল। এই বহ্নিবর্ত্তুলের একটি অদ্ভুত বিচিত্র লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ণ ৫০ মিনিট কাল ব্যাপিয়া ইহার পথ ৫০ মাইল লম্বা, ৪ মাইল চওড়া, স্বপ্রভমেঘ দ্বারা আলোকিত ছিল।

দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র পদার্থ দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠে ও নিভিয়া যায়, সেগুলি অতি ক্ষুদ্র উল্কা, চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না; তাহাদের নয়ই কেবল তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ। ভূবায়ু দ্বারা যদি আমরা আবরিত না

থাকিতাম, তবে উল্কাপাতে আমাদিগকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইত। তাহাদিগের বেগই তাহাদের বিনাশের কারণ; বায়ুমণ্ডলে প্রবেশমাত্রেই দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে, এবং ফুস্ করিয়া নিবিয়া যায়, ভস্মাবশেষও প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

৭। উল্কাবৃষ্টি।—কখন কখন অনবরত উপর্য্যুপরি বারিবৃষ্টির ন্যায় উল্কাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ১৮৬৬র নবেম্বর মাসে যে উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অতি চমৎকার শোভন ও মোহন দৃশ্য। এই উল্কাবৃষ্টির ইতিহাস বলিতে হইলে সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কথা পাড়িতে হয়। ইতিহাস এই যে, ৯০২ খৃষ্টাব্দে জনৈক আফ্রিক যবনরাজের মৃত্যুকালে, সমস্ত রাত্রি প্রদীপ্ত শক্তির ন্যায় অসংখ্য তারাপাত হইয়াছিল। উক্ত রাজার লোকান্তরগমনের স্মরণোৎসব-স্বরূপ দেবগণ আতসবাজি করিয়াছিলেন! এ কথায় এখন আর কে শ্রদ্ধা করিবে! এই ঘটনাপাঠে জ্যোতির্বিদ বুঝিলেন যে, ৯০২ হইতে কতিপয় বর্ষ ব্যবধানে যথানিয়মে এক এক বার উল্কাবৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, এবং ১৮৬৬র যে উল্কাবৃষ্টি, তাহা এই সাময়িক উল্কাবৃষ্টির পর্য্যায় ৯০২ হইতে একাল পর্য্যন্ত উনত্রিশ বার এই উল্কাবৃষ্টি হইয়াছে; তন্মধ্যে শেষ বারের ইতিহাস অতিযত্ন-পূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে।

৮। পোতাধান।—মনে কর, অসংখ্য ক্ষুদ্র পদার্থসংঘাত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। মনে কর, সাগরসলিলে কোটি কোটি চিলিচিম পোতাধান (Shoal of herrings) বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া নানা ভঙ্গিক্রমে ক্রীড়া করিতেছে। মনে কর, সংখ্যাতীত কপোতকুল নিবিড় অরণ্য মধ্যে কলরব করিতেছে; কিন্তু উল্কাধান, পোতাধান ও কপোতকুল অপেক্ষা বিপুল। উল্কা-সমূহ তত নিবিড় নহে, দু' চারি মাইল অন্তরে থাকিয়া ঘুরে; কিন্তু সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের মণ্ডল-পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজন।

৯। পোতাধানের গতি।—চিলিচিম-সংঘাত বা কপোতকুল স্বেচ্ছাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে; কিন্তু উল্কাসমূহের সে স্বাধীনতা নাই; তাহারা সাবিবাবিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করে; তাহাদের গত্যন্তর নাই; প্রত্যেকে স্বীয় বৃত্তাভাগে ভ্রমণ করে, প্রতিবেশীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না, এবং প্রতি ৩৩ বৎসর কোটি কোটি যোজন ঘুরিয়া এক এক ভূ-ভ্রম সমাধা করে। এই উল্কা-সংঘাত আমরা দেখিতে পাই না। এক্ষণে ১৮৯০ অব্দে সে গুলি সূর্য্য হইতে বহু দূরে আছে; সমুদ্রের মাছ দেখিতে পাই না; কিন্তু জানি যে, সমুদ্রে মাছ আছে; তেমনি উল্কা দেখিতে পাই না, কিন্তু জানি যে, উল্কা আছে। মাছ

ধরিলে দেখিতে পাই, তেমনই ভূ-বায়ু রূপ জালে যখন উল্কাধান পড়ে, তখনই
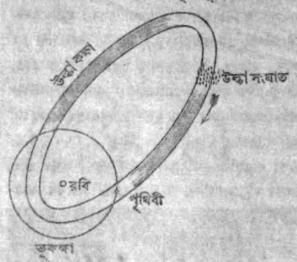
দেখিতে পাই। তেত্রিশ বৎসর অন্তর এই শূন্য-সাগর কূলে পৃথিবী-রূপ বুড়োজালে উল্কা মাছ ধরা পড়ে। উল্কার সংখ্যা এত অধিক যে, প্রতি ৩৩ বৎসরে কোটী কোটী বিনষ্ট হইলেও ভাবী বর্ষের জন্য কোটী কোটী থাকিয়া যায়।

১০। উল্কা-সংঘাতের চিত্র।—চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন করিয়া উল্কাসমূহ ভূবায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী রবিপরীত স্বীয় কক্ষায় ভ্রমণ করিতেছেন; উল্কাসংঘাতও নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করিতেছে; পরন্তু উল্কাকক্ষা পর্য্যাপ্তির অভাবে যথাপরিমাণে অঙ্কিত হয় নাই; ইহা রামবড়ীর আকারে দীর্ঘতর হইবে। বর্ষে বর্ষে ১২ই কি ১৪ই নবেম্বর তারিখে পৃথিবী উক্ত উল্কাকক্ষা অতিক্রমণ করেন; তৎকালে উল্কাসংঘাত তথায় না থাকিতে পারে; ভ্রষ্টপথ অর্থাৎ এড়াটে যে কতকগুলি উল্কা ঐ তারিখে ঐ স্থানে বেড়াইতে থাকে, তাহারাই ধরা পড়ে; সেগুলি তারাবাজির মত ভূবায়ুতে নিপতিত হয়, এবং তাহাকেই আমরা নবেম্বর উল্কা বলিয়া থাকি।

পৃথিবী যখন উল্কাকক্ষা পার হন, তখন যদি উল্কাসমূহ তথায় থাকে, তবে তাহারা বায়ুজালে পতিত হয়; তাহাদের আর নড়ন চড়নের শক্তি থাকে না; এবং পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে ভ্রামিত হইয়া কতিপয় ঘণ্টার মধ্যে উল্কাকক্ষার ও দিকে বাহির হন,—থালুই-ভরা মাছ। যে উল্কা সকল বাঁচিয়া গেল, তাহারা এখন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিল; এক এক ক্ষেপে যদি কোটি কোটি পড়ে, তবে শত সহস্র কোটি এড়াইয়া যায়। সংখ্যাই বা কত!

১১। ১৮৬৬ অব্দের ১৩ই। ১৪ইএর উল্কাবর্ষণ।—এই সময় পৃথিবী উল্কা-সংঘাত ভেদ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। রজনী অতিশোভনা,—নিশ্চন্দ্রা, নিরভ্রা; উল্কার সংখ্যা নাই, ঔজ্জ্বল্যের পরিসীমা নাই। এ উল্কাবর্ষণ যদিও অনাদিষ্ট ছিল না, তথাপি তারাধারাবিস্ফারিত নভোমণ্ডল অচিরে যে

এরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে, তাহা কাহারও মনে হয় নাই। সকলেই নির্নিমেষ,—বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি ১০টা হইতে (ইংলণ্ডে) একটি একটি, ছুটি ছুটি, তিনটি তিনটি, তারা খসিতে লাগিল; ক্রমে আসারপাত; দক্ষিণে, বামে, মাথার উপর, যে দিকে চাও, উল্কাবৃষ্টি! কিন্তু সকলই পূর্ব্বদিক হইতে আসিতেছিল; রজনী অতিবাহিত হইতে লাগিল, ক্রমে পূর্ব্বক্ষিতিজে সিংহের উদয় হইল; তখন বুঝা গেল যে, মঘা হইতে উল্কা সকল আসিতেছে।

১২। এই উল্কাবর্ষণের জন্মভূমি।—চিত্রে দেখ, এ বর্ষণের উল্কাগুলি সিংহের অন্তর্গত বিন্দুবিশেষ হইতে বিনিক্রমণ করিতেছে। নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বে জ্যোতিষী গগনের যে প্রদেশ হইতে উল্কা পড়িতেছে, সেই প্রদেশের একখানি চিত্র সংগ্রহ করেন, এবং যে তারার দিক হইতে উল্কা পড়িল, সেই দিকে ঐ খ-চিত্রে একটি লাইন টানেন। এক একটি করিয়া উল্কার পথ-বাচক রেখাগুলি অঙ্কিত

হইলে দেখা যায় যে, উল্কাগুলি বিন্দুবিশেষ হইতে আইসে; যদিও অনেক অনেক খগুণ দিগন্তর হইতে আইসে, তথাপি অধিকাংশকেই উক্তনিয়মপরতন্ত্র দেখা যায়। আপাততঃ দেখিলেই বোধ হয়, যেন সত্য সত্য উল্কাসমূহ এক-স্থানসম্ভূত; কিন্তু একটু ভাবিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বাস্তবী গতি আর দৃষ্টা গতিতে বিলক্ষণ ভেদ আছে। স্বস্তিক বিশেষ হইতে উল্কাপাত হইলেও ভূতলের ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ দর্শকগণ ভূপঞ্জরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাহাদের গমনাগমনের নির্দ্দেশ করিতেন; কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীর যেখান হইতে দেখ না কেন, সকলেই বলিবে, এক স্থান হইতে তারা খসিতেছে। ফল কথা, এই উল্কার গতি সমান্তর রেখায়; আমরা দেখিবার সময় মনে করি, সেগুলি

এক বিন্দু হইতে আসিতেছে, এবং আসিতে আসিতে তফাৎ হইয়া পড়িতেছে, যেমন রেলওয়ের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হইবে, দুই খান রেল ক্রমে কাছাকাছি হইতেছে, এবং কিছু দূরে দুইখানি মিলিয়া একখানি হইয়া গিয়াছে।

১৩। সৈংহিকেয়।—উক্ত উল্কাবর্ষণ সৈংহিকেয় নামে অভিহিত; এ গুলি সিংহরাশি হইতে আইসে; এই সৈংহিক সংঘাতের সুদীর্ঘ পর্য্যটনের অৰ্দ্ধাবশেষ হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহারা রবি হইতে পরমান্তরে ছিল, অর্থাৎ অপহৈলিক প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি পরিহেলিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ষে বর্ষে পৃথিবী এই উল্কাকক্ষা পার হইতেছেন; বর্ষে বর্ষে সৈংহিকেরা সেই সৰ্ব্বনেশে জায়গার দিকে সরিয়া আসিতেছে; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পোতাধান পৃথ্বীজালে পড়িয়া প্রাণে মরিবে। ১৮৯৯ বা তাহার পর বৎসর বা উভয় বর্ষে, পূর্ব্ববৎ চমৎকার উল্কাসার বিকাশ পাইবার সম্ভাবনা। এমনও হইতে পারে, পোতাধান পড়িবার পূর্ব্বে ভূজালিনীর বায়ুরূপ বেঁউতী তাহার সঙ্গে আড়া পার হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় এখন আর এক বৎসর তাহাদের কোন অনিষ্টশঙ্কা নাই। পরন্তু যে উল্কাগুলি ঝাঁকের অগ্রে থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইল; কিন্তু যেগুলি পশ্চাৎভাগে থাকে, সেগুলি কোটিশঃ ব্যাপ্তমুখ বায়ু দ্বারা কবলিত হয়। আবার এমনও হইতে পারে যে, পোতাধানের উপর উপর্য্যুপরি দুই বৎসর জাল পড়িতে পারে। প্রথম বৎসর পৃথিবী যদি উল্কাসংঘাতের অগ্রভাগ দিয়া যায়, পর বৎসর পৃথিবী ৬০ কোটি মাইল ঘুরিয়া আসিয়াও ঐ সংঘাতের শেষ অংশকে ধরিতে পারে,—উল্কাসংঘাত এতই লম্বা। উপরি উপরি দুই বৎসর নবেম্বরে উল্কাবর্ষণের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

১৪। উল্কাসংঘাত ক্রমশঃ কক্ষাবৃত্তে ছড়াইয়া পড়ে।—প্রতি ৩৩ বৎসরে কোটি কোটি উল্কা ভূবায়ুতে নিপতিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়; অতএব উল্কাসংখ্যার যে ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং তন্নিবন্ধন ভবিষ্যতে উল্কাবর্ষণের এবম্ভূত প্রভা ও শোভা থাকিবে না। ঔজ্জ্বল্যহানির আরও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। উল্কাসংঘাতের আকার ক্রমশঃ পরিবৰ্দ্ধিত হইতেছে। সংঘাতের প্রত্যেক উল্কা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষায় ভ্রমণ করে; কক্ষা সকল অবশ্য সমান হইতে পারে না, সুতরাং ভ্রম কালের বিভিন্নতা ঘটে। একটি উল্কা যদি ৩৩ বৎসরে ঘুরে, তবে হয় ত আর একটিকে ঘুরিতে ৩৪ বৎসর লাগিবে। অতএব যদি কোন সময়ে সকলে একত্র হইয়া এক স্থান হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করে, তবে তাহাদের কক্ষার পরিমাণের ভেদ প্রযুক্ত অনেকে

অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে, সুতরাং কালক্রমে উল্‌কাসমূহ পথময় ছড়াইয়া পড়িবে, এবং নবেম্বরে আর সে উল্‌কাপাতের সে রকম ধুমধাম থাকিবে না।
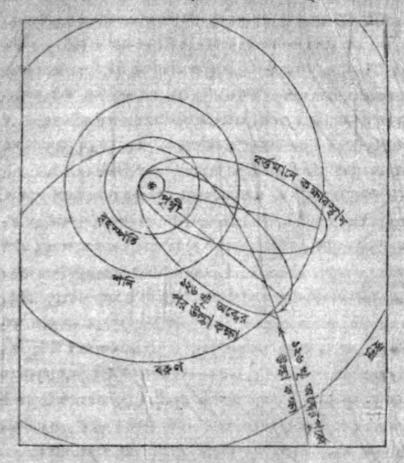
১৫। গ্রহদিগের আকর্ষণজনিত উল্‌কাকক্ষের পরিবর্ত্তন।—জ্যোতির্ব্বিদেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ধূমকেতু ও উল্‌কা, এই উভয়বিধ জ্যোতিষ্ক অনন্ত আকাশের সুদূর প্রদেশ হইতে ক্ষেপণি বৃত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সৌর জগতে উপনীত হয়, এবং এখানে আসিয়া গ্রহগণ কর্ত্তৃক বিক্ষুব্ধ হইয়া পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অখণ্ড পটোলাকার মার্গে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সুতরাং সাবিত্র পরিবারের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গ্রহধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ১৪ই নবেম্বরের উল্‌কাসংঘাত যখন প্রথমতঃ ১২৬ খৃষ্টাব্দে আদিত্য-অধিকারে প্রবেশ করে, তখন উহাকে বরুণের অনতিদূর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই বরুণসান্নিধ্যবশতঃ স্বল্পকায় তাত্ত্বিক উল্‌কাসমূহ আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ব পথ ক্ষেপণী পরিত্যাগ করিয়া বৃত্তাভাসে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

১৮৬

১৬। সৈংহিকের গতি। প্রতি ভূভ্রমে উল্‌কাসংঘাত কেপ্‌লারের নিয়মাধীন হইয়া ঘুরিতে থাকে; তখন গতি অত্যন্ত মন্দ হয়, প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইলের কিছু অধিক; ক্রমশঃ রবির যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই বেগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং যখন ভূকক্ষার উপনীত হয়, তখন বেগ এক সেকেণ্ডে ২৬ মাইল হয়; তখন পৃথিবীর গতি প্রায় উল্টা দিকে এবং এক সেকেণ্ডে ১৮ মাইল, সুতরাং এ সময়ে উল্‌কাসমূহ ভূবায়ু কর্ত্তৃক আহত হইলে, আহতির বেগ সেকণ্ডে প্রতি ৪৮ মাইল হয়। যদি সমাঘাত হইতে পরিত্রাণ পায়, তবে ভূয়ঃ অগ্রসর হইতে থাকে; এখান হইতে বেগ কমিতে থাকে, পরিশেষে ৩৩$\frac{1}{8}$ বৎসরে চক্র সমাপ্তি করে।

১৭। সৈংহিকের দৈর্ঘ্য।—এই অসংখ্য উল্‌কাসংঘাত সুদীর্ঘধারাকারে বিন্যস্ত; এই ধারার বিততির তুলনায় বিস্তৃতি অকিঞ্চিৎকর। সাত ফুট পরিমিত বৃত্তাভাস অঙ্কিত করিলে দেড় ফুট বা দু' ফুট লম্বা সেলাই করিবার রেসমী সূতা উল্‌কাধারার অনুরূপ হইবে। সূতা গাছটি ঐ বৃত্তাভাসে আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। যদি বলি যে, সূতা গাছটি লক্ষ মাইল চওড়া, তবে ভাবিয়া দেখ, সে গাছটি লম্বায় কত। লম্বারও একটা মোটামুটি এষ্টিমেট করা যাইতে পারে। সৈংহিকেরা যখন ভূকক্ষায় উপনীত হয়, তখন উহাদের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৬ মাইল। এই বেগে সমস্ত উল্‌কা ট্রেনকে ভূকক্ষা পার হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগে। ১৮৬৬র ১৩ই। ১৪ই নবেম্বর তারিখের রজনীতে পৃথিবী এই উল্‌কাস্রোতের শীর্ষভাগে অবগাহন করিয়া পাঁচ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত নিমজ্জিত ছিলেন, তাহার পর স্রোতের অপর পারে বাহির হইলেন। এখন পৃথিবীর গতি ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখ যে, পাঁচ ঘণ্টায় পৃথিবী কত দূর চলিলেন। এই পাঁচ ঘণ্টার পথ উক্ত প্রবাহের চওড়া পরিমাণ।

১৮। উল্‌কার সহিত ধূমকেতুর সম্বন্ধ।—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। গণিতজ্ঞেরা অসকৃত বেধ দ্বারা ইহার কক্ষার আকার অবস্থান ও পরিমাণ নিরূপণ করিলেন। যখন দেখিলেন যে, এই কেতুকক্ষা আর সৈংহিকের কক্ষা সর্ব্বতোভাবে এক, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কক্ষাদ্বয় সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন,—ক্ষেত্র এক, অক্ষ এক, এবং অধিশ্রয়ণ এক; এই ত্রিবিধ সমতা দ্বারা সুপ্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধূমকেতুতে আর উল্কাসংঘাতে কোন আন্তরিক গহন, অনির্ব্বচনীয়, ভৌতিক ব্যতিষঙ্গ থাকিতে পারে। পরন্তু এই সম্বন্ধে বাস্তবিক প্রকৃতি যে কি, তাহা অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।

পারসিক নামা উপরাশি হইতে যে উল্কাবর্ষণ হয়, তাহাকে পারসিকের বলে। এই উল্কাবৃষ্টি প্রতিবর্ষে ৯ই, ১০ই, ১১ই আগষ্টে হয়। অতি যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগের কক্ষা অবধারিত করিয়া আচার্য্যেরা দেখিয়াছেন যে, এ কক্ষাও ধূমকেতুবিশেষের কক্ষার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়।

অন্তর্ম্মদা নাম্নী নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭ নবেম্বর তারিখে ভূরিপ্রমাণে উল্কাবর্ষণ হইয়াছিল। এই উল্কাসংঘাত আন্তর্ম্মদের নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ স্থলে বিস্ময়ের কথা এই যে, যখন পৃথিবী বিওলার কেতুকক্ষা পার হইতেছিলেন, তখনই তাঁহাকে অন্তর্ম্মদেয়বর্গে উপনীত হইতে হইল। অনন্তর গণিত দ্বারা অবগতি হইল যে, বিওলার কক্ষা আর অন্তর্ম্মদেয়ের কক্ষা একই। এখন দেখা যাইতেছে যে, ধূমকেতুতে আর উল্কাতে যে একটা সবিশেষ সম্পর্ক আছে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। অধিকন্তু, এই ধূমকেতু ১৭৭২এ দৃষ্ট হয়; পুনঃ ১৮০৫—৬এ; এখনও ইহার সপ্তবার্ষিক আগমন প্রকাশিত হয় নাই। পুনঃ ১৮২৬ বিএলা ইহাকে অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দেও দৃষ্ট হয়। ১৮৪৬ সালে এই ধূমকেতুকে দ্বিখণ্ড দেখিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং উহা ১৮৫২তেও যুগলরূপে দেখা দিয়াছিল। ১৮৫৯ অব্দে বিএলার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই, এবং আদিষ্ট আগমনের কাল ১৮৬৫—৬৬তেও নয়নগোচর হয় নাই। আবার ১৮৭২এ যখন বিএলার পুনরাগমনের কাল উপস্থিত হইল, ঠিক তখনই আন্তর্ম্মদেয়গণ আমার আকারে পতিত হইতে লাগিল। অতএব অনুমান এই যে, আন্তর্ম্মদেয়গণ হয় বিএলার দেহজ, নচেৎ তাহার সহিত তাহাদের গূঢ় সম্পর্ক আছে।

১৯। নির্ঘাত।—যদিও কখন কখন পতনকালে কোন কোন উল্কাকে খণ্ডীকৃত হইতে দেখা যায়, তথাপি কোনরূপ শব্দ কর্ণগোচর হয় না। সময়ে সময়ে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট উল্কোদয়ের অব্যবহিত পরেই সশব্দ বিদারণ ব্যাপার শুনা যায়। এবম্ভূত উল্কাকে নির্ঘাত বলে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বরের প্রাতে নবজরসির দক্ষিণ ভাগ দিয়া এরূপ একটি উল্কা চলিয়া গিয়াছিল যে, ঘনভ্রাচ্ছাদিত মরীচিমণ্ডল বিদ্যমানেও উহার অপূর্ব্ব দীপ্তি দ্বারা অনেকের নেত্র আকৃষ্ট হইয়াছিল। দ্যুতিবিস্ফুরণের অবিলম্বে উপর্য্যুপরি ভয়ানক সশব্দ বিদারণ ব্যাপার ঘটিল। বোধ হইল, যেন সহস্র সহস্র কামান হইতে গোলা বিনির্গত হইতেছে। বহু স্থানে বহু ব্যক্তি এই অদ্ভুত ব্যাপার নেত্র ও শ্রোত্রগোচর করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে হারাহারি ফল এই

দাঁড়ায় যে, উল্কা যখন নেত্রগোচর হয়, তখন উহার উচ্ছ্রায় ৬০ মাইল এবং বজ্রবৎ নিদারুণ শব্দশ্রবণকালে উহার উচ্চ ২০ মাইল ছিল। উহার দৃশ্যমান পথের দৈর্ঘ্য ৪০ মাইলের অধিক, ইহার বেগ ভূসম্বন্ধে অন্ততঃ প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, এবং সূর্য্য সম্বন্ধে ২৮ মাইল। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, উল্কাটি রবিপরীত; অত্যুৎকেন্দ্রিক বৃত্তাভাসে বা ক্ষেপণিতে বিচরণ করিতেছিল।

১৮৬০, ২রা আগষ্ট তারিখে সায়াহ্নে পিটরস্বর্গ হইতে নব অর্লিয়েন্স এবং চারলস্টন্ হইতে সেণ্টলুইস্, এই চতুঃসীমাপরিচ্ছিন্ন সমস্ত প্রদেশে একটি দেদীপ্যমান বহ্নিবর্তুল অবলোকিত হইয়াছিল। ইহার তিরোধানের কতিপয় মিনিট পরেই সুদূরস্থিত কামানের আওয়াজের ন্যায় গুরুগম্ভীর স্তনিত শুনিতে পাইয়াছিল। এই উল্কার দৃশ্যমান পথের দৈর্ঘ্য ২৪০ মাইল, অপক্রমকাল ৮ সেকেণ্ড; সুতরাং বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ মাইল, সূর্য্যাপেক্ষ বেগবান ২৮ মাইল।

বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রে নির্ঘাতসংখ্যা ৮০০এর অধিক দেখা যায়। আবির্ভাবকালে হারাহারি উচ্চতা ৯২ মাইল, তিরোভাবকালে ৩২ মাইল। গতির বেগ হারাহারি ১৯ মাইল।

বেগ, উচ্ছ্রায় ইত্যাদির তুলনা করিলে সাধারণ উল্কা হইতে নির্ঘাতের বিশেষ ভেদ লক্ষিত হয় না। আয়তনে এবং সান্দ্রত্বে কেবল বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। উল্কোদয়ের পরে যে শব্দ শুনা যায়, তাহা পতিষ্ণু উল্কার পশ্চাৎ শূন্যস্থানে বায়ুসন্নিপাতজনিত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। সামান্য উল্কাপাতকালে শ্রোত্রগ্রাহ্য শব্দ হয় না; তাহার কারণ এ গুলি ক্ষুদ্র ও লঘু, এবং ভূপৃষ্ঠোপরি ৫০ মাইলের উপর আসিতে আসিতে দগ্ধীভূত হইয়া যায়।

এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, উক্ত উল্কাসারের সঙ্গে কোন কালে কোন পদার্থ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখা যায় নাই। কোটি কোটি সৈংহিকেয়, পারসিকেয় এবং আন্তর্দ্ধদেয় পতিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই বলিতে পারেন না যে, এই কণাটি অমুক উল্কার অগ্রাংশ। আকাশ হইতে যেগুলি পড়ে, এবং যেগুলিকে আমরা নির্ঘাত বলি, সেগুলি উক্ত মহাসারসম্ভূত নহে; সাধারণ সাময়িক উল্কাবর্ষণ তাহাদিগের উৎপত্তির স্থল নহে।

২০। অশনি, অশনি-পাতে অবিশ্বাস।—আকাশ হইতে যে প্রস্তর বা লৌহবৎ ধাতুপিণ্ড নিপতিত হয়, তাহাকেই অশনি বলে। ব্যোমাশ্মপাতের কথায় পূর্ব্বপণ্ডিতেরা বড় শ্রদ্ধা করিতেন না। পুরাকালের অদ্ভুত উপলবর্ষণের

বিস্তর জনশ্রুতি থাকিলেও তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিতেন না; এমন কি, শতবর্ষ পূর্ব্বে অশনিপাতের কথা কল্পিত উপন্যাস বলিয়া তত্ত্বজ্ঞেরা অগ্রাহ্য করিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অমুক স্থানে রহিয়াছে, ইহা তত্রত্য প্রস্তর হইতে বিসদৃশ, ইহা আপাততঃ পার্থিব খনিজ বলিয়া বোধ হয় না, ইহা দ্বারা আহত হইয়া অমুক অমুক মরিয়াছে, ইত্যাদি কোন কথাই গ্রাহ্য হইত না, কিছুতেই বিশ্বাস জন্মাইত না।

এরূপ অবিশ্বাসও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না; কারণ, অশনিপাতের সংবাদ যাঁহারা প্রথমে প্রচার করেন, তাঁহারা প্রায়ই অজ্ঞ, অশিক্ষিত; তাহারা যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে অক্ষম; একাকী বিজন বনে প্রদীপ্ত কালানল দেখিয়া, এবং অচিরে বিভীষণ বজ্রনিনাদ শুনিয়া, সহজেই অনেকেই হতজ্ঞান এবং হতচেতন হন, অশনির বর্ণনা করিবেন কি?

২১। অশনি-সংগ্রহ ও পরীক্ষা।—১৭৯৪ অব্দে জনৈক পর্য্যটক সাইবিরিয়া দেশে এক লৌহপিণ্ড আবিষ্কার করেন; এই লৌহপিণ্ড এবং তদ্বৎ আর কতিপয় খণ্ড দেখিয়া অনেকে বুঝিলেন যে, এ গুলি পার্থিব নহে, আকাশসম্ভব। কিন্তু উক্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ পর্য্যটক বহুবিধ যুক্তি ও উপপত্তি দর্শাইলেও সার্ব্বজনিক অনুমোদন লাভ হইল না। অনন্তর ইটালি, কাশী, ফ্রান্স ইত্যাদি নানা বিদেশ হইতে ব্যোমাশ্ম আসিতে লাগিল, এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, বস্তুতঃ আকাশ হইতে প্রস্তর আদি পদার্থ পড়ে।

১৮০৭ ডিসেম্বর মাসে কনেক্‌টিকট্ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে একটি অত্যুজ্জ্বল উল্‌কাপাত হইয়াছিল; ইহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার পরেই তিন বার তোপের ন্যায় গভীর বিদারণশব্দ শুনা গেল, এবং উল্‌কের উপলখণ্ড বর্ষণ হইল। যতগুলি খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মোট ওজন ৩০০ পাউণ্ডের কম নহে। প্রস্তরের সাপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৬, ইহার অঙ্গোপকরণের মধ্যে অর্দ্ধাংশ সাইলেক, একের তিন অক্‌সাইড অব লৌহ, অবশিষ্ট বেশীর ভাগ ম্যাগনেসিয়া।

১৮৬০ মে মাসে পূর্ব্ব ওহিও প্রদেশে একটা ব্যোমাশ্ম ফুটিয়াছিল, এবং তাহাতে যে প্রস্তরবৃষ্টি হয়, তাহার ভারসমষ্টির আনুমানিক ৭০০ পাউণ্ড, সাপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫৪ এবং অঙ্গোপকরণ ১৮০৭এর অশনির সদৃশ।

১৮৪৭ জুলাই মাসে বোহিমিয়াতে যে অশনি বিদীর্ণ হয়, তাহা হইতে দুই খণ্ড প্রস্তর পড়ে; ঐ দুই খণ্ডের মোট ওজন ৭২ পাউণ্ড; উহার সাপে-

ক্ষিক গুরুত্ব ৭·৭১ ইহার উপকরণ শতকরা ৯২ লৌহ, ৫ নিকেল, অবশিষ্ট কোবল্ট ইত্যাদি।

যে সকল পদার্থে ভূপৃষ্ঠ বিরচিত, সে সমুদায় অশনিমধ্যে দৃষ্ট হয়, কিন্তু পার্থিব খনিজে ভৌতিক পদার্থের সংশ্লেষণের ভাব, আর ব্যোমাশ্মে ভৌতিক পদার্থের সংশ্লেষণের ভাব পৃথকবিধ। অতএব খনিজ হইতে ব্যোমাশ্মকে অনায়াসে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে।

২২। অশনির উৎপত্তি।—অশনির উৎপত্তির মূল নিরূপণ করিবার জন্য অনেক মত উপন্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মতেই একটা না একটা দোষ দৃষ্ট হয়, সুতরাং অসমর্থনীয় হইয়া পড়ে; অতএব আপাততঃ কোন মত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে মত অত্যন্ত সম্ভবপর। বহুসংখ্যক ও বহুবিধ অশনি পরীক্ষা করিয়া খনিজজ্ঞেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, অশনি সকল জ্বালামুখসম্ভূত। স্বীকার করা গেল, ব্যোমাশ্ম বহ্নিগিরিবিনির্গত; কিন্তু সে গিরি বা গিরি সকল জগতের কোথা কোন গ্রহে বা উপগ্রহে? এ প্রশ্নের উত্তর গণিতজ্ঞ দেউন,—দেখুন সম্ভবতুলা কোন দিকে ঝোঁকে।

২৩। জ্বালামুখবিনির্গত পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের ফল।—মনে কর, মঙ্গলাদি কোন গ্রহের আগ্নেয় গিরি হইতে ভীষণ বেগে প্রস্তরাদি উদগীর্ণ হইতে লাগিল; সেগুলি ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, কিন্তু গ্রহও সেগুলিকে টানিতে আরম্ভ করিলেন, আগ্নেয়োদ্গার কতদূর যাইবে?—ফিরিল, গ্রহতলে পড়িল। মনে কর, প্রস্তরাদি প্রচণ্ডতর বেগে বাহির হইতে লাগিল, খুব উচ্চতে উঠিল; এমন কি, গ্রহের ব্যাসার্দ্ধের সমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইল; এখন কাজেই গ্রহের আকর্ষণ কমিয়া গেল, সিকি হইয়া পড়িল, * গ্রহ এখন আর সেগুলিকে সহজে ফিরাইতে পারেন না। ফের ধর, দগ্ধপিণ্ডগুলি এত বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল যে, গ্রহের ব্যাসার্দ্ধের দশগুণ ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল, এখন আর মাধ্যাকর্ষণের জোর খাটে না; পিণ্ড সকল উপরেই রহিয়া গেল। কিন্তু এত দূর উঠিতে হইলে জ্বালামুখ হইতে বিনির্গমনকালে প্রস্তর আদির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৭ মাইল হওয়া চাহি। এত বেগ কোথায় পাইবে? উদ্গীর্ণ পদার্থের বেগ দু'মাইলের অধিকও দেখা যায় নাই। এখন জ্যোতিষ ছাড়িয়া যাই কোথা?

২৪। অশনি সকল কি চন্দ্রসম্ভব?—পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্রের সামগ্রী অত্যন্ত

* কারণ আকর্ষণ দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী।

কম, ৮০ চাঁদকে এক পিণ্ডে পরিণত করিলে পৃথিবীর সামগ্রীর সমান হইবে; অতএব চন্দ্র খুব হাল্‌কা। সুতরাং, তাঁহার আকর্ষণশক্তিও তদনুসারে কম। পৃথিবী হইতে কোন জিনিস ছুঁড়িয়া দিলে আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না, এমন ভাবিয়া কোন জিনিস ছুঁড়িতে হইলে যে বেগের প্রয়োজন হয়, চন্দ্রমণ্ডল হইতে তদভিপ্রায়ে কোনও পদার্থ নিক্ষেপ করিতে হইলে অনেক কম বলেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে; পরন্তু এবম্ভূত উৎক্ষেপণের বেগ ঠিক সামগ্রীর অনুপাতী নহে; এরূপ বেগ সামগ্রীর অনুপাতী, এবং ব্যাসার্দ্ধের বর্গমূলের বিলোমানুপাতী। হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পৃথিবী হইতে কোন জিনিসকে চিরকালের জন্য বিদায় করিতে হইলে উহাকে যে জোরে ছুঁড়িতে হয়, সে জোরের ষষ্ঠাংশ হইলেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে তদর্থে প্রস্তর আদি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডলে মাইল-মিত-বলবিশিষ্ট আলামুখ থাকিলে, সেই গুলিকেই অশনিপ্রসূ বলা যাইতে পারে। যে আগ্নেয় গিরি হইতে প্রস্তরাদি বিনির্গত হইয়া এক সেকেণ্ড মধ্যে এক মাইল ঊর্দ্ধে যাইতে পারে, তাহাকে মাইল-মিত-বল বিশেষণ দেওয়া যায়। চন্দ্রমণ্ডলে প্রচণ্ড আলামুখের উপদ্রবসূচক বহুবিধ লক্ষণ লক্ষিত হয়। সেখানে আলামুখের প্রকাণ্ড গহ্বর দেখিয়া অনুমিত হয় যে, সেগুলি পুরাকালে প্রবল অগ্ন্যুদ্গীরণের স্থান ছিল। বোধ হয়, সমস্ত চন্দ্রমণ্ডলেই বহ্নিশৈল ছিল। চন্দ্রমণ্ডলবিনির্গত প্রস্তরাদি ভূতলে পতিত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং দু'দশটা সত্য সত্য পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু চন্দ্রের আলামুখ সম্বন্ধে একটা বিষম আপত্তি আছে। মনে কর, চন্দ্রমণ্ডল হইতে একখণ্ড উপল বিনির্গত হইল; উহা কেপলারের নিয়ম অনুসারে পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভূপরিত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। এখন যদি অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ ছাড়িয়া দাও, যদি স্বয়ং চন্দ্রের আকর্ষণও ছাড়িয়া দাও, তবে বিনিক্রান্ত পিণ্ড যদি এক বার পৃথিবীকে এড়াইয়া যায়, তবে আর কস্মিনকালেও ভূপৃষ্ঠে পড়িবে না। প্রক্ষিপ্তের কক্ষ আর ভূগর্ভ, এতদুভয়ের ব্যবধান ভূব্যাসার্দ্ধের কম না হইলে উক্ত প্রক্ষিপ্ত ভূতলে পড়িবে না। অতএব উপপন্ন হইল যে, চন্দ্রমণ্ডলবিনিক্রান্ত অশনি যদি ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তবে উহাকে চন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমবার ঘুরিতেই পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে হইবে। উল্কাসমূহকে চন্দ্র হইতে ভূমণ্ডল বেশী দিনের পথ নহে। অতএব যখন এখনও অশনিপাত হইতেছে, তবে সেগুলি চন্দ্র হইতে অনবরত আসিতেছে। কিন্তু চন্দ্রাদ্রিসমূহ

এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছে; সেখান হইতে পাথর কি লোহা আর বাহির হইয়া আইসে না। যদি বল যে, ব্যোমাশ্ম সকল কোন কালে চন্দ্রমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল; যদি তাহাই ধর, তবে সে বহু বর্ষের ব্যাপার; তদনন্তর তাহারা অবশ্য বৃহত্তর জ্যোতিষ্ক পৃথ্বী বা সূর্য্য পরিত; অবশ্যই ভ্রামিত থাকিবে, অর্থাৎ ব্যোমাশ্মের উৎপত্তিস্থান যাহাই থাকুক না কেন, সেগুলিকে এক্ষণে পৃথিবীর বা সূর্য্যের উপগ্রহ বা সহচরস্বরূপ ধরিতে হইবে। এক্ষণে অগত্যা চন্দ্রমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশনির জন্মভূমির অনুসন্ধানে লোকান্তরে যাইতে হইল।

২৫। ক্ষুদ্র গ্রহগণ হইতে অশনিপাত হয় কি?—তাম্রা গ্রহগণের বিম্ব ভাল দেখা যায় না, তথায় জ্বালামুখ আছে কি ছিল, তাহা বলা যায় না; পরন্তু যেটনা। এই প্রচুর [illegible]পর অস্তিত্ব দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হয়, তথায় কোন না কোন রকম আগ্নেয়গিরির [illegible]র্য্য থাকিতে পারে। বৃহদ্বিগ্রহ গুরু শনিকে একেবারে ছাড়া যাইতে পারে; তথা[illegible]ময় গিরির কোন লক্ষণ নাই; অধিকন্তু এতদ্দ্বয়ের সামগ্রীমান অত্যধিক, অ[illegible]ব তাহাদের আকর্ষণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কোন বস্তু যদি তথা হইতে বি[illegible]ক্রান্ত হইতে পারে, তবে তাহার বেগ কত ভয়ানক! পার্থিব জ্বালামুখ হই[illegible] [illegible] ৫৬ গুণে প্রবল না হইলে তথা হইতে অশনিপাত সম্ভবে না।

এখন দেখিতে হইবে, অশনি উৎপাদনে ক্ষুদ্র গ্রহগণের কোন অধিকার আছে কি না। এগুলি অতি ক্ষুদ্রকায়; ইহাদিগের ব্যাস কতিপয় মাইল মাত্র, তথা হইতে যৎসামান্য বেগে কোন পদার্থ ছুঁড়িয়া দিলে বহুদূরে গিয়া পড়িতে পারে। ২০ মাইল ব্যাস পরিমিত গ্রহে ক্রুট বলে হিসাব মাফিক ঠোকর দিলে সে বল জন্মের মত চলে যায়। ক্রিকেট খেলিরা বলের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে, বল হয় ত আকাশে উঠিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছিদ্রে ঘুরিতে লাগিল। তবেই অশনিনিক্ষেপণে ক্ষুদ্রগ্রহস্থিত জ্বালামুখের প্রচুর শক্তি থাকার সম্ভাবনা আছে, এবং সে অশনি বহুদূর পর্য্যটন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে পারে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া দেখিলে ব্যাপারটা তত সহজ বোধ হইবে না। মনে কর, অত্যঙ্গারক অন্তরীক্ষে সিরিস্ নামক ক্ষুদ্র গ্রহে একটি জ্বালামুখ আছে; তাহা হইতে অশনি উদ্গীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে হইলে, অশনির ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া বা নীচে দিয়া চলা হইবে না; উহাকে ৮০০০ মাইল ভূব্যাস পরিমিত অবিকৃত বলয়াকার

যে পৃথিবীর পথ দিয়া যাইতে হইবে, এবং উহার পতনকালে যদি পৃথিবী কক্ষার সেই স্থানে থাকেন, তাহা হইলেই হইল; নচেৎ উহা রবিপরিত সূচিছেদে আরোহণ করিতে থাকিবে, এবং অবরোহণকালে উল্লিখিত সংকীর্ণ বলয়াকার স্থানে ক্রান্তিবৃত্ত অতিক্রম করিবে। শিরিসের কক্ষাগতির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১১ মাইল। আগ্নেয় বেগ এবং কাক্ষ বেগ, এই উভয়ের সংশ্লিষ্ট যে বেগফল, তাহাই উৎক্ষিপ্তের বাস্তব বেগ। গণিতজ্ঞরা উপপন্ন করিয়াছেন যে, শিরিস্ হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থের স্পর্শরৈখিক বেগ ৮ মাইলে না হইলে উহা ভূকক্ষা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অর্থাৎ শিরিসের বেগ অত্যন্ত; ৩ মাইল কমাইতে হইবে। তবেই বহ্নিগিরিবিনির্গত পদার্থের বেগ ন্যূনকল্পে ৩ মাইল হওয়া চাই। অতএব তিন মাইলের কম বেগ পাওয়া গেল না। তবেই ক্ষুদ্র গ্রহ হইতে কোন লাভও দেখা গেল না। আ~ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর পথ অতিসংকীর্ণ; সূর্য্যস্থিত ... হইতে কোন উৎক্ষিপ্ত আসিয়া উহার ভিতর দিয়া ভূপৃষ্ঠে পড় ... সম্ভাবনা বড় কম। ৮ মাইলের কম বেগ হইলে উৎক্ষিপ্ত ভূতলে পৌ ... ছবে না। ১৬ মাইল হইলে ভাভ্রমরেখায় চলিয়া ... ১২ মাইল ধরিলে উৎক্ষিপ্ত যে ভূমার্গ দিয়া যাইবে, তাহারও সম্ভাবনা বড় কম। পণ্ডিতেরা বলেন যে, শিরিস্ হইতে ৫০ হাজার ঢেলা ছুড়িলে জোর একটা ঢেলা পৃথিবীর গায়ে লাগিতে পারে। ইহাতেই বুঝা গেল যে, ক্ষুদ্র গ্রহ হইতে অশনি আসে না; কারণ, ক্ষুদ্র গ্রহে এত প্রবল আলামুখ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, একটা অশনিকে পৃথিবীতে আসিতে হইলে ৫০ হাজারকে বাহির হইতে হইবে। এখন খুঁজিতে বাকি পৃথিবী।

২৬। তবে পৃথিবীই কি অশনির জননী?—পৃথিবীতে এখন যে সকল আগ্নেয় গিরি আছে, সে সকল নির্ব্বাপিতপ্রায়; তাহাদের আর অশনি-উদ্গীরণের শক্তি নাই। কিন্তু পূর্ব্বকালে ভূস্তররচনাকালে পার্থিব আগ্নেয় পর্ব্বত সকল প্রভূত শক্তিসম্পন্ন ছিল, তাহার সন্দেহ নাই; তথাপি অশনির পৃথিবীতে উৎপত্তি আর পৃথিবীতে নিবৃত্তি বড় সোজা কথা নহে। অশনির উৎপত্তিস্থান তো আছে, সে স্থান যে কোথা, তাহারই ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না। যে স্থানটি খুব সম্ভবপর, তাহাই আপাততঃ গ্রহণ করিতে হইবে। মনে কর, অতি প্রাচীনকালে,—কল্পারম্ভে, আগ্নেয়গিরি হইতে প্রচণ্ডবেগে প্রস্তরাদি উদ্গীর্ণ হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম পূর্ব্বক সৌরাকর্ষণের অধিকারে পতিত হইল। এখন অগত্যা ইহাকে গ্রহবৎ সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতে হইল। এই উৎক্ষিপ্ত

সকল নানাবিধ কক্ষে ভ্রমণ করিতে পারে ; তন্মধ্যে যেগুলি বৃত্তাভাসে চলে, সেগুলিকে প্রতি ভ্রমে পৃথিবীর পথের যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, সেই স্থান দিয়া যাইতে হয়। এ সম্বন্ধে পৃথিবী আর শিরিষে অনেক প্রভেদ। শিরিষ-বিনির্গত ৫০ হাজার উৎক্ষিপ্তের মধ্যে একটা ভূতলে পড়িতে পারে, পৃথ্বী-বিনির্গত প্রত্যেক উৎক্ষিপ্ত পৃথিবীতে পড়িতে পারে। এ মত যদি গ্রাহ্য হয়, তবে অসংখ্য অশনি বৃত্তাভাস কক্ষে রবিপরিত ভ্রমণ করিতেছে। ইহা-দিগের কক্ষা অবশ্য পৃথিবীর পথ কাটিয়া যায়। পৃথিবী যখন এই স্থানে উপনীত হন, তখন যদি অশনি সকল ঐ পথ অতিক্রম করিতে থাকে, তবে দীর্ঘ প্রবা-সের পর জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করে !

অশনির উৎপত্তিসম্বন্ধে, চান্দ্র-বাদ অপেক্ষা ভৌমবাদ সম্ভাব্যতর। চান্দ্রবাদে চন্দ্রমণ্ডলে অত্যাপি প্রজ্বলিত আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, ভৌমবাদে অতীতকালে পার্থিব আগ্নেয়গিরি পর্য্যাপ্তশক্তিসম্পন্ন ছিল বলিলেই চলে। আমাদের জ্বালামুখ হইতে এখনও প্রস্তরাদি উদ্গীর্ণ হইয়া ভাবী অশনি প্রস্তুত হইতেছে, এ কথা অবশ্য কেহ বলেন না ; কিন্তু এখান হইতে যেগুলি প্রয়াণ করিয়াছিল, সেগুলি যে ফের পৃথিবীতে পড়িতেছে, এ কথা অসঙ্গত বোধ হয় না। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইল যে, যদি অশনিসমূহ তারাগ্রহসদৃশ কোন বিশালজ্যোতিষ্কস্থিত জ্বালামুখসম্ভব বলিয়া স্বীকার কর, তবে সে জ্যোতিষ্ক এই বসুন্ধরা।

২৭। ভৌমবাদ-সমর্থক বৃত্তান্ত।—অশনি সকল যে অতি প্রাচীন কালে ভূতলেই জন্মিয়াছিল, তাহা তাহাদের অঙ্গীভূত পদার্থনিচয়ের লক্ষণ দেখিয়া সম্ভব বোধ হয়। অশনিপিণ্ডের সবিশেষ লাক্ষণিক পদার্থ লৌহ আর নিকেলের মিশ্রণ, ইহা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অশনিবিশেষে প্রায় উক্ত মিশ্রণমাত্র দৃষ্ট হয় ; কোন কোন স্থলে সমস্ত পিণ্ড লৌহ-নিকলের কণাময়। কোন ভূতত্ত্ববিদ্ গ্রীনলণ্ডে এক খণ্ড প্রাকৃত লৌহ নিকেল পাইয়া তৎক্ষণাৎ উহার আকাশ-সম্ভবত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম পরীক্ষার পর প্রকাশ পায় যে, এই অশনি বাসল্ট নামক পাথরে শায়িত। বাসল্ট শ্যামনীলিম কঠোর অকর্ম্ম্য শিলাবিশেষ, ইহা ভাঙ্গিয়া রাস্তার খোয়া হয়। এই বাসল্ট জ্বালামুখ হইতে প্রথম উদ্গারিত হয়, এবং ইহার অর্দ্ধতরলাবস্থা থাকিতে থাকিতে উহার উপর লৌহোদ্গার আসিয়া পড়ে। বাসল্টে প্রাকৃতিক লৌহ অন্যান্য স্থানেও পাওয়া গিয়াছে।

দেখা গেল যে, বড় বড় নিরেট অশনি দেখিয়া তাহাদের ভূসম্ভবত্বের

প্রমাণ পাওয়া যায়। সামান্য উল্কা সকল ভস্মীভূত হওয়ার পর, ধীরে ধীরে রজোবর্ষণেরও সম্ভাবনা। সুমেরু প্রদেশের তুষারে রেণুচিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং সেই রেণুতে লৌহাণু পাওয়া যায়। সূর্য্যকিরণে যে ধূলিকণা দেখি, গ্রহসামগ্রী হইতে যে ধূলা ঝাড়ি, সে সকল আশ্‌মানী বলিলেও বলিতে পার। সাগরগর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত পঙ্কে লৌহের চিহ্ন পাওয়া যায়; এ লৌহের গুঁড়া অবশ্য আকাশ হইতে পড়িয়া থাকিবে। এখন আকাশ হইতে কেবল ধূলা পড়িতেছে; পৃথিবী হইতে কণামাত্রও যাইতেছে না; অনিবার্য্য ফল এই হইতেছে যে, অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে পৃথ্বী পৃথুতরা হইতেছেন।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অত্যঙ্গারক,	Beyond orbit of Mars.	চক্র সমাপ্ত করে	Completes circuit.
অত্যুৎকেন্দ্রিক,	Of great eccentricity.	চান্দ্রবাদ,	Lunar theory.
অনাদিষ্ট,	Not predicted.	জ্বালামুখ,	Volcano.
অনুপাতী,	Proportioned.	তাপবাদ,	Theory of heat.
অভ্রমর্দা,	Andromeda.	দগ্ধদশান্ত,	Burnt end of wick.
অপক্রমকাল,	Duration.	নন্দনকানন,	ইন্দ্রের কানন।
অপহেলিক,	Aphelion.	নির্ঘাত	Detonating Meteors.
আগ্নেয়,	Volcanic.	নির্ব্বাপিত,	Extinguished.
আদিষ্ট,	Predicted.	পরিহেলিক,	Perihelion.
আভ্রমর্দেয়,	Pertaining to Andromeda	পারসিক,	Per.
আসার,	Shower.	বাসল্ট,	Basalt.
ইন্দ্র,	Neptune.	বিএলা	Biela.
উৎক্ষিপ্ত,	Thrown up, Projectile.	বরুণ,	Uranus.
উৎক্ষেপণ,	Throwing up.	বহ্নিবর্ত্তুল,	Tirecall.
উদ্গারিত,	Vomitting.	বিস্তৃতি,	Extension.
উল্কা,	Shooting stars.	বেগ,	Velocity.
একশঃ,	One by one,	বৈজয়ন্ত,	ইন্দ্রালয়।
কক্ষা,	Orbit.	ব্যোমাশ্ম,	Meteor.
ওলিফক,	Olifak.	ভ্রমণ,	Revolution.
ক্ষুদ্র গ্রহগণ,	Minor planets.	ভ্রমণরেখা,	Hyperbola.
ক্ষেত্র,	Field.	ভূবায়ু,	Atmosphere.
ক্ষেপণী,	Parabola.	ভৌমবাদ,	Terrestrial Theory.
ক্ষোদিষ্ঠ,	Smallest.	মঘা,	Regulus.
খদ্যুৎ,	Shooting stars.	রামখড়ী,	যে পাটোলাকার খড়ীতে ছেলেরা ক খ লেখে।
খেট,	Planets.		
জ্বালামুখের গহ্বর	Crater.	শিরিষ	Ceres.
		সৈংহিকেয়,	Leonides.

কবিতাকুঞ্জ।

প্রেম কি বুঝান যায় ?

১

প্রেম কি বুঝান যায় ?
নয়নে নয়নে না বুঝিল যদি,
কেমনে বুঝাব তায় ?
সে ত চলে যায়, ফিরিয়া না চায়,
আমি শুধু চেয়ে থাকি—
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,
আঁখিতে মিলিত আঁখি।
বহে যেত দিন কোন পথ দিয়ে,
নয়নে নয়ন মিলি—
পলক পড়ে না, জগৎ নড়ে না,
ত্রিসংসার নিরিবিলি !

২

প্রেম কি বুঝান যায় ?
নিশাসে নিশাসে বুক ভেঙে আসে,
কেমনে বুঝাব তায় ?
দাঁড়াইলে কাছে দুরু দুরু হিয়া,
গুরু গুরু গরজন—
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,
দেহে মনে সেই রণ !
শিথিল নিশাস, সুবাসে সুবাস,
স্বরেতে মিলিত স্বর—
পড়ে র'তো দেহ ভেসে যেত প্রাণ
কোন আকাশের দূর !

৩

প্রেম কি বুঝান যায় ?
আভাসে বিভাসে যদি না [illegible]ল,
কেমনে বুঝাব তায় ?
যদি বলি করি, আছে কাছে ঘুরি,
সে যদি ডাকিয়া কয় !
পাশাপাশি ক'রে দাঁড়াইয়া থাকি,
সে যদি চাহিয়া লয় !
শিথিল অঞ্চল সরমে সম্বরি
কত না যতন করি !—
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত
বাঁধিত আঁচল ধরি !

৪

প্রেম কি বুঝান যায় ?
কথায় কথায় মরম-ব্যথায়
কেমনে বুঝাব তায় !
কোথা তার আদি, কোথা তার শেষ,
কত আঁখিজল-মাখা !
একে সদা হায় আন বুঝে যায়,
এত লাজ-ভয়-ঢাকা !
বলি যেন কত, মুখখানি নত,
কাঁপে শুধু ঠোঁট দুটি—
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,
হৃদয়ে পড়িত লুটি !
প্রাণ পেত ভাষা ভাষা পেত আশা
পরকাল ইহকালে—
দুটি হৃদয়ের একটি আঘাত
বাজিত সমান তালে !

৫

প্রেম কি বুঝান যায় ?
না দেখে দেখুক, না বুঝে বুঝুক,
সুখ দুখ সেই পায়।
কোথা রবি ওঠে, কোথা ফুল ফোটে,
ছোটে কেন পরিমল !
দেবতা আকাশে, ঋষি বনবাসে,
মাঝে কেন আঁখিজল !
পরবাসে পতি, কেন মরে সতী ?—
সতি পতি সেই পায়।
আপন মরমে আপনি মরিয়া
কেমনে বুঝাব তায় !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বাঁশি।

কবে তুমি বেজেছিলে [illegible]
হে বিরহবেদনাভরা বাঁশি ! কালিন্দীর
কালো বুকে, সেদিন কি তরঙ্গ অধীর
প্রথম পড়িল লুটি তটের চরণে ?
জোয়ার কি দিল দেখা প্রেমেরই স্বপনে
কদম্বকুসুম-রূপে [illegible] ?

সুনীল অঞ্চলে গণ্ড ঢাকি' অশ্রুনীর
ফেলিল কি তপ্তশ্বাস সুপ্ত সখীগণে ?
কিশোরী সে ধরিত্রীর কোমলহৃদয়ে
প্রথম সে পূর্ব্বরাগ, কি অন্ধ আগ্রহে
কি গূঢ় গৌরবভরে উঠেছিল জাগি ?
কি উচ্ছ্বাসে মরমের গোপন নিলয়ে
কেঁদেছিল অবিরত সর্ব্বস্ব তেয়াগি
অপূর্ব্ব হৃদয় লাগি' অপূর্ব্ব বিরহে ?

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

কুহু।

গৌর সারং—ঝাঁপতাল।

কি জানি কেন কোয়েলা গায় এত মধুর গানে।
ও কুহু কুহু, কুহুর তান শিখিল কোনখানে।
কত যে নব মিলনকথা, কত দীর্ঘ বিরহব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু কুহু কুহু কুহুর তানে।
বলে সে বুঝি "এসেছি আমি ওগো
এসেছি আমি,
বিশ্বভরা অমিয় লয়ে স্বর্গ হ'তে নামি,
সঙ্গে লয়ে শ্যামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধভরা,
সঙ্গে লয়ে মলয়মধু তব সন্নিধানে।"
মধুরতর মিলনগাথা গেয়েছে কবি শত ;
গাহনি কেহ বিরহগান পাখী রে তোর মত।
—কি অনুরাগ, কি অনুনয়, কত বাসনা-
বেদনাময়,—
এ কুহু তাই আকুল করে বিরহিজনপ্রাণে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গান।

এস হে এস হে প্রাণে প্রাণসখা !
আঁখি তৃষিত অতি, আঁখি-রঞ্জন,
আঁখি ভরিয়া মোরে দেহ দেখা।

খুলিয়া প্রাণের আধ লাজ-বসন,
জীবনমন্দিরে পেতেছি আসন,
এস হে বিরহক্লেশনাশন,
লহ মম মালিকা।

উন্মাদ এ তরঙ্গ, উথলিছে ভীষণ ভঙ্গ,
ঘোর তিমির হেরি দশ দিক,
এস হে নবীন নাবিক !

সুখ-তরণী মাঝে নাহিক কাণ্ডারী
প্রেম-পারাবারে আমি একা।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

মরণের পথে।

মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি !
আমি যবে ভেসেছিনু মরণ-সাগরে
তুমি কেন দেখা দিলে নয়নের পরে !
ঘন মেঘে ঢাকা পথ, চিকুর চমকে,
দূরে কাছে কোথা কিছু নাহি পড়ে চোখে—
অস্তমিত দিনমণি আঁধারের মাঝে
তুমি কেন প্রকাশিলে ইন্দ্রধনু সাজে !
গন্ধে গন্ধে ছন্দে ছন্দে নাচিলে সৈকতে
যারা অবসানপ্রায় মরণের পথে
লাবণ্য ফুটালে কেন দুই কূল ভরি'।—
বড় সাধে তাই আমি ফিরাইনু তরি।

ছবি-আঁকা সেই গ্রাম, সেই নদীতীর,
লতিকামণ্ডপচ্ছায়ে সেই সে কুটির,
বাঁধা ঘাট, খেয়া তরি, সেই লোকজন,
পরিত্যক্ত আমার সে প্রিয় নিকেতন—
ভিজায়েছি যারে বিদায়ের অশ্রু দিয়া—
স্বপ্নসম একে একে গেল যে ভাসিয়া।
বাঁশরীর রবে মুগ্ধ কুরঙ্গের প্রায়
নাহি রাত্রি নাহি দিন আঁখি শুধু চায়,
সুদিন দুর্দ্দিনে চির আত্মবিহীন
তাহার মতন তব অঞ্চলেতে লীন
ফিরিয়াছি অনিশ্চিত কূল হ'তে কূলে—
যদি চাহ একবার দুটি আঁখি তুলে !
মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি !

পূর্ণিমা রজনী, নিস্তরঙ্গ নদীনীর,
বিবকূলে কুঞ্জ বহে সমীরণ ধীর,

প্রস্তরসোপান পরে শিবের মন্দির—
যেন কোন্ মায়াপুরে নন্দনের বনে
ভাসিয়া এসেছি স্রোতে মোরা দুই জনে!—
মন্দ বহে তরি, তরণী চমৎকার,
সৌন্দর্য্য মাঝারে তুমি সুন্দরী অপার—
ঈষৎ হেলায়ে তনু এলাইয়া কেশ,
চারু অঙ্গে সম্বরিয়া নীলাম্বরী বেশ—
মৃণাল বাহুর পরে কমল-আনন
মোহন মূরতি মাঝে মদির নয়ন—
মন প্রাণ যাহা ছিল করিলে হরণ!
ব্যাকুল অন্তরে চিরপিপাসিত-হিয়া
মন্ত্রমুগ্ধ আমি শুধু রহিনু চাহিয়া!—
কখন্ কাটিয়া গেল সুখবিভাবরী!
মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

সুদূর তটান্তে ধীরে উদিল তপন,
শান্তিময় নিশীথের ভাঙিল স্বপন;—
অসংখ্য যাত্রীরে লয়ে ভরাপালে চলি'
দিকে দিকে বাহিরিল তরণীমণ্ডলী;—
যেন কোন শুভলগ্নে শুভসন্ধিস্থলে
রাণী উষার আদেশে দলে দলে দলে
বাহিরিল বন্দী সবে, আমি শুধু হায়,
তোমার পশ্চাতে চিরদণ্ডীটির প্রায়
একা রহিলাম পড়ি';—সপ্তমে চড়ায়ে
মাঝিরা ছাড়িল তান, পায়ে পায়ে পায়ে,
বধূরা নামিল ঘাটে জল লইবারে,—
কেহ খুইছে বাসন বসি' একধারে;—
জেলেরা পাতিল জাল—তীরে টানি' আনি'
কেহ সারে একমনে ভাঙা তরিখানি;—
মধ্যাহ্ন-গগনে রবি কখন না জানি।
মনোরথ রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

দেখিতে দেখিতে পড়ে' এল দীর্ঘ বেলা;
সন্ধ্যাদেবী ভাসাইয়া সুবর্ণের ভেলা
ক্রমে দেখা দিল;—জলে স্থলে নভস্তলে
সুবর্ণের খেলা;—দেবী কনক অঞ্চলে
দিল সাজায়ে তোমায়;—চন্দ্রিকাবরণ
অলক মুখে জ্বলিল নীরের কিরণ।
খণ্ড মেঘ ভেসে যায় নীলাম্বর পরে,
বাজিল আরতি-ঘণ্টা, তটিনী-শিয়রে
জ্বলিল সন্ধ্যার দীপ, সুন্দর তরণী;
তারি মাঝে তুমি অয়ি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি,
জীবনের চিরবাঞ্ছা পরাণের হার
স্বভাবসুন্দরি অয়ি প্রেয়সি আমার,
কোথায় টানিছ মোরে!—থাম একবার!
আমারে তুলিয়া লও ঐ তরণী পরে!—
নয়নপল্লবচ্ছায়ে ফুল্ল বিম্বাধরে
অতল অগাধ ওই হৃদি-সরোবরে
জীবনের চিরদুঃখ হয় অবসান!—
কাঁদিয়া ফিরিল মোর নিষ্ফল আহ্বান!
মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

* * *

সহসা ভাঙিল স্বপ্ন—যেন অমানিশি
ঘন মেঘ নেমে এল আঁধারিয়া দিশি!—
ঝর ঝর ঝরে জল, বায়ু বহে বেগে,
ওড়ে ফুল পড়ে পাতা ঢেউ উঠে জেগে!
অশনি হাঁকিয়া যায়,—ঝটিকার ঘায়ে
নদী কাঁপে থরথরি তটেরে জড়ায়ে!
বিহঙ্গের প্রায় দূরে শ্বেতপাল তুলে
দেখিনু তোমার তরি লাগিল সে কূলে
কর্ণহীন তরি মোর ছিন্নপাল তার—
মনে হ'ল এই বার বুঝি যায় যায়!
ঝটিকা আসিল বেগে দিগন্ত আবরি,
নারিনু রাখিতে আর ডুবে গেল তরি!

* * *

চাহিয়া দেখিনু একা পড়ে' আছি তীরে!
ভীষণ সংগ্রামশেষে সমরশিবিরে
সৈনিকের মত নিদ্রামগ্ন চরাচর!
অম্বরে হাসিয়া উঠে পূর্ণ শশধর!
যত দূর আঁখি ধায় দূর দূরান্তরে
চাহিনু আবার;—শুধু কুলু কুলু স্বরে
নদী গাহে গাথা! হায় আমি যার তরে
মৃত্যুপারাবার হ'তে আসিনু ফিরিয়া—
মনোরথ রাণি মোর জীবন-অমিয়া
সে বাহি গো আজ!—তরণী

কখন্ গিয়াছে চলি। আমি কোথা যাই।
মৃত্যুপথে ফিরে যাই সে শকতি নাই।
মনোরথ-রাশি মোর হায় গো সুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সে আমার গেছে চলে।

সেই শেষ বারিবিন্দু মধ্যাহ্ন মরুর,
বসন্তের শেষ ফুল নিদাঘ তরুর,
নিরাশার শেষ আশা মুমূর্ষু জনার,
রজনীর শেষ স্মৃতি মলিন জোছনার,
জীবনের একমাত্র প্রীতি-পারাবার,
শান্তিময়ী সুখময়ী মূর্ত্তি মমতার,—
আঁধারে একাকী ফেলে
কোথায় গিয়াছে চ'লে,
কে বলিবে কোথা পথ সেই অমরার?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

হাসির গান।

চাষার পূর্ব্বরাগ।

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে,
ঐ বাবলাগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে।
সে এমনি করে' চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—ঠিক্ এ—এইখানে।
তার রং যে বড়ই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা, } কোরস
তার জন্যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান। }
পরণে তার ভুরে শাড়ি মিহি শান্তিপুরে;
ঐ শান্তিপুরে ভুরে রে ভাই শান্তিপুরে ভুরে।
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা;
আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—সকলকার সেরা।
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি।]
ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা, পায়ে বাঁকা মল;
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা, কপালটি একরত্তি;
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি।]
তার এলো চুলের কিবে বাহার—আর বলবো কিরে;
—তার হাঁটুর নীচে পড়েছিল—মিথ্যে বলিনি রে;
মুই মিথ্যে কথা'র লোক নইরে—করিনিও ভুল;
ও তার হাঁটুর নীচে চুল রে ভাই হাঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি।]
তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট, গোল গাল্ সে তার ঢং;
আর কি বলবো মুই ওরে নেতাই! কিবে সে তার রং;
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল কোরে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়নের ছুরি।
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি।]

বিরহ।

ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমারই বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমোই।
কি বল্‌ব আর—পরিত্যাগ (এখন) একেবারে চিঁড়ে দই—
রোচে না ক মুখে কিছু (আর) পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ।

এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশপ্রাণে সন্দেশ খাই,
কভু দু'খান সরপুরি—আর দুঃখের কথা কারে কই?
দুঃখের বারিধির আমার কোন মতেই পাইনে থৈ—
—আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ!

(এখন) বিকেলটাও যদি হায় সর্ব্বৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি বিনা প্রাণটা আর বাঁচে কৈ!
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে দু' চার এয়ার ডেকে (এ দারুণ) বিরহের বোঝা বই।

(এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে ঘুম আসে না নয়ানে,
রাত্রির অন্ত মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টা জেগে রই।
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "কিষণকাম" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শর্ম্মার লিখিত একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী "নক্ষত্রের ক্ষমতা" প্রবন্ধে 'অনন্ত আকাশের রাশির সহিত পৃথিবীর অগণ্য মানবের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না'—এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক এ সম্বন্ধে বিবিধ উদাহরণ সঙ্কলিত করিয়াছেন, কিন্তু কি সমূলক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বোধগম্য হইল না। কোনও অজ্ঞাত লেখকের "দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতীকার" নিবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বরুণ" একটি জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ রচনা। লেখক যদি ভাষা আরও সরল ও প্রাঞ্জল করেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্যোতিষনিবন্ধগুলি সাধারণ পাঠকের অধিকতর অধিগম্য ও আদরভাজন হয়। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "বামাচারের মূলক" শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমাকান্ত গুপ্ত "আনন্দময়ী" প্রবন্ধে আনন্দময়ী দেবীর জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠক মূল প্রবন্ধে আনন্দময়ীচরিত্রের পরিচয় পাইলে তৃপ্ত হইবেন। শ্রীমতী সরলা দেবী "অনাথবন্ধু" নামক একখানি উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা

লেখিকার মুখবন্ধের মর্ম্ম এই যে, বইখানি উপন্যাস হিসাবে যদিও পদাঘাতঃকরণ করা সঙ্গত নয়, তথাপি সংসারবাসী পাঠকের আমার্জ্জন মত এখানি পড়িয়া দেখা ও শিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু উপন্যাসের মোড়কে মুড়িয়া এই কুইনিন চালান কেন? আজকাল কথাও কি উপন্যাসের মধু অনুপান দিয়া চালাইতে হইবে! শ্রীমতী সরলা দেবীর এই অভিনব মন্তব্য পাঠ করিয়া আমরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়াছি।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রস্তাব"—দ্বিতীয় অংশ, শিক্ষাসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য। লেখকের প্রস্তাব উত্তম, কিন্তু কে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে, তাহার উপায়ও স্থির করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এই সংখ্যার "শেলি" প্রবন্ধে বিলাতী কবি শেলির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। আরম্ভপাঠে আশা ও কৌতূহলের উদ্রেক হয়; লেখক বঙ্গসাহিত্যে শেলির প্রভাব কিরূপ, তাহারও আলোচনা করিবেন বলিয়াছেন। আমরা সাগ্রহে এই প্রবীণ লেখকের মতবাদ শুনিবার আশায় রহিলাম। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "নেপালের পুরাতত্ত্ব" প্রশংসনীয় ও সুপাঠ্য। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "হেনরী মার্টিন" প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক।

সখা ও সাথী। জ্যৈষ্ঠ। এখানি 'সখা ও সাথীর' জুবিলি-সংখ্যা। পত্রের পুরোভাগে মহারাণীর যে স্বতন্ত্র ছবিখানি প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানি উৎকৃষ্ট। এই চিত্রের তুলনায় অপর চিত্রগুলি নিকৃষ্ট। এই সংখ্যায় সতরখানি চিত্র আছে। "হীরক জুবিলি" প্রবন্ধে মহারাণীর জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতেই পত্রিকার অধিকাংশ পরিপূর্ণ। অন্য প্রবন্ধ বিশেষ কিছু নাই। এবারকার সাথীর আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। চিত্রে যে যত্ন, রচনায় তাহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্ট হইল না।

মুকুল। জ্যৈষ্ঠ। স্বর্গীয় ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত ও চিত্রখানি বেশ হইয়াছে। "শম্বুক" প্রস্তাবটির উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "স্নেহময়ী" কবিতাটি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। ছেলেদের জন্য আমরা এমনই খাঁটি বাঙ্গালা কবিতা দেখিতে চাই। কেবল শিশু কেন, শিশুর গুরুজনগণও কবিতাটি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবেন, এই আশায় আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম;—

"ঘুম পেয়েছিল তাই নে'ছিল মাকুনি,
ঘুমাইল খেয়ে বাছা কতই বকুনি।
না দিয়া কাহারো কোলে,না ভুলিয়া মিষ্ট বোলে,
অমনি মুদিয়া চক্ষু বাঁধিয়া আদুর,
তখনি বুঝেছি ঘুম ধ'রেছে যাদুর।

"সোণার যাদুরে মোর কে দিয়াছে দুখ,
বিনা দোষে কে ব'কেছে,কে করেছে রুখ!
ওর যে ননীর প্রাণ, সয় কি গো অপমান?
ঘুমুলো, বকুনি তবু গেল না ত ভুলে—
এখনো উঠিছে মরি ঠোঁট ফুলে ফুলে।

"বাছার চোকের জল শুকাইল চোকে,
যাদুকে কেন গো তোরা ব্যথা দিলি ব'কে?
রাখিয়াছে চাঁদমুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
একমাথা চুল তার যাতনায় ভার—
গোটা মাথা ভিজে গেছে ঘামেতে বাছার।

"আসুক ত আজি ওর দিদিমণি ঘরে,
শাসন করিব তার দিব ভাল ক'রে;
তিলেক কাঁদিলে খোকা,মুখে যে' মুখোস্ ঢাকা,
বড় সে দেখায় ভয় ভয়ঙ্কর বেশে,
খোকা যে কেমন শান্ত দেখুক না এসে!"

অনুতাপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিনয়ের সঙ্গে শান্তির যখন বিবাহ হয়, তখন শান্তির বয়স তের বৎসর। শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া শান্তির বনিবনাও করিয়া লইতে বেশী দিন লাগিল না। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বিবাহের পূর্ব্বেই শ্বশুরবাড়ীর সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার একরকম অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। স্বামী যে দেবতা, শ্বশুর শাশুড়ী যে গুরুজন, ভাসুরকে দেখিলে যে ঘোমটা দিতে হয়, স্বামীর উচ্ছিষ্ট আহার যে স্ত্রীর কর্ত্তব্য, এ সকল বিষয়ে দেখিয়া শুনিয়া তাহার বেশ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্ব দিনে শান্তির পিতা এ সকল বিষয়ে যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য বারবার বলিয়া দিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ী আসিয়া শান্তি প্রথম প্রথম যন্ত্রবৎ যথাকর্ত্তব্য পালন করিত, ক্রমে সে যান্ত্রিক ভাব গিয়া স্বামীর প্রতি তাহার স্বাভাবিক ভালবাসা এবং গুরুজনের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি জন্মিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে সে শ্বশুরবাড়ীর সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

বাস্তবিকই শান্তি খুব ভাল মেয়ে। বাপের বাড়ীতে ভাই বোন বাপ মা আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাহার যে কি টান ছিল, তাহা বলা যায় না। হাজার সুন্দরী মেয়ে বাড়ীতে আসিলে সে তাহার সেই ছোট বোনটির অপেক্ষা কাহাকেও অধিক সুন্দর দেখিত না। অন্য কেহ বহুমূল্য জিনিস দিলে তাহাতে তাহার মন উঠিত না, কিন্তু বাবা যদি আদর করিয়া সামান্যও একটি জিনিস দিতেন, অমনি সে আনন্দে আটখানা হইয়া যত্নে তাহা বাক্সে উঠাইয়া রাখিত।

শান্তির দুই বৎসরের বড় একটি ভাই ছিল। দাদাকে শান্তি আপনার প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসিত। কেহ কিছু খাবার দিলে শান্তি অমনি বলিত, "দাদাকে দেবে না ?" দাদাকে ভাগ না দিয়া, কিম্বা দাদা না খাইলে, সে কোন জিনিস খাইত না। দাদাকে কেহ যদি ধমকাইত, দাদার কাঁদিবার আগে শান্তির চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িত। ছোট বোনটিকে শান্তি নিজের হাতে স্নান করাইয়া দিত, খাওয়াইত, এবং সে যখন ছোট ছোট

দু'খানি হাত ঘুরাইয়া "চুড়ি চাই, বালা চাই" বলিত—শান্তি স্নেহচক্ষে দেখিত, যেন আনন্দে সমস্ত জগৎটাও তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছে। এইরূপে তপ্তপক্ষ বিস্তার করিয়া মুখাগ্রভাগে স্নেহচঞ্চু লাগাইয়া যে পোষা পাখীটি এতদিন পড়িয়াছিল, সে যখন চলিয়া গেল, পিতৃগৃহে কি হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহা কল্পনা করা কিছু দুরূহ নহে।

শান্তির স্বামী বিনয় একরকম অদ্ভুত ধোঁচের লোক ছিল। তাহার কাছে জগতের সমস্তই যেন ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হইত। তাহার কাছে পাপ পুণ্যের কোনই প্রভেদ ছিল না। "তুমিও যেমন!" "তা বেশ!" ইত্যাদি ২৪ চব্বিশ ঘণ্টাই তাহার মুখে লাগিয়াছিল। বিনয়ের কাছে যদি কেহ বলিত, "অমুক লোকটা খুব ফাঁকি দিয়েছে"—বিনয় অমনি গম্ভীরভাবে বলিত, "লোকটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে।" এক কথায় বিনয় অতিশয় হাল্‌কা রকমের লোক ছিল, অন্ততঃ আপনাকে সেইরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিত।

বিবাহের দুই মাস পরে বিনয়ের বি. এ. পাশের খবর বাহির হইল। তখন তাহার পিতা অম্বিকা বাবু ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত তাহাকে বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। অম্বিকা বাবু খুব সঙ্গতিপন্ন, এবং দলের একরকম কর্তা ছিলেন, সুতরাং ছেলেকে বিলাত পাঠানর পক্ষে তাঁহার কোন বাধা ছিল না। তবে গৃহিণী কখনও নথ নাড়া, কখনও নাক ঝাড়া দিয়া দুই দশ দিন বাধা দিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু শেষে তাহাও ব্যর্থ হইল। ঠিক হইল, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে বিনয় বিলাত যাইবে।

পিতার নিকট হইতে শুনিয়া সেইদিনই রাত্রে শয়নকক্ষে বিনয় শান্তির নিকট বিলাত-যাত্রার খবর দিল। শান্তি চুপ করিয়া রহিল। বিনয় বলিল, "আমি বিলেত গেলে তোমার কষ্ট হবে?" শান্তি কোন কথা কহিল না। বিনয় বলিল, "যদি জাহাজ ডুবে মারা যাই?" তবুও চুপ। "বেশ ত আর একটা বিয়ে করবে"—এইরূপ বারবার বলাতে শেষে শান্তি আর না থাকিতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে দিন আর কোন কথা হইল না।

দিন ঘুনাইয়া আসিয়া শেষে চব্বিশ ঘণ্টারও কম ব্যবধানে দাঁড়াইল। কাল খুব ভোরে জাহাজ ছাড়িবে, আজ রাত্রেই বিনয়কে জাহাজে চড়িতে হইবে। আহারাদি শেষ করিয়া যখন বিনয় সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতে গেল, তখন বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। শান্তি একলা একটি ঘরে চুপ করিয়া শুইয়াছিল, বিদায়কালের রোদনের প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য

দুইটি অপরিচিত নরনারীর হৃদয়ের গ্রন্থি কেমন করিয়া বাঁধিয়া যায়! দুই মাসের মধ্যেই শান্তির বালিকাহৃদয় নবপরিচিত বিনয়কে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আপন করিয়া লইয়াছিল। পাছে কেহ টের পায়, এই জন্য তাহার সেই অন্তর্দাহ এতক্ষণ সে অনেক কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। কান্নার স্বর শুনিয়া সেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিনয় একে একে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শান্তির ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতেছে। অনেক কষ্টে তাহাকে উঠাইয়া বিনয় সান্ত্বনা দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার কান্না থামে না। যতই সান্ত্বনা পায়, ততই আরও সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে শান্তির অশ্রুসিক্ত অধরে জীবনশোষ একটি প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া *"আমাকে কি মেলে চিঠি লিখো"* বলিয়া বিনয় গাড়ীতে গিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি। জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর দুই কূল ভরিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে কোকিলের পঞ্চমস্বর শূন্যতল প্লাবিত করিয়া উঠিতেছিল। এমন সুখময়ী জ্যোৎস্নারাত্রে বিবাহের কয় মাস অতীত হইতে না হইতে এক জন আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের উপায় সংগ্রহ করিতে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে চলিল, এবং আর এক জন ক্ষুদ্র বালিকা—সে একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন হইতে মনের কষ্ট চাপিয়া শান্তি পূর্ব্বমত সাংসারিক কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল। পুত্রবিরহে অধীর হইয়া বিনয়ের মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, শান্তি নিয়ত তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। শাশুড়ীর কাতরতা দেখিয়া শান্তির যে স্বামিস্মৃতি কিছুমাত্র জাগিয়া উঠিত না, তাহা নহে; যখনই সুবিধা পাইত, একেলা নির্জ্জনে সে চোখের জল ফেলিয়া আসিত। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

বিলাতে পৌঁছিয়াই বিনয় শান্তিকে এক মস্ত চিঠি লিখিল। চিঠিটা আসিবামাত্র তাহা শান্তির দেবর সুরেশের হাতে পড়ে। ঠাকুরপো চিঠিটা লইয়া ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বৌঠাকরুণ! একটা সুখবর [illegible]চ, কি দেবে?" বলিয়াই চিঠিটা বাহির করিয়া বলিল, "দূরি? [illegible] লজ্জায় অস্থির ও আরক্তিম হইয়া উঠিল। "ঠাকুরপো, [illegible] বলিয়া ছুটিয়া

গিয়া চিঠিটা কাড়িয়া লইল। তাহার পর ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কতবার যে চিঠিটা পড়িল, তাহার ঠিক নাই। শেষে আশ মিটাইয়া পড়িয়া বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

রাত্রে যখন সকলে শুইতে গেল, শান্তি নিজের ঘরে আসিয়া বাতি জ্বালাইয়া চিঠির জবাব দিতে বসিল। কত কাগজ ছিঁড়িয়া কত কি ভাবিয়া আঁকা বাঁকা অক্ষরে শেষে লিখিল, "শ্রীচরণেষু, তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলুম। তোমার চিঠি না পেলে আমার বড় কষ্ট হবে। তুমি কেমন থাক লিখতে ভুলো না। মা বাবা বাড়ীর সব ভাল। আমি একরকম আছি। প্রণাম জেনো। শীগ্গির উত্তর চাই। আর কি লিখিব।" শেষে নাম সইয়ের জায়গায় আবার মুস্কিলে পড়িল। বিনয় লিখিয়াছিল, "তোমার হতভাগা বিনয়।" শান্তি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল, "তোমার হতভাগিনী শান্তি।"

চিঠিটা মুড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া দিবার জন্য সকালে আবার ঠাকুরপোকে ধরিল। ঠাকুরপো আবার ভারি দুষ্টুমি আরম্ভ করিয়া দিল। "কি লিখেছ যদি দেখাও তবে ঠিকানা লিখে দেব।" অনেক সাধ্যসাধনার পর, অনেক মাথার দিব্যি দিয়া শান্তি ঠাকুরপোকে চিঠি দেখা হইতে নিরস্ত করিল। ঠাকুরপো ঠিকানা লিখিয়া দিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে নিজ হস্তে চিঠিটা ডাকে দিবে, এবং কখনও খুলিয়া দেখিবে না।

চিঠি পাইয়া সম্বোধন দেখিয়া বিনয় মনে মনে হাসিল বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যেক অক্ষরে শান্তির সেই বালিকাসুলভ সরল ভাব প্রতিফলিত দেখিল। উত্তর লিখিবার সময় বিনয় আপনার মনোমত শ্রুতিমধুর কতকগুলি সম্বোধন লিখিয়া পাঠাইল। শান্তি স্বামীর ইচ্ছামত প্রত্যেক বার তৎপ্রেরিত এক একটি সম্বোধন লইয়া চিঠি লিখিত।

বছর দেড়েক বিনয় রীতিমত চিঠি লিখিয়াছিল। ক্রমে তাহার চিঠি লেখা সম্বন্ধে শিথিলতা দেখা দিল; এমন কি, তিন চারি মাস অন্তর শান্তি একখানি চিঠি পাইত, এবং শেষাশেষি তাহাও বন্ধ হইল। চিঠি না লিখিলে যে আপনা হইতে চিঠি লিখিবে, লজ্জাসঙ্কুচিতা শান্তির সেরূপ প্রকৃতিই ছিল না। অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিল। অম্বিকা বাবু চিঠিপত্র না পাইয়া টেলিগ্রাফ করিয়া জানিলে[illegible] ভাল আছে। সহসা স্বামীর এই অবহেলাভাবের প্রকৃত [illegible]রিয়া শান্তি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত যে, কর্ম্ম ও পরী[illegible]তে বিনয় চিঠি লিখিবার অবসর পান না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিন বৎসরের পর একদিন টেলিগ্রাম্ আসিল যে, বিনয় ব্যারিষ্টারী পাশ হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার শান্তি ছাতে বসিয়াছিল। কত কথাই মনে আসিতেছিল। বর্ষায় মেঘ, জল ও বাতাসে যেমন মারামারি হয়, শান্তির মনের মধ্যেও তেমনি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার সেই বাপের বাড়ী, পুতুল খেলা, বাপ মা ভাই বোন, সকলকে একে একে মনে পড়িল; তাহার পর বিবাহের কথা, দুই মাস ভরিয়া স্বামীর আত্যন্তিক ভালবাসার কথা, তিন চারি বৎসরের বিরহের কথা, চিঠি না লেখার কথা, একটার পর একটা আসিয়া মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। শান্তি এখন ষোড়শী, নববিকশিত পরিপূর্ণ যৌবনভার লইয়া সে আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিল, চোখে জল আসিল। এমন সময়ে সুরেশ আসিয়া হাসিতে হাসিতে খবর দিল, "দাদা বাড়ীর জন্যে ছেড়েছেন, শীগ্গির আসচেন, আজ টেলিগ্রাম এসেছে।" সুরেশ শান্তির ভাবগতিক দেখিয়া আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। শান্তিও অল্পক্ষণ পরে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে আসিয়া বিনয়ের লেখা চিঠিগুলো শান্তি আর একবার আদ্যোপান্ত পড়িল,—পড়িয়া ভাল করিয়া গুছাইয়া একটি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বম্বে পৌঁছিয়াই বিনয় টেলিগ্রাফ করিল। বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বাড়ী পরিষ্কার করিতে লোক লাগিল। বিনয়ের বসিবার জন্য টেবিল, চৌকি, ছবি, কার্পেট দিয়া একটি ঘর সুসজ্জিত হইল। আলাদা একটি ডাইনিংরুম্ও ঠিক হইল।

বিনয়ের আসিবার পূর্ব্বদিন দরজায় মঙ্গলঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল; নহবৎ বাজিতে লাগিল। আমোদে আহ্লাদে গল্পে রাত কাটিয়া গেল।

খুব ভোরে উঠিয়া অম্বিকা বাবু ও সুরেশ বিনয়কে আনিতে ষ্টেশনে গেলেন। এদিকে শান্তিকে সাজাইয়া দিবার জন্য সকলে ধরিল। শান্তি প্রথমে অনেক ওজর আপত্তি করিল, কিন্তু যখন আর কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, তখন যে যাহা ইচ্ছা করিল, বিনা আপত্তিতে তাহাই করিতে দিল। স্নান করাইয়া, খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া, নীলাম্বরী পরাইয়া, গলায় ফুলের মালা দিয়া,

মল বাজুবন্ধ প্রভৃতিতে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া তাহার ঘরে লইয়া গিয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে খাটে বসাইল। শান্তি পুত্তলিকার মত বসিয়া রহিল।

বাড়ীতে আসিয়াই বিনয় খট্‌মট্‌ করিয়া প্রথমে শান্তির ঘরে প্রবেশ করিল। শান্তি অমনি ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। O' you look like a princess বলিয়া ঘোম্‌টা খুলিয়া দিয়া বিনয় সকলের সমক্ষে শান্তির মুখ চুম্বন করিল—শান্তি লজ্জায় মরিয়া গেল। সকলে বিনয়ের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইল। যে ধুতি পরিয়া ফিন্‌ফিনে উড়ানি উড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কথা কহিত, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ফুঁ দিয়া বেড়াইত—সে আজ নিতান্ত কাটখোট্টা ফিরিঙ্গীর মত হইয়া আসিয়াছে। খাবার সময় বিনয় শান্তিকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া টেবিলে বসাইল—বসাইয়া তিন চারি বৎসরের বিরহের পর এই প্রথম সম্মিলনে নিতান্ত অরসিকের মত কাঁটা চামচ কি করিয়া ধরিতে হয়—শিখাইতে লাগিল। লজ্জায় শান্তির মুখ লাল হইয়া উঠিল, এবং গা দিয়া ঘাম বহিতে লাগিল। সে কিছুই স্পর্শ করিল না। কিছুতেই না পারিয়া বিনয় শেষে হার মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

বিলাতে থাকিতে বিনয়ের বিলক্ষণ পানদোষ জন্মিয়াছিল। প্রথম রাত্রেই সে তর্ হইয়া আসিয়া শান্তিকে ইংরাজি বাঙ্গলায় লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে শেষে শান্তির প্রতি গালি বর্ষণও আরম্ভ হইল। টেবিলে কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া, গাড়ী হাঁকাইয়া যাওয়া, গাউন পরা, স্ত্রীলোকদের যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। শান্তিকে চুপ্ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়ের রাগ আরও বাড়িতে লাগিল—"যা বলচি করবে? বল? বল? বল?"—শান্তি আস্তে আস্তে বলিল, "হাঁ।"

পরদিন বিনয় তাহার বিলাতপ্রত্যাগত অনেক বন্ধুর স্ত্রীকে আনাইয়া আধুনিক শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের মত শান্তিকে কাপড় পরা শিখাইয়া দিতে বলিলেন। অনেক কষ্টে অনেকবার চেষ্টা করিয়া শান্তি এক রকম শিখিয়া লইল। তাহার পর হইতে কল্‌-এ, ইভ্‌নিং-পার্টি, টী-পার্টি প্রভৃতিতে বিনয় শান্তিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। শান্তি কত পায়ে পড়িত, কাঁদিত, বিনয় করিত,—বিনয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিত না। শান্তি ঘোম্‌টা দিতে গেলে বিনয় তাহা খুলিয়া দিত। শত শত নর নারীর মেলায় শান্তি ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং মনে মনে পৃথিবীকে দ্বিধা হইয়া তাহাকে লইবার জন্ত প্রার্থনা করিত।

তার উপর বিনয় প্রায়ই রাত্রে বাড়ী আসিত না। শান্তি না খাইয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। কখনো কখনো দ্বিপ্রহর রাত্রে মত্ত অবস্থায় বিনয় বাড়ী আসিয়া শান্তিকে অকথ্য গালি দিত, এবং নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করিত। সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া কেহ যেন তাহা টের না পায়, সেই জন্য শান্তি প্রাণপণে চেষ্টা করিত। শান্তির কাছে বিনয় "আমারি দেবতা তুমি দোষে গুণে।"

শান্তি যতদূর পারে বিনয়ের মন রাখিয়া চলিতে লাগিল। সাহেবী মেজাজে বিনয় যখন যাহা বলিত, শান্তি তাহাই করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। সে নিজে ইচ্ছা করিয়া একখানি ফার্ষ্ট-বুক-অব-রিডিং আনাইয়া সুরেশের কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। টেবিলে খাইতে ও ভাল করিয়া কাপড় পরিতে শিখিল। কোন পার্টিতে গেলে সে আর ঘোম্‌টা দিত না, সকলের সঙ্গে মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিত। স্বামীর মনোরঞ্জনের আন্তরিক চেষ্টাসত্ত্বেও এত করিয়াও পাশ্চাত্যসৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ বিনয়ের হৃদয়ে সে স্থান পাইল না।

দিন কাটিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ সুরেশের বিবাহ। বাড়ীতে খুব ধুম পড়িয়াছে। ঝাড় লণ্ঠনের শব্দ ও চাকরবাকরদের হাঁকডাকে বাড়ী ভরিয়া উঠিয়াছে। ছেলেরা সকাল হইতেই ভাল কাপড় পরিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে। ক্ষীর দই সন্দেশ প্রভৃতি একটার পর একটা আসিতেছে। দেবদারুপত্রশোভিত উচ্চ মঞ্চে নহবৎ আজিকার আনন্দোৎসব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। সন্ধ্যা সাতটার সময় লগ্ন।

আজ যথার্থ যদি কাহারও আনন্দ হইয়া থাকে ত সে শান্তির। সুরেশকে শান্তি ঠিক্ আপনার ছোট ভাইটির মত ভালবাসিত। বিনয় বিলাতে থাকিতে দুই জনে এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিত, গল্প করিত; এক জনের অসুখ হইলে অন্য জন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা করিত। আজ সুরেশকে কি রকম করিয়া সাজাইয়া দিবে, তাহাই লইয়া শান্তি বিব্রত। নিজের হাতে চন্দন বাটিয়া সুরেশের কপালে মাখাইয়া দিল, বিনয়ের একটি ভাল সিল্কের কামিজ সুরেশের জন্য বাহির করিয়া দিল, এবং গোপনে সুরেশের মুখে একটু স্নো পাউডারও মাখাইয়া দিল। সুরেশের সেই লজ্জানম্র মুখখানি যখন স্নেহ-অঙ্গুলিস্পর্শে ফুটিয়া উঠিল, তখন শান্তি আপনাকে বড়ই সৌভাগ্যবতী মান

খুব সমারোহে বরযাত্রী বাহির হইল।

অনেক রাত্রে মত্ত অবস্থায় বিনয় বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আনিয়া সুরেশকে সাজাইয়া দেওয়া উপলক্ষে শান্তিকে ঠাট্টা করিতে করিতে তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহব্যঞ্জক তীব্র এমন একটি কথা বলিল, যাহা বিষময় শরের ন্যায় শান্তির মর্ম্মস্থলে গিয়া বিদ্ধ করিল। মদ খাইয়া বলিলেও বিনয়ের মনে যে অবিশ্বাসের ভাব কোন না কোন রূপে স্থান পাইয়াছে, তাহা শান্তির আর বুঝিতে বাকি রহিল না। অদৃষ্টদোষে সে স্বামীর ভালবাসা এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর সুখ হইতে বঞ্চিত, কিন্তু স্বামীর অকারণ অবিশ্বাস স্ত্রীর পক্ষে অসহনীয়। যে ক্ষুদ্র তরণী নদীপথে শত সহস্র বার যাতায়াত করিয়াছে, যে পথ ছাড়া তাহার দাঁড়াইবার আর অন্য স্থল নাই—ভীষণঘটিকাবর্ত্তে তরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাহা যেমন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়ে, শান্তির অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। শান্তি চুপ করিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

পরদিন শান্তি বিছানা হইতে আর উঠিল না। অসুখ হইয়াছে বলিয়া সমস্ত দিন শুইয়া রহিল, আহারও করিল না। সুরেশ আসিয়া দেখিল, শান্তির মুখখানি যেন কালীর মত হইয়াছে, চোখ দু'টা বসিয়া গিয়াছে। সুরেশকে দেখিয়া অপমানিত ব্যথিত শান্তির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, অনেক কষ্টে সে তাহা চাপিয়া রাখিল। সুরেশ পাখা লইয়া বিষণ্ণমনে বসিয়া বসিয়া শান্তিকে বাতাস করিতে লাগিল। শান্তির ইচ্ছা তাহাকে বারণ করে, কিন্তু আজ হঠাৎ কি বলিয়া নূতন করিয়া বারণ করিবে!

অনিয়মে অত্যাচারে মনের কষ্টে শান্তি দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল, এবং অবশেষে যাহা হইয়া থাকে, সাংঘাতিক ব্যাধি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

তিন মাস রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর ডাক্তার বলিল, রক্ষা পাইবার আর সম্ভাবনা নাই।

প্রাতঃকাল, তথাপি সূর্য্যের মুখ দেখা যা[য়] না। ঘনান্ধকার মেঘগর্জ্জনে মুষলধারে অবিরল বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন অন্ধকার যে দিনের বেলায় ঘরে আলো জ্বালিতে হইয়াছে। সেই দিন দ্বিপ্রহরবেলায় নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় শান্তি সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া বিনয় বিলা[তে] থাকিতে শান্তি তাহাকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিল, বাক্স হইতে বাহির [করিয়া এ]ক একে সে সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিল। গলার হার, কাণের সোনার [...]ন্নি

ভাল কাপড় পুঁটুলি বাঁধিয়া একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ছোট বোনটির জন্ম বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল, এবং সেই সঙ্গে কম্পিতহস্তে মাকেও একখানি চিঠি দিল। রেশমের কাপড়ের একটি গাড় শান্তি ভাল থাকিতে নিজ হাতে বুনিয়াছিল, সেটি সুরেশের বৌকে দিল। তাহার পর সুরেশকে কাছে ডাকিয়া কি বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিল না। বেলা চারিটার সময়, বিনয় যখন বন্ধুগৃহে পার্টিতে গিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজনের আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি তখন ইহলোকে চিরশান্তি লাভ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শান্তির মৃত্যুর পর বিনয় মদ্যপান আরও বাড়াইল। অম্বিকা বাবু মর্ম্মাহত হইয়া বিনয়কে টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। বিনয় শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া শান্তির ভাল ভাল দামী গহনা কাপড় যাহা ছিল, একে একে সমস্ত বিক্রয় করিল—যে যাহা পাইল, জলের দামে কিনিয়া লইল।

শনিবার। কাল কোর্ট বন্ধ। জ্যোৎস্না রাত্রে বন্ধুবান্ধবসমেত বিনয় পান্সী করিয়া গঙ্গায় হাওয়া খাইতে বাহির হইল। আমোদ আহ্লাদ করিয়া অনেক রাত্রে সকলে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিবার পথে বিনয় সবান্ধব এক অপরিচিত বারবনিতালয়ে প্রবেশ করিল।

সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিনয় একেবারে চমকিয়া উঠিল। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বোম্বায়ে বিনয়ের স্বহস্তে ক্রীত, রেশমীপুষ্পখচিত পুণ্যতনুবেষ্টনে নিত্যপরিহিত শান্তির বড় আদরের বাদামী রঙের শাড়ি জ্যাকেট্ পরিয়া, শান্তির পুণ্যকণ্ঠাশ্রিত হীরক নেক্‌লেস্ গলায় দিয়া, এবং বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তিরাজী সোনার ব্রোচ্ পরিয়া এক বারবিলাসিনী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। উজ্জল দীপালোকে বিনয় সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সে হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। নিস্তব্ধ রজনীতে শান্তির সেই বিষাদাঙ্কিত পবিত্র সুন্দর মুখখানি বিনয়ের চক্ষের সম্মুখে কেবলি ভাসিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবদিগের দৃঢ় কবল হইতে আপনাকে সজোরে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পাগলের ন্যায় বিনয় ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইল। অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, সর্ব্বান্তঃকরণ যেন কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—

> "এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস।
> আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে ফিরে এস।"

রাণী ভবানী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রাজ্যলাভ।

দিল্লীর বাদশাহেরা অনেকবার বাঙ্গলা দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু একবারও দীর্ঘকাল রীতিমত রাজকর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার জমিদারগণ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই স্বেচ্ছায় রাজকর প্রদান করিতেন না, বরং অবসর ও সুযোগ পাইলে সকলেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন। যাঁহারা নামে দিল্লীর অধীন, তাঁহারাও কার্য্যতঃ আপন-আপন জমিদারীতে স্বাধীন ভূপতির ন্যায় রাজশক্তি পরিচালন করিতেন। সেই জন্য বঙ্গদেশ অনেকগুলি ছোট ছোট স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল;—সেই সকল ছোট ছোট স্বতন্ত্ররাজ্যের কলহ বিবাদে দেশের সুখশান্তি সর্ব্বদাই বিপর্য্যস্ত হইত।

মানসিংহ তরবারি হস্তে বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়া সম্রাট আকবর শাহের একচ্ছত্র শাসন সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজা টোডরমল্ল বাঙ্গালা দেশ বাহুবলে পরাজিত করিয়া বুদ্ধিকৌশলে তাহার রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। টোডরমল্ল যুদ্ধব্যবসায়ী রাজপুত বীর হইয়াও মসীজীবী রাজকর্ম্মচারীর মত অনবরত রাজস্বসংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া এরূপ নিপুণভাবে কার্য্য সম্পাদন করিলেন যে, তাঁহার বীরত্বকীর্ত্তি ভুলিয়া গিয়া লোকে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার রাজস্বনীতির আলোচনা করিয়া থাকে। তিনি বাঙ্গলা দেশ ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া বার্ষিক ১০৬৯৩২৫০ টাকা রাজস্ব নির্ণয় করিয়া দেন।* তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে বাঙ্গলা দেশে জিন্নতাবাদ (গৌড়), পূর্ণিয়া, তেজপুর, পিঞ্জারা (দিনাজপুর), ঘোড়াঘাট (রঙ্গপুর), বারবাকাবাদ, বাজুহা, শ্রীহট্ট, সুবর্ণগ্রাম, ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম, আকবরনগর (ঢাকা), সেরিফাবাদ, সেলিমাবাদ, মান্দারণ, সপ্তগ্রাম, মহম্মদাবাদ (ভূষণা), খলিফতাবাদ (যশোহর) ও বাক্‌লা নামে ১৯টি সরকার নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং প্রত্যেক সরকারের অধীনে যতগুলি পরগণা ও যে পরিমাণ রাজস্ব, তাহাও লিপিবদ্ধ হয়।† কাগজপত্রের যেরূপ কড়াকড়, খাজানা আদায়ে সেরূপ কড়াকড় ছিল

---

* আইন-আকবরি।

† Grant's Analysis of Finances of Bengal.

না; অল্প দিনের মধ্যেই অনেক জমিদার খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া-ছিল[illegible], এবং "খাল্‌সা" অপেক্ষা "জায়গীরেরই" অধিক শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল।

[illegible]দ কুলী খাঁ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপন করি-বা[illegible]র সময় হইতেই রাজস্বনির্দ্ধারণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে রায় প্রধান্ রঘুনন্দন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। রাজস্বনির্দ্ধারণ কা[illegible]গের হইলে যেরূপ অধ্যবসায় এবং প্রতিভা থাকা আবশ্যক, রঘুনন্দনে [illegible]গর [illegible]ভাব ছিল না; তিনি টোডরমল্লের প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ধীরে ধী[illegible] ত্যপ্রদে ও জায়গীর ভূমির করধার্য্যে অগ্রসর হইলেন। যথাসময়ে রাজস্ব-[illegible] জন্য প্রত্যেক সরকারে এক এক জন "ফৌজদার" রাখিবার [illegible] সশে[illegible]; ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য রঘুনন্দন কেবলমাত্র ১৩ জন "ফৌজ-[illegible]র" [illegible]বার কল্পনা করিয়া সমুদায় দেশ ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করিলেন, এবং সে সকল চাক্‌লা ১৬৬০ পরগণায় বিভাগ করিয়া তাহার রাজস্ব নির্দ্ধা-রণ করি[illegible] আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উড়িষ্যায় দুই চাক্‌লা ও বাঙ্গলা দেশে [illegible]সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ভূষণা, আকবরনগর, ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়া, জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদ নামে একাদশ চাক্‌লা নির্দ্দিষ্ট হইল। *

* সুবা	চাক্‌লা	পরগণা	রাজস্ব
উড়িষ্যা	বালেশ্বর	১৭	১০৮৮৭৬
"	হিজ্‌লী	৩৫	৪১৮৫৮৯
বাঙ্গলা	মুর্শিদাবাদ	১১৮	২৯৯৯১২৬
"	বর্দ্ধমান	৬১	২২৪৪৮১২
"	সপ্তগ্রাম	১১৩	১৫৩৯০০৩
"	ভূষণা	১১৫	৬৭৮৫৭৮
"	যশোহর	৭৯	৩৫৫২৬৬
"	আকবরনগর	১১৮	৯২৬২৬৬
"	ঘোড়াঘাট	৪৫১	২১৮০৪১৫
"	কড়াইবাড়ী	২৫	২০২৭০৫
"	জাহাঙ্গীরনগর	২৩৬	১৯২৮২৬৪
"	শ্রীহট্ট	১৪৮	৫৩১৪৫৫
"	ইসলামাবাদ	১৪৪	১৭৬৭৯৪
		১৬৬০	১৪২৮৮১০৩

এই সকল পরগণাগুলির রাজস্ব আদায়ের ভার জমিদারদিগের হস্তে পূর্ব্ববৎ ন্যস্ত হইল। ইহা ব্যতীত নবাব বাহাদুরের পরিবারপালনের জন্য ১০৭০৪৬৫ টাকা আয়ের ৬০ পরগণা, আমীরুল ওমরা বক্সী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির জন্য ২২৫০০০ টাকা আয়ের ১৮ পরগণা, ফৌজদারদিগের জন্য ৮৯২৮০০ টাকা আয়ের ৭৫ পরগণা, সীমান্তরক্ষক মন্‌সবদারদিগের মুচি জন্য ১১০৮৫২ টাকা আয়ের ২০ পরগণা, ত্রিপুরা সুসঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশ রক্ষার জন্য ৬৯৭৫০ টাকা আয়ের ২ পরগণা, মৌলবী পোষণের জ. রাই ৭ টাকা আয়ের ২ পরগণা, নৌয়ারা অর্থাৎ নৌসেনার জন্য ঢাকা প্রদেশে ২০ জন পর্ত্তুগিজ নাবিক ও ৭৬৮ খানি রণতরী রাখিবার জন্য ৭৮৯হাজার অ । আয়ের ৫৫ পরগণা, আসাম প্রদেশের পার্ব্বতীয়দিগের উৎপাত নিবারণক ৮ ৩৫৯১৮০ টাকা আয়ের ১৩৮ পরগণা নির্দ্দিষ্ট হইল।*

রাজস্ব-নির্দ্ধারণকার্য্য যেরূপ কৌশল ও যোগ্যতার সহিত স ন্ন হইয়া গেল, রাজস্বসংগ্রহের কার্য্যও সেইরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতার সহিত নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, রঘুনন্দন বুদ্ধিবলে যে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে , নবাবে। দৌহিত্রীপতি সৈয়দ রেজা খাঁ বাহুবলে তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাকে সেকালের লোকে মহম্মদ বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল। রঘুনন্দনের নাম অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মহম্মদের নাম এখনও অনেক প্রাচীন জমিদারবংশের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে! তাহার মত নির্ম্মম-হৃদয়ে কর-সংগ্রহ করিতে ও আবশ্যকমত উৎপীড়নের নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে আর কেহ জানিত কি না সন্দেহ। সে প্রথমে অনুচর পাঠাইয়া রাজকর চাহিত, তৎক্ষণাৎ দিতে না পারিলে জমিদারকে মুর্শিদাবাদে ধরিয়া আনিত; সেখানে মহম্মদের কুটিল কল্পনা "বৈকুণ্ঠ" † নামে এক নরককুণ্ড খনন করাইয়া খাজনার

* Grant's Analysis.

† 'তারিখ বাঙ্গালা' ও 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' নামক পারস্য গ্রন্থে 'বৈকুণ্ঠের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতেই যথাক্রমে গ্লাডউইন, স্টুয়ার্ট এবং গ্রাণ্ট এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' সংকলন করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'বর্ত্তমান কেল্লার দক্ষিণ তোরণদ্বারের সম্মুখে' ইহার স্থান নির্দ্দেশও হইয়া থাকে। 'মুর্শিদ কুলী খাঁর জীবনচরিত সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন; তিনি বলেন, 'বৈকুণ্ঠের' কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। রাজসাহী প্রদেশে কিন্তু ইহার জনশ্রুতি এখনও প্রবল।

পূতিগন্ধময় অপবিত্র পদার্থে তাহা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হইলে, অথবা শিথিলতাপ্রদর্শন করিলে, জমিদারদিগকে সেই নরক-হ্রদে ফেলিয়া মহম্মদের অনুচরগণ নির্ম্মমহৃদয়ে পীড়ন করিত, এবং আবশ্যক হইলে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া বিদ্রোহী অথবা অশক্ত জমিদারের ভিটামাটি উৎসন্ন করিয়া আসিত।* মহম্মদের সুব্যবস্থায় দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল! দুর্ব্বল জমিদারগণ বাড়ী ঘর ফেলিয়া পলায়নপর হইলেন, কেহ কেহ মহম্মদের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে আসিয়া "বৈকুণ্ঠবাস" করিতে লাগিলেন।† কাহারও কাহারও হাস্যময়ী রাজপুরী বিজনবনে পরিণত হইতে লাগিল! যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাজকর সংগ্রহ করা এবং বৈশাখমাসে তাহা সম্রাটসদনে প্রেরণ করাই নবাবের একমাত্র উদ্দেশ্য,—সে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রাচীন জমিদারগণকে পৈতৃক বাস্তভিটা হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিতে কেহই ইতস্ততঃ করিল না, নবাবও তাঁহাদের করুণক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই মৃত, পলায়িত বা নির্ব্বাসিত জমিদারদিগের প্রাচীন জমিদারীর রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নূতন নূতন জমিদার সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া উঠিল;—ইহাই নাটোর-রাজবংশের রাজ্যলাভের ঐতিহাসিক মূলসূত্র।

দেওয়ানখানা হইতে যখন নূতন জমিদারী-বন্দোবস্তের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইতে লাগিল, মহম্মদের ভয়ে তখন অল্প লোকেই সাহস করিয়া জমিদারী লইবার জন্য আবেদন করিল। দেওয়ান রঘুনন্দন তখন নবাবের প্রিয় সহচর এবং প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি প্রতিভা ও বুদ্ধিকৌশলে যে রাজস্বের নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা নিরুদ্বেগে আদায় করিবার জন্য আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে নূতন জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। রামজীবন বাহুবলে প্রবল পরাক্রমে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই নবাবের প্রিয় জমিদার বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। তখন বিনা চেষ্টাতেও অনেক জমিদারী রামজীবনের হস্তগত হইতে লাগিল।

রামজীবন পরগণা লস্করপুরের অধিপতি পুঁঠিয়ার রাজাদিগের অধীনে তরফ কানাইখালির অন্তর্গত নাটোরে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন, এবং নবাবের অনুকম্পায় দিল্লী হইতে ২২ থান "খেলাত" ও রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়া ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নাটোরের

* Stewarts' History of Bengal.

† Sir John Shore's Minute—Fifth Report. Vol I.

রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন। * এতদিনের পর রঘুনন্দনের প্রতিভা ও পদগৌরবের সঙ্গে ঐশ্বর্য্য ও রাজশক্তি মিলিত হইল ;—অতি অল্পদিনের মধ্যে নাটোর রাজবংশের এরূপ রাজ্যোন্নতি হইতে লাগিল যে, তাহা "রঘুনন্দনী বাড়" অর্থাৎ রঘুনন্দনের পদবৃদ্ধি বলিয়া বাঙ্গলা দেশের প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া উঠিল।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের সমকালে পরগণা বাগগাছি বিখ্যাত জমিদার গণেশরাম চৌধুরীর অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রামজীবনকে বাগগাছির জমিদারী প্রদান করা হয়। ইহাই প্রথম রাজ্যলাভ।

আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সম্মিলনস্থানের নিকটে সাস্তোল রাজ্যের একটি পুরাতন রাজধানী ছিল। একদিন যেখানে বিপুল রাজপুরীর ঐশ্বর্য্যকোলাহলে অট্টালিকা-বেষ্টিত রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইত, আজ সেখানে শৃগাল-রোদনে বনভূমি পরিপূরিত হইতেছে; কোথাও বা দুই চারি জন অন্নহীন মলিনমুখ কাঙ্গাল কৃষক নিভৃতে হলচালনা করিতেছে! একটি জরাজীর্ণ পুরাতন দেবমন্দির ভিন্ন সে রাজপুরীর আর কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রামকৃষ্ণ নামক একজন ব্রাহ্মণ জমিদার সাস্তোলের রাজা। ভয়ে ভাতুড়িয়া ও তদন্তর্গত ২৪১০৯৭ টাকা বার্ষিক রাজস্বের ১৩ পরগণায় তাঁহার জমিদারী ছিল। † নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা রঘুরাম রায় ও সাস্তোলাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণই সে সময়ে বিদ্যোৎসাহ ও পুণ্যকীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নদীয়ার ন্যায় সাস্তোলের রাজধানীতেও তৎকালে বিবিধশাস্ত্রবিশারদ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বসতি ছিল। সুপণ্ডিত জয়দেব, তর্কবিশারদ রামকৃষ্ণ, দিব্যসিংহ, অনন্তরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সাস্তোলের রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন। ‡

রাজা রামকৃষ্ণ ভেমরার রায়বংশের সর্ব্বাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া সর্ব্বাণী দেবীকে বর্ত্তমান রাখিয়া ১১১৭ শকে (১৭২০ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গারোহণ করেন। ¶ হরিপুর-নিবাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান রামদেব চৌধুরী সাস্তোল রাজ্যের

---

* Ghose's Indian Chiefs etc..

† Grant's Analysis. ‡ লঘু-ভারতম্। ¶ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। রাণী সর্ব্বাণী নিয়ত ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন যাপন করিতেন, দেওয়ান রামদেব সমুদায় রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। বগুড়ার দশ ক্রোশ দক্ষিণে করতোয়া নদীর প্রাচীন খাদের তীরবর্ত্তী ভাব্‌তা গ্রামে সর্ব্বাণী দেবী এক প্রাচীনতীর্থের লুপ্তোদ্ধার করিয়া,

"করতোয়াতটে গুল্ফং বামে বামনভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥" *

এই তন্ত্রোক্ত বচন অবলম্বন করিয়া তাহাকে "মহাপীঠ" সংজ্ঞা প্রদান করেন। রাণী সর্ব্বাণী এই সকল পুণ্যকীর্ত্তির জন্য হিন্দুসমাজে সম্মানশালিনী হইলেও রাজস্ব অনাদায়ে নবাব-দরবারে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমেই অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন মহম্মদ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সান্তোলের রাজপুরী শ্মশানভস্মে পরিণত করিল! রাণী সর্ব্বাণী প্রাণত্যাগ করিলেন। উত্তরাধিকারিহীন সান্তোলরাজ্য দেওয়ান রামদেব চৌধুরীর সহায়তায় ১৭২১ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা রামজীবনের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। †

কেহ কেহ বলেন যে, "ভাতুড়ীয়াদিগের জমিদার রামকৃষ্ণ ১১১৭ সালে পরলোক গমন করিলে তাঁহার জমিদারী রাণী সর্ব্বাণীর নামেই চলিত ছিল, কিন্তু রঘুনন্দন তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিতেন; অবশেষে অল্পদিনের মধ্যে উত্তরাধিকারিহীনা সর্ব্বাণী দেবীর মৃত্যু হওয়ায়, সেই জমীদারী রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে হস্তান্তরিত হয়।" ‡

চাকলা মুর্শিদাবাদের অধীন নিজ চাকলা রাজসাহীতে উদিতনারায়ণ নামে এক জন প্রাচীন জমিদার ছিলেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী পরগণে রাজসাহী তাঁহার জমিদারী ছিল। প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতায় উদিতনারায়ণ রঘুনন্দনের সমকক্ষ ছিলেন, এবং উভয়েই নবাবের সমধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজস্বনির্ণয়ের নূতন বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর রাজধানীর

---

* তন্ত্র-চূড়ামণি।

† নাটোর রাজবংশের বর্ণনা করিতে গিয়া এক জন স্বদেশীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজস্বনির্ণয়কার্য্যে রঘুনন্দন যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারই পুরস্কারস্বরূপ নবাব তাঁহাকে সান্তোল রাজ্য অর্পণ করেন। উক্ত লেখক নিজ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি নাটোর রাজবংশের "কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নিকট এই সকল কথা অবগত হইয়াছেন।"

‡ The Rajas of Rajshahi.

নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ জমিদারীর শাসন, সংরক্ষণ ও রাজস্বসংগ্রহের ভার উদিতনারায়ণের উপরেই ন্যস্ত হয়। এইরূপে বার্ষিক ৯০৫৩২৪ টাকা রাজস্বের ৬৯ পরগণায় উদিতনারায়ণের জমিদারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।* এই বিস্তীর্ণ জনপদের করসংগ্রহকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য গোলাম মহম্মদ জমাদার নামক এক জন মুসলমান সেনানায়কের অধীনে দুই শত অশ্বারোহী উদিতনারায়ণের আজ্ঞাধীন ছিল, এবং উদিতনারায়ণ রাজসাহীর রাজা ও নবাবদরবারের সর্ব্বপ্রধান সামন্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অতি সামান্য কারণে উদিতনারায়ণের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। কয়েক মাস বেতন না পাইয়া উদিতের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া বাহুবলে বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জন্য নবাব একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সৈন্যের সঙ্গে উদিতের বিদ্রোহী সৈন্যের যুদ্ধ হইয়া গোলাম মহম্মদ নিহত হইলেন; মনঃক্ষোভে উদিতনারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন।† দুই শত সৈন্যের বিদ্রোহ আর কয় দিন থাকিবে? বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু অরাজকতায় রাজসাহী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল! নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ রায় নামে উদিতের দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্র বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু রাজধানীর নিকটবর্ত্তী রাজসাহীর ছত্রভঙ্গ জনপদ তাহাদের ন্যায় শিশুর শাসনাধীন করা নিরাপদ নহে বলিয়া নবাব রঘুনন্দনকেই রাজসাহী রাজ্য প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে‡ রামজীবন ও তৎপুত্র কালিকাপ্রসাদের নামে রাজসাহী রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

বর্ত্তমান রাজসাহী জেলা পদ্মানদীর বামতীরে, উদিতের রাজসাহী রাজ্য তাহার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল; সেখানে এখনও পরগণা রাজসাহী বর্ত্তমান আছে।¶ এই রাজসাহী রাজ্য লাভ করিয়া রাজা রামজীবন রাজসাহীর মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব-দরবারের সর্ব্বপ্রধান সামন্তের আসন প্রাপ্ত হইলেন। এই সূত্রে নাটোর রাজবংশের অধিকৃত সমুদায় রাজ্যই "রাজসাহীর জমিদারী" বলিয়া পরিচিত হইল, এবং যখন যে পরগণা রাজসাহী ভিন্ন জেলাভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি রাজসাহীর রাজাদিগের নাটোরের রাজবাটী ও পদ্মার বামতীরস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ এখনও রাজসাহী বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

---

* Grant's Analysis. † Stewart's History of Bengal.

‡ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

¶ *Hunter's Statistical Accounts of Bengal Vol. IX.*

রাজসাহীর রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে রামজীবনের রাজনৈতিক ক্ষমতাও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল,—তিনি সৈন্যবলে ও পদগৌরবে সকলের নিকটেই পরিচিত হইলেন। অতঃপর উদিতনারায়ণের বংশধরগণ নাটোর রাজবংশের নিকট মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন; রাজসাহীর বিস্তীর্ণ রাজ্য নাটোর রাজবংশের হস্তচ্যুত হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা যে ইংরাজ কালেক্টারের নিকট হইতে বৎসরে ৯৪৮৲ এবং ২৪০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাই-তেন, তাহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের কাগজপত্রে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজসাহীর জমিদারী পাইয়াই নাটোর-রাজবংশ বাঙ্গলার ইতিহাসে সম-ধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে মূল দলিল বিপর্য্যস্ত হওয়ায় ইহার কালনির্দ্দেশ করিতে অনেকে গোলযোগ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের সমকালীন অন্যান্য ঘটনার সহিত এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হয়, তাহা হইতেই নবনারী-রচয়িতা ১১১৫ সালে ইহার কালনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র ১১২০ সালে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়া উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন একটি কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি কি সূত্রে কোন্ কথা জানিয়াছিলেন, কোন স্থানে তাহার উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার কোন কথারই সত্য মিথ্যা বিচার করিবার উপায় নাই। তিনি বলেন যে, উদিতনারায়ণ নিজেই বিদ্রোহী হন, এবং রঘুনন্দন তাঁহাকে বন্দী করিয়া পুরস্কারস্বরূপ রাজসাহীর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। *

রঘুনন্দনের মন্ত্রণাসাহায্যে বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ পরগণাই নবাবের করায়ত্ত হইয়াছে;—ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের স্বাধীন রাজারাও নবা-বের প্রসন্নতালাভের প্রত্যাশায় সময়ে সময়ে উপঢৌকন পাঠাইতেছেন, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে একটি নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য কিছুতেই নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতেছে না। যখন সমুদায় বাঙ্গলা দেশ মুর্শীদ কুলি খাঁর পদানত, তখনও

---

* "In 1120 Uditnarain, the Zamindar of Rajshahi, being discontented with the oppression of the officers of the Nawab, rebelled, collected his adherents, and retired to the hills of Sultanuba. Raghunandana was deputed to arrest him. He seized and confined him in prison for which service he was rewarded with the Zamindari of Rajshahi which he took in 1121 in the name of his brother Ramjiban."—The Rajas of Rajshahi.

দক্ষিণবঙ্গে সীতারামের স্বাধীনপতাকা নবাবের রাজশক্তিকে উপহাস করিতে-ছিল।

সীতারাম কে? এক জন ইংরাজ ইতিহাসলেখক বলেন যে, "তিনি এক জন দস্যুদলপতি বিদ্রোহী জমিদার;—দস্যুদলের সহায়তায় জলে স্থলে দস্যুতা করিয়া লোকের ধনসম্পত্তি গোমহিষাদি অপহরণ করিতেন, এবং ভূষণা চাক্‌লার মুসলমান ফৌজদারের রাজধানীর নিকটে থাকিয়াও তাহার রাজশক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।" * কথাটি কত দূর সত্য, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক,—তাহার সহিত নাটোর রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে।

আরঙ্গজীবের শাসনসময়ের চরমদশায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ছোট খাট অনেকগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সেই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে ভূষণা চাক্‌লায় মধুমতী-তীরে হরিহর নগরে সীতারাম রায় নামে এক জন দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। শ্যামনগর নামে একখানি ক্ষুদ্র তালুক ভিন্ন সীতারামের আর কোন সম্পদ ছিল না;—কিন্তু বাহুবলে, অসীম সাহসে, উজ্জ্বল প্রতিভায়, সীতারাম প্রকৃতিদত্ত সৌভাগ্যগর্ব্বে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। সত্যের সঙ্গে কল্পনা জড়িত হইয়া সীতারামের কাহিনী এতই জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, এখানে তাঁহার উত্থানপতনের আনুপূর্ব্বিক ইতি-হাসের যথাযথ বিচার করিবার অবসর নাই। মূল কথা এই যে,—মুসলমান রাজ্যের অধঃপতনসময়ে সুযোগ বুঝিয়া দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থা-পনের আশায়, সীতারাম বাহুবলে ভূষণা চাক্‌লার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া মহম্মদপুরে রাজদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রাজধানীর ও কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

সীতারাম মুসলমান-রাজ্যে বাস করিয়া একদিনের জন্যও মুসলমানকে কর-প্রদান করেন নাই। বহু বিন্দু জল একত্র মিশিয়া মহাসাগর রচিত হইয়াছে, বহু ধূলিকণা একত্র মিলিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ গঠিত হইয়াছে;—সীতারামও ভাবিয়া-ছিলেন, বিলাসলোলুপ বাদশাহের দুর্ব্বলমুষ্টি হইতে তিল তিল করিয়া বঙ্গভূমি কাড়িয়া লইয়া পুনরায় হিন্দু রাজ্য গঠন করিবেন। সীতারামের আশার আকাশ-কুসুম মুকুলেই শুকাইয়া গিয়াছে;—কিন্তু তাহার শোভাটুকু সৌরভটুকু ইতি-হাস এখনও সযত্নে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে! বাঙ্গালীর নিকট সীতারামের

* Stewart's History of Bengal.

সমুচিত সমাদর হয় নাই ;—কিন্তু ইতিহাসের কীর্ত্তিমন্দিরে মহারাষ্ট্রকুলপ্রদীপ শিবজীর জন্য যদি অমরসিংহাসন রচিত হইয়া থাকে, তাহার পার্শ্বে কায়স্থ-কুলতিলক সীতারামের বসিবার স্থানের অভাব হইবে না! আশা সফল হয় নাই বলিয়া সীতারামের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। ইতিহাস যাহাদের ললাটে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া চিরপতনের কলঙ্করেখা আঁকিয়া দিয়াছে, তাহাদের ইতিহাসে সীতারামের যোগ্য স্থান কোথায় ?

সীতারামকে পরাস্ত করিবার জন্য নবাব যতই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন, সীতারামের প্রবল পরাক্রম ততই চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে আবু তোরাপের পরাজয়ে ও অকালমৃত্যুতে নবাব ভীত হইয়া পড়িলেন। সে সংবাদ বাদশাহের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে সীতারামকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন, তাহার জন্য মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। অবশেষে মন্ত্রণাদাতা রঘুনন্দনের উপরেই সকল ভার ন্যস্ত হইল। রঘুনন্দন চারি দিক হইতে খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করিয়া বাহুবলের সঙ্গে বুদ্ধিকৌশল মিশাইয়া সীতারামকে পরাজয় করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগের সাহায্য লইবার পরামর্শ দিলেন, এবং নাটোর রাজবংশের সাহসী ও সুচতুর দেওয়ান দয়ারাম রায়কে সংগ্রাম সিংহের অধীন সৈন্যদলের সহিত ভূষণায় প্রেরণ করিলেন। এতদিন বাহুবলে যাহা অসম্ভব হইয়াছিল, এবার বুদ্ধিকৌশলে তাহা সম্ভব হইল। অল্পদিনের মধ্যেই দয়ারাম সীতারামকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ভূষণারাজ্যে নবাবের বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিলেন। যশোহরের ইতিহাসলেখক বলেন যে, "সীতারাম বন্দিভাবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহাকে শূলারোহণে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" * স্বাধীনচেতা সীতারাম কুক্কুরের ন্যায় বধ্যভূমিতে নীত হইবেন, রাজপথের কৌতূহলপরায়ণ জনপ্রবাহ তাঁহার উদ্দেশে লাঞ্ছনা ও উপহাস বর্ষণ করিবে,—সীতারামের সে কলঙ্ক সহ্য হইল না। তিনি "১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ রাজকারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন!" †

সীতারামের জীবন ও মৃত্যুকাহিনী লইয়া হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মুসলমান ইতিহাস-লেখক ও তাঁহার ইংরাজ অনুবাদক বলেন যে, সত্য সত্যই সীতারাম মুর্শিদাবাদে

* Westland's Jessore.

† Westland's Jessore.

শূলদণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। * জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া একজন হিন্দু লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, সীতারাম বন্দিদশায় নাটোর রাজবাটীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। † ইহার কোন্ কথা সত্য?

সীতারাম পরাজিত হইলে তাঁহার ভূষণারাজ্য রামজীবন প্রাপ্ত হন; এবং রামজীবনের কর্ম্মচারী দয়ারাম রায় নবাব দরবার হইতে পুরস্কারস্বরূপ "রায়-রাইয়ান" উপাধি ‡ ও সীতারামের অনেক তৈজসপত্র প্রাপ্ত হন; তাহার কোন কোন দ্রব্য এখনও দয়ারামের বংশধরদিগের দিঘাপতিয়ার রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে। নাটোর রাজবাটীর একটি অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীর্ণ কক্ষ দেখাইয়া লোকে এখনও বলিয়া থাকে যে, সেই গুপ্ত কক্ষে সীতারাম বন্দিদশায় প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতির মূল কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সীতারামের মৃত্যু হইলে নবাব দিল্লীর দরবারে সেই সংবাদ দিবার সময়ে লিখিয়া-ছিলেন যে, মুর্শিদাবাদে তাঁহার সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। সীতারাম আত্মহত্যাই করুন, আর শূলদণ্ডেই নিহত হউন, তাঁহাকে একবার ধরিতে পারিয়া নবাব যে চক্ষের অন্তরালে নাটোরের রাজকারাগারে রাখিতে দিয়া-ছিলেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

সীতারামের মৃত্যুকাল লইয়াও কথঞ্চিৎ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। একজন বাঙ্গালী লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, খৃষ্টাব্দ ১৭৬৪ পর্য্যন্তও যে সীতারাম জীবিত ছিলেন, তাহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের কাগজপত্রেই প্রকাশ আছে। ¶ লেখক যে কাগজপত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের একখানি সরকারী পত্র;—তাহাতে লিখিত আছে যে, "দস্যুদল মিষ্টার রস্ সাহেবকে হত্যা করিয়া সীতারামের জমিদারী মধ্যে পলায়ন করিয়াছে।" § ইংরাজগণ বহুদিন পর্য্যন্ত ভূষণা অঞ্চলকে "সীতারামের জমিদারী" বলিয়া উল্লেখ করিতেন; সুতরাং তাহা হইতে সীতারাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত থাকা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না!

উদিতনারায়ণের "রাজসাহী রাজ্য" পাইয়া নাটোর রাজবংশের রাজ-নৈতিক পদগৌরব, রামকৃষ্ণের "সাম্ভোল রাজ্য" পাইয়া হিন্দুসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি, এবং সীতারামের "ভূষণারাজ্য" পাইয়া চারি দিকে বাহুবলের পরিচয়

---

* Stewart's History of Bengal. † মধুভারতম্।

‡ The Rajas of Rajshahi. ¶ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

§ Long's Selections. Vol. 1.

প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহার পর ক্রমে পরগণার পর পরগণা রামজীবনের হস্তগত হইতে লাগিল, এবং মহারাজা রামজীবন স্বরাজ্যে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদায় ক্ষমতাই পরিচালন করিবার অধিকার পাইলেন।

মহারাজা রামজীবন নবাবের প্রিয় জমিদার বলিয়া ক্রমে ক্রমে যে সকল নূতন জমিদারী পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সেকালে হাবেলি, মহম্মদাবাদ, সাহুজিয়াল, তুঙ্গী, স্বরূপপুর প্রভৃতি কতকগুলি পরগণা কিশোর খাঁ, সমসের খাঁ এনায়েত খাঁর জমিদারী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পরগণে পুখুরিয়ার জমিদারীও তখন ইস্কিন্দার বেগ নামক একজন মুসলমান জমিদারের শাসনাধীন ছিল। নরহত্যা অপরাধে এই সকল মুসলমান জমিদার রাজ্যচ্যুত হইলে রামজীবন সেই সকল জমিদারী প্রাপ্ত হন। জামালপুরের জমিদার এনায়েতুল্লা রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হইয়া ফতেহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জমিদারী রামজীবনের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। * এইরূপে যে সকল জমিদারী রামজীবনের হস্তগত হয়, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নবাব সরকারে ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর ও ২১৩৯৫ টাকা বাজে জমা, একুনে ১৭,৬৩,৩৮২ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হইত।

নবাবী আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকে বেতন দিবার রীতি ছিল না। নবা[illegible] প্রধান সেনাপতি, ফৌজদারগণ—সকলেই বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর [illegible]তন, এবং নৌসেনাদির জন্যও জায়গীর বন্দোবস্ত ছিল। এই সকল জ[illegible]র মধ্যে মহারাজা রামজীবনের হস্তে অনেক জায়গীরের শাসন-ভার অ[illegible]। তাঁহাকে বৎসরে যে ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর দিতে হইত, তন্মধ্যে [illegible] ১৬৯৬০৮৭ টাকা "খালসা" জমিদারীর জন্য; অবশিষ্ট রাজ-করের মধ্যে [illegible]৬৪ টাকা "আয়মা" এবং ৪৫১৩৬ টাকা জায়গীরের জন্য প্রদান করিতে হইত। জায়গীর বা আয়মার উপর বাজে জমা বার হইত না; সুতরাং মহারাজা রামজীবন নবাব সরকারে ১৩৯ পরগণাভুক্ত "খালসা" জমিদারীর জন্য ১৩৯৬০৮৭ রাজকর এবং ২১৩৯৫ বাজে জমা প্রদান করিতেন। এই রাজকর ও বাজে জমা ভিন্ন তাঁহাকে আর কিছু দিতে হইত না; বিস্তীর্ণ জমিদারী হইতে ইহার অতিরিক্ত যত টাকা আদায় হইত, সে সকলই তাঁহার রাজশ্রী বর্দ্ধন করিত। এত অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান

* *The Rajas of Rajshahi.*

সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রঘুনন্দনের প্রভুত্ব ও বুদ্ধিকৌশলের সাহায্যে মহারাজা রামজীবন নবাবদরবারে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সামাজিক পদগৌরব।

রাজকার্য্য উপলক্ষে রঘুনন্দকে সর্ব্বদাই নবাব-দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত। সেই জন্য, রামজীবন যেমন নাটোরে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন, রঘুনন্দনও সেইরূপ আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে এক নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজদিগের নিকট এই স্থান কখন বড়নগর, কখন বা বীরনগর নামে পরিচিত হইয়াছিল, এবং লোকে এখনও ইহাকে "নাটোরের রাজবাটী" বলিয়া থাকে। কিন্তু নাটোর রাজবাটী অপেক্ষা বড়নগরের রাজবাটীর সঙ্গেই বাঙ্গলার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠতর সংস্রব। রঘুনন্দন যখন এই বাটীতে বাস করিতেন, তখন তাঁহার সৌহার্দ্যলাভের জন্য বাঙ্গলার ছোট বড় সকল জমিদারকেই কখন না কখন এই বাটীতে পদার্পণ করিতে হইত। মহারাণী ভবানী গঙ্গাবাস উপলক্ষে অধিকাংশ জীবন এই বাটীতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং এই বাটীর প্রাচীরসংলগ্ন ভাগীরথীতীরে মহারাজা রামকৃষ্ণ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। বড়নগর রাজবাটীর আর সে সৌভাগ্য-গর্ব্ব নাই, রাজ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটীও জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেবল কয়েকটি দেবমন্দির এখনও পূর্ব্ব সৌভাগ্যের নীরব সাক্ষিস্বরূপ ধ্বংসাবশেষের ইষ্টকস্তূ[illegible]ধ্যে দৃঢ়-ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উদিতনারায়ণের রাজসাহী রা[illegible]ধিকাংশ স্থান মুর্সিদাবাদ চাকলার অধীন ছিল, সেই জন্য বড়নগরের রা[illegible]ই প্রকৃত পক্ষে রাজসাহী রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

এই রাজবাটীতে বসিয়া রঘুনন্দন যেরূপ মন্ত্রণা দিতেন, না[illegible]র-রাজবাটীতে বসিয়া রামজীবন তদনুসারেই রাজ্যশাসন করিতেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, রামজীবন সাহসী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মশীল, দীর্ঘকায় * বলিষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন; কিন্তু বাহুবলের অনুরূপ বুদ্ধিকৌশল ছিল না। রঘুনন্দন সেরূপ বীরপুরুষ না হইলেও বুদ্ধিকৌশলের জন্য বাঙ্গলা দেশের মধ্যে এক জন প্রতিভাশালী

---

* রাজসাহীর কালেক্টারীতে "মহারাজা রামজীবনের হাতকাঠীর" একটি মাপ আছে; তাহা ২২ ইঞ্চি।—তাহাই যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে রামজীবনের হাতের মাপ হয়, তবে তিনি যে সবিশেষ "দীর্ঘকায়" ছিলেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

মন্ত্রণাকুশল "খুরন্দিং" বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন; শিক্ষার সঙ্গে প্রতিভা মিলিত হইয়া রঘুনন্দনকে সমধিক ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিল। রঘুনন্দনের সেই অসীম ক্ষমতাই রাজ্যলাভের মূল কারণ; কিন্তু সেকালের ভ্রাতৃপ্রেম দুই ভাইকে এক বৃন্তের যুগল কুসুমের মত এমন অভেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে, রঘুনন্দন সর্ব্বতোভাবে রাজসাহীর বিস্তীর্ণ জনপদের প্রভু হইয়াও জ্যেষ্ঠের নিকট দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, এবং প্রতিভা ও ক্ষমতাবলে নবাব-দরবার হইতে যখনই কোন নূতন জমীদারী পাইতেন, তাহা জ্যেষ্ঠের চরণেই উৎসর্গ করিয়া দিতেন।

মুর্সিদ কুলী খাঁর নবাবী আমলে কেবলমাত্র বীরভূমিই যবন জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল; তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদায় চাক্‌লাতেই হিন্দু জমিদারদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই সকল হিন্দু জমিদারদিগের মধ্যে দিনাজপুরাধিপতি শূদ্রবংশীয় রামনাথ, নবদ্বীপাধিপতি ব্রাহ্মণবংশীয় রঘুরাম, এবং নাটোরাধিপতি রামজীবন ও রঘুনন্দনই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তি ও ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পদগৌরবলালসা স্বভাবতই প্রবল হয়;—রামজীবন এবং রঘুনন্দনও ক্রমে সামাজিক পদগৌরববৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষিদিগের অনুশাসনক্রমেই হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইত; কিন্তু মুসলমানাধিকারসময়ে বাঙ্গলা দেশে কিছু কিছু মতবিপর্য্যয় আরব্ধ হইয়াছিল। শকাব্দা ১২৫০ সালের সমকালে "বারেন্দ্রনন্দনাবাসীয় ভট্টদিবাকরাত্মজ শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট" মেধাতিথি-বিরচিত প্রাচীন মানব-ভাষ্যের দোষ দেখাইয়া "মন্বর্থমুক্তাবলী" * নামক

"সারাসারবচঃপ্রপঞ্চনবিধৌ মেধাতিথেশ্চাতুরী
স্তোকং বস্তুনিগূঢমল্পবচনাদ্গোবিন্দরাজো জগৌ।
গ্রন্থেঽস্মিন্ ধরণীধরস্য বহুশঃ স্বাতন্ত্র্যমেতাবতা
স্পষ্টং মানবমর্থতত্ত্বমখিলং বক্তুং কৃতোঽয়ং শ্রমঃ॥
প্রায়ো মুনিভির্ব্বিবৃতং কথয়ত্যো বা মনুস্মৃতেরর্থং।
দশভিশ্চ সহস্রৈঃ সপ্তদশযুতৈঃ স্মৃতা বৃত্তিঃ॥
সোঽয়ং ময়া মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যধায়ি বৃত্তির্ব্বিদুষাং হিতায়।
ছুর্ব্বোধজাতেষু বিতর্কয়ায় ভূয়াৎ ততো মে জগতামধীশঃ॥"
*এ মাধ্যেষা শ্রীমৎকুল্লুকভট্টবিরচিতা মন্বর্থমুক্তাবলী।"

একখানি নূতন টীকার প্রচলন করেন। ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ অভিনব "গৌড়ীয় পণ্ডিতগণ" নূতন নূতন যুক্তি তর্ক উপস্থিত করিয়া প্রাচীন স্মৃতির পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা দেশে নব্যস্মৃতির প্রচলন করেন। কালক্রমে জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" এবং রঘুনন্দন স্মার্ত্তশিরোমণির "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের" সঙ্গে বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত, এবং বাঙ্গলা দেশের হিন্দুসমাজে অনেকগুলি নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বল্লালসেন শ্রেণীবিভাগ ও কুলমর্য্যাদানিরূপণ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন, বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং কুলীন এবং শ্রোত্রীয়ের মধ্যে কন্যা আদানপ্রদানের কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছিল না; কুলীন পিতা আবশ্যকমত শ্রোত্রীয় বরে কন্যাদান করিলেও কুলচ্যুত হইতেন না। কুল্লুকভট্টের সমসময়ে কাশ্যপগোত্রীয় ভাদুড়ীবংশে তর্কশাস্ত্রবিশারদ বৃহস্পতি আচার্য্যের ঔরসে উদয়নাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। * তিনি বারেন্দ্রদেশে অভিনব সমাজ-সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন। কৌলীন্যসংস্থাপক বল্লালসেন "ভাদড়াঃ পংক্তি-পূরকাঃ" বলিয়া ভাদড়গ্রামী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকেও কুলীন করিয়াছিলেন; উদয়নাচার্য্য নিতান্ত অনাবশ্যকবোধে তাঁহাদিগকে কুলচ্যুত করিয়া দিলেন। কুলীনগণ শ্রোত্রীয় বরে কন্যাদান করিতেন, ইহা তাঁহার বিচারে বড়ই অকীর্ত্তিকর ও গ্লানিজনক বলিয়া বিবেচিত হইল। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—ইহা অনেক দিনের পুরাতন কথা। সেই পুরাতন মহাজন-প্রদর্শিত পথারোহণে কুলীনগণ দুষ্কুল শ্রোত্রীয় হইতে "স্ত্রীরত্ন" গ্রহণ করিবার অধিকারী; কিন্তু তাই বলিয়া জানিয়া শুনিয়া সেই দুষ্কুল শ্রোত্রীয়বরে কন্যাদান করিবেন কেন? উদয়নাচার্য্যের তর্কস্রোতে সমুদয় "সনাতনী প্রথা" ভাসিয়া গিয়া কুলীন পিতার পক্ষে শ্রোত্রীয় বরে কন্যাদান করা রহিত হইল; এবং বারেন্দ্র কুলীনসমাজে "করণ" নামক পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইল।

বল্লালসেনের কৌলীন্যের সঙ্গে উদয়নাচার্য্যের কৌটিল্য মিলিত হইয়া কুলীন-কুমারীদিগের সার্ব্বত্রিক বিবাহের পথ বন্ধ হইয়া গেল। কুলীন পিতা এবং শ্রোত্রীয় পিতা উভয়েই কুলীন বরের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন; উভয়ের প্রতিযোগিতায় কুলীন বর দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল, কুলীনদিগের মধ্যে "আচারো বিনয়ো বিদ্যা" ক্রমশঃ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতে লাগিল;—অবশেষে

* কেহ কেহ ইঁহাকেই কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা কাশ্যপগোত্রীয় ছিলেন না।

২২৩

বারেন্দ্রসমাজে বহুবিবাহ এবং কু—বিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিল। কুলীনের সদ্‌গুণরাশি কালক্রমে "লীন" হইয়া "কু" টুকু অবশিষ্ট থাকিয়া গেল!

যখনই কোন নূতন মত প্রচারিত হয়, তখনই তাহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুইটি দল হইয়া থাকে;—উদয়ের সময়েও তাহাই হইল। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি ও শচীপতি নামক ছয় পুত্র মধু মৈত্রেয়ের কুলবহিষ্কৃত আনন্দ ও অর্জ্জুন নামক পুত্রদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া এক নূতন দল গঠন করিলেন; কিন্তু প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া এই দল "কাপ" নামে পরিচিত হইল। কাপের ও কুলীনের মধ্যে দলাদলি জাঁকিয়া উঠিতে লাগিল;—কাপের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদান করা ত দূরের কথা, তাঁহাদের সঙ্গে আহারাদি করিলেও লোকের কুলচ্যুতি হইতে লাগিল! এই চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর "উপকারের করণে" লিপ্ত হইয়া নাটোর-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জীবর মৈত্রেয় কাপ-দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কাপের দল দিন দিনই পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কুলীনদিগের নিয়ম যতই কঠিন হইতেছে, তাহাতে লোকের কুলচ্যুতির পথ ততই সহজ হইয়া উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া তাহিরপুরের বিখ্যাত শ্রোত্রীয় রাজা কংসনারায়ণ মধ্যস্থ হইয়া কতকগুলি নূতন বিধান প্রচলিত করিয়া দিলেন। ইহাতে কাপ-দিগের পক্ষে পুনরায় কৌলীন্যলাভের উপায় হইল না বটে, কিন্তু শ্রোত্রীয়বরে কন্যাদান করিয়া কাপ হইতে শ্রোত্রীয় হইবার, এবং শ্রোত্রীয় হইয়া কুলীনবরে কন্যাদান করিয়া সিদ্ধশ্রোত্রীয় হইবার উপায় হইল। জীবর মৈত্রেয়ের বংশধর-গণ কাপ হইয়াছিলেন, পরে শ্রোত্রীয়বরে কন্যাদান করিয়া শ্রোত্রীয় হন; রামজীবন ও রঘুনন্দন সিদ্ধশ্রোত্রীয় হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সান্ন্যাসী-গ্রামী পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশে রাজা কংসনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। কুলীনগণের আশ্রয়দাতা বলিয়া বারেন্দ্রসমাজে পদগৌরবে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। রামজীবন ও রঘুনন্দনের সমসময়ে রাজা কংস-নারায়ণের প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাহিরপুরে রাজত্ব করিতেন। রামজীবন ও রঘুনন্দন সেই লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত কুমার কালিকাপ্রসাদের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে চেষ্টা ফলবতী হইতে অধিক বিলম্ব হইল না; রাজসাহীর ভবিষ্যৎ মহারাজা "কালু কোঙারকে" কন্যাদান করিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের কোনরূপ ইতস্ততঃ থাকিলেও, নবাব-দরবারে রঘুনন্দনের প্রভুত্ব থাকায়, তাহা লইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পাইলেন না।

কালিকাপ্রসাদের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার শুভবিবাহ হইয়া নাটোর-রাজ-বংশের সামাজিক পদগৌরবলাভের পথ সহজ হইয়া গেল।

বাঙ্গলা দেশ দিল্লী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। বাঙ্গলার জলবায়ুর দুর্নামে দিল্লীর দরবার পরিপূর্ণ; সুতরাং বাদশাহেরা বাঙ্গলা দেশ শাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া শোষণ করিবার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেন। সেই জন্য বাঙ্গলার নবাবেরাও এই দেশ যথারীতি শাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রমাগত "দেহি দেহি" রবে কর সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেন; আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য জমিদারদিগের হাতেই পড়িয়া থাকিত। রাজা এরূপ উদাসীন হইলে রাজপ্রসাদ না পাইয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গলার জমিদারগণও যদি নবাবদিগের মত কেবলমাত্র কর-সংগ্রহেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল মুসলমানশাসনাধীন থাকিয়া বাঙ্গালী জাতি একেবারে সভ্যতার নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িত। বাঙ্গালী প্রবীণ সুসভ্য আর্য্যজাতি যে নিরক্ষর বর্ব্বর জাতিতে পরিণত হয় নাই, বাঙ্গলার জমিদারগণই তাহার মূলকারণ। তাঁহারা শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষার উন্নতি-কল্পে সাধ্যানুসারে উৎসাহদান করিতেন বলিয়া বাঙ্গালীমাত্রেই এখনও তাঁহাদিগের লুপ্তস্মৃতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে বহন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলার অনেক প্রাচীন জমিদার বংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাহারও কাহারও ইতিহাসবিখ্যাত রাজভাণ্ডার ভিক্ষাপাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের বংশগৌরব এখনও বহুমানাস্পদ হইয়া রহিয়াছে।

নাটোর-রাজবংশের রাজোন্নতি ও সামাজিক গৌরববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য সদনুষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রামজীবন ও রঘুনন্দন যেমন প্রবলপ্রতাপে রাজকর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সেইরূপ শিক্ষা ও শিল্প বাণিজ্যের উৎসাহ দিবার জন্যও মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেকালে এ দেশে সংস্কৃত, পারসী ও বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন ছিল। হিন্দু স্বাধীনতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবার হইতে সংস্কৃত ভাষা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার তখন পর্য্যন্তও ভাল করিয়া দন্তোদ্গম হয় নাই; সুতরাং একমাত্র পারসী বা উর্দ্দু ভাষাই বহুলরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। রাজকার্য্য উপলক্ষে যাঁহাদিগকে নবাব-দরবারে গতিবিধি করিতে হইত, তাঁহারা বাধ্য হইয়া রাজভাষা অভ্যাস করিতেন; কিন্তু সকলেই কোনরূপে

কাজ চালাইবার মত পারসী শিক্ষা করিয়াই মৌলবী হইয়া উঠিতেন, তাহাতে উচ্চশিক্ষার অভাব পূরণ হইত না। অগত্যা সংস্কৃতই উচ্চশিক্ষার একমাত্র সোপান হইয়া উঠিয়াছিল। আজ কাল সংস্কৃতশিক্ষা ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই একমাত্র আরাধ্য বস্তু, কিন্তু সেকালে রাজা জমিদার ও রাজসভার সদস্যগণ সকলেই সংস্কৃত ভাষায় পরিপক্ক হইতেন; সম্ভ্রান্ত বংশের হিন্দু সন্তানদিগের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা সাধারণতঃ নিন্দার বিষয় ছিল। অনেকেরই সংস্কৃতশিক্ষায় সবিশেষ অনুরাগ ছিল; কিন্তু অধ্যাপকগণ বিনা মূল্যে বিদ্যা বিতরণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের অধ্যাপনাকার্য্যে রাজার সাহায্য আবশ্যক হইত। মুসলমান রাজত্বে হিন্দু জমিদারগণ মুক্তহস্তে সাহায্যদান না করিলে সংস্কৃতশিক্ষা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু রামজীবন ও রঘুনন্দনের সংস্কৃত ভাষার উপর আশৈশব অনুরাগ থাকায়, রাজসাহী রাজ্যে তাঁহাদের উৎসাহে সংস্কৃত শিক্ষা ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহারাজা রামজীবনের এক জন সভাসদ ছিলেন। রামজীবন যে সত্য সত্যই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৫ শকে (১৭২৩ খৃষ্টাব্দে) পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পদাঙ্কদূতের ললিতলাবণ্যময়ী কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখনও আনন্দাশ্রু বিমোচন করিয়া থাকেন। পদাঙ্কদূত ক্ষুদ্র চম্পূ-কাব্য, কিন্তু তাহার ছত্রে ছত্রে যে লিপিকৌশল ও পদলালিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই কবির যশঃ চিরজীবী হইয়াছে। কবি কাব্যশেষে লিখিয়া গিয়াছেন,

"শাকে সায়কবেদষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মার্পয়ন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দন-পদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥" *

* বেণীমাধব দে কোম্পানী বটতলা হইতে পদাঙ্কদূতের যে বিকৃত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শেষোক্ত চরণটি একটু বিভিন্ন করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রঘুরাম রায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অনুসন্ধানপ্রিয় পাঠক তাহা পাঠ করিয়া পদাঙ্কদূতের কবির লেখনীপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। এ বিষয়ে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-রচয়িতা যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"নমস্কারনিবেদনমেতৎ

১১ আশ্রীল দিবসীয় আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর এবং

বাদশাহ আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর হইতে মোগলের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন ক্রমেই খরবেগ ধারণ করিতেছিল। এক জন ভাল করিয়া সিংহাসনে বসিতে না বসিতেই আর এক জন আসিয়া বাহুবলে অথবা মন্ত্রণাকৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতে লাগিলেন। মোগলের "ময়ূর-সিংহাসন" যতই ক্রীড়াপুতুলে পরিণত হইতে লাগিল, চারি দিকে ততই ছোট খাট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল;—সেই বিপ্লবের অনুকম্পায় বাঙ্গলার নবাবও প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া এক দল অবাহূত বিদেশীয় বণিক ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে বাঙ্গলা দেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিদেশীয় বণিক এখন সমুদায় ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট; তাঁহাদের ইতিহাসই নব্য বাঙ্গলার ইতিহাস, তাঁহাদের কাহিনীই ভারতবাসীর নিত্য আলোচনার বিষয়। নাটোর-রাজবংশের, বিশেষতঃ রাণী ভবানীর জীবন-কাহিনীর অনেক ঘটনার সঙ্গে তাঁহাদের সংস্রব;—সুতরাং বাহুল্যভয়ে ভীত হইলেও, তাঁহাদিগের কথা এবং তাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিতে হইবে।

বগুড়াতে বিদ্যাভ্যাস এবং বিষয় কার্য্য করিয়াছি। বাটী যাতায়াতে রায়গঞ্জ থানার অন্তঃপাতী ঘুরকাগ্রামের নিকট হইয়া যাতায়াত করিতাম, এবং বহুবার ঘুরকাতে নামিয়া পাক শাক করিয়া খাইয়াছি। ঐ ঘুরকাগ্রামে মোরশেদাবাদ চক্রের ভূতপূর্ব্ব জজ আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিবাস ছিল; অদ্যাপি তাঁহার বাটীর দালান বর্ত্তমান আছে। পদাঙ্কদূতরচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ঐ কৃষ্ণনাথের পিতামহ, এবং তিনি পদাঙ্কদূত রচনা করিয়াছেন, ঐ সুযোগে জ্ঞাত হই। বগুড়ার ত্রিলোচন সিদ্ধান্তের বাটী হইতে আমি একখান পদাঙ্কদূত প্রাপ্ত হই, এবং বাল্যকালে নকল করি, তাহাতে রামজীবন পাঠ ছিল স্মরণ হয়। এবং বগুড়া অঞ্চলের প্রাচীন পণ্ডিতের শুনা এবং বিশ্বাস যে, পদাঙ্কদূত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথের পিতামহ এবং নাটোরের রামজীবনের সভাসদ ছিলেন। কৃষ্ণনাথ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক তাহা আপনিও বোধ হয় শুনিয়াছেন। পদাঙ্কদূত পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণও নৈয়ায়িক ছিলেন। ১৮৪০ শকাব্দে শ্রীরামপুর যন্ত্রে ডাক্তার জান্ হেবরলীন্ কর্ত্তৃক দেবনাগরাক্ষরে কাব্যপ্রকাশ ছাপা হয়, তাহাতে যে শ্লোক আছে, তাহাই অবিকল আমি নকল করিয়া উঠাইয়া দিয়াছি। রঘুরামের আজ্ঞাতে পদাঙ্কদূত রচনা হইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বে শুনি নাই।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম, তৎপিতা রামজীবন। রঘুরাম ১৬৫০ শকে অভাব হন। রামজীবনের অন্তে রঘুরাম রাজা হন। ১৬৫৫ শকে নদীয়ার রামজীবন রাজা ছিলেন না, এই সকল কারণে গৌড়ে ব্রাহ্মণে নাটোরের সভা হইতে পদাঙ্কদূত প্রস্তুত হওয়া লিখিয়াছি। নিবেদনমিতি—শ্রীমহিমাচন্দ্র শর্ম্মা মজুমদারস্য নিবেদনম্।"

পর্ত্তুগালের রাজা ইমান্যুয়েলের শাসনসময়ে বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডি গামার উদ্যোগে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হয়; পর্ত্তুগিজ নাবিকগণ উৎসাহে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলে পদার্পণ করেন। কিন্তু তাঁহারা পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, যাহা ভবিয়াছিলেন, তাহা সত্য নহে;—"ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ভীরু কাপুরুষ নহে, যাহার ইচ্ছা সেই আসিয়া বাহুবলে বা ছলকৌশলে তাহাদের দেশ কাড়িয়া লইবার সুবিধা নাই; তাহারা বিদ্যাবুদ্ধি ও বাহুবলে তখনপর্য্যন্তও জাতীয়বিক্রমের পরিচয় দিতেছে"।* দেখিয়া শুনিয়া অগত্যা রাজ্যলাভের দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় নাবিকগণ বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে, প্রথমে দিনামার, তাহার পর ইংরাজ ও তাহার পর ফরাসীরা আসিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে এই সকল বিদেশীয় বণিক ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ এই সকল বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে যেরূপ কঠোর হস্তে শুল্কগ্রহণ করিতেন, তাহাতে সকলেই মোগলের অধঃপতনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। এখন সুসময় নিকটে দেখিয়া ইংরাজবণিক্-সমিতি দিল্লীর দরবারে এক দল প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তোষামোদ, বহুমূল্য উপঢৌকন ও সময়োচিত উৎকোচেরই সমধিক প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। ইংরাজগণ সেই সকল ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া হামিল্টন নামক এক জন ইংরাজচিকিৎসকের চিকিৎসাগুণে শীঘ্রই সম্রাট ফরোকশায়ারের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন।

ইংরাজ বণিকেরা পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনখানি গণ্ডগ্রাম লইয়া ভাগীরথীতীরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজসাহী প্রদেশের নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আরও ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিয়া ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইবার অধিকারযুক্ত সম্রাটের মোহরাঙ্কিত সনন্দ লইয়া, বাঙ্গলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।† ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সনন্দ নবাবের নিকটে উপস্থিত করিবামাত্র নবাব বুঝিতে পারিলেন যে, বাঙ্গলার অন্তর্ব্বাণিজ্য আর বেশী দিন বাঙ্গালীর হাতে থাকিবে না, এবং ইংরাজেরা যেরূপ অকুতোভয় অধ্যবসায়শীল যুদ্ধনিপুণ বণিক্‌জাতি,

* Torren's Empire in Asia.

† Torren's Empire in Asia.

তাহাতে তাহারা বাঙ্গলা দেশে ৩৮ খানি গ্রামে দুর্গনির্ম্মাণ করিলে বাঙ্গালীকে সসর্প গৃহবাসের ন্যায় সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইবে।

বাঙ্গলার নবাব সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইলেও, তখন পর্য্যন্ত বাদশাহের "ফারমাণ" প্রকাশ্যরূপে অমান্য করিতে সাহস পাইতেন না। অগত্যা প্রকাশ্যে বাদশাহের ফারমাণ শিরোধার্য্য করিয়া গোপনে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য নবাবদরবারে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। ইংরাজগণ বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন, কিন্তু জমিদারগণকে গোপনে শাসন করিয়া দেওয়া হইল যে, কেহ যেন সূচ্যগ্র ভূমিও ইংরাজবণিকের নিকট বিক্রয় না করেন। *

এই সময়ে রঘুনন্দন নবাবদরবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইংরাজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যস্থান রাজসাহীর জমীদারীর অন্তর্গত; সুতরাং ইংরাজেরা যখন উচিত-মূল্য দিয়া একখানি গ্রামও ক্রয় করিতে পারিলেন না, তখন রঘুনন্দনের মন্ত্রণার উপরেই দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ইহাই বাঙ্গালী জমিদারদিগের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম বিবাদ; সে বিবাদে নথাগ্রগণনীয় ইংরাজ বণিককেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। † কিন্তু বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়া ইংরাজ বণিক জলে স্থলে সর্ব্বত্রই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং দেশের নিরীহ লোকের উপর অনেক অন্যায় উৎপীড়ন হইতে আরম্ভ হইল।

ইংরাজদিগের এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য নবাব তাঁহা-দিগের অন্তর্ব্বাণিজ্যে বাধা প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। নবাবদরবারের বিচক্ষণ দেওয়ান রঘুনন্দন রায় বাদশাহের ফারমাণ হইতেই প্রমাণ করিয়া

---

* Stewart's History of Bengal.

† "The prudent foresight of Moorshud cooly khan, added to his resentment at the success of the Embassy, made him behold with indignation the concession of this article; but not daring openly to oppose the Imperial mandate, he privately threatened the proprietors of the land with denunciations of his vengeance, if they parted with their ground upon any terms that should be offered: and the Companys servants confiding too much in the sanction of the Emperor's firman, neglected the more efficacious means of bribing the Nuwab to compliance with their wishes. Thus the most important concession which had been obtained by the Embassy was entirely frustrated."-----Stewart's History of Bengal.

দিলেন যে, পান গুপারি তামাক গুড় প্রভৃতি গরিবলোকের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া অন্তর্ব্বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজগণ কোনই ক্ষমতালাভ করেন নাই। অগত্যা ইংরাজ বণিক অন্তর্ব্বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে ইউরোপে পণ্যদ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজের নিশান উড়াইয়া যাহারা জলে স্থলে কলিকাতাভিমুখে পণ্যদ্রব্য বহন করিত, তাহাদিগকে কিছুমাত্র শুল্ক দিতে হইত না। সুতরাং ইংরাজের অধীনে পর্ত্তুগিজ, আর্ম্মাণী, মোগল এবং হিন্দুরাও কলিকাতায় বাস করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন; সামান্য গণ্ডগ্রাম হইতে কলিকাতা একটি সমৃদ্ধিশালী মহানগরে পরিণত হইতে লাগিল।

মুর্শীদ কুলী খাঁ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ নবাব বলিয়া হিন্দুমুসলমানের নিকট সুপরিচিত। তিনি সুরাপান করিতেন না, একটিমাত্র সহধর্ম্মিণীতে অনুরক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন, এবং কঠোর শূলদণ্ডে দস্যু তস্কর নিধন করিয়া এবং বিদেশে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ রহিত করিয়া, জমিদারদিগের সহায়তায়, অকুতোভয়ে বাঙ্গলা দেশে রাজত্ব করিতেন।

যদিও সহসা মুর্শীদ কুলি খাঁকে তাড়িত করিয়া কাহারও পক্ষে সিংহাসন কাড়িয়া লওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি দিল্লীর দরবারের ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখিয়া মহম্মদাবাদের দুই জন পাঠান জমিদার সেনা সংগ্রহ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ লুণ্ঠন করিয়া, পথিমধ্যে নবাবের ৬০০০০ টাকা অপহরণ করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে আহসান আলিখাঁ হুগলীর ফৌজদার এবং নবাবের সবিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নবাব তাঁহার উপরেই এই বিদ্রোহদমনের ভার সমর্পণ করিলেন। আহসান্ আলীর চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহী পাঠানদ্বয় বন্দিদশায় মুর্শিদাবাদে আনীত হইল। মুসলমান বলিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া নবাব তাঁহাদের মহাম্মদাবাদের জমিদারী তাঁহার প্রিয় জমিদার রামজীবনকে অর্পণ করিলেন। রাজকোষের যে ৬০০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছিল, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় জমীদারদিগকে অংশানুসারে পূরণ করিয়া দিতে হইল।*

মুর্শীদ কুলী খাঁ ইহার পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। মৃত্যুকাল নিকট

* Stewart's History of Bengal.

হইতেছে দেখিয়া, তিনি স্নেহভাজন দৌহিত্র সরফরাজখাঁকে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসাইবার আশায় দিল্লীতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সরফরাজের পিতা সুজাখাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সিংহাসনলাভের সম্ভাবনায় সুখী হওয়া দূরে থাকুক, নিজেই পুত্রের প্রতিদ্বন্দী হইয়া গোপনে গোপনে দিল্লীতে প্রার্থনা জানাইতে আরম্ভ করিলেন। আমীরল্ উমরাখান্ দৌরান্ তখন দিল্লীর দরবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি নামে বাঙ্গলার নবাব হইয়া সুজাখাঁকে বাঙ্গলার রাজপ্রতিনিধি করিতে সম্মত হইলেন। সুজাখাঁ সেই সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া বৃদ্ধ নবাব মুর্শীদ কুলীখাঁর মৃত্যুদিনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

কুলীখাঁর শেষ জীবন এই সকল কারণে বড়ই তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। জীর্ণ শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতাও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কুলীখাঁর সৌভাগ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাটোর রাজবংশের সম্পদ লাভ হইয়াছিল, আবার কুলীখাঁর শেষ জীবনের দুঃখবিষাদের সঙ্গে সঙ্গে নাটোর রাজবংশেও দুঃখবিষাদ উপস্থিত হইতে লাগিল।

১১৩১ সালে (১৭২৪ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ রামজীবনের একমাত্র সুস্নেহ পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলেন! পুত্রশোক দারুণ শোক, বৃদ্ধ বয়সে সেই শোক শেলের মত রামজীবনের বুকের মধ্যে বিঁধিল। তাহার যন্ত্রণা না ভুলিতেই সেই বৎসরেই রাজসাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, নবাবের মন্ত্রণাকুশল প্রিয়সহচর, মহারাজ রামজীবনের দক্ষিণবাহু, নাটোর রাজবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ, রায় রাইয়ান রঘুনন্দন ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন! কুলীখাঁ অল্পদিনের মধ্যেই চিরশান্তির আশ্রয় গ্রহণ করায় সুজা ও সরফরাজের মধ্যে সিংহাসন লইয়া প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল।

সুজাখাঁ বাঙ্গলার নবাব হইলেন,—সরফরাজ পিতার সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না। নবাব হইয়াই সুজা খাঁ পূর্ব্বসুহৃদ্ হাজি আহমদ ও আলিবর্দ্দী নামক দুই জন সুশিক্ষিত মুসলমানকে আনিয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন নাই, রাজকুমার কালিকাপ্রসাদ নাই,—সুতরাং এতদিন নবাবদরবারে রাজসাহীর রাজার জন্য যে উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে বসিবার আর কেহই রহিল না। শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ মহারাজ শাখাপত্রহীন শুষ্কতরুর ন্যায় শেষ ঝটিকার অপেক্ষায় নাটোর রাজবাটীতে বসিয়া বিষন্নহৃদয়ে দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর নাম বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণের নিকট অপরিচিত নাই। স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার নাম কেবল ভারতবর্ষে নয়,—সমগ্র সভ্য জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাঁহার গবেষণার মৌলিকতায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসম্মিলনীমাত্রই বিস্মিত হইয়াছেন। য়ুরোপ-প্রবাসকালে লর্ড কেলভিন্ প্রভৃতি আচার্য্যগণ জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং য়ুরোপীয় নানা বিজ্ঞানসভার সভ্যগণ, তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া, সম্মানসূচক বহু উপাধি প্রদান করিয়াছেন।—এরূপ গৌরব অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলে, রাজভাণ্ডার হইতে যথেষ্ট বৃত্তি পাইয়া থাকেন, এবং আবশ্যকানুযায়ী যন্ত্রাদিও রাজব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে;—এইরূপে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে গবেষণায় রত থাকিয়া, অল্পায়াসেই নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশে তদনুরূপ সুব্যবস্থা কিছুই নাই;—কৃতবিদ্য ভারতসন্তানগণ ছাত্রজীবনের শেষেই, আর্থিক অসচ্ছলতার কঠোর তাড়নায় বিচলিত হইয়া পড়েন; পূর্ব্বাধীত প্রিয়বিদ্যার চর্চ্চা চিরজীবনের মত ত্যাগ করিয়া, নীরস ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যয়নে রত হন। এ অবস্থায় বঙ্গসন্তানের নানা[illegible]ক্রান্ত মস্তিষ্কে স্বাধীন বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্থান থাকিতে পারে কি? সৌভাগ্যের বিষয়, [illegible]দীশচন্দ্র পাঠসমাপনান্তে ব্যবসায়ান্তরে প্রবিষ্ট হন নাই, নচেৎ বঙ্গের শত শত কৃতবিদ্য হতভাগ্যের ন্যায় তাঁহার প্রতিভাও আজীবন মলিন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়া তাঁহার অতি অল্পই অবকাশ থাকে; এই অত্যল্প সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চা করা, এবং গবেষণার উপযোগী যন্ত্রাদির অভাবে স্বয়ং যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া একটা মহৎ আবিষ্কার করা, কত অধ্যবসায়, শ্রম ও উন্নত প্রতিভার পরিচায়ক, পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

অধ্যাপক বসু বৈদ্যুতিক তরঙ্গসম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, "ঈথর" নামক এক সর্ব্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম পদার্থের কম্পনে আলোকের উৎপত্তি হয়,—এবং ইহারই কম্পনভেদে তড়িৎ ও চৌম্বকশক্তির বিকাশ হয়। উক্ত ঈথরস্থ তড়িৎ-তরঙ্গ দ্বারা যে এক প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অদৃশ্য আলোক উৎপন্ন হইতে পারে, এত দিন দার্শনিকগণ সে কথা জানিতেন না,—ডাক্তার বসু এই ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। উল্লিখিত অদৃশ্যালোকের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সাধারণ আলোক যে সকল পদার্থের বাধা অতিক্রম করিতে অসমর্থ, উক্ত আলোক তাহার অধিকাংশগুলিই অবাধে অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইতে পারে,—ইষ্টক, কাষ্ঠ, প্রস্তর, নাতিস্থূল ধাতুফলক ইত্যাদি এই বৈদ্যুতিক-তরঙ্গজাত আলোকের অণুমাত্র বাধা উৎপাদন করিতে পারে না; আবার এই আলোক-উৎপাদক তড়িৎ-তরঙ্গ একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রের উপর পতিত হইলে টেলিগ্রাফের যন্ত্রের ন্যায় শব্দ করিয়া থাকে;—এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ-সাহায্যে এক প্রকার তন্ত্রীহীন বার্ত্তাবহযন্ত্র শীঘ্রই উদ্ভাবিত হইবে বলিয়া অনেকে আশান্বিত হইয়াছেন। নূতন বার্ত্তাবহযন্ত্রনির্ম্মাণে তড়িৎ-তরঙ্গের উপযোগিতা,

কয়েক মাস হইল, অধ্যাপক বসু কলিকাতাতেই সাধারণসমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন ;—তিনি প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র গৃহে উক্ত তড়িৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া, প্রকোষ্ঠান্তরস্থ একটি সজ্জিত বন্দুকের অভিমুখে তরঙ্গ পরিচালন করিয়াছিলেন। তরঙ্গগুলি নির্বাধে গৃহ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া, বন্দুকের বারুদ প্রজ্বলিত করিয়াছিল। বৈদ্যুতিক তরঙ্গে সাধারণ আলোক-তরঙ্গের অনেক ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়,—স্থূলমধ্য কাচখণ্ড (Lenses) দ্বারা কি প্রকারে সাধারণ আলোক কেন্দ্রীভূত হইয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন ; নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক আলোক উক্ত উপায়ে দূরে প্রেরণের জন্য অধ্যাপক বসু চেষ্টা করিতেছিলেন,—সম্প্রতি এবোনাইট (Ebonite) নামক একজাতীয় কৃষ্ণপদার্থ দ্বারা স্থূলমধ্য লেন্‌স্ নির্ম্মাণ করিয়া, প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে তড়িৎ-তরঙ্গ প্রেরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যথেচ্ছ ব্যবধানে তরঙ্গপ্রেরণের সুব্যবস্থার জন্য আজ কাল বহু উদ্যোগ হইতেছে,—ডাক্তার বসু যে প্রকাণ্ড ঐকান্তিকতার সহিত অদ্যাপি উপস্থিত বিষয়ে নিয়োজিত রহিয়াছেন; তাহাতে শীঘ্রই তাঁহার শ্রম সার্থক হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

ডাক্তার বসু, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের উৎপাদন, এবং এই তরঙ্গের অস্তিত্বপরীক্ষার উপযোগী দুইটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যন্ত্রদ্বয় অতীব সূক্ষ্ম ও সুগঠিত,—জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রযুগলে একাধারে মৌলিক গবেষণা ও যন্ত্রশিল্পের চরমোৎকর্ষের উদাহরণ দিয়া জগতকে আরও মোহিত করিয়াছেন। অতি অল্পকালের মধ্যে উক্ত যন্ত্রযুগলের সাহায্যে বিদ্যুৎতরঙ্গের কার্য্য ও ইহার প্রকৃতিসম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কারগুলির অধিকাংশই অতীব জটিল,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সাধারণ পাঠকগণের চিত্তাকর্ষক হইবে না বলিয়া, অধুনা ক্ষান্ত থাকিলাম।

তড়িৎ-তরঙ্গের কার্য্যাদিসম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,—কোন স্বচ্ছ তরলপদার্থে একটি বস্তু অর্দ্ধমগ্ন করিলে, বস্তুটির মজ্জমান অংশ, অমগ্ন অংশ হইতে ঈষৎ ভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় ; কাচপাত্রস্থিত পরিষ্কার জলে, একটি পেন্সিলের কিয়দংশ বক্রভাবে মগ্ন করিলে, ইহার বেশ পরীক্ষা হয় ;—লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই পেন্সিলটি জলের ঠিক উপরিভাগে ভগ্ন হইয়া, নিম্নে বাঁকিয়া আছে, এইরূপ বোধ হইবে। অন্ধকার কক্ষে সূক্ষ্মছিদ্রাগত আলোক-রশ্মি জলপূর্ণ পাত্রে পড়িতে দিলেও, রশ্মি-পথ বাঁকিয়া যায়।—যে সরল পথে আলোক পাত্রে পতিত হয়, সেই সরলপথক্রমে ইহা কিছুতেই জলে প্রবিষ্ট হয় না। স্বচ্ছ পদার্থমাত্রই এই প্রকার আলোকপথ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে,—কিন্তু এই পথ-পরিবর্ত্তনের (Refraction) পরিমাণ সকল পদার্থে সমান দেখা যায় না ; নানা স্বচ্ছ পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিলে, প্রত্যেক জাতীয় পদার্থে ইহার পরিমাণ পরস্পর পৃথক্ দৃষ্ট হয় ;—কেরোসিন্ তৈল ও বিশুদ্ধ জলে আলোকপথ বাঁকিবার পরিমাণ পরীক্ষা করিলে, উভয় ফলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় ; কিন্তু কেবল কেরোসিন তৈল লইয়া বহু পরীক্ষা করিলেও এটির পরিমাণ সকল সময়ে অপরিবর্ত্তনীয় দৃষ্ট হইবে। ইহার সাহায্যে অনেক সময় কেবল আলোকপথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া, পদার্থটি কি, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ অনায়াসেই স্থির করিতে পারেন। পূর্ব্ববর্ণিত তড়িৎ-তরঙ্গজাত আলোক ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইলেও, কোন পদার্থের মধ্য দিয়া বহির্গত হইবার সময়, সাধারণ আলোকের ন্যায় বক্রপথ অবলম্বন করে।—ডাক্তার বসু তাঁহার নবোদ্ভাবিত যন্ত্র দ্বারা,—কোন্ কোন্ পদার্থে কি পরিমাণে আলোকপথপরিবর্ত্তন হয়, তাহা অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বচ্ছ পদার্থগুলিতে আলোকপথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ পরি-

জ্ঞাত থাকিলে, যে কোন স্বচ্ছপদার্থে সাধারণ আলোকের পথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া, কি প্রকারে পদার্থের জাতিনির্দ্দেশ করা যায়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।—এখন ডাক্তার বসুর যন্ত্র দ্বারা বৈদ্যুতিক অদৃশ্যালোকের পথ পরীক্ষা করিবার সুযোগ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পদার্থমাত্রেরই জাতিনিরূপণের একটি সুন্দর উপায় পাওয়া গিয়াছে। মর্ম্মর প্রস্তর বা গজদন্তে আলোকপথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ পরিজ্ঞাত থাকিলে, সেই সেই পদার্থে নির্ম্মিত বহুমূল্য বস্তু সকল অকৃত্রিম মর্ম্মরময় বা গজদন্তনির্ম্মিত কি না, এখন অনায়াসেই বলা যাইবে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে,—কোন বস্তুর মধ্যে "গাঁইট্" থাকিলে, তড়িৎ-তরঙ্গ তাহা ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে, তরঙ্গের কম্পন কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া যায়; এই প্রকারে প্রবেশ ও বহির্গমনকালে তরঙ্গের কম্পনের অবস্থা তুলনা করিলে, বস্তুমাত্রেরই আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঠিক্ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা কাষ্ঠময় ও প্রস্তরাদিনির্ম্মিত বস্তুক্রয়কালে, ক্রেতৃগণের বস্তু মনোনীত করিবার যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ডাক্তার বসুর বৈদ্যুতিক তরঙ্গসম্বন্ধীয় গবেষণা আজও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার আবিষ্কারাদিসম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলই অতীব বিস্ময়কর। জগদীশ্বর ডাক্তার বসুকে কার্য্যক্ষম দীর্ঘজীবন দান করুন।

ভারতে সূর্য্যগ্রহণ।

আগামী ২২শে জানুয়ারি ভারতবর্ষে এক সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণ হইবে। সূর্য্যগ্রহণে পূর্ণগ্রাস প্রায়ই দেখা যায় না,—এজন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক বিজ্ঞানসভা হইতে জ্যোতির্বিদ্‌গণ ভারতে আসিয়া, এই সুযোগে সূর্য্যমণ্ডল পরিদর্শন করিবেন। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানমণ্ডলী হইতে ইতিমধ্যেই কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন; সূর্য্যগ্রহণের পূর্ণতা অতি অল্পকালস্থায়ী, এই কারণে অল্পকালমধ্যে বহুবিধ পরিদর্শনাদি সুসম্পন্ন করিবার জন্য নানাপ্রকার উদ্যোগ হইতেছে।

আলোকাধিক্য ও উজ্জ্বলতানিবন্ধন সৌরমণ্ডল-পরিদর্শন বড় দুরূহ কার্য্য। গ্রহণকালে উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা আবৃত হইয়া রশ্মি সকল ক্ষীণজ্যোতি হইলে, যন্ত্রাদি দ্বারা পরিদর্শনকার্য্য অতি সহজসাধ্য হইয়া থাকে। এই সকল কারণে পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ জ্যোতির্বিদ্গণের নিকট বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়াছে। সূর্য্যগ্রহণই সৌরাকাশপরিদর্শনের একমাত্র অবকাশ; পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যেরও আকাশ আছে।* কিন্তু এই আকাশ কেবল জ্বলন্ত বাষ্পে পূর্ণ; গ্রহণকালে সূর্য্যমণ্ডল আবৃত হইলে, ইহার বাষ্পাবরণমাত্র কেবল দৃষ্টিগোচর থাকে; পণ্ডিতগণ সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্রাদি দ্বারা, ইহার আলোক পরীক্ষা করিয়া, কোন্ কোন্ পদার্থ সৌরাকাশে বর্ত্তমান আছে, তাহার আবিষ্কার করেন। কয়েকটি পূর্ণগ্রহণে পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরিদর্শনাদি দ্বারা সূর্য্যের বাষ্পাবরণের গঠনসম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। অনেকে বোধ হয় জানেন, সূর্য্যমণ্ডলে নির্দ্দিষ্টসময়ান্তে একপ্রকার কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায়;—এগুলি কয়েক মাস সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া, আবার বিলীন হইয়া যায়; সময় সময় ইহাদের আকার এত বৃহৎ হয় যে, তৎকালে নগ্ন চক্ষুতেও স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি ইহার উৎপত্তি-তত্ত্বের নিরূপণ করিতে পারেন নাই;—অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, সৌরাকাশস্থ জ্বলন্ত বাষ্পরাশি কোন কারণে স্থানান্তরিত হইলে উক্ত সৌর-কলঙ্কের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কি

* সৌরাকাশের অস্তিত্বও এক পূর্ণসূর্য্যগ্রহণকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কারণে বাষ্পাবরণ স্থানান্তরিত হয়, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। প্রকাশ যে, আগামী জানুয়ারির সূর্য্যগ্রহণে, পণ্ডিতগণ সৌরকলঙ্কের কারণ নিরূপণের জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন।

আগামী গ্রহণের পূর্ণগ্রাস ভারতের সকল অংশ হইতে দেখা যাইবে না ; কেবল মান্দ্রাজ প্রদেশ, বোম্বাই ও বিহারের কিয়দংশে পূর্ণগ্রাস স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে। গত বৎসর মের প্রদেশে এক পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল ; নানা দেশ হইতে অনেক দার্শনিক সূর্য্য-পরিদর্শনের জন্য বহুযত্নে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ;—কিন্তু গ্রহণকালে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া, পণ্ডিতগণের বহু অর্থব্যয় ও উদ্যম মুহূর্ত্তে বিনষ্ট করিয়াছিল ; ভারতের আকাশ পৌষ মাসে সাধারণতঃ অতি পরিচ্ছন্ন থাকে, এবং গ্রহণটিও মধ্যাহ্নকালে হইবে, এই সকল কারণে উপস্থিত আয়োজনে অর্থ ও শ্রমের অপব্যবহার হইবে না বলিয়া অনেকেই আশান্বিত হইয়াছেন। ভারত-গবর্মেণ্টও নিশ্চিন্ত নাই,—কোন্ স্থানে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে বিদেশাগত জ্যোতির্বিদগণের সুবিধা হইবে, তাহার নিরূপণের জন্য গবর্মেণ্টের জ্যোতিষী ইতিমধ্যেই নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া যথোপযুক্ত পরিচর্য্যা করিবারও আয়োজন হইতেছে।

মাইক্রোফোনোগ্রাফ।

জগদ্বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিক ও যন্ত্রবিৎ এডিসনের ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের কথা অনেকেই অবগত আছেন।—সম্প্রতি ডুসাও (M. Franty Dussand) নামক জনৈক জর্ম্মান বিজ্ঞানবিৎ, মাইক্রোফোনোগ্রাফ (Microphonograph) নামক ততোধিক বিস্ময়কর আর একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অতি ক্ষুদ্র পদার্থ বৃহৎ দেখায়,—এই যন্ত্র দ্বারা সেইরূপ অতি মৃদু শব্দ যথেষ্ট উচ্চ ধ্বনিতে পরিণত হয়। গত বৎসর এক দিবস ডুসাও, একটি মূক ও বধির বালিকার দুর্দ্দশায় বিশেষ ব্যথিত হইয়া বধিরগণের শ্রবণশক্তি-উজ্জীবনের উপযোগী একটি যন্ত্রনির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হন, এবং বৎসরাধিককাল কেবল এই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া, সম্প্রতি উক্ত আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে বধিরগণ যে কোন শব্দ অতি স্পষ্টরূপে শুনিতে পায়,—য়ুরোপীয় অনেক মূক-বধির বিদ্যালয়ে উক্ত যন্ত্র দ্বারা শিক্ষাপ্রদানের প্রস্তাব হইতেছে। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন,—বধিরগণের শ্রবণেন্দ্রিয়, প্রথমাবস্থায় বিশেষ বিকল থাকে না, ব্যবহারাভাবে পরে এই ইন্দ্রিয় অত্যন্ত বিকল হইয়া পড়ে। পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন, যদি এই যন্ত্র দ্বারা বধিরগণকে ক্রমাগত উচ্চশব্দশ্রবণে অভ্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া, তাহারা শীঘ্রই নির্ব্যাধি হইতে পারিবে।

স্থূলতঃ বলিতে গেলে, মাইক্রোফোনোগ্রাফ্ যন্ত্রটি এডিসনের ফোনোগ্রাফ ও আর একটি যন্ত্রের সম্মিলনে নির্ম্মিত, কিন্তু কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলে ইহাকে একটি সম্পূর্ণ নূতন যন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়। ইহাতে মাইক্রোফোন্ (Microphone) নামক যন্ত্র দ্বারা অতি মৃদু শব্দ উচ্চ করিয়া, পরে সাধারণ ফোনোগ্রাফের প্রথায় তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং শেষে সেই শব্দ যন্ত্র হইতে ইচ্ছামত নির্গত করা হয়। মৃদু শব্দ ইচ্ছানুযায়ী উচ্চ করিবার ব্যবস্থাও অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম,—যন্ত্রের মূল চালক বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিলেই শব্দ যথেষ্ট উচ্চ হইয়া থাকে।

এই যন্ত্র দ্বারা শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইবে। হৃৎপিণ্ডের অতি মৃদু শব্দগুলিও ইহার সাহায্যে অতি স্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে ; গীতারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গায়কের স্নায়ুমণ্ডলীর যে অতি মৃদু স্পন্দন হয়, ডুসাও উল্লিখিত যন্ত্র দ্বারা তাহারও

স্পন্দনধ্বনি শুনিয়াছিলেন। মানবমনে হঠাৎ চিন্তার উদয় হইলে শরীরের নানা অংশ হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয়; পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই শোণিতপ্রবাহ দ্বারা মস্তিষ্কে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়,—কিন্তু এই শব্দ এত মৃদু যে, কোন উপায়েই তাহা এতদিন মানবশ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হয় নাই; সুতরাং এ পর্য্যন্ত কথাটা অনুমানমূলকই ছিল,—অধুনা এই যন্ত্রের সাহায্যে কথাটার শেষ মীমাংসা হইবে, অনেকে এমন আশা করিতেছেন। অধ্যাপক ডুনাও, অভীষ্টযন্ত্রনির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইয়াই নিরস্ত হন নাই; এই যন্ত্রের আরও নানাবিধ উন্নতি করিয়া আগামী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মহাপ্রদর্শনীতে দিগ্দেশীয় বিজ্ঞানবিদ্‌গণের পরীক্ষার জন্য রক্ষা করিবেন বলিয়া, এখন হইতেই সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

অমঙ্গলের সৃষ্টি।

একখানি সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে দেখিলাম, বিগত ভূমিকম্পের দুইটি কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথম, বাঙ্গলা দেশের জমীদারেরা গরীব প্রজার উপর বড় অত্যাচার করিয়া থাকেন, সেই জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগকে একটা হাত দেখাইয়া শিক্ষা দিলেন। দ্বিতীয়, প্রবল দুর্ভিক্ষে গরীব লোকের নিতান্ত অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বহুলোকের ঘর বাড়ী এক সঙ্গে তৈয়ার উপলক্ষে বহুতর লোক মজুরি পাইয়া জীবন রক্ষা করিবে। উভয়ত্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয়।

এক শরে দুইটি শীকার সচরাচর সম্ভব হয় না। একটিমাত্র ঘটনার সৃষ্টি করিয়া এত প্রকাণ্ড দুইটা উদ্দেশ্যের যুগপৎ সাধন করিয়া ফেলা সামান্য ক্ষমতার কাজ নহে। আবার দেখ, করুণার সহিত ন্যায়পরতার কেমন অপূর্ব্ব সম্মিলন সাধিত হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তের নিকট আমাদের ইংরাজ গবর্মেণ্টকেও হারি মানিতে হয়!

আমাদের এত অভাব ও এত প্রয়োজন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে উকীলেরও এত ছড়াছড়ি, তথাপি পয়সা না দিলে কেহ ওকালতনামা গ্রহণ করিতে চাহে না। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য অবারিতভাবে বিনাবারে ওকালতি করিবার জন্য এত লোকে আগ্রহসহকারে প্রস্তুত! অথচ আশ্চর্য্য এই, যে আসামীর পক্ষে লোকে ওকালতী গ্রহণের জন্য এত লালায়িত, তিনি স্বয়ং বিচারফলের প্রতি সম্পূর্ণমাত্রায় উদাসীন, এবং কোন্ বিচারকের নিকট

মীমাংসা হইবে, তাহাও এ পর্য্যন্ত স্থির হইল না। ভূমিকম্প সত্ত্বেও সংসার বিশেষ সুখের স্থান, কিন্তু ইহার বন্দোবস্ত বড়ই রহস্যময়; কিছুতেই বোধগম্য হইতে চাহে না।

আদালতের অস্তিত্ব অসত্ত্বেও ও আসামীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি কল্পিত আসামীর জন্য উকীল সাজিয়া সংগ্রামে দাঁড়ান, তাহা হইলে অস্তিত্বশূন্য ফরিয়াদীর হিতার্থেও কেহ না কেহ ওকালতি গ্রহণ করিবে না, এরূপ আশা করিতে পার না।

বাস্তবিক উক্ত প্রবন্ধে যে দুইটি হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, বিপক্ষ হইতে এইরূপে তাহার ছিদ্র দেখান সম্ভব। প্রথম, অমুক বড়লোক অত্যাচারী ছিলেন, ঘরের দেওয়াল পড়িয়া তাঁহার মস্তকটা চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে, ইহা বেশ সুন্দর দৃশ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ সুশীল ব্যক্তিটারও দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপক্ষীকে তাড়াইবার জন্য এত তাড়াতাড়ির কি প্রয়োজন ছিল?

মনে করিও না যে, এই প্রশ্নেই নিরুত্তর হইতে হইবে। অতি বাল্যকালেই কথামালাতে পড়া গিয়াছিল যে, দুরন্ত বায়সসমাজে বাস করার ফলে নিরীহ সারস পক্ষীকেও নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল; দুষ্টের সংসর্গটাও যে পরিহার্য্য পাপ, তাহা জানা উচিত। আবার সে ব্যক্তিকে আকার প্রকারে শিষ্ট শান্ত বোধ হইলেও, তাহার মনের ভিতরে কি ছিল, কে বলিতে পারে? আবার তিনি না হয় কায়মনোবাক্যে নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীটির চরিত্রে এমন কিছু ছিল না যে, তাঁহার বৈধব্যপ্রাপ্তি নিতান্ত আবশ্যক হয় নাই! তাঁহার দোষ না থাক, তাঁর বাপের দোষ ছিল, অথবা পিতামহের দোষ ছিল; এ জন্মে পাপ না করিয়া থাকেন, পূর্ব্বজন্মের সাক্ষী কি আছে? ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের কাহিনী কি একেবারে ভুলিয়া গেলে?

প্রকৃত কথা এই, বিধাতার ন্যায়পরতাতে যখন সংশয় করিবার কোন উপায় নাই, তখন উত্তর-বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশে দুষ্কৃতকারীর যে বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তবে চেরাপুঞ্জীর পাহাড়ের উপর এতটা পাপ কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে গবেষণা করিতে পার।

ইহুদী জাতির রচিত বাইবেল নামক বিশেষ মান্য ও প্রামাণিক ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তাহাদের জেহোবা-নামধেয় জাতীয় ঈশ্বর সময়ে সময়ে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপন প্রিয় ও চিহ্নিত জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত হুলস্থূল ঘটাইয়া

দিতেন। ইহুদী জাতির সহিত তাঁহাদের বিধাতার কারবারের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বিধাতা ঐ জাতিকে আপনার বলিয়া বিশেষরূপে পছন্দ করিয়া পরিণামে অপরিণামদর্শিতা ও হঠকারিতার জন্য অত্যন্ত অনুতাপ করিয়াছিলেন। বিবিধ উপদেশ ও শিক্ষা সত্ত্বেও তাহারা সময়ে সময়ে এমন অবাধ্য হইত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত যে, বিধাতা দুষ্ট শিষ্ট নির্ব্বোধ সকলকেই আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন ; এবং পরবর্ত্তীকালে প্রদর্শিত তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁয়ের অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া দণ্ডের ভারটা বালবৃদ্ধবনিতার উপরও অপক্ষপাতে সমাবেশ করিতে কাতর হইতেন না। কিন্তু সুধী ব্যক্তি জানেন যে, এইরূপ দণ্ডনীতির ব্যবস্থা না করিলে সকল সময় শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না। এবং অত্যন্ত আধুনিক সময়ে আমাদের শাসনকর্ত্তারাও পুনা সহরে এই নীতির কতকটা আশ্রয় লইয়া সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

আজ কাল আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বাইবেলের জেহোবার ছাঁচে ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়া নূতন ধরণের উপাসনাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই প্রাচীন ব্রাহ্মণশাসিত দেশের ইতিহাসটাকে একবারে ওলট পালট করিতে চাহিয়া কতটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। অথবা যে শিক্ষাপ্রণালীর কল্যাণে প্রাচীন টোলের স্থানে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় দণ্ডায়মান হইয়াছে, এবং উকীল ও এডিটার ও গ্রন্থকার ও বক্তৃতাকারের যুগপৎ আবির্ভাবে বঙ্গদেশে রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ফল এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ আর কি আশা করা যাইতে পারে! বেণ্টিক ও মেকলের প্রেতপুরুষ, তোমরা ভারতবর্ষের উর্ব্বর ভূমিতে যে জ্ঞানবৃক্ষের চারা রোপণ করিয়া গিয়াছ, তাহার ফলভোজনে 'পারাডাইস্ লষ্ট' হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই!

সে যাহাই হউক, জগতের যে সকল ঘটনা নির্ব্বোধ সাধারণের চোখে নিকলঙ্ক অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অভ্যন্তরেও পরম কারুণিকের যে গুপ্ত গূঢ় মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার উদ্‌ঘাটন কেবল নির্ব্বাচিত ও চিহ্নিতের পক্ষেই সম্ভব। নতুবা কে জানিত, ভারতবর্ষের এই ঘোরতর দুঃসময়ে যখন সর্ব্বত্র হাহাকার ও নৈরাশ্যের করুণক্রন্দন উত্থিত হইতেছিল, তখন কোন অখণ্ডবুদ্ধির আশ্রয়, অনন্তশক্তিমান পুরুষ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের সমুদয় পাকাবাড়ী ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ অন্নার্থী লোকের

অন্নের সংস্থান করিয়া দিবেন? আমাদের সরকার বাহাদুর এত যে বুদ্ধিমত্তার আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও মস্তিষ্কের সচলতার পরিচয় এইখানে পাওয়া গেল; যে হেতু তাঁহারা যে কার্য্য একটা আইন পাস করিয়া ও দুটা সঙ্গীনের গুঁতার ভয় দেখাইয়া অক্লেশে সম্পন্ন করিতে পারিতেন, তাহার জন্য দেশ বিদেশে অর্থভিক্ষার যাতনা ও এত করিয়া পার্লেমেণ্টের নিকট কৈফিয়তের যাতনা সহিতে হইত না। উপানৎপ্রদানরূপ পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য প্রাণিবিশেষের জীবননাশে কিছুই নীতিবিরুদ্ধ দেখা যায় না; বিশেষতঃ যখন জীবনদাতা প্রাণীটি নিরীহ স্বভাবের জন্য জনসমাজে সুবিখ্যাত এবং শৃঙ্গসত্ত্বেও আত্মরক্ষণে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ!

দুর্ব্বুদ্ধি লোকে বলিতে ছাড়িবে না যে, অমঙ্গলের অভ্যন্তরেই মঙ্গলহস্ত দেখা যাইতেছে সত্য কথা, কিন্তু করুণার প্রকোপটা আসাম অঞ্চলের চা-বাগীচার উপরে ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে না হইয়া, নাগপুর ও প্রয়াগের অঞ্চলে হইলে অধিক গরীবের উপকার হইত, এবং আমরাও বোধ হয় আর একটু অধিক কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অবকাশ লাভ করিয়া আনন্দ পাইতাম।

আসামীর পক্ষের উকীলের জয়ধ্বনি দিয়া এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিলে, প্রবন্ধলেখক পাঠক মহোদয়গণের এতক্ষণ সম্যক্‌রূপে উদ্দীপিত ক্রোধবহ্নির লেলিহান শিখা হইতে পলায়নের অবকাশ পাইতেও পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে যে শিরোনাম ধরিয়া প্রবন্ধের অবতারণা হইয়াছে, তাহার কিছুই সার্থকতা হয় না। সুতরাং দগ্ধ হইবার বিভীষিকা সম্মুখে রাখিয়াও এখন পাপ লেখনীকে বিশ্রাম দিতে পারিলাম না। তবে সাহস এই যে, জাগতিক বিধানের মঙ্গলময়ত্বে সন্দিহান হইলে যদি পাতকের সঞ্চার হয়, জগতের বিধানকর্ত্তার বিধানপ্রণালীতে মঙ্গলময় বা অমঙ্গলময়, যে কোনও উদ্দেশ্যের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া আস্ফালন করিলে সেই বিধাতার নিকটই যে মহাপাতক বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত সংশয়ের ক্ষমা থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানহীনের পক্ষে জ্ঞানের অভিনয় সর্ব্বতোভাবে মার্জ্জনার অযোগ্য।

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তি-অনুসন্ধানের পূর্ব্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। নতুবা কেহ যদি বলিয়া বসেন, অমঙ্গল আদৌ অস্তিত্বহীন, তাহা হইলে সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে যদি জীবের নিশ্বাস বা অভ্যুদয় না থাকিত, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ

কম্পিত কেন, সমগ্র ভূমণ্ডল চূর্ণ হইয়া আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলেও কাহারও কোনও মাথাব্যথা ঘটিত না। এবং ব্যাপারটা মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক, তাহা ভাবিবার কোন আবশ্যকতাও উপস্থিত হইত না। জগতে জীবের অস্তিত্ব না থাকিলে এবং জীবের আবার সুখ দুঃখের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার শক্তি না থাকিলে, অমঙ্গল শব্দের অর্থ লইয়া বিচার করিবার অবকাশই উপস্থিত হইত না। অচেতন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই।

এক সম্প্রদায় পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা জীবমধ্যে কেবল মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট হিসাব করিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গলের বাছাই করিয়া থাকেন। যাহাতে মনুষ্যের ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট, তাহা অমঙ্গল। এই সম্প্রদায়ের মনের ভাবটা এইরূপ। এই প্রকাণ্ড জগৎটা তাহার বৈচিত্র্য লইয়া কেবল মনুষ্যের ভোগের জন্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং মনুষ্য জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিয়াই জগতের এত মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য। মনুষ্যের ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থ সৃষ্ট হইবার বা বর্ত্তমান থাকিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের জন্যই এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যেটা মানুষের উপভোগে যত সাহায্য করে, সেটার অস্তিত্ব তত দূর সার্থক, এবং সৃষ্টিকর্ত্তারও সৃষ্টি তত দূর সফল, এবং তাঁহার নৈপুণ্য ও বিবেচনাশক্তি তত দূর প্রশংসনীয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ধন্য, কেন না, তাঁহার নির্ম্মিত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন সুন্দর লাগে, আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি ধন্য, কেন না, এত বিচিত্র দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে আমাদের জীবনরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সুনিপুণ কারিগর, কেন না, এত কৌশল ও এত বুদ্ধিমত্তাসহকারে তিনি যখন যেটি দরকার, যখন যাহা নহিলে অসুবিধা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রশংসনীয়, কৃতজ্ঞতাভাজন ও প্রীতিভাজন, কেন না, তাঁহার রচিত জগতের মধ্যে আমরা এত স্ফূর্ত্তিসহকারে বেড়াইতেছি।

সূর্য্য কেমন আশ্চর্য্য পদার্থ! সূর্য্যের উত্তাপ নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিজ্ঞান শতমুখে সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার গুণগান করিতেছে। বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিধাতা আমাদিগকে বায়ু দিয়াছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? তাই বিধাতা আমাদিগকে জল দিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পৃথিবী স্থির থাকিত না, এবং পৃথিবী না থাকিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থল থাকিত না, অতএব মাধ্যাকর্ষণের ব্যবস্থা কেমন

দূরদর্শিতার পরিচায়ক! এমন কি, বিধাতা আমাদের আহারের জন্য ঘাসের ফলকে শস্যে ও আমাদের শীতনিবারণের জন্য কাপাসের ফলকে তূলায় পরিণত করিয়া কি অপূর্ব্ব মানবহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন! পদ্যপাঠ প্রথম ভাগের প্রথম কবিতাতেই যাহা পড়িতে পাই, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রকার ও নীতিকার সকলেরই মুখে একই সুর চিরকাল শুনিতে পাইয়াও মানুষের তৃপ্তি জন্মিল না। মানবের প্রতি যে অপার করুণার বশে বিধাতা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই করুণার বশেই মানুষের আহারের জন্য দেশকালানুসারে গোরু ভেড়া হইতে সীল ও শ্বেত ভল্লুকের সৃষ্টি করিয়া কি অপরিসীম প্রীতি দেখাইয়াছেন!

সমগ্র জগৎটাই যখন মনুষ্যজাতির উপকারের ও সুবিধার জন্য নির্ম্মিত ও সৃষ্ট, তখন জগতের মধ্যে যদি এমন কোন পদার্থ থাকে,—যাহা মানুষের কোন কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যপ্রণালীতে দোষারোপ ঘটে, সেই জন্য এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত জাগতিক সমুদয় পদার্থের মনুষ্যের পক্ষে উপকারিতা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত। এবং যদি সহজ চোখে কোনরূপ প্রমাণ না মিলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জ্ঞানের উন্নতিসহকারে ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

কিন্তু এইখানে একটা খট্‌কা আসিয়া দাঁড়ায়। কোটি সূর্য্যমণ্ডলে পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণামাত্র, এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই মনুষ্যের কারবার। আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর মাত্র হইয়াছে। মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে, এবং আর কিছু দিন পরে মনুষ্যের আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন অন্যে সন্দেহ করে না। জগৎটারও সীমা পাওয়া যায় না, এবং কোন কাল হইতে জগৎ বর্ত্তমান আছে, এবং কতকাল ধরিয়া জগৎ রহিবে, তাহারও আদি অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। ক্ষুদ্র সাদি ও সান্ত মনুষ্যশিশুর জন্য এত বড় অনাদি অনন্ত কারখানাটা চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অন্যান্য জীবজন্তু বর্ত্তমান ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং পৃথিবীর বাহির অনন্ত আকাশে অবস্থিত অসংখ্য পৃথিবীতে জীবজন্তু যে বর্ত্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই; এমন কি, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস হইলেও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রে জীব বর্ত্তমান

থাকিবে, ইহাই সম্ভব। কাজেই জগৎটা কেবল মানুষের জন্য নির্ম্মিত, এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহস কুলায় না। জগৎটা জীবের জন্য, চৈতন্যযুক্ত, সুখ-দুঃখভোগী জীবমাত্রেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ নির্দ্দেশই সঙ্গত হইয়া পড়ে। দূরস্থিত ধ্রুবতারাকে কেবল নাবিকের দিঙ্‌নির্ণয়ের সুবিধার জন্য বিধাতা ঐরূপে স্থাপন করিয়াছেন বলিলে নিতান্ত হাস্যরসের উদ্রেক হয়, কাজেই অন্যান্য অজ্ঞাত জীবলোকের অজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য হিতসাধনই ধ্রুবতারার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, এইরূপে মন বুঝাইতে হয়।

এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর জীব, যাহার চৈতন্য আছে, সুখভোগের ও দুঃখভোগের ক্ষমতা আছে, তাহার সুবিধার জন্য, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ও আরামে রাখিবার জন্য জগতের সৃষ্টি। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই এই, এবং যে ব্যাপার এই উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা মঙ্গল, ও যাহা ইহার প্রতিকূল, তাহা অমঙ্গল।

মঙ্গলের উৎপত্তি বেশ বুঝা যায়। কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যই তাহাই। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এবং ইহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের জ্ঞানের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত গণ্ডগোল চলিতেছে।

জীবকে সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ অমঙ্গল সেই সুখের বিঘ্ন উৎপাদন করে। তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল?

মঙ্গলটা যেমন জগতের অংশ, অমঙ্গলও সেইরূপ জগতেরই অংশ। উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা এক। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি দোষ ঘটে।

প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছানুক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবকে সুখ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়া উভয়ই তাঁহার অভিপ্রায়। জীবকে সুখ ও দুঃখ দিয়াই তাঁহার আমোদ। এই তাঁহার লীলা। ইহাতে তাঁহার লাভ কি, তিনিই জানেন। তিনি রাজার উপর রাজা, বাদশার উপর বাদশা; তাঁহার অভিরুচির উপর কাহারও হাত নাই। তাঁহার খেয়াল ও তাঁহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন।

এইরূপ নির্দ্দেশে তর্কশাস্ত্রে কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আসিয়া পড়ে। পরমকারুণিক মঙ্গলময় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা ঈশ্বরের পক্ষে একচেটিয়া রহিয়াছে, সেইগুলির আর প্রয়োজ্যতা থাকে না। কাজেই এইরূপ নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

যদি বলা যায়, ঈশ্বর সমুদয় মঙ্গলার্থেই সৃষ্টি করিয়াছেন; তবে কি কারণে জানি না, মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলও আসিয়া পড়িয়াছে। অমঙ্গলের উৎপত্তি তাঁহা হইতে হইতে পারে না। অমঙ্গলের উৎপত্তির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উন্মূলনের জন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বত্র প্রয়াস। কাজেই অমঙ্গলের সৃষ্টি অন্যত্র দেখিতে হইবে।

মনুষ্যের কল্পনা কিছুতেই হটিবার নহে। মঙ্গলময়ের—ঈশ্বরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী অমঙ্গলময় ঈশ্বর কল্পনা করিতে হইয়াছে। এক জন মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যজন অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন। একের নাম জেহোবা, অন্যের নাম শয়তান। একের নাম অরহ্‌-মজদ, অন্যের নাম আহ্রিমান। উভয়ে চিরন্তন বিরোধ। একে অন্যকে পরা-ভবের চেষ্টায় রহিয়াছেন। শয়তান জেহোবার বিদ্রোহী। শয়তান জেহোবার কার্য্য পণ্ড করিবার জন্য, তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। উভয়ের মধ্যে চিরকাল হাঙ্গাম চলিতেছে। ঈশ্বর সর্ব্বদা শয়তানকে জব্দ করিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু শয়তান বুদ্ধিপ্রাচুর্য্যে ও শয়তানীতে শিবাজীরও সমকক্ষ। আরঙ্গজেবের সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে করায়ত্ত করেন। তবে শুনা যায়, শেষ পর্য্যন্ত শয়তানের পরাভব হইবে। সেদিন কবে আসিবে, তাহা গণিয়া বলা দুষ্কর।

শয়তানে বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক। যাঁহাদের ঈশ্বরে ভক্তি যত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তিনিও শয়তানের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে সেই পরিমাণে বাধ্য। গত ভূমিকম্পে অনেকে চুলে চুলে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময়। ভূকম্প ঘটনাটা শয়তানের কাজ, ঘর বাড়ীগুলা সমূলে ভূমিসাৎ করা, মানুষগুলাকে মারিয়া ফেলা, শয়তানের কাজ। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের ধন্যবাদের আস্পদ হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? অবশ্য শয়তানের অত্যাচারে যে সকল জননী পুত্র-হীনা ও রমণী পতিহীনা হইয়াছে, তাহাদের নিকট ধন্যবাদ দাবী করিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই।

শয়তানের কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দোষ পড়ে, কিন্তু তাহাতেও আবার তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরের শক্তির অপরিসীমত্বে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা যুক্তিমাত্রের অনুরোধে শয়তানে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

কাজেই অন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। মনুষ্যের অমঙ্গল ঈশ্বরের অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু মনুষ্যের ইচ্ছাকৃত। মনুষ্য স্বাধীন-ইচ্ছা-বিশিষ্ট জীব। মনুষ্যের জন্য ভাল মন্দ দুইটা রাস্তা আছে; মনুষ্য ইচ্ছা করিলে যে রাস্তায় ইচ্ছা চলিতে পারে। যে ভাল রাস্তায় চলে, ঈশ্বর তাহার ভাল করেন। যে মন্দ রাস্তায় চলে, ঈশ্বর তাহাকে সাবধান করিবার জন্য দণ্ডিত করেন। মানুষ জানিয়া শুনিয়া আপন অমঙ্গল আপনি ডাকিয়া আনে। বিধাতা তাহাকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, সে সেই পথে যায় না, তাহা তাহারই দোষ। মনুষ্যের দোষে অমঙ্গলের উৎপত্তি।

প্রকৃত হইলে কৈফিয়ৎটা সুন্দর হইত, কিন্তু কথাটা মিথ্যা। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীনতার একটা পরিচ্ছদ পরিয়া আছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহার ইচ্ছা স্বাধীন নহে। তাহার শারীরিক গঠন তাহার নিজের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন নহে। তাহার সমগ্র মানসিক গঠনও তাহার ইচ্ছামত সে প্রাপ্ত হয় নাই। পিতৃপিতামহাদি সহস্র পূর্ব্বতন পুরুষ তাহার শারীর প্রকৃতি ও তাহার মানস প্রকৃতির জন্মদাতা। সে সেই প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়া কর্ম্মভোগ করিতেছে মাত্র। তাহার ইচ্ছা তাহার মানসিক প্রকৃতির একটা অঙ্গমাত্র। সে যেমন ইচ্ছাশক্তি পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, সে তাহারই ব্যবহার করিতেছে, তজ্জন্য তাহাকে দায়ী করিও না।

আবার, ইচ্ছা না হয় স্বাধীন হইল। তাহার দুর্ব্বলতার জন্য দায়ী কে? সংসারের প্রচণ্ড নির্ম্মম দ্বন্দ্বে সে কি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আপনার ইচ্ছামত চলিতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেও কি তাহার সাধ্য আছে? দুর্ব্বল জীবের সহস্র শত্রু। সহস্র শত্রু তাহাকে গন্তব্য পথে চলিতে দিতেছে না, সহস্র প্রলোভন তাহাকে অপথে টানিতেছে। ভাগ্যবান সে, যে এই শত্রুকুলকে অতিক্রম করিয়া প্রলোভনসমূহ এড়াইয়া আসল পথে চলিতে সমর্থ হয়।

আবার মনুষ্যের পাপে না হয় মনুষ্যের অমঙ্গল উৎপন্ন হইল। কিন্তু অমঙ্গল একটা মনুষ্য মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যের নিম্নস্থ জীবপর্য্যায়ে যেখানে কোনও নৈতিক পণ্ডিত স্বাধীন ইচ্ছার আবিষ্কার করিতে সাহস করেন না, যেখানে পাপপুণ্য অস্তিত্বহীন ও অর্থশূন্য, সেই মনুষ্যেতর জীবপর্য্যায়ে নিদারুণ নিষ্ঠুর নির্ম্মম জীবনদ্বন্দ্ব কোথা হইতে আসিল? জীবসমাজে যে দুঃখের যাতনার ও মরণের করুণ কোলাহল প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিয়া নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষা-

কর্ত্তা অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়! কিন্তু জীবের আহার জীব, যখন এইরূপ ব্যবস্থা, একের শোণিতপান ব্যতীত অপরের ক্ষুধানিবৃত্তির যখন উপায়ান্তর নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন ঐ নির্দ্দেশের সারবত্তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

চারি দিকেই গোল। ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে তাঁহার দয়াময়ত্বে সন্দেহ প্রকাশ হয়। অমঙ্গলের সৃষ্টিভারটা শয়তানের উপর চাপাইলে তাঁহার শক্তির পূর্ণতায় দোষ পড়ে। নিরীহ মনুষ্যকে দায়ী করিলে অত্যাচারপীড়িতের উপর আরও অত্যাচার করা হয়। দায়িত্বশূন্য জীবের যাতনার কৈফিয়ৎ ত একবারে পাওয়াই যায় নাই। অগত্যা বলিতে হয়, অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক, অগত্যা বলিতে হয়, মঙ্গলসম্পাদনের জন্য অমঙ্গলের বিকাশ। অল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্য দূরদর্শনে ও সূক্ষ্মদর্শনে অসমর্থ। সম্মুখে স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গল, দূরে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই মঙ্গল।

কথা প্রকৃত। অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল। জীবজগতেই দেখা যাউক। দারুণ জীবনসংগ্রাম, রক্তপাত, দুর্ব্বলের নিগ্রহ, সবলের অত্যাচার, দুঃখ, যাতনা, মৃত্যু; ফলে জীবজগতে অপকৃষ্টের বিলোপসাধন, উৎকৃষ্টের অভ্যুদয়। জীবের উন্নতির এই একই মাত্র উপায়। অভিব্যক্তির এই একমাত্র পথ। ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে বিরাট মনুষ্যের উৎপত্তি, জগতের এই বিবিধ বৈচিত্র্যের আবির্ভাব, বিবিধ সৌন্দর্য্য, বিবিধ রূপের ক্রমিক বিকাশ, সমস্তই একই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভালর জয়, মন্দের ক্ষয়, সবলের জয়, দুর্ব্বলের ক্ষয়, সুন্দরের বিকাশ, কুৎসিতের নাশ, ধর্ম্মের অভ্যুদয়, অধর্ম্মের পরাজয়; সর্ব্বত্র এই একই সূত্র। তোমার সুখের জন্য, তোমার উন্নতির জন্য, তোমার আরামের জন্য, প্রকৃতির এই কাণ্ডকারখানা চলিতেছে না। ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি নহে, জাতির জন্য সৃষ্টি। ব্যক্তির জীবনে সুখের আশা না থাকিতে পারে, জাতির জীবনে সুখেরই প্রাধান্য। জীবের ইতিহাস সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান। মনুষ্যের ইতিহাস সাক্ষিস্বরূপে দণ্ডায়মান। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। কত জীব এই সংগ্রামে নিষ্ঠুরভাবে জীর্ণ পিষ্ট আহত হইয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিল। শুধু জীব কেন? কত জাতি এই ধরাপৃষ্ঠে দিনকতক জীবনের খেলা অভিনয় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। ভূপঞ্জরের স্তরমালা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখ। কত মৃত জীবের কঙ্কাল ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কত অতিকায় হস্তী, কত ভীমকায় কুম্ভীর, কত বিশালদেহ কূর্ম্ম এককালে ধরাপৃষ্ঠে নাচিয়া বেড়াইয়াছিল। এখন তাহারা কোথায়? এখন তাহারা লোপ পাইয়াছে;

...হাদের শিলীভূত কঙ্কালচয় তাহাদের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান। তাহারা গিয়াছে, তাহারা জীবনদ্বন্দে পরাভূত হইয়াছে; অন্যে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাদের রাজ্যে নূতন রাজ্যপাট স্থাপন করিয়াছে। পুরাতন গিয়াছে, নূতনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দুঃখ যাতনা ও মৃত্যুর পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা উন্নত জীবকে তাহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। জীবনসংগ্রাম আজিও চলিতেছে। এখন দুঃখ, এখন যাতনা, এখন মৃত্যু। ফলে উন্নতি, ফলে বৈচিত্র্য, ফলে সৌন্দর্য্য, অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবির্ভাব। অমঙ্গলের ক্ষয়, মঙ্গলের জয়। পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয়। বিশ্বনিয়ন্তার এই অভিপ্রায়, বিশ্বপ্রণালীর এই রহস্য; বিশ্বসৃষ্টির এই উদ্দেশ্য।

ঠিক কথা, দুঃখের পরে সুখ। কিন্তু তাহা হইলে দুঃখের অস্তিত্ব মিথ্যা নহে। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি, কিন্তু তাহা হইলে অমঙ্গল অস্তিত্বহীন নহে। বিধাতার বিধান এইরূপ, কিন্তু হায়! বিধান কি অন্যরূপ হইলে চলিত না? মঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপাদন কি বিশ্ববিধাতারও অসাধ্য ছিল? উন্নতির জন্য, অভিব্যক্তির জন্য, মৃত্যুর পথ ভিন্ন জীবনের পথ নির্দ্দিষ্ট হইলে কি বিধাতার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিত না? ধর্ম্মের পথ কণ্ঠকাকীর্ণ না করিলে কি তাঁহার করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত পড়িত? এ জীবনের শোণিতপাত ভিন্ন কি জীবের উদ্ভবের অন্য উপায় অনন্তবুদ্ধিও আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই? এক বল, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন। অথবা বল, তিনি দয়াময়, তাহা হইলে তিনি পূর্ণশক্তি নহেন।

এইরূপ স্থলে আর একটা মাত্র পন্থা আছে। মনুষ্যের বুদ্ধি দিগ্বিজয়ী। ইহার অনধিগম্য দেশ নাই; ইহার অসাধ্য কার্য্য নাই। ইঙ্গিতমাত্র মনুষ্য বুদ্ধি না-কে হাঁ ও হাঁ-কে না-তে পরিণত করিতে সমর্থ। তখন আর ভয় কি? নীতিকার ও শাস্ত্রকার, ধর্ম্মপ্রচারক ও দর্শনপ্রচারক, একবাক্যে একস্বরে বলিয়া উঠিবেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কোথায়? অমঙ্গল একবারে অস্তিত্বহীন। বৃথা তুমি বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছ; বৃথা বাক্যব্যয়ে নিজে মজিতেছ ও পরকে মজাইতেছ। মিথ্যা, মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তি। তোমার জ্ঞানচক্ষুর উপর যে মোহের আবরণ ও ভ্রান্তির আবরণ অবস্থিত, তাহা অপসারণ করিয়া দেখ; পূর্ণ মঙ্গলে অমঙ্গল নাই। বৃথা স্বপ্নে তুমি শিহরিতেছ, অলীক আতঙ্কে তুমি আতঙ্কিত ও দিশাহারা হইতেছ। ভ্রান্ত তুমি, অন্ধ তুমি, তোমার সম্মুখে জগৎ বিস্তীর্ণ; জ্যোতিতে পূর্ণ, আনন্দে

পূর্ণ। অন্ধ তুমি, তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, আনন্দের কোলাহলে আম... শ্রবণপথ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। জ্যোতির তীব্র আলোকে আমার নয়ন ঝলসিতেছে। নির্ম্মল প্রভাময় তরঙ্গে বিশ্বের মহাসাগর উথলিতেছে, জ্যোতির তরঙ্গ, প্রেমের হিল্লোল, তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। কাহাকে তুমি দুঃখ বলিতেছ? দুঃখই সুখ, দুঃখই আরাম, দুঃখই আনন্দ। কাহাকে তুমি মৃত্যু বলিতেছ? মৃত্যুই জীবন, মৃত্যু জীবনের সার, মৃত্যু জীবনের সোপান, মৃত্যু জীবনের সহচর, আনন্দময়, বিরামময় সহচর।

জ্ঞানীর কথা এইরূপ, ভক্তের কথা এইরূপ, প্রেমিকের কথা এইরূপ। যিনি একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিক, তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবন সুখের জীবন, কেন না; অমঙ্গল তাঁহার নিকট মঙ্গল। অন্ধকার তাঁহার নিকট আলোক। তিনি পিতাপুত্রের অকালমৃত্যুতে বিধাতার মঙ্গলময় আবির্ভাব দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত হইতে পারেন। তিনি অন্নহীন ক্ষুৎপীড়িতের মরণযাতনায় বিধাতার প্রেমার্পণে অবসর পাইয়া আনন্দলাভ করেন। তিনি সুখী, তিনি আনন্দে বিভোর, তিনি দুঃখের অস্তিত্ব জানেন না। তাঁহার অবস্থাতে আমাদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়, তাঁহার চরণে আমরা প্রণত হই, তাঁহার প্রসাদের জন্য আমরা ভিখারী। তিনি অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করিয়াছেন, তিনি দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছেন; তাঁহার নিকট অমঙ্গল মঙ্গলরূপী। তিনি অসাধ্যসাধনে পটীয়ান, তাঁহার ক্ষমতার সীমা নাই। তাঁহার চরণে প্রণাম।

তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি করিতে আমরা অসমর্থ। তিনি স্বার্থপরতার কঠোর বর্ম্মে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ভয় করি, কিন্তু ভালবাসিতে পারি না। তিনি দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছেন, স্বয়ং তিনি সুখী। তিনি আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন, তিনি অপারশক্তিশালী। আমার সে শক্তি নাই, আমি তাঁহার সুখে সুখী হইব কিরূপে? তিনি চক্ষুষ্মান। তিনি আলোকে রহিয়া আনন্দপূর্ণ; আমি অন্ধ; আমি অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার আনন্দে যোগ দিতে অসমর্থ।

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যদি সেই মঙ্গল শব্দ ও আনন্দ শব্দ প্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত না হয়। তাহার অপর অর্থ কিরূপ, তাহা ঠিক আমরা বুঝি না। আমরা মঙ্গল বলিতে

ও আনন্দ বলিতে কথা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আঁধার ছাড়িয়া আলোক নাই, সাদা ছাড়িয়া কালো নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। জগৎ হইতে যদি আঁধারের বিলোপ-সাধন করিতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে আলোকেরও বিলোপসাধন ঘটিয়া যাইবে। দুঃখকে যদি নির্ব্বাসিত করিতে যাই, সুখও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে। আঁধার ও আঁধার ও আঁধার। নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আঁধার কেমন, তাহা বুঝিতে পারি না। আবার আলোক আর আলোক আলোক—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের পার্শ্বে আমরা আঁধার দেখিতে পাই, আঁধার আছে বলিয়াই আমরা আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয় করি। অমঙ্গলকে উড়াইয়া দাও, মঙ্গলকে আটকাইয়া রাখা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য; মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া যাইবে। অমঙ্গলের পার্শ্বে আছে বলিয়াই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব, নতুবা মঙ্গল অস্তিত্বহীন, অর্থশূন্য বাতুলের প্রলাপ।

কবিকল্পিত অলকাপুরে নিত্য বসন্ত বিরাজ করিয়া থাকে। সেখানে মলয়-পবন নিরন্তর প্রবাহিত হয়, রাত্রি নিরন্তর জ্যোৎস্নাময়ী; সেখানে যৌবন ভিন্ন জরা নাই, মরণের দ্বার সেখানে রুদ্ধ। সেখানে বিরহ নাই, মিলনের আনন্দ সেখানে সর্ব্বদা বিদ্যমান। কবির কল্পনা এই দেশের সৃষ্টি করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু কল্পনার বাহিরে সত্যের রাজ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই নিত্য বসন্তে ও নিত্য জ্যোৎস্নায় কবিকল্পনা সুখের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতে পারিত, কিন্তু সুস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক কল্পনা এই নিত্য জ্যোৎস্না ও নিত্য বসন্তে সুখ দেখিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। অথবা এই প্রাকৃত স্বভাবরাজ্যে জ্যোৎস্নার ও বসন্তের ও আরামের ও মিলনের নিতান্ত অসদ্ভাবের উপলব্ধি করিয়াই বোধ করি কবিকল্পনা এই অতিপ্রাকৃত প্রদেশের নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিল। অন্ধকারের পার্শ্বেই জ্যোৎস্না সম্ভব। বিরহদুঃখের পার্শ্বেই মিলনসুখ উপভোগ্য। যে বিরহের দুঃখ ভোগ করে নাই, সে মিলনের সুখ-আস্বাদনে অধিকারী নহে। যে মরণের সম্মুখীন হয় নাই, সে জীবনে মমত্বহীন।

অমঙ্গলকে জগৎ সংসার হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে ও মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকে সেই ভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পার, কিন্তু হইবার কারণ নাই। অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে

গিয়া অকূলে হাবু ডুবু খাইবার দরকার নাই। যেদিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিনই অমঙ্গলের যুগপৎ বিকাশ হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে, একই উদ্দেশ্যসাধনার্থ উভয়েরই উৎপত্তি। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, এককে ছাড়িয়া অন্যের অর্থ নাই। যেখান হইতে মঙ্গল, ঠিক সেইখান হইতেই অমঙ্গল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। একই প্রস্রবণ, একই নির্ঝরধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে; একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে। উভয়ই বা কেন বলি? একই স্রোতস্বতী একই নির্ঝর হইতে বাহির হইয়াছে। এ পার হইতে বলি সুখ, ও পারে দাঁড়াইয়া বলি দুঃখ। দক্ষিণ পারে সুখ, বাম পারে দুঃখ। দক্ষিণে মঙ্গল, বামে অমঙ্গল। দক্ষিণ ছাড়া বাম নাই, বাম ছাড়িয়া দক্ষিণ নাই। যেখানে এ পার নাই, সেখানে ও পারও নাই। সেখানে স্রোতস্বতীও চক্ষুর অগোচর। জগতের ইতিহাসে অমঙ্গলের উৎপত্তির তারিখ-নির্দ্দেশ মহা সমস্যা; কিন্তু সেই তারিখে তাহার সহচর মঙ্গলেরও উৎপত্তি। যদি এককে পরিহার করিতে চাও, তবে অন্যের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মঙ্গলের অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে ছাড়িবে না। জগতের নিয়ম এই। অথবা জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের সূত্রে ধৃত রহিয়াছে।

জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস কিরূপ। অভিব্যক্তির নাম উন্নতি, উন্নতি বল, ক্ষতি নাই; কিন্তু উন্নতি অর্থে সুখবৃদ্ধি ও আনন্দবৃদ্ধি বুঝিও না। উন্নতিসহকারে সুখের বৃদ্ধি, উন্নতিসহকারে দুঃখেরও বৃদ্ধি। যখন সুখ ছিল না, তখন দুঃখ ছিল না; যখন সুখের আধিক্য, তখন দুঃখের জ্বালা তীব্রতাময়। অচেতন জগতে জড়জগতে অনুভূতি নাই, অর্থাৎ সুখও নাই, দুঃখও নাই। চৈতন্যের সহ সুখদুঃখ উভয়েরই পার্থক্য বিকাশ। যে যত সুখ বুঝে, যে যত দুঃখ বুঝে, সে তত চৈতন্যময়; তাহার চৈতন্য সেই পরিমাণে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। জীবপর্য্যায়ে যত উন্নতি, যত অধম হইতে উত্তমের বিকাশ, যত নীচ হইতে উচ্চের উদ্ভব, ততই সুখ দুঃখেরও অধিক বিশ্লেষণ। জীবসমাজে যাহা দেখা যায়, মনুষ্যসমাজেও তাহাই। সভ্যতার উন্নতির অর্থ কি? সুখের উন্নতি কি দুঃখের উন্নতি, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ বলে, সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত সুখের পরিমাণ বাড়িতেছে, কেহ বলে, দুঃখের পরিমাণ বাড়িতেছে। প্রকৃত কথা, উভয়েরই মাত্রা বাড়িতেছে; কেন না, এককে ছাড়িয়া অন্য স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

অমঙ্গলের জন্মস্থান কোথায়—জিজ্ঞাসা করিতে চাও! মঙ্গলের জন্মস্থান অনুসন্ধান কর। অমঙ্গল কেন? ইহার উত্তরে বলিব, অমঙ্গলই বা কেন! এক প্রশ্নের উত্তর মিলিলেই অন্যেরও উত্তর মিলিল। অথবা পূর্ব্বের চৈতন্যের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অনুসন্ধান কর; চৈতন্যের উৎপত্তি কেন, তাহার উত্তর দাও। চৈতন্য কি? না, সুখে ও দুঃখে পার্থক্যবোধই চৈতন্য। যেখানে সুখে ও দুঃখে পার্থক্যবোধ নাই, সেখানে চৈতন্যও ফুটে নাই। আবার যাহাতে সুখ, তাহা মঙ্গল, যাহাতে দুঃখ, তাহাই অমঙ্গল। কাজেই যেদিন চৈতন্যের সৃষ্টি, সেই দিনই অমঙ্গলের সৃষ্টি। জগতে অমঙ্গল অবর্ত্তমান, জগতে দুঃখ অবিদ্যমান, অথচ চৈতন্যময় জীব কেবল একই শান্তি, একই আরাম, একই আনন্দ উপভোগে বিরত রহিয়াছে; ইহা কল্পনার অগোচর, ইহা চিন্তার অগোচর, ইহা বাতুলতা, অলীক কল্পনা।

অতএব এস বন্ধু, অকারণ আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন নাই। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না, অমঙ্গলকে সম্মুখে দেখিয়াও উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইও না। সত্যের আশ্রয় কর, মিথ্যাচার বর্জ্জন কর। অমঙ্গলকে মানিয়া লও, অমঙ্গল তোমার সহচর, তোমার চৈতন্যের সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা, মঙ্গল ও অমঙ্গল সমানভাবে তোমার আত্মাকে জড়াইয়া থাকিবে। যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততদিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলও নিত্য নিত্য ফুটিয়া উঠিবে। যখন অমঙ্গলের তিরোধান হইবে, তখন মঙ্গলেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ তখন সুষুপ্তিতে বিলীন হইবে। তুমি সুষুপ্তির প্রার্থনা করিও না; সুষুপ্তিতে তোমার লাভ নাই, সুষুপ্তিতে তোমার মুক্তি, তোমার নির্ব্বাণ, তোমার জীবত্বের বিলোপ। যতদিন জাগিয়া আছ, ততদিন তোমার তুমিত্ব, ততদিন মঙ্গল তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গল তোমার বামহস্ত ধরিয়া থাকিবে। উভয়ে তোমাকে জীবত্বের পথে টানিয়া লইয়া চলিবে। একের বুঝি আকর্ষণ, অপরের বুঝি বিকর্ষণ; উভয়ের মধ্যে তোমার গমনীয় পন্থা। জীবনের পন্থা তোমার সম্মুখে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর, তোমার গন্তব্য তোমার সম্মুখে প্রসারিত। তোমার অন্তরের অন্তর হইতে তোমার তুমি তোমাকে জলদগম্ভীরধ্বনিতে সেই গন্তব্য পথে চলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। বৃথা আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা পাইও না। মঙ্গলকে আহ্বান কর, অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও। একেকে আলিঙ্গন কর, ও

প্রেমের বন্ধনে জড়াইয়া ধর; অপরকে ভীতিভরে নমস্কার কর। গন্তব্যপথে তোমার গতি হউক, মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার পথপ্রদর্শক হইয়া তোমার গতি-বিধি চালনা করিতে রহুক। ধীরপদবিক্ষেপে অটলভাবে তোমার কর্ত্তব্য কাজ সম্পন্ন কর, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাক। মঙ্গলের জয় হউক, অমঙ্গলেরও জয় হউক, উভয়ের জয়ে তোমার আত্মার জয়, তোমার আত্মার পুষ্টি ও বিকাশ।

ভীত ভ্রান্ত স্বাস্থ্যচ্যুত মানবাত্মা মঙ্গলের জয় গান করিয়া আসিতেছে। অমঙ্গলের জয় কি কখনও গীত হইবে না?

ট্যাভারনিয়ার ও বার্ণিয়ার।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আসমুদ্রহিমালয় সমুদয় ভারত মোগলরাজছত্রের বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বিরাজমান ছিল। অভ্রভেদী হিমালয় মোগল বিজয়বৈজয়ন্তী মস্তকে লইয়া সে সময়ে আসিয়া খণ্ডের অন্যান্য সাম্রাজ্যকে উপহাস করিত। দুর্ভেদ্য হিন্দুকুশকেও একদিন সেই বিজয়পতাকা মস্তকে বহন করিতে হয়; কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি প্রদেশও এক সময়ে মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। যদিও ষোড়শ শতাব্দী হইতে ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এবং তাহারই শেষভাগে মোগলকেশরী, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" আকবর সাহ পশুবল পরিহার করিয়া মহামিলনমন্ত্রে ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যে সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সপ্তদশ শতাব্দীতেই মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত মোগল গৌরব-নীহারিকাকে প্রদীপ্ত তপনে পরিণত করিয়া সপ্তদশ শতাব্দী জগতের সমক্ষে উপস্থিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত আকবর সাহের উজ্জ্বল মহিমায় সপ্তদশ শতাব্দীর শৈশবকাল পরিপূর্ণ; ভুবনসুন্দরী নুরজাহানের প্রতিভায় ইহার কৈশোর হাস্তময়; সৌন্দর্য্যসারভূত তাজমহল ও রূপৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব আদর্শ ময়ূরসিংহাসনে অলঙ্কৃত হইয়া ইহার যৌবন শোভাশালী হইয়া উঠে; এবং বিচক্ষণ ও বিশ্ববিজয়ী আরঙ্গজেবের কূটনীতিমন্ত্রে ইহার প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য প্রভাবিত হয়। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ইহার জীবনে কেবল মোগলের গৌরবলীলাই অঙ্কিত হইয়াছিল। তৎকালে রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির অনন্ত গৌরবগাথা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।

মোগলের গৌরবপ্রদীপ্ত ভারতে ভাগ্যোদয়ের আশায় দলে দলে ইউরোপীয়গণ সমাগত হইতে থাকেন। পর্টুগীজ, ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতির বাণিজ্যজাহাজ সুনীল সাগরবক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া মোগল ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর কণিকামাত্র প্রসাদলাভের লোভে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, আগমনমাত্রেই তাঁহাদের ভাগ্যফলক মোগল গৌরব-স্পর্শমণির স্পর্শে উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠে, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইউরোপ ভারতের পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মোগল ঐশ্বর্য্যের অনুমানে অক্ষম হইয়া সেই অদ্ভুত কাহিনীকে ইউরোপীয়গণ আরবের উপন্যাস বলিয়া মনে করিত। অনেকে পর্য্যটকরূপে সেই ঐশ্বর্য্যদর্শনে সমাগত হন। এই সমস্ত পর্য্যটকগণ মোগল গৌরবের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁহাদিগের লিখিত সেই সমস্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। ঐ সকল বিবরণ অনেকপরিমাণে নিরপেক্ষ বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, হিন্দু বা মুসলমানের লিখিত সে সময়ের কোনও ইতিহাস তাদৃশ নিরপেক্ষ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। মুসলমানেরা আপনাদিগের গৌরববৃদ্ধির জন্য অনেক সময়ে হিন্দুর অনেক বিষয় গোপন করিয়াছেন; আবার কোন কোন স্থলে হিন্দুরাও স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া কোন কোন বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ের বৈদেশিক পর্য্যটকদিগের গ্রন্থে সেই সকল ঘটনা অনেকটা নিরপেক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাঁহাদিগের গ্রন্থও যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহাও বলা যায় না। কারণ, তাঁহাদিগের বর্ণিত অনেক ঘটনাই পরমুখশ্রুত; তাহার সত্যাসত্যে একটু বিবেচনাপূর্ব্বক বিশ্বাস করাই সঙ্গত। যে সমস্ত বৈদেশিক পর্য্যটক এইরূপ ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত জানিবার জন্য সাধারণের কৌতূহল হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দুই জন প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের সংক্ষিপ্ত জীবন প্রদান করিতেছি। ইঁহারা উভয়েই ফরাসী। একজনের নাম ট্যাভারনিয়ার, এবং দ্বিতীয়ের নাম বার্ণিয়ার। ইঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া, এবং অনেক দিন ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া, কেহ বা দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকিয়া, অনেক বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত বর্ণনা অতীব প্রীতিপ্রদ। অনেকে তাঁহাদের বর্ণিত গ্রন্থের বিষয় অবগত আছেন, অথচ তাঁহাদের জীবনীর কিছুই জ্ঞাত নহেন; সেই জন্য আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের জীবনচরিত বিবৃত করিতেছি।

জিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট ট্যাভারনিয়ার ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, সৌন্দর্য্যের অমরনিকেতন পারিস মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জনৈক ফ্লেমিশ শিল্পীর ঔরসজাত। উক্ত শিল্পী সাধারণতঃ প্রস্তরাদির খোদাই কার্য্য করিতেন। ট্যাভারনিয়ারের পিতা দেশভ্রমণেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পিতার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পুত্রও বাল্যকাল হইতে সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই ট্যাভারনিয়ার পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। প্রথমতঃ, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, তিনি দুই জন ফরাসী সম্ভ্রান্ত লোকের অধীনে কার্য্য স্বীকারপূর্ব্বক প্রাচ্য দেশের অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাস হইতে তাঁহার সেই ভ্রমণ আরম্ভ হয়। রীজেন্সবর্গ, ড্রেসডেন, ভিয়েনা, কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি পরিভ্রমণের পর, তিনি ফরাসী ভদ্রদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, এবং নিজে এয়জিরোয়ম, তাব্রিজ, ইস্পাহান, বোগদাদ, আলোপো ও স্কাণ্ডারুন প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রপথে রোমনগরীতে উপস্থিত হন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার পরিভ্রমণে বহির্গত হন। এবারে মার্শেলিস হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডারুন পর্য্যন্ত, পরে সিরিয়া পার হইয়া ইস্পাহান ও পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ সকল পরিদর্শন করিয়া, অবশেষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার দ্বিতীয় বারের ভ্রমণ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ১৬৪৩ হইতে ১৬৪৯ পর্য্যন্ত তাঁহার তৃতীয়বার ভ্রমণের কাল। এইবারে তিনি ইস্পাহান হইতে আরম্ভ করিয়া যাবা প্রভৃতি পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যটন করেন। তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম বার ভ্রমণের সময় নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ ১৬৫১ হইতে ১৬৫৮ পর্য্যন্ত তাঁহার উক্ত দুই বার ভ্রমণে শেষ হয়। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ষষ্ঠবারের ভ্রমণ আরম্ভ হয়। সিরিয়া ও আরবের মরুভূমি পার হইয়া তিনি পারস্য ও ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে আসিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে উপস্থিত হন। ট্যাভারনিয়ার সাধারণতঃ জহরতের ব্যবসায়ী হইয়া এই সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, সে সময়ে মোগলের গৌরবতপন প্রাচ্য আকাশ আলোকিত করিয়া সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া তিনি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানসমূহে পরিদর্শন করেন। বাঙ্গলা দেশেও তিনি আগমন করিয়াছিলেন; কাশিমবাজার প্রভৃতি তৎকালীন বাঙ্গলার প্রধান বন্দরসমূহের কথা তাঁহার

ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে মোগলসাম্রাজ্যের গৌরবে ও বাণিজ্যব্যবসায়ে ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, এতভিন্ন, ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরের ও মোগল শাসনপ্রণালীর চিত্র, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে, সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের অনেক ঘটনা অবগত হইতে পারা যায়। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ট্যাভারনিয়ার ইউরোপে উপস্থিত হইলে, ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই, ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহাকে উপাধিতে ভূষিত করেন। ট্যাভারনিয়ার অবশেষে অবনীর ব্যারণ নামে অভিহিত হন। রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সুইজর্লণ্ডে বাস করিতে হয়। তিনি তথা হইতে অবশেষে বার্লিনে গমন করেন। তথায় ব্রাণ্ডেনবর্গের ইলেক্টার কর্ত্তৃক স্থাপিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া রুসিয়ার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত একটি পথের আবিষ্কারের জন্য, [illegible]ন ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন হইতে যাত্রা করেন। কিন্তু ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের জুল[illegible] মাসে মা[illegible] নগরে তাঁহার জীবনবায়ুর অবসান হয়। ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত এক[illegible]নি সুন্দর গ্রন্থ। যদিও তাঁহার রচনাপ্রণালী সাহিত্যের হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করে নাই, তথাপি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে তাহাতে অনেক সুন্দর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া প্রাচ্য দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য, প্রধান প্রধান বন্দর, বাণিজ্যপথ ও নানা স্থানের প্রচলিত মুদ্রার বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম দুই খণ্ড ১৭৭৬।৭৭ অব্দে প্রথমে প্রকাশিত হয়। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক বার ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি মুদ্রিত হয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সেগুলি সাত খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য ভাষাতেও তাহার অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজীতে ১৬৭৮ ও ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ডে, ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজীতে, ও ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

ট্যাভার্ণিয়ারের ন্যায় বার্ণিয়ারও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত পর্য্যটন করিয়া অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মোগল দরবারে তিনি চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, মোগল সম্রাটদিগের অনেক পারিবারিক গুপ্তরহস্যও তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সিস বার্ণিয়ার ফ্রান্সের অন্তর্গত আঞ্জীয়ার্স নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বার্ণিয়ারের জন্মসময় নির্ণয় করা

দুঃসাধ্য। ভল্টেয়ার ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বার্ণিয়ার প্রথমতঃ চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং মণ্টিলিলিয়ার হইতে ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। দেশভ্রমণে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া সিরিয়ায় উপস্থিত হন। তথা হইতে মিসরে গমন করিয়া এক বৎসরের অধিক কাল কায়রো নগরে অবস্থিতি করেন। সেইখানে তিনি মারক (plague) রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর সুয়েজ হইতে জলপথে যাত্রা করিয়া লোহিত সাগরের প্রত্যেক অংশ আবিষ্কারের জন্য প্রবৃত্ত হন; কিন্তু মোথায় উপস্থিত হইয়া গণ্ডা পর্য্যন্ত গমন করা বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া, তিনি একখানি জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক সুরাট বন্দরে আগমন করেন। বার্ণিয়ার দশ বৎসর কাল ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আট বৎসর তিনি বাদসাহ আরঙ্গজেবের দরবারে চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আরঙ্গ ়বের প্রিয় অমাত্য দানেশ মন্দ খাঁ, আরঙ্গজেবের রাজত্বে সা ত্য ও বিজ্ঞ নের একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি বার্ণিয়ারে . প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে বার্ণিয়ার অনেক বিষয়ে উৎসাহ প্রাপ্ত হন। সম্রাট আরঙ্গজেবের সহিত তিনি কাশ্মীরভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কাশ্মীরের বিবরণ ইউরোপীয়দিগের নিকট অমূল্য রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে ফ্রান্সে গমন করিয়া বার্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেই সময়ে রেসিন, বইলোঁ, সেণ্ট এভারমণ্ট, নিনোন ডী লিউক্লস, ম্যাডাম্ ডী লা লাবলীয়ার ও নলিয়ার চাপেল প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। বার্ণিয়ারের রমণীয় মুখমণ্ডল ও শারীরিক গঠন, মনোজ্ঞ ব্যবহার ও মিষ্ট আলাপনের জন্য সেণ্ট এভারমণ্ট তাঁহাকে "চারু দার্শনিক" বলিয়া অভিহিত করিতেন। বার্ণিয়ারের দার্শনিক মত এপিকিউরসের অনুযায়ী ছিল। এপিকিউরসের মত কতকাংশে আমাদের চার্ব্বাক দর্শনের ন্যায়; সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাপনই উক্ত মতের মূল সূত্র। বার্ণিয়ার গ্যাসেণ্ডীরও একজন স্তুতিবাদক ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাদির অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করিতেন না। বার্ণিয়ারের দার্শনিক মত অপেক্ষা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তই সাহিত্যসংসারে অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর প্যারিস নগরীতে তাঁহার ইহজীবনের অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে কনিষ্ঠ

য়েসিন এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, কোনও প্রমোদসমিতিতে প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডী হার্লে বার্ণিয়ারের প্রতি একটু বিদ্রূপাত্মক ভাষা প্রয়োগ করায়, তিনি তাহাতেই মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন।

বার্ণিয়ারের মোগল সাম্রাজ্যের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক রাজনৈতিক ঘটনা অবগত হওয়া যায়, এবং মোগল রাজত্বে প্রজাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহাও অনেকপরিমাণে জানা যায়। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম অংশ সাজাহানের পুত্রকন্যাগণের অন্তর্বিবাদ ও অবশেষে আরঙ্গজেবের বিজয়লাভ ব্যাপার বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্তর্বিপ্লবের পর যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় অংশ তাহাতেই পরিপূর্ণ; ইহাতে কতকগুলি উপাখ্যানও সন্নিবেশিত হইয়াছে। যদিও তাহাদের বিশেষ কোনও গুরুত্ব নাই, তথাপি যে সমস্ত লোকের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাদের বিশিষ্টত্ব ও তৎকালীন আচার ব্যবহারের বিষয় সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়। তৃতীয় অংশে সুপ্রসিদ্ধ কোলবার্টকে একখানি পত্র লেখা হয়। তাহাতে ভারতের অর্থাগমের বিবরণ, সামরিক বল ও ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছিল। কেবল সেই পত্রখানি হইতেই বার্ণিয়ার স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসা লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। ইহাতে তিনি নিজের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাঁহার ভ্রমণের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম, তিনি বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ ও দ্বিতীয়টিতে সেই সেই দেশে আপনাদিগের সাধু মত প্রচার করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। তাহার পর দিল্লী ও আগরা নগরীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের যথেষ্ট ফল প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ সেই সমস্ত আচার ব্যবহার যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকেন, বার্ণিয়ার তদপেক্ষা অধিক কিছু পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহার সঙ্গে আবার তাঁহার পারমাণবিক দর্শন-মতের কথাও আছে। সম্রাট আরঙ্গজেবের সহিত মহাধুমধামে তিনি যে কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছিলেন ও তথা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন বঙ্গভূমির বিবরণও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তও ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে ইহার প্রথম অনুবাদ হয়, কিন্তু সে অনুবাদ তাদৃশ

সুস্পষ্ট হয় নাই। আর্ভিং ব্রক ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে ইহার এক সুন্দর অনুবাদ করিয়া সাধারণের নিকট প্রশংসালাভ করিয়াছেন। যাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল সাম্রাজ্যের বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, ট্যাভারনিয়ার ও বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে অনেক পরিমাণে নিরপেক্ষ ভাবে সাহায্য করিবে।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজ-তত্ত্ব।

চীন রমণী।

চীন অতি প্রকাণ্ড দেশ। চীনের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও অধিক। কিন্তু চীন আপনাতে আপনি এমনই নিমগ্ন যে, সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিদেশীর প্রায় অনধিগম্য। তাই কোন ভ্রমণকারী চীনসম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিলে, আমরা আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করি। চীনবাসীর পারিবারিক জীবনে রমণীর প্রভাব বড় অল্প নহে। চীনে গার্হস্থ্যশাসনসক্ষম হওয়াই রমণীর ঈপ্সিত বাসনা। তাঁহারা পরিবারবর্গের সুখের জন্যই জীবনযাপন করেন। পতি ভাল হইলে চীন রমণী আপনাকে অসাধারণসৌভাগ্যশালিনী মনে করেন।

সম্প্রতি মসো কোর্ াঁত কোনও ফরাসী পত্রে চীনরমণী সম্বন্ধেএকটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

চীন-বাসীদের মধ্যে পুরুষেরই সম্মান অধিক। তাই কোনও দম্পতীর কন্যাসন্তান জন্মিলে, তাহা পূর্ব্বজন্মকৃত কোনও অপরাধের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তি বলিয়াই গণ্য হয়।

জন্ম ও নামকরণ।

যে দম্পতীর প্রথম সন্তান পুত্র না হইয়া কন্যা হয়, সে দম্পতী আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, চাইনিস পরিবারে দুহিতার অযত্ন হয়। সন্তান জন্মিবার এক মাস পরে পিতামাতার আত্মীয় বন্ধুগণ শিশুকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিতে আইসেন। কিন্তু দুহিতা জন্মিলে গৃহে যেন একটা বিষাদের ছায়া থাকে; পুত্র জন্মিলে জননী যেমন "পূর্ব্বপুরুষদিগের কক্ষে" গিয়া ধূপ পোড়ান, এবং প্রেত তাড়াইবার ব্যবস্থা করেন, কন্যা জন্মিলে সেরূপ কোনও অনুষ্ঠান হয় না। রমণীর এই অনাদর কেবল চীনেই আবদ্ধ নহে। এবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসংক্রান্ত ব্যাপারে, ইংলণ্ডের সভ্যতার শত কোলাহলের মধ্যে এক ধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে—এখনও ইংরাজের বর্ব্বরতা লোপ পায় নাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদিগকে উপাধি দিতে অসম্মত হইয়াছেন, যেন রমণীর প্রতিভা নাই! কুমারী ফসেট প্রভৃতি রমণীগণ যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের সঙ্কল্প টলিল না। ছাত্রগণ যখন জানিতে পারিল যে, ভোটে রমণীদিগকে উপাধি প্রদান না করাই স্থির হইয়াছে, তখন তাহারা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। যখন বিবেচনা করা যায় যে, এই সকল ছাত্র ভদ্রসন্তান এবং ইহাদের অধিকাংশেরই জননী ভগিনী বিদ্যমান, তখন নিতান্ত বিষন্নভাবে এ কথা বলিতে হয় যে,

ইংরাজের নারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন আন্তরিক নহে, কেবল মৌখিক। তাই আমরা বলিয়াছি, রমণীর অনাদর কেবল চীনেই আবদ্ধ নহে।

চাইনিস বালিকাদিগের দুই একটি নাম বড় মধুর ও কবিত্বপূর্ণ। শিশু কোনও সুন্দর দ্রব্যের দিকে চাহিলে, দ্রব্যের সেই নামানুসারেই তাহার নামকরণ হইয়া যায়;—যেমন "সুন্দর জলদ," "সুগন্ধ পত্র," ইত্যাদি। সাত বৎসর পর্য্যন্ত বালিকার এই নামই প্রচলিত থাকে, তাহার পর একটা জমকাল রকমের নাম বাছিয়া রাখা হয়; তখন নূতন নাম আসিয়া পুরাতন নামকে বেদখল করে। তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে, আত্মীয় স্বজনগণ বালিকাকে পূর্ব্বের পরিচিত নামেই ডাকিয়া থাকেন; তাঁহাদের নিকট নূতন নামটা পোশাকী।

শৈশব।

চীনে জননী স্বয়ং শিশুপালনের ভার গ্রহণ করেন। অপরের হস্তে ছেলের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাকুক, শিশুকে গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ প্রদান করিতেও জননী অসম্মত। এ প্রথা ভাল কি মন্দ,—ইহাতে জননী ও সন্তানের মধ্যে স্নেহবন্ধন দৃঢ়তর হয় কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, চাইনিস পরিবারে দুহিতার আদর অল্প, তথাপি তাহারা অতিযত্নে পালিত হইয়া থাকে। তাহাদের বেশ হয় হরিদ্রাবর্ণের, নয় লোহিতবর্ণের, নয় ত হরিৎবর্ণের; এই তিন বর্ণ সৌভাগ্য সূচিত করে। শৈশবেই বালিকাদিগের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়; কেবলমাত্র তিনটি শিখা থাকে,—সে শিখা কয়টি লোহিতবর্ণ রেশমী [illegible] বাঁধিয়া রাখা হয়। মোটের উপর চাইনিস্ জনকজননী শিশুসন্তানের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্ষুদ্র পদ।

চীনে একটা বিস্ময়কর প্রথা আছে,—মেয়েদের পা ছোট করা। ইংরাজ-সুন্দরী যেমন আপনার কটিদেশ যথাসম্ভব সূক্ষ্ম করিবার জন্য শরীরকে ক্লিষ্ট করেন, চাইনিস বালিকা তেমনই আপনার পদদ্বয় ক্ষুদ্র করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। বালিকার বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হইলেই তাহাকে আর ভ্রাতাদিগের সহিত খেলা করিতে দেওয়া হয় না। শৈশবের সে স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া কৌতুক তখন অতীতের ঈপ্সিত স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত হয়। তখন হইতেই বালিকার পদদ্বয় বাঁধিয়া দেওয়া হয়, পদদ্বয় আর বড় বাড়িতে পারে না। বাস্তবিক এই পদ ক্ষুদ্র করিবার প্রবৃত্তি চীনে এতই প্রবল যে, প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় সকলের অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত বালিকারাও আশ্রমকর্ত্রীদিগকে পদদ্বয় বাঁধিয়া দিতে বলে; তাহারা জানে, আপনাদের পূর্ণবিকশিত পদদ্বয় লইয়া চাইনিস সমাজে বিবাহ করা বড় সহজ হইবে না। ইহাকেই বলে "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। আবার বিস্ময়ের কথা এই যে, চীনে সর্ব্বস্থানে এই প্রথা প্রচলিত নাই। চীনের রাজবংশ অর্থাৎ ম্যাঞ্চুরা কখনও এ প্রথা অবলম্বন করেন নাই।

স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে চীন অনেক দেশের আদর্শ হইতে পারে। চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন, চীনের প্রচলিত আচার ব্যবহারও নূতন নহে; নব সভ্যতা বা নবমত চীনের দৃঢ়গঠিত প্রাচীরেই প্রতিহত হয়, চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। চীনে যাহা ছিল, তাহাই আছে। চীনে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। আমাদিগের উচ্চ চীৎকারসত্ত্বেও লজ্জিতভাবে এ কথাটা স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার হয় নাই। এ দেশে যে দুই এক জন বিদুষী মহিলার নাম শুনিতে-পাই, তাঁহারা জলদাচ্ছন্ন অনন্ত অম্বরে দুই একটি তারকার সহিত উপমেয়। স্ত্রীশিক্ষার স্রোত এখনও আমাদিগের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পুরুষের প্রচুর চেষ্টার অভাব ও রমণীর শিক্ষার প্রতি

আন্তরিক অনুরাগের অভাব, এই দুই কারণে, এ দেশে মহিলাদিগের মধ্যে আজও শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার সাধিত হয় নাই। কিন্তু চীনে বালিকাদিগের ভালরূপ শিক্ষাই হইয়া থাকে। চীনে শিক্ষয়িত্রীরা প্রত্যেকের গৃহে গিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া আইসেন। সেখানে বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণ করিবার জন্যও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। বালিকাদিগের শিক্ষার বিষয়ও অল্প নহে;—পাঠ, হস্তলিপি, সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, সূচিকার্য্য। বালিকাদিগকে বিশেষ কোনও ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হয় না; তবে বালিকারাও পিতামাতার সহিত মন্দিরে গমন ও গৃহের ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদান করে।

বিবাহ।

চীনে একটা প্রবাদ আছে, বিবাহই মানব-জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। চাইনিস বালিকার বয়স দ্বাদশ বৎসর হইতে না হইতেই তাহার পিতা উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। পাত্র মিলিলেই সম্বন্ধ স্থির করা হয়;—আমাদের দেশের "পাকা দেখার" মত।—আবার কোনও বিশেষ কারণ ভিন্ন সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায় না। বিবাহের কিছু দিন পূর্ব্বেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে, অনেক সময় বালক বালিকার শৈশবেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। বিবাহটা চাইনিসের নিকট এতই আবশ্যক ও গুরুতর যে, যদি কোনও পিতার অবিবাহিত পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে শোকসন্তপ্ত পিতা অনুসন্ধান করেন, কাহার অবিবাহিতা দুহিতা মরণের মহা-স্বপ্নে অভিভূত হইয়াছে। তখন একটি মৃতদেহ সমাধি হইতে তুলিয়া আর একটির সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। বন্ধুবান্ধবগণ বিবেচনা করেন যে, এই অনুষ্ঠানে মৃত বালক বালিকার জীবন তবু সফল হইল। এই "বিবাহের" পর শোকার্ত্ত পিতামাতাদের মধ্যে যথারীতি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। এরূপ বিস্ময়কর প্রথা জগতে আর কোথাও আছে কি না, জানি না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের মত চীনেও বিবাহ ব্যাপারটা নিতান্তই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চীনের জনসংখ্যাও অসাধারণ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাতে লোকের আয় কমিয়া যায়, নানাবিধ অসুবিধা হয়, দেশের যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটে। অর্থনীতিবিদ্ ইহাকে নানা দোষের মূল বলিয়া নির্ণয় করেন।

বিবাহান্তে।

বিবাহ হইলে চাইনিস রমণী সম্পূর্ণভাবে স্বামীর পরিবারভুক্ত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষ ছাড়িয়া স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট প্রার্থনা করেন। পিতা-মাতার মৃত্যু হইলে, বিবাহিতা দুহিতার অশৌচ অল্পদিনমাত্র স্থায়ী হয়। যদি কোন চাইনিস বিবাহবন্ধন ছেদন করে, তবে তাহাকে নিকট হইতে গৃহীত সমস্ত দ্রব্যজাত প্রত্যর্পণ করিতে হয়। এইখানে বলিয়া রাখি, চীনে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ বড় দেখা যায় না।

শিশুহত্যা।

পূর্ব্বে রাজপুতানার মত চীনে বালিকাহত্যা প্রচলিত ছিল। তাহাকে জলদেবতার সহিত বিবাহ দেওয়া বলিত। এখন চীনে নানা বিদেশীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনাথাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এখন অনেক সময় বালিকার জনক তাহাকে এমন কোনও স্থানে ফেলিয়া যায়, যেখানে কোনও ধর্ম্মযাজক বা "নান" তাহাকে দেখিতে পাইবেন। অনেক সময় দুহিতাকে কোনও ধনী পরিবারের নিকট বিক্রয় করা হয়, সময় সময় কোনও পিতা ইহার পর পুত্রের সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া শিশুকে গ্রহণ করেন।

যাঁহারা চাইনিসদিগের পারিবারিক জীবনের বিষয় জানিতে চাহেন, আমরা তাঁহা-দিগকে জেনারল চেঙ-কিন্টঙ-প্রণীত পুস্তকদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভ্রমণবৃত্তান্ত ।

ব্রহ্মদেশ ।

ইতিপূর্ব্বে মিষ্টার কেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া আমরা পাঠকদিগকে উত্তর ব্রহ্মের চিত্র উপহার দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। * তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের আর এক অংশ অবলম্বন করিয়া আমরা পাঠকদিগকে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আরও কতকগুলি বিষয়ের বিবরণ দিতেছি।

শোভা ও সমৃদ্ধি।

লেখক প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছেন যে, তিনি জগতের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মবাসীদিগের আচার ব্যবহার অন্যান্য স্থানবাসীদিগের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আবার ব্রহ্মে অনন্তযৌবনসম্পদশালিনী শোভাময়ী প্রকৃতির অনন্ত শোভা। খরস্রোত নদ, কলনাদিনী নিম্নগা, অভ্রভেদী গিরি-শ্রেণী, রম্য কানন, আর শ্যামশোভাময় শস্যক্ষেত্র,—এই সকলের একত্র সমাবেশ বড় মনোরম। লেখকের মতে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সকলের অপেক্ষা ব্রহ্ম অধিক সমৃদ্ধিশালী। ইরাবতীর জলরাশি ব্রহ্মের অভ্যন্তরভাগ বিধৌত করিয়া বহিতেছে;—এখানে অনাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয় না;—কৃষক তাহার শ্রমের আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। বঙ্গদেশ বা চীনের মত এখানে জনসংখ্যা অতিরিক্ত অধিক নহে, তাই বসতিও ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। চারি দিকে বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্র—জনসংখ্যা তুলনায় অল্প। এখন ক্রমেই জমী আবাদ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু এখনও অনেক জমী পড়িয়া আছে। ব্রহ্ম হইতে চাউল ও সেগুনকাঠের যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। লেখক অনুসন্ধানে যত দূর জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বোধ হয়, ব্রহ্মে কেরাণীরা, এমন কি, শ্রমজীবীরাও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বেতনের হিসাবে, তিন গুণ পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহুকালব্যাপী দারিদ্র্যের যে ভীষণ প্রকোপ দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মে তাহা আদৌ দৃষ্ট হয় না। দারিদ্র্য-দুর্দ্দশার ইতিহাস কখনও ব্রহ্মের ইতিহাস কলঙ্কিত করে নাই। ইহা অতীতের কথা—এখন ব্রহ্মের মর্ম্ম গাঙ্গে নব সভ্যতার বন্যা আসিয়াছে; ভবিষ্যতে কি আছে, তাহা কে বলিবে! প্রাচ্য সভ্যতা ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষণে যে অনল জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতে অলস ব্রহ্মবাসী ভস্মসাৎ হইবে কি না, তাহা কে বলিবে?

জাতি ও ধর্ম্ম।

ব্রহ্মবাসিগণ বহু জাতিতে বিভক্ত। দেখিলে বোধ হয়, মঙ্গোলিয়ানদিগের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; ইহাদিগের শিরায় আর্য্যশোণিত আছে কি না সন্দেহ। ইহাদিগের আকৃতি ও স্বভাবসুলভ ব্যবহার দেখিলে সহজেই জাপানিদিগের কথা মনে পড়ে;—সেও এমনই ব্যবহার। ব্রহ্মে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে আমেরিকান অধিক—প্রচারকার্য্যে তাঁহাদের প্রচুর উৎসাহ। ব্রহ্মে মোটের উপর খৃষ্টানের সংখ্যা ৮৪০০০; মগ ধর্ম্মযাজকের সংখ্যাও অল্প নহে; ব্রহ্মে গীর্জ্জার সংখ্যা ৫২৬—বড় অল্প।

বৌদ্ধধর্ম্মই ব্রহ্মের প্রধান প্রচলিত ধর্ম্ম। পুরোহিতগণ সকলেই অকৃতদার, সংসারত্যাগী, বিষয়বাসনাহীন। তাঁহারা সাধারণতঃ মঠেই বাস করেন। বৌদ্ধ ব্রহ্মবাসিমাত্রই জীবনে একবার অন্ততঃ একদিনেরও জন্য পুরোহিত হয়। দীক্ষাকার্য্য প্রায় দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সম্পন্ন হয়। দীক্ষান্তে বালক মঠে প্রবেশ করে। যদি তাহার পুরোহিত অর্থাৎ ফুঙ্গি হইতে ইচ্ছা না থাকে, তবে সে পৌরোহিত্য-প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ না হইয়া, দুই চারি দিন পরেই গৃহে ফিরিয়া আইসে।

ফুঙ্গিরাও সকলেই চিরজীবনের জন্য পৌরোহিত্য-ব্রত গ্রহণ করেন না। তাঁহারাও যতদিন

---

* ১৩০৩ সালের ফাল্গুনের "সহযোগী সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছা পুরোহিত থাকেন;—তাহার পর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশের লোকের

পুরোহিতসম্প্রদায়।

সাহায্যেই মঠগুলি সংরক্ষিত। প্রত্যূষেই গলদেশে পিত্তলের ভিক্ষাপাত্র বিলম্বিত করিয়া দলে দলে ফুঙ্গিরা সহরে বা গ্রামে ভিক্ষার্থ বাহির হয়েন। ফুঙ্গিরা কোনও কথা না বলিয়া কেবল আসিয়া গৃহস্থের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হয়েন; গৃহকর্ত্রী তখনই আসিয়া অন্ন, ব্যঞ্জন, ফলমূলাদি প্রদান করেন। ফুঙ্গিরা সকলেই মুণ্ডিত-মস্তক, পীতাম্বরধারী; অধিকন্তু রমণীদিগের দৃষ্টি হইতে আপনাদের মুখ আবৃত করিবার জন্য সকলের সহিতই এক একখানা পাখা থাকে। ফুঙ্গিরা সকলেই মঠে বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। লেখক কোনও পল্লীগ্রামে কোনও আশ্রমে প্রধান ফুঙ্গির (সর্দ্দার পাওা বা মোহন্ত) সহিত সাক্ষাৎ করেন; তিনি লেখককে মঠের সকল কার্য্য দেখাইয়াছিলেন। বালকগণ উবুড় হইয়া বৃত্তাকারে শয়ন করিয়া থাকে, আর শিক্ষক পড়াইতে থাকেন। বিদ্যালয়ে লিখিতে ও পড়িতে শিখান হয়।

ব্রহ্মে ধর্ম্মমন্দিরকে প্যাগোডা বলে। ব্রহ্মদেশে লক্ষ লক্ষ প্যাগোডা আছে। মক্কাগমন যেমন মুসলমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, একটা প্যাগোডা নির্ম্মাণ করাও তেমনই মগের

প্যাগোডা।

সর্ব্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা। তাই কিছু টাকা জমাইতে পারিলেই মগ রৌদ্রশুষ্ক ইষ্টকে একটা প্যাগোডা নির্ম্মাণ করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। তবে প্যাগোডানির্ম্মাণেই পুণ্য, প্যাগোডার সংস্কারে পুণ্যসঞ্চয়ের সম্ভাবনা নাই;—তাই অল্প দিনের মধ্যেই প্যাগোডার গর্ব্বোন্নত শির ধূলিবিলুণ্ঠিত হয়—তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর বৃক্ষ লতা জন্মে, ভগ্নস্তূপ উরগজাতীয়দিগের আবাসভূমি হইয়া উঠে। তবে দুই চারিটি প্রসিদ্ধ প্যাগোডার কথা স্বতন্ত্র—সেগুলিতে যাত্রীর স্রোতে কখনও ভাঁটা পড়ে না; সেগুলি প্রায়ই সুসংস্কৃত থাকে। সকল প্যাগোডার আকার একরূপ—দেখিতে কতকটা ঘণ্টার মত।

রেঙ্গুনের "সইডেগণ" প্যাগোডা অতি প্রসিদ্ধ;—মগদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। একটা পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল করিয়া তাহার উপর প্যাগোডা নির্ম্মিত, প্যাগোডার

"সইডেগণ।"

মূলদেশ বৃহদায়তন—ক্রমে যত উচ্চ হইয়াছে, ততই আয়তন কমিয়া, শেষে চূড়ামাত্রে শেষ হইয়াছে। প্যাগোডার চূড়া বহুমূল্য প্রস্তরখচিত, সুবর্ণনির্ম্মিত কিঙ্কিনীজালে জড়িত;—মৃদু মন্দ পবনে সেই কিঙ্কিনীমালার সুমধুর ধ্বনি সত্য সত্যই বড় শ্রুতিমধুর। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দে এই প্যাগোডা নির্ম্মিত হয়। ইহাতে বুদ্ধের আট গাছি কেশ সংরক্ষিত হইয়াছিল। দেড় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্যাগোডায় এই অভিনব শ্রী। প্যাগোডা বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে মনোহর ভ্রমণপথ—পথিপার্শ্বে মন্দিরের সারি—কোনটি সুসংস্কৃত, কোনটির অঙ্গে কাল ধ্বংসের চিহ্ন চিহ্নিত করিয়াছে।

প্যাগোডাগুলি হয় ইষ্টকে নয় কাষ্ঠে নির্ম্মিত;—সকলগুলিতেই মর্ম্মর বা পিত্তলনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়ের উপর উঠিবার জন্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ,—চারি দিকে

প্যাগোডার বর্ণনা।

সোপানশ্রেণী। সহরের দিকের সোপানশ্রেণীর উপর সেগুন কাঠের ছাত। মন্দিরের কাছে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণিশ্রেণী; এই সকল বিপণিতে খাদ্য দ্রব্য, বুদ্ধের মূর্ত্তির পদতলে অর্পণ জন্য পুষ্প, মন্দিরে জ্বালাইবার জন্য বাতি, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ ও খেলেনা বিক্রয় হয়। অনেকে বিক্রেতাদের নিকট হইতে বিহগ ক্রয় করিয়া তাহাকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। সোপানশ্রেণীর উপর দুইটি সিংহ-বা সারমেয়ের মূর্ত্তি—ইহারা প্রেত দূর করে। মগেরা বুদ্ধকে যত ভয় না করে, প্রেতকে ততোধিক ভয় করে। সোপানে ভিক্ষুকের দল—ইহাদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীরও অভাব নাই। কোনও উৎসবের দিন প্যাগোডামূলে যে দৃশ্য নয়নসমক্ষে উদ্ভাবিত হইয়া উঠে, তাহার বর্ণনা করা সম্ভব নহে। মগ পরিচ্ছদে সমুজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্য বড়ই ভালবাসে।

পুরুষ ও রমণীদিগের রেশমী কাপড়ের জামার বর্ণবৈচিত্র্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর ; পুরুষের মস্তকে রেশমী রুমাল বাঁধা—রমণীর মস্তকে আজানুলম্বিত ভ্রমরকৃষ্ণকেশকলাপে কুণ্ডলীকৃতা ফণিনীর মত মনোহর কবরী, তাহাতে আবার পুষ্পগুচ্ছ শোভা পাইতেছে ; কর্ণে, কণ্ঠে ও বাহুতে মণিমুক্তার অভাব নাই।

কর্ম্ম ও ভক্তি।

ব্রহ্মবাসীদিগের বুদ্ধোপাসনায় ভক্তির সংস্পর্শমাত্র নাই। কতক লোক্ যখন উপাসনা করে, কতক লোক তখন গল্প করে ; উপাসনাকারীরাও মধ্যে মধ্যে চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এবং পরিচিতদিগকে অভিবাদন করিয়াও দূষণীয় বলিয়া মনে করে না। অনেকে মন্দিরদ্বারে রক্ষিত সারমেয়কুলকে আহার দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। সকল দেশেই ধর্ম্মের এইরূপ দুর্দ্দশা ; ব্রহ্মবাসীর ধর্ম্মবুদ্ধিও যে বিকৃত হইয়াছে, তাহা বিচিত্র নহে।

চুরুট।

ব্রহ্মে চুরুট সর্ব্বব্যাপী। কি ছোট, কি বড়, কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেই ধূমপান করে। শিশুরা একবার স্তন্য পান করে, একবার জননীর দ্বাদশ ইঞ্চ দীর্ঘ চুরুটে ধূমপান করে। ছেলেরা তাহাদের পদের মত দীর্ঘ চুরুট ফুঁকে। আবার পুরুষ অপেক্ষা রমণীর চুরুটানুরাগ অধিক প্রবল। তবে ব্রহ্মের চুরুট নাকি আদৌ কড়া নহে। তাই বোধ হয় ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। ব্রহ্মবাসীরা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত আলস্যপরবশ।

হস্তী।

ব্রহ্মে আর একটি দেখিবার জিনিস,—হস্তী। হস্তীর বুদ্ধির নানা গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মে কাঠের কারখানায় শিক্ষিত হস্তী দিয়া নানাবিধ কাজ করান হয়। লেখক একদিন প্রভাতে একটি বৃহৎ কাঠের কারখানায় হস্তীর কার্য্যকৌশল দেখিতে গিয়াছিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতমাত্র হস্তী নদী হইতে বৃহৎ বৃহৎ সেগুন কাষ্ঠ আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে। এক একটি শিক্ষিত হস্তীর মূল্য পাঁচ হইতে ছয় হাজার টাকা। এক একটা বড় কারখানায় এইরূপ তিন চারি শত হস্তী আছে।

ব্রহ্মের বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে,—ইংরাজ গভর্মেণ্ট বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় নয় শত মাইল রেলপথ খুলিয়াছেন।

কবিতাকুঞ্জ।

নীরব সাধনা।

১

আজ বুঝি সব মোর হল অবসান,
ভাবা আর পাই না খুঁজিয়া ;
নূতন নূতন ছন্দ চাই রচিবারে,
বিন্দুমাত্র পাই না ভাবিয়া।
হৃদয়ের গ্রন্থখানি খুলিয়া যতনে
ব্যগ্র-আঁখি পড়িবারে ধাই ;
কে জানে পড়িতে বুঝি গিয়েছি ভুলিয়া,
রেখামাত্র দেখিতে না পাই।

২

মনে মোর ছিল সাধ, জগতের কাছে
এ হৃদয় দেখাব খুলিয়া,
যে উচ্ছ্বাস প্রাণে ল'য়ে লভেছি জনম
দিব তারে সঙ্গীতে ঢালিয়া।
একমাত্র সেই আশা ধরিয়া হৃদয়ে,
দিবানিশি করি প্রাণপণ,
নিভৃতে আপন মনে গান গাইয়াছি,
আর শুধু গেঁথেছি স্বপন।

৩

হায়! হায়! তবু ত গো নারিনু বলিতে
যাহা আমি চাই বলিবারে,
কোনও মতে বাহিরে তা হ'ল না প্রকাশ
ভিতরে যা পাই দেখিবারে;—
বিমল হৃদয়-সরে উঠে যে লহরী
সৌন্দর্য্যের অতল নিভৃতে,
পৃথিবীর নিদারুণ ভাষার বাঁধন
প্রাণে সে ত পারে না সহিতে।

৪

ওরে মূঢ়! এত তুই গাঁথিলি কবিতা,
এত ভাব ঢালিলি সঙ্গীতে,
তবুও যাহার লাগি যত্ন আজীবন
তাই তুই নারিলি বলিতে!
অতীতের অতি মৃদু স্মৃতির মতন,
অদৃশ্যের স্বপনের প্রায়,
জীবন্ত যে ছবিখানি জাগিছে হৃদয়ে
তাই আঁকা হ'ল না রে হায়!

৫

চিহ্ন নাই, শব্দ নাই, নাহিক উপমা,
শূন্য মোর হ'ল অভিধান;
মরমে যে ভাবরাশি উঠেছে উথ'লি
আজিও তা রয়েছে সমান।
যোগাতে পারি না তার ছন্দ অনুরূপ,
সুর তার পারি না মিলাতে;
হায় গো এ হৃদয়ের অসীম উচ্ছ্বাস
কিছুতে কি নারিব কমাতে?

৬

জানি না এ জগতেরে বুঝাব কেমনে,
তাই আমি মানি পরাজয়;—
মৌন মোর ভাবরাশি, শূন্য অলঙ্কার,
ম্রিয়মাণ ইন্দ্রিয়নিচয়।
কথা না বলিলে এরা পায় না শুনিতে,
না দেখালে দেখিতে জানে না;
আলোকের পর-পারে জাগে যে আলোক
সে আলোক বুঝিতে পারে না।

৭

তবে কি কিছুই আর নাহি রে উপায়?
বৃথা মোর বৃথা এ জীবন?
একটু যে আলো ল'য়ে উঠিনু ফুটিয়া
তাও মোর যাবে অকারণ?
এত যে সাধনা করি সাজানু এ গৃহ
মৃত্যুরে কি দিতে উপহার!
এ বাসনা উপাসনা সবই হবে বৃথা?
ধিক্ ধিক্! অদৃষ্ট আমার!

৮

রে অবোধ! একবার দেখ চেয়ে দেখ
সমুখেতে মরণ দাঁড়ায়ে;
এ তোর সঙ্গীত-রাজ্য কল্পনার খেলা
এখনই দিবে সে ঘুচায়ে!
একমাত্র ভাব—তাও বুঝাতে নারিলি,
তোর কথা যাবে তোরই সাথে,
জীবন যেথায় ছিল সেথা পড়ে রবে
অসুন্দর অসত্য-গুহাতে।

৯

আজ তুই পুনর্ব্বার কর প্রাণপণ,
আশা সাধ ডেকে নে সকল।
বাক্য তোর হেরে গেছে, হেরেছে সঙ্গীত,
আজ শুধু ঢাল অশ্রুজল।
দূরে ফেলি বীণা-বাঁশী নীরবে চাহিয়া
অশ্রু তুই থাক্ বরষিতে,—
কাব্য-কল্পনার সেই অশক্য কাহিনী
সেও যদি পারে বুঝাইতে!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বিরহ।

খাম্বাজ।

আজি স্বরগ-আবাস তুমি এস ছাড়ি,
আজি বরষে বরষা বিরহ বারি।
আজি ফুলে নাহিক মধু গন্ধ,
মলয়ে নাহিক মৃদু মন্দ,
জীবনে নাহিক গীত ছন্দ,
তোমারে ছাড়ি।
মোর এ ভালবাসা পাবে না নন্দনে,
উঠেনি এত সুধা সাগরমন্থনে,
না জানি নিশি যাপ' কতই ক্রন্দনে,
আমারে ছাড়ি।
সেথায় নাহিক আত্মবলিদান,
মিছে কলহ, মিছে অভিমান,
বিরহ-বেদন, বিরহ-অবসান,
সেথা রবে কেমন করি।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

সন্ধ্যা।

অয়ি সন্ধ্যা,
ছায়ার বসন পরি এলায়ে অলকরাশ,
শান্ত আঁখি নত করি, ধীরে,
দাঁড়ায়ে নিশার কূলে ফেলেছিস্ জগতেরে
কি যেন রহস্যজালে ঘিরে!
রবিতাপে খেলা করি' শ্রান্ত শিশুটির ভাবে,
ধরা নিতি আসে তোর কোলে,
ঢেকে দিস্ স্নেহে তার অনাবৃত শ্যাম কায়া
সুকোমল আঁধার-আঁচোলে!
নিঃশবদে রুদ্ধ করি দিক্-বাতায়নগুলি
নিরালায় নিভৃত নিলয়ে,
ঘুমাইয়া সযতনে, শিয়রে বসিস্ তার,
সন্ধ্যা, তুই নতমুখী হ'য়ে!
কি এক মোহন মন্ত্র অস্ফুট বচনে পড়ি
ললাটে বুলাস্ মৃদু কর,—
বসুধার আঁখি যেন তন্দ্রায় মুদিয়া আসে,
স্থির হ'য়ে আসে কলেবর!
স্নেহময় শান্তিময় দয়াময় চোকে যেন
ব্যথিতের মুখে তুই চাস্,
কমে যায় হৃদয়ের দারুণ পাষাণ-ভার
তোর কাছে ফেলি' দীর্ঘশ্বাস!
বিজনে বিরহী যবে বসিয়া ছায়াতে তোর
চায় তোর কোমল আকাশে,
মানসী মুর্ত্তি তার সাকার রূপেতে যেন
নয়নের কত কাছে আসে!
হৃদয়ের প্রিয় যারা ছেড়ে এই ধরাধাম
চলে' গেছে আর এক লোকে,
তোর তারাটির মাঝে সেই স্নেহ-মুখগুলি
ফুটে ফুটে ওঠে, হেরি চোকে!
তোর সাথে কলপনা আসি' যেন মায়াবলে
রুদ্ধ হৃদি-দ্বার খুলে দেয়,
বন্দী আত্মা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র কারা হতে যেন
অসীমের মাঝে মুক্তি পায়!
অস্ফুট হেমাভাব্যাপ্ত পশ্চিম আকাশে তোর,
স্বর্ণময় মেঘের প্রাঙ্গণে,
বসি সে দেখিতে পায় ধরাতলস্থিত তার
দূরবাসী অতিপ্রিয় জনে!
ছায়াময় পাখা মেলি নগ নদী অতিক্রমি'
কত স্থানে উড়ে চলে' যায়;
কত নব জগতের চারু চিত্রবৎ দৃশ্য
আঁখির সম্মুখে খুলে যায়।
প্রশান্ত হৃদয়ে তোর একটি দুইটি ক'রে
যেমন তারারা জ্বলে' ওঠে,
স্মৃতির কাননে মোর তোরে হেরি তেমনি লো
হারানো সুখের ফুল ফোটে!
বড় ভালবাসি আমি, অয়ি সন্ধ্যা, সঙ্গ তোর,
আসিস্ লো সখীর মতন,
তোর কাছে বসে' থাকি তোর মুখপানে রাখি
স্বপ্নময় বিমুগ্ধ নয়ন!

বিনয়কুমারী ধর।

পথ চাহি।

সারা নিশি গন্ধটুকু ব্যথিত হৃদয়ে ধরে,
কুসুম রয়েছে চেয়ে রজনী-প্রভাত তরে;
সারা দিন ম্লানমুখ ব্যথিত তারকাবালা,
জেগে আছে সাঁঝবেলা ছড়াতে সে স্নিগ্ধ আলা;
স্নেহ-অশ্রুকণারাশি ধরিয়া হৃদয়প'রে,
লতায় ঢালিতে বারি ছুটে মেঘ দেশান্তরে;
নিশিদিন স্রোতস্বতী বুকে নিয়ে উর্ম্মিরাশি
আত্মহারা চলিয়াছে সুদূর সাগরে ভাসি;
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ওই চাঁদ আছে চেয়ে,
নীল আকাশের বুক আলোকে ফেলিবে ছেয়ে;
মধুর সঙ্গীত-সুধা জড়ায়ে আপন গানে
বিহগ রয়েছে চাহি সাথীটির পথ পানে।
আমিও ব্যথিত হৃদি দিব বলি উপহার,
আছি তব পথ চাহি প্রাণে বেঁধে আশাভার।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হৃদয়ের আলো।

আঁধার যেতেছে সরি,
আলোক আসিছে ফিরে,
আবার আলোক ডুবি
আঁধার আসিছে ঘিরে;
আঁধারে আলোকে খেলা
এ ধরায় ঘুরে ফিরে;
হৃদয়ের আলো কেন
নিভে যায় চির তরে!

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

মুকুল। আষাঢ়। এখানি 'মুকুলের' জুবিলি-সংখ্যা। রঞ্জিত বর্ণে উত্তমরূপে মুদ্রিত এবং কুড়িখানি সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। অনেকগুলি ছবি খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছে। দেখিতেছি, 'সখা ও সাথী', 'দাসী' ও 'মুকুল', এই তিনখানি মাসিকপত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন আবিষ্কার জুবিলি-'ব্রত' পালন করিয়াছেন; এই তিনখানি পত্রের মধ্যে চিত্রগৌরবে "মুকুলই বিজয় লাভ করিয়াছে। মহারাণীর তিনখানি বড় ছবি ও প্রিন্স্ আলবার্টের প্রতিমূর্ত্তিখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবারকার আবরণপত্রখানিও অভিনব ও মনোরম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় এই চিত্রসৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের ধন্যবাদভাজন। চিত্র সম্বন্ধে এ দেশ এখনও অন্ধতমসে পড়িয়া আছে, সেই দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রয়াস সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। 'মুকুলের' আদ্যোপান্ত মহারাণীর বিবরণে পরিপূর্ণ—বালকগণ পড়িয়া সুখী হইবে। "জয় ভিক্টোরিয়া জয়!" ইতিশীর্ষক কবিতা আরম্ভভাগই কবিতা, তাহার পর সবটাই 'জুবিলি।' 'জুবিলি' কবিতার বিষয় নয়, অগত্যা লেখক 'পদ্য' রচিয়াই বিরত হইয়াছেন।

সখা ও সাথী। আষাঢ়। "মহারাণীর উত্তরাধিকারী" প্রবন্ধে, প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্, তদীয় পত্নী প্রভৃতির পাঁচখানি চিত্র আছে। বঙ্গে 'বাহুল্য' ভিন্ন কোনও কাজের উপসংহার দেখিতে পাওয়া যায় না। জুবিলি উপলক্ষে রাজভক্তির যে তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহাও সহসা নির্ব্বাণসুখ লাভ করিবে, আমরা অবশ্য এমন দুরাশা হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। জুবিলি, রাজা ও রাণী এবং রাজপরিবারের ছবি পুরাতনেরও পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, আর কেন? এখন কি 'ইতিশেষ' করিলে ভাল হয় না? "ভূমিকম্প" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুচিত্রিত। "দুই বন্ধুর" ছবিখানি সুন্দর—একটি বাঘ ও তাহার বন্ধু একটি কুকুর!

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের "গাছের বুদ্ধি" একটি সংক্ষিপ্ততম প্রবন্ধ, কিন্তু কৌতূহলের উদ্দীপক। লেখক উদ্ভিদ্-জগতের যে কয়টি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিবিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা "গাছের বুদ্ধির" অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি? "কোনও কোনও গাছের ফুল এবং শাখাগ্রভাগ সূর্য্যের অভিমুখে সতত থাকিতে ভালবাসে। তাহারা প্রাতঃকালে পূর্ব্বমুখে, অপরাহ্নে পশ্চিমমুখে থাকে। ইহার মধ্যে কি সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা নাই?" এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ইহাও বলা যায়, সৌন্দর্য্যপ্রিয় লেখকের কল্পনায় যাহা সৌন্দর্য্য-প্রিয়তারূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা হয় ত কোনও প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘনীয় শাসন-মাত্র। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "কলিকাতা" প্রবন্ধে প্রাচীন কলিকাতার বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

উৎসাহ। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ক্রমশঃপ্রকাশ্য অজ্ঞেয়বাদ ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "জগৎ শেঠ", এই দুইটি প্রবন্ধই উল্লেখযোগ্য। আজ কাল একটা কথা উঠিয়াছে, কবিতার পরমায়ু আর কত দিন? শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ "কবিতার যুগ" প্রবন্ধে সে বিষয়ের বিতর্ক করিয়াছেন।

দাসী। জুন। "জুবিলি উপলক্ষে সচিত্র।" এই সংখ্যার আদ্যোপান্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাহিনী ও কথায় পরিপূর্ণ। এবারকার দাসীতে অনেকগুলি চিত্র আছে। গোটা 'মুকুলের' অনেক 'ছবির' গহনাই এবার দাসীর অঙ্গে শোভিত দেখিতেছি। প্রবন্ধগুলি অনুবাদ বা সংগ্রহ; "ভিক্টোরিয়া যুগ" প্রবন্ধে চিন্তাশীলতা না হউক, অন্ততঃ মৌলিক মন্তব্য দেখিতে পাইবার আশা ছিল; কিন্তু হায়, মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না।

রাণী ভবানী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ;—বিবাহ।

বিল বাসবের বর্ষাসলিলপ্লাবিত নিম্নভূমি সমুন্নত করিয়া, মহারাজ রামজীবন তাহার উপর নবপ্রতিষ্ঠিত নাটোর রাজবাটীর বিচিত্র সৌধমালা রচনা করিয়াছিলেন। সম্মুখে দৃঢ়োন্নত সিংহদ্বার, চারি দিকে সমুন্নত পুর-প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে প্রশান্তসলিলা দুর্গ-পরিখায় সুশোভিত হইয়া, রামজীবনের রাজবাটী রাজসাহী প্রদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল। যে তিনটি দুর্গপরিখা চক্রাকারে রাজবাটী পরিবেষ্টন করিয়া শত্রুসেনার আক্রমণ প্রতিহত করিত, তাহা এখন স্থানে স্থানে জলশূন্য হইয়াছে ;—রামজীবনের গৌরবমণ্ডিত সিংহদ্বারের জরাজীর্ণ ভগ্নাবশেষমাত্র এখনও বর্ত্তমান আছে। পুরাতন রাজ-বাটীর অধিকাংশ রাজপ্রাসাদ কালক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ; যাহা কিছু অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, তাহাও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ধরাবিলুণ্ঠিত হইয়াছে। *

এই ঐতিহাসিক রাজবাটীতে বাস করিয়া মহারাজাধিরাজ রামজীবন সবিশেষ উৎসাহে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন ও কালিকা-প্রসাদের পরলোকগমনে তাঁহার উৎসাহ অনুরাগ অবসন্ন হইয়া পড়িল! আর সেকালের যৌবনোৎসাহ নাই ; আর বঙ্গবিহার উড়িষ্যার নবাব-দেওয়ান কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনন্দন নাই ; আর অতুল রাজসম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী কুলপ্রদীপ কালিকাপ্রসাদ নাই ;—এখন কেবল শোকতাপপূর্ণ বৃদ্ধদশা! বাহুবলে, সংগ্রাম-কৌশলে, প্রতিভাগুণে, যে বিস্তীর্ণ রাজসাহী রাজ্য গঠিত হইল, তাহা উপভোগ করিবে কে, তাহাই রামজীবনের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

---

* রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত 'দোলমঞ্চ' নাটোর রাজবাটীর সমধিক শোভাবর্দ্ধন করিত ; এখন তাহার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। দোলমঞ্চের ভিত্তিমূলে যে তাম্রফলক নিহিত ছিল, তাহা এখনও নাটোরাধিপতির রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাই পূর্ব্বগৌরবের যৎসামান্য নিদর্শন।

সকলেই দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার জন্ম পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আবার বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকেই রাজ্যদান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অবশেষে দত্তকপুত্র গ্রহণ করাই স্থির হইয়া গেল।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক গৌড়ের বাদশাহদিগের অধীনে কাশ্যপ-গোত্রীয়, ভাদুড়ী-বংশজাত, সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ নামে তিন ভাই উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান-রাজ-সরকারে ইঁহারা খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগদানন্দ খাঁর পাঁচু রায় ও ভুবন রায় নামে দুই বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচুর পুত্র রসিক রায় মহারাজ রামজীবনের সমসাময়িক ব্যক্তি। রসিক রায়ের দুইটি সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রসন্তান ছিল; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটিকে মহারাজ রামজীবন দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন। * এই দত্তকপুত্র নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে মহারাজ রামকান্ত নামে সুপরিচিত।

রসিক রায় পুত্রদান করিয়া রামজীবনের বংশরক্ষা করিলেন; রামজীবনও প্রত্যুপকারস্বরূপ তাঁহাকে দুইটি মূল্যবান ভূসম্পত্তি দান করিলেন। নবাব সরকারে মহারাজ রামজীবনের নামে ঘোড়াঘাট চাকলায় তপ্পে ভাতুড়িয়ার অন্তর্গত বার্ষিক ১১৬০৲ টাকা জমায় পরগণা চৌগ্রামের জমিদারী লিখা যাইত। † রসিক রায় উক্ত চৌগ্রাম ও ইসলামাবাদ নামক দুইটি পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। রসিকের পুত্র কৃষ্ণকান্ত চৌগ্রামে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বংশানুক্রমে "চৌগ্রামের রাজা" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই রাজসম্পদ এখন তাঁহার কুলভূষণ প্রপৌত্র সুপণ্ডিত রাজা রমণীকান্ত রায় বি. এ. উপভোগ করিতেছেন।

রামকান্তকে দত্তকগ্রহণ করায় রামজীবনের সামাজিক পদগৌরব অধিকতর উজ্জল হইয়া উঠিল। পাঁচু রায় এবং ভুবন রায় উভয়েই শ্রেষ্ঠ কুলীন; সুতরাং তাঁহাদের বংশের সন্তানকে দত্তকগ্রহণ করায় রামজীবনের পদগৌরব আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিল না।

রামজীবন দত্তকগ্রহণ করায় সকলেই সমধিক আনন্দলাভ করিলেন; কেবল বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ বিমর্ষ হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে দেবীপ্রসাদের আশালতা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল;

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

† Grant's Analysis of Finances of Bengal.

তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অপুত্রক রামজীবনের অতুল রাজসম্পদ অতঃপর তাঁহারই করতলগত হইবে। দেবীপ্রসাদের সৌভাগ্যলাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল; রামকান্তকে দত্তকগ্রহণ করায় তাহা আবার কণ্টকপূর্ণ হইল; সুতরাং দেবীপ্রসাদের হর্ষবিন্দু বিষাদসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া গেল।

রামজীবন, রঘুনন্দন এবং বিষ্ণুরাম, তিন সহোদর। তিন জনেই একত্রে এক বাটীতে পরমসুখে জীবন যাপন করিতেন। রঘুনন্দনের উত্তরাধিকারী ছিল না; রামজীবনের দত্তকপুত্র রামকান্ত এবং বিষ্ণুরামের ঔরসপুত্র দেবীপ্রসাদ ভিন্ন নাটোর রাজ-সম্পদের আর কোনও অধিকারী নাই! সুতরাং দেবীপ্রসাদ বুঝিলেন যে, রামকান্তকে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধ দত্তকপুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, তিনি কেবলমাত্র অর্দ্ধ রাজ্যের অধিকারী; আর যদি তাঁহাকে অসিদ্ধ দত্তকপুত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তবে একমাত্র দেবীপ্রসাদই সমগ্র রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিপতি। কিন্তু রামজীবনের জীবনকালে এ সকল কূটতর্ক উপস্থিত করিতে সাহস হইল না; দেবীপ্রসাদ নিতান্ত বিষণ্ণহৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দেবীপ্রসাদের মনের ভাব অধিক দিন গোপন রহিল না। রাজদরবারে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পরামর্শদাতার কখনও অভাব হয় না। মধুমত্ত মধুকর যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে মধুচক্রের আশে পাশে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, রাজদরবারেও সেইরূপ মক্ষিকারূপী হিতাকাঙ্ক্ষিগণ, আবশ্যক না থাকিলেও, গায়ে পড়িয়া সদুপদেশ দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাঁদের সুপরামর্শে কখনও কখনও সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করে, কিন্তু সেরূপ সৌভাগ্য প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না;—অধিকাংশ স্থলে দংশনযাতনাই সার হইয়া থাকে। রামজীবনের ভাগ্যেও তাহাই হইতে লাগিল। তিনি এই সকল পরম-হিতাকাঙ্ক্ষিগণের কথায় বার্ত্তায় আকারে ইঙ্গিতে অল্পদিনের মধ্যেই দেবীপ্রসাদের মনের লেব বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, এখন সময় থাকিতে কোনরূপ মীমাংসা না করিলে, কালে ইহা হইতেই তুমুল গৃহকলহের সূত্রপাত হইবে। সেই জন্য, রামজীবন দেবীপ্রসাদকে অনেক বুঝাইলেন, এবং তাঁহার রাজ্যপিপাসা শান্ত করিবার জন্য, তাঁহাকে রাজসাহী রাজ্যের ছয় আনা অংশ দান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।* ইহাতে দেবীপ্রসাদের হিতৈষিবর্গ আহ্লাদিত না হইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দেবীপ্রসাদ

* The Rajas of Rajshahi.

2-97

রামকান্তকে স্বীকার করিয়া লইলেও যখন অৰ্দ্ধরাজ্য লাভ করিতে সক্ষম, তখন তিনি ভিখারীর মত ছয় আনা অংশের দানগ্রহণ করিবেন কেন? রামজীবন বুঝিলেন যে, দেবীপ্রসাদ সহজে সম্মত হইবেন না, এবং এখন সম্মত হইলেও কালে গৃহকলহের সূত্রপাত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। সুতরাং তিনি আর পীড়াপীড়ি করিলেন না; সমুদায় রাজ্যই রামকান্তের থাকিয়া গেল।

রামজীবনের বিস্তৃত রাজ্যের তিন স্থানে তিনটি প্রধান রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। নাটোর, বড়নগর এবং সেরপুরে এই সকল রাজধানীর কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বড়নগরের রাজধানীই রাজসাহী রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী; তথায় চাক্‌লে মুরশিদাবাদ ও নিজ চাক্‌লা রাজসাহীর সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের উপর বড়নগরের পরিদর্শনভার ন্যস্ত ছিল; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে রায় রাইয়ান রঘুনন্দন সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বড়নগর, এবং পূর্ব্ববঙ্গে সেরপুর,—এই দুইটি প্রধান কর্ম্মস্থল। সেরপুর বড় পুরাতন স্থান। ইহা এখন বগুড়া জেলায় পরগণে মেহমানশাহীর অন্তর্গত। সম্রাট আক্‌বরের সময়ে শাহজাদা সেলিমের নামানুসারে সেরপুর কিছু দিবস "সেলিমনগর" নামে পরিচিত ছিল। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে সেরপুরে একটি বাদশাহী কেল্লা ছিল; আইন-আক্‌বরীতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৯ হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার শাসনভার পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে সেরপুরে একটি রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। গত শতাব্দীতে সেরপুর একটি গণ্য মান্য স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রাচীন মানচিত্রে * দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেরপুর পূর্ব্ববাঙ্গলার প্রান্তরাজ্যের প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই জন্য এখানে "বারদ্বারী কাছারি" নামে রাজসাহী রাজ্যের একটি প্রধান কাছারী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। † এই কাছারীতে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় হইত। রঘুনন্দনের অভাবে এই সকল প্রধান প্রধান কাছারীর পরিদর্শনকার্য্য শিথিল হইয়া উঠিতে লাগিল। নাটোর রাজবাটীতে বসিয়া একাকী বিস্তীর্ণ জনপদের শাসনভার

* Rennel's Map.

† Hunter's Statistical Accounts, Vol. VIII.

পরিচালন করা কত দূর কঠিন, তাহা ক্রমেই রামজীবন উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রামজীবনের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া, অনেকেই তাঁহার শাসনক্ষমতা চূর্ণ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দয়ারাম রায়ের শাসনকৌশলে আবার রামজীবনের প্রবল প্রতাপ চারি দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

দয়ারাম সাহসী, প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু রাজকর্ম্মচারী বলিয়া, রামজীবন তাঁহাকে বহুদিন হইতে সস্নেহে সমাদর করিয়া আসিতেছিলেন; এখন রঘুনন্দনের অভাবে সেই দয়ারাম রায় মহারাজ রামজীবনের দক্ষিণ-বাহু বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। নাটোর-রাজবংশের ইতিহাসে দয়ারামের স্মৃতি এখনও চিরজীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। কখনও অসিহস্তে, কখনও বা লেখনীধারণ করিয়া, কখনও ভূষণায়, কখনওবা রাজসাহী অঞ্চলে, যখন যেখানে যেরূপ কার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে, দয়ারাম অকুতোভয়ে, অপরাজিত উৎসাহে, অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে তাহাই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া রামজীবন সময়ে সময়ে তাঁহাকে যে সকল বহুমূল্য 'তালুক' প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখনকার দিনে একটি ছোট খাট রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দয়ারাম এই সকল রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া রাজসাহী রাজ্যে এবং নবাব দরবারে সবিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামজীবন তাঁহার সঙ্গে প্রভুভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না; রাজকুমার রামকান্ত তাঁহাকে দাদা ভিন্ন অন্য কোনরূপ সম্বোধন করিতে পারিতেন না; লোকেও দয়ারামকে সবিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

বিশ্বস্ত মন্ত্রী দয়ারামের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া মহারাজ রামজীবন শেষ জীবনে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। ক্রমে চরমকাল উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, দয়ারামকেই রাজকুমার রামকান্তের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন।

নানা স্থান হইতে রামকান্তের বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। দয়ারামই সে সকল বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। অবশেষে দয়ারামের উদ্যোগে, ছাতিনগ্রাম-নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ভবানী দেবীর সহিত রামকান্তের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। এই রাজকুললক্ষ্মী উত্তরকালে বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী নামে চিরপরিচিতা হইয়াছেন।

রাণী ভবানীর বিবাহে অনেক সমারোহ হইয়াছিল। অনেক দেশ বিদেশের রাজা মহারাজেরা নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। নাটোর রাজসংসারের তখন পূর্ণযৌবনের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা; সুতরাং "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" এই প্রবাদ সার্থক হইয়াছিল;—কিন্তু সে সকল কথার সঙ্গে আমাদের সংস্রব অল্প। এখনও তাহার কত কিম্বদন্তী রাজসাহী প্রদেশে প্রচলিত রহিয়াছে।

আত্মারাম একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। ছাতিনগ্রাম অঞ্চলে পদগৌরবে বা মানমর্য্যাদায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। ছাতিনগ্রামের প্রাচীন অধিবাসীরা বলেন যে, আত্মারামের আগ্রহাতিশয্যে ছাতিনগ্রামেই রাণী ভবানীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল; এবং তদুপলক্ষে বরকর্ত্তা মহারাজাধিরাজ রামজীবনকেও ছাতিনগ্রামে পদধূলি প্রদান করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এখনও একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সেই স্থানে বরকর্ত্তার বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বরকর্ত্তা অন্যের জমিদারীতে পদার্পণ করিতে অসম্মত হওয়ায়, আত্মারাম চৌধুরী সাহ্লাদে ছাতিনগ্রামের একাংশ বৈবাহিককে যৌতুকদান করিয়াছিলেন। এ সকল কাহিনীর সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, আত্মারামের ছাতিনগ্রাম কালক্রমে অন্য লোকের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ছাতিনগ্রামের একাংশ, এখনও নাটোর রাজবংশের অধিকারে রহিয়াছে।

এই বিবাহের পর, মহারাজ রামজীবন অধিকদিন জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু রামকান্তের বিবাহ এবং রামজীবনের মৃত্যুকাল লইয়া ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে বহুদিন হইতে বাদ প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

রামজীবনের স্বর্গারোহণের পরে, রাজকুমার রামকান্ত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দয়ারাম রায়ের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া, ১১৪১ সালে নবাবসরকার হইতে নিজ নামে জমিদারী সনন্দ লাভ করেন; * কেহ কেহ বলেন যে, তখন তিনি "অষ্টাদশ বৎসরের তরুণ যুবক।"† মহারাজ রামজীবন ১১৩৭ সালে পরলোক গমন করেন; কেহ কেহ বলেন যে, তখনই রামকান্ত "অষ্টাদশ বৎসরের তরুণ যুবক।" ‡ স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন যে, দয়ারামের হস্তে

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† নবনারী।

‡ দ্বাদশনারী।

রাজসাহী রাজ্যের ও রাজকুমার রামকান্তের রক্ষণভার সমর্পণ করিয়া, মহারাজ রামজীবন ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। * মিত্র মহাশয়ের অন্যান্য অনেক উক্তির ন্যায় এটিও অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোথায় কাহার নিকট হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে কথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ ১১৪৪ সাল; তাহার অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্ব্বে, ১১৪১ সালে রামকান্ত যে রাজ্যভার পাইয়াছিলেন, তাহা নবাবী আমলের ১১৪১ সালের "এহিতিমামবন্দীতে" প্রকাশিত রহিয়াছে। † সুতরাং সকল কথা একত্র বিচার করিলে, মহারাজ রামজীবন যে ১১৩৭ সালে (১৭৩০ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দিল্লীর বাদশাহের প্রবল প্রতাপ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; তথাপি লোকে বিপদে পড়িলে বাদশাহের দোহাই দিতে ত্রুটী করিত না। এইরূপে বাদশাহের দোহাই দিয়া সুজা খাঁ দিন কতকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি চিররুগ্ন হইয়া পড়ায়, তাঁহার নামে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাবী করিতেছিলেন। সরফরাজের সময়ে, হাজি আহম্মদ এবং আলিবর্দ্দীর প্রতিপত্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

এই সময়ে মুরশিদাবাদে একরূপ রাজবিপ্লব। পিতা সুজা খাঁকে প্রতিহত করিয়া পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; অবশেষে সুজা খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করায়, সরফরাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজধানীতে সুজা খাঁর এবং সরফরাজ খাঁর আত্মীয় অন্তরঙ্গগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের লোক সুজা খাঁর অনুরক্ত, কিন্তু নানা কারণে সরফরাজ খাঁর উপর বিরক্ত;—অথচ সুজা খাঁ শয্যাগত, আর অপ্রিয়দর্শন সরফরাজ খাঁ তাঁহার নামে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত! কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা অল্প লোকেই অনুমান করিতে পারিত। এরূপ অবস্থায় রাজসাহীর ন্যায় বিস্তৃত জনপদের শাসনভার লইয়া দয়ারাম যেরূপ সুকৌশলে প্রজাপালন করিতেছিলেন, তাহাতে নবাব-দরবারে রাজসাহীর গৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১১৩৭ হইতে ১১৪১ পর্য্যন্ত দয়ারাম যেরূপ

---

* In *1737*, Ramjiban died, leaving the temporary charge of the Raj in the hands of his friend and counsellor Dayaram Rai"—The Rajas of Rajshahi.

† Grant's Analysis of Finances of Bengal.

সুকৌশলে রাজারক্ষা করিতেছিলেন, তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও, দেবীপ্রসাদ কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিতে সাহস পাইলেন না।

দয়ারামের শাসনকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য মিত্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দয়ারাম যেরূপ ভাবে রাজসাহী রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য। ইহাতে দয়ারামের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ স্বভাবের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।" * রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, দিঘাপতিয়ায় রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১৪১ সাল (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ) হইতে রামকান্ত স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন কার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

এতদিন দেবীপ্রসাদ যে সুযোগের অপেক্ষায় নীরবে দিনযাপন করিতেছিলেন, দয়ারাম অবসর গ্রহণ করায় সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু নবাব-দরবারে চেষ্টা করিয়া ফল হইল না; সেখানে তখন পর্য্যন্তও রঘুনন্দনের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং রামকান্তের প্রতি সকলেরই সবিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে (১১৪৪ সালে) নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব রাজস্বপ্রদানে অক্ষম হইলে, নবাব সুজা খাঁর আদেশে তাঁহার জমিদারী রামকান্তের হস্তে সমর্পিত হইল। দেবীপ্রসাদ বুঝিলেন যে, নবাব সুজা খাঁর আমলে তাঁহার আশালতা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। রামকান্ত রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন; দেবীপ্রসাদ ঈর্ষ্যাকষায়িতলোচনে তাঁহার ছত্রদণ্ডের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

মহারাজ রামজীবনের সময়ে অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি জমিদারী রাজসাহীর রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে কত পরগণা রাজসাহীর, কত পরগণা অন্য লোকের, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। রামজীবন এবং রঘুনন্দনের বাহুবলে আবা শাসন-কৌশলে অনেক স্থান নবাবের অজ্ঞাতসারেও তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। রামকান্ত রাজ্যলাভ করিলে, রাজসাহী রাজ্যের সীমা ও পরগণাদি নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং বার্ষিক রাজকর ও বাজে জমার পরিমাণ পুনরায় স্থিরীকৃত হইল।

---

* "His management of the Raj during the inter-regnum was admirable; and evinced great sagacity and impartiality."—The Rajas of Rajshahi.

রামজীবনের সময়ে রাজসাহী প্রদেশে ৬৮ পরগণা, ভাতুড়িয়া প্রদেশে ৩০ পরগণা, ভূষণা অঞ্চলে ২৯ পরগণা, এবং বাজে মহালে ১২ পরগণা, রাজসাহীর রাজ্যভুক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। এতদনুসারে ১৩৯ পরগণার জন্য রামজীবন বার্ষিক ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর প্রদান করিতেন। রামকান্তের সময়ে রাজসাহী প্রদেশে ৭৮ পরগণা, ভাতুড়িয়া প্রদেশে ২৩ পরগণা, ভূষণা অঞ্চলে ২১ পরগণা, এবং বাজে মহালে ৪২ পরগণা, মোট ১৬৪ পরগণা ও ১৮৫৩৩২৫ টাকা বার্ষিক রাজকর নির্দ্দিষ্ট হইল। * পূর্ব্বাপেক্ষা ১১১৩৩৮ টাকা রাজকর বর্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু নূতন বন্দোবস্তে অনেক নূতন পরগণা রামকান্তের রাজ্যভুক্ত হইল। এই সকল পরগণার রাজকর বড় অধিক ছিল না; কিন্তু বিলক্ষণ লাভ ছিল। সুতরাং রামকান্তের সময়ে রাজসাহী রাজ্যের সমধিক উন্নতির অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

১১৪১ সাল হইতে ১১৪৭ সাল (অর্থাৎ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের ইতিহাস একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এইরূপ আলোচনা না করিয়া অনেকে অনেকরূপ অদ্ভুত জনশ্রুতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের ইতিহাস নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য;—এই সময়ে রাজসাহীর শাসনভার লইয়া "তরুণ যুবক" রামকান্ত রাজসাহীর মহারাজা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; এই সময়ে বিচক্ষণ বৃদ্ধমন্ত্রী দয়ারাম রায় দিঘাপতিয়ায় রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন বলিয়া নাটোর রাজদরবারে সর্ব্বদা গতিবিধি করিতেন না; এই সময়ে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে কখন সুজা, কখন সরফরাজ উপবেশন করিয়া, নানারূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত করিতেছিলেন।

এই ছয় বৎসর রামকান্ত 'তরুণযুবক' হইলেও কিরূপ সুকৌশলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। রাজসাহী রাজ্যের মত অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী সুবিস্তৃত জনপদের শাসন সংরক্ষণ করিয়া যথাকালে নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদান করাই সেকালে সবিশেষ যোগ্যতার পরিচয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। 'তরুণযুবক' রামকান্তের সমসাময়িক অনেক পুরাতন জমিদার বার্ষিক রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিয়া, এই ছয় বৎসরের মধ্যে অন্যের হস্তে জমিদারীর রক্ষণভার প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামকান্তের

---

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

ভাগ্যে সেরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত না হইয়া, ক্রমে ক্রমে এই ছয় বৎসরে তাঁহার হস্তে অনেক নূতন জমিদারীর শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছিল। যশোহরের ইতিহাস-লেখক * বলেন যে, ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসরের জন্য নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেবের জমিদারী রামকান্তের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। মিত্র মহাশয় বলেন যে, ১১৪৬ সালে রামকান্ত স্বরূপপুর ও পাতিলাদহের জমিদারী প্রাপ্ত হন। † এই ছয় বৎসরের মধ্যে রামকান্ত যে অনেক নূতন জমিদারীর শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুজা খাঁর আমলের 'এহিতিমামবন্দী'ই তাহার প্রমাণ। ‡

একালে টাকা থাকিলে নূতন জমিদারী ক্রয় করিতে পারা যায়; সুতরাং কাহাকেও জমিদারীর উপর জমিদারী ক্রয় করিতে দেখিলে তাহাতে কোনরূপ ব্যক্তিগত যোগ্যতা সূচিত হয় না। নবাবী আমলে এরূপ নিয়ম ছিল না। কেহ বৎসরের রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জমিদারী নিলাম হইত না; কিন্তু যাঁহারা শাসনকৌশল ও রাজস্বপ্রদানের জন্য নবাব-সরকারে সুখ্যাতি লাভ করিতেন, সেই সকল সুযোগ্য জমিদারের হস্তে ঐ সকল রাজস্বদানবিমুখ জমিদারীর শাসনভার ন্যস্ত হইত। সুতরাং সবিশেষ শাসনকৌশল না থাকিলে, কেহ নবাবী আমলে নূতন জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন না।

নবাব-দরবারে রামকান্তের শাসনকৌশলের পরিচয় না থাকিলে, অন্যের রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইত না। যথাকালে রাজকর প্রদান করা জমিদার-দিগের অবশ্যকর্ত্তব্য; তাহাই তাঁহাদের শাসনকৌশলের প্রধান পরিচয়। মুরশিদ কুলী খাঁ প্রতি বৎসরের বৈশাখ মাসে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, এবং তদুপলক্ষে নূতন বৎসরের রাজস্বসংগ্রহের জন্য জমিদারদিগকে লইয়া "পুণ্যাহ" করিবার এক অভিনব নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুণ্যাহদিনে সকল জমিদারকেই স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি পাঠাইয়া জগৎশেঠের বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া, পূর্ব্ব বৎসরের রাজকর পরিশোধ করিয়া দিতে হইত; কপর্দ্দক বাকী থাকিলে এবং সেই বাকী সঙ্গত কারণে "মাফ্" না পাইলে, কেহই নূতন বৎসরের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা পাইতেন না। জমিদারেরা

* J. Westland.

† The Rajas of Rajshahi.

‡ Grants' Analysis of Finances of Bengal.

নবাবসরকারের করসংগ্রহকারী বার্ষিক কর্ম্মচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং পৈতৃক পদগৌরব রক্ষা করিতে গিয়া, অনেকে জগৎশেঠের নিকট ঋণগ্রস্ত হইতেন। এই সকল নিয়ম প্রচলিত থাকায়, কাহারও পক্ষে দুই তিন বৎসরের রাজকর বাকী রাখা সম্ভব হইত না।

আমরা যে ছয় বৎসরের ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ছয় বৎসরে রামকান্ত যে শাসনকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া অন্যের জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই কথাগুলি বিস্মৃত হইলে মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীর পরবর্ত্তী দুঃখ-কাহিনী ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ সেই জন্য ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান না করিয়া, রামকান্তকে কল্পনাবলে নিতান্ত অসচ্চরিত্র, বিষয়-বুদ্ধিহীন, উচ্ছৃঙ্খল, "তরুণ যুবক" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন! মিত্র মহাশয় রামকান্তের ধর্ম্মনিষ্ঠার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াও তাঁহার বিষয়বুদ্ধিহীনতার উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিতে ত্রুটি করেন নাই। *

প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রী বলিয়া রাণী ভবানী বাঙ্গলার ইতিহাসে চির-স্মরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া রামকান্ত যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ও রাজ্যশাসনের জন্য স্বদেশে প্রশংসালাভ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মহারাজ রামকান্তের ইতিহাসের সমুচিত সমালোচনা না করিয়া, অনেকেই তাঁহাকে বিষয়বুদ্ধিহীন কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রামকান্ত জীবিত থাকিতে রাণী ভবানী রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার পুণ্য কার্য্যের প্রবাহ তখন হইতেই প্রবাহিত হইয়াছিল। সহসা এক অভিনব রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রামকান্ত ও রাণী ভবানীর সুখের সংসার দুঃখের হাহাকারে ডুবিয়া পড়িল।

নবাব সুজা খাঁর শাসনসময়ে আলিবর্দ্দী বিহারের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া পাটনার নবাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। হাজি আহমদ ও আলিবর্দ্দী বাঙ্গালী জমিদারদিগের নিকট সবিশেষ সুপরিচিত; সুজা খাঁর দক্ষিণবাহু

* When Ramkanta succeeded to the Raj, he was 18 years old. He was a pious man, and devoted his time to the performance of the Pujas and religious duties, but he had no capacity for business.—The Rajas of Rajshahi.

বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করিতেন। তাঁহাদের পদগৌরবে, তাঁহাদের ক্ষমতাবিস্তারে, তাঁহাদের লোকপ্রশংসায়, সরফরাজ খাঁ ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই জন্য সরফরাজের সঙ্গে আলিবর্দ্দীর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। সুজা খাঁ এই সকল গৃহকলহের আভাস পাইয়া, আলিবর্দ্দীকে পাটনার শাসনভার প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সরফরাজের চক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই সময়ে * লুণ্ঠনলোলুপ নাদির শাহ সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ করিয়া সদর্পে পুরপ্রবেশ করেন। উন্মত্ত নাদির-সৈন্যের উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে দিল্লীর ইতিহাসবিখ্যাত ইন্দ্রপুরী শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল। রাজধানীর পল্লীতে পল্লীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কত লোক শত্রুহস্তে নিহত হইল;—কত লোক আহত-শরীরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল;—যখন চারি দিক হইতে বায়ুবেগে প্রচণ্ড উল্কাপিণ্ড উদ্গীরণ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তখন কত অন্তঃপুরচারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী ও অসহায় বালকবালিকা অর্দ্ধদগ্ধ-কলেবরে একবিন্দু পিপাসার জলের জন্য করুণ ক্রন্দনে রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল,—কেহ তাহার সন্ধান লইবার অবসর পাইল না। সকলেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল! নাদির শাহ যথাশক্তি ভারতলুণ্ঠন-ব্রত সুসম্পন্ন করিয়া, ভারতরত্ন কোহিনূর কুক্ষিগত করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন;—কিন্তু মোগলের প্রবলপ্রতাপ আর দিল্লী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না!

এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যে সুজা খাঁ লোকান্তরিত হইলেন; সরফরাজ তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সরফরাজের পাপস্রোত খরবেগ ধারণ করিল;—হাজি আহম্মদ পদে পদে অবমানিত হইতে লাগিলেন; বিলাসবাসনার সঙ্গে সঙ্গে পাপলিপ্সা শতমুখী হইয়া ছুটিয়া চলিল; অবশেষে একদিন জগৎশেঠের পুত্রবধূকে বলপূর্ব্বক প্রাসাদে আনয়ন করিয়া সরফরাজ সম্ভ্রান্ত শেঠবংশের নিষ্কলঙ্ক কুলে কালিমা ঢালিয়া দিলেন। † জগৎশেঠ পাদাহত কালসর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; জমিদারদল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সরফরাজের সর্ব্বনাশসাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

---

* 8th March, 1739.

† ষ্টুয়ার্ট এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেঠবংশধরদিগের মধ্যে কেহই এই কলঙ্ক-কাহিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

সেকালে জগৎশেঠের ন্যায় আর কোনও ক্ষমতাশালী ধন-কুবের ছিলেন কি না সন্দেহ। বাদশাহ ফরোক্‌শায়ারের "ফারমান" অনুসারে নবাবের বাম পার্শ্বেই জগৎশেঠের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। লোকে বলিত, জগৎশেঠ মনে করিলে কেবলমাত্র স্বর্ণমুদ্রা ঢালিয়া দিয়া ভাগীরথীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। জগৎশেঠ জমিদারদিগের আশ্রয়বৃক্ষ ;—যথাসময়ে রাজকর প্রদান করিতে না পারিলে, অনেকেই তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতেন। তাঁহার উপর যখন এরূপ অত্যাচার হইয়া গেল, তখন আর অন্য লোকের নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা কি ? অগত্যা সকলেই সরফরাজ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া আর কাহাকেও সিংহাসনে বসাইবার জন্য দিল্লীতে দরবার করিতে লাগিলেন। নাদির শাহের নির্য্যাতনে দশ মাস পর্য্যন্ত কোনও ফল হইল না ; অবশেষে প্রার্থিত সনন্দ বাহির হইল। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ খাঁকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে, প্রজাসাধারণের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, নবাব আলিবর্দ্দী বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ভুল।

১

মানবজীবন নদীর স্রোতের মত ; ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ তাহার বক্ষ বিলোড়িত করে। তরঙ্গহীন নদীস্রোত নাই ; ঘটনাহীন মানবজীবন নাই। নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যেমন উঠে, আবার মিলাইয়া যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না, মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও তেমনই কোনও অলক্ষ্য অচিন্তনীয় কারণে আইসে যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না। নদীর এক একটা বৃহৎ তরঙ্গ যেমন তীরে আপনার চিহ্ন রাখিয়া যায়, মানবজীবনের এক একটা বৃহৎ ঘটনা তেমনই হৃদয়ে চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায় ; কালের করস্পর্শেও সে চিহ্ন মুছে না। সকলেরই জীবনে সেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে ; তবে কোনও ঘটনায় আমরাই কর্ত্তা, কোনও ঘটনায় আমরা কোন না কোনরূপে বিজড়িত। আমি আমার জীবনের একটা সেইরূপ ঘটনার কথা বলিব।

ভবেশ আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত ভাল-

বাসিতাম। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন—"বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।" বাল্যকালে যাহাদিগের সহিত এত ভালবাসা ছিল, আজ তাহারা কে কোথায়? সংসারের স্রোত নানা জনকে নানা দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; সে অতীত জীবন যেন স্বপ্নের মত হইয়া গিয়াছে। আজ এই সংসারে পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিত হইয়াও কিন্তু সে স্বপ্ন বড় মধুর বলিয়া মনে হয়।

সংসারে প্রবেশের পরও ভবেশের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার একটা বাতিক বিশেষ। তাহার পর একেবারে বর্ষাধিক কাল ভবেশের কোনও সংবাদ পাই নাই। ইহার মধ্যে একবার কোনও বিবাহবাটীতে আমার পত্নীর সহিত ভবেশের পত্নীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গৃহিণী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, ভবেশের পত্নী বড় কৃশ হইয়াছেন, আর গৃহিণী ভবেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। আমি সে কথায় বড় কান দিই নাই; রমণীর অশ্রু আমার নিকট নিতান্তই সহজ ও সুলভ বলিয়া বোধ হয়।

২

ইহার পর একদিন এক বন্ধুর কাছে শুনিলাম যে, ভবেশ আবার বিবাহ করিবে। কথাটা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার যে ভবেশ বিবাহ করিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। সেই দিন বন্ধুগৃহ হইতে গৃহে ফিরিবার পথে আমি ভবেশের গৃহে গমন করিলাম। ভবেশের দেখা পাইলাম না।

তাহার পর দিন ভবেশকে একখানা পত্র লিখিলাম।

চার দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল—সুদীর্ঘ পত্র। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভবেশ লিখিয়াছে,—সে কথা সত্য! সে লিখিয়াছে,—

"আমি যে যাতনা সহিয়াছি, তাহা আর কি বলিব? বিবাহের পরেই দেখিলাম, আমি আকাশে ঘর বাঁধিতেছিলাম। দেখিলাম, আমার কথা, আমার আশা, আমার পত্নীর নিকট দুর্ব্বোধ প্রহেলিকা, তাঁহার কথা আমার নিকট শিশুসুলভ। ছেলেখেলার জন্য কি বিবাহ করিয়াছিলাম! এ যে আমার খেলার সাথী; জীবনের মহদনুষ্ঠানে এ ত আমার সহায় সহচর নহে! তবে এ কি করিয়াছি? কেন এ ভুল করিলাম? তখনই দেখিলাম—

'সে কি জানে কি প্রেম-ভাণ্ডার পুরুষের বিশাল হৃদয়?
সে কি জানে নিজ অধিকার কি বিস্তৃত কি শকতিময়?

বুঝালে কি বুঝিবে আমার অতীত সমর-পরাজয় ?
এ আমার বিলাস-সাধন, আত্মার সঙ্গিনী এ ত নয় !'

"দেখিয়া ব্যথিত হইলাম। তবুও একবার তাঁহাকে 'আত্মার সঙ্গিনী' করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম, সব চেষ্টা বিফল হইল।

"আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম। যখন বিফলমনোরথ হইলাম, তখন বুঝিলাম, জীবনে যে সুখের আশা করিয়াছিলাম, তাহা পাইব না। এ মরুময় জীবন লইয়া জগতে কোনও কার্য্যই সাধন করিতে পারিব না। এ নিষ্ফল জীবন কেবল দুঃখ যন্ত্রণার ইতিহাস হইবে। যেমন ঔৎসুক্য হইতে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে প্রেম ভালবাসার ক্রমবিকাশ, তেমনই তাহার আবার ক্রমনিবৃত্তি আছে ; প্রেম হইতে উপেক্ষা, উপেক্ষা হইতে বিরক্তি, বিরক্তি হইতে ঘৃণা। ঘটনায় যেমন প্রেম বিকশিত হয়, তেমনই আবার ঘটনায় প্রেমের নিবৃত্তি হয়।

"আমার প্রেম ক্রমে ক্রমে উপেক্ষায় পরিণত হইল। আমি আমার পত্নীর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তিনি তাঁহার হাসি, গল্প, বসন, ভূষণ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন।

"তাঁহার প্রতি আমার আর কি কর্ত্তব্য ছিল ? তাঁহার ভরণপোষণের জন্য আমি দায়ী—সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করি না। আমার কার্য্য আমি করিয়াছি, করিতেছি, এবং করিব। তাহার পর আমার আর কি কর্ত্তব্য আছে ? তিনি আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করেন নাই, তিনি আমার নিকট আবার কি প্রত্যাশা করিতে পারেন ? আমি জীবনে যে কি যাতনা সহ্য করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যদি তিনি এতটুকু চেষ্টা করিতেন, যদি আপনার এতটুকু উন্নতি সাধিত করিতেন, যদি আমার মনোমত হইবার জন্য এতটুকু চেষ্টা করিতেন! আমি কি করিয়াছি, কি যাতনা সহিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।"

তাহার পর ভবেশ এমনই নানা কথা লিখিয়াছে। কথাগুলা বড়ই বেদনায় বাহির হইয়াছে। পড়িয়া ভবেশের জন্য দুঃখ হইল ; কিন্তু আমার মনে হইল, কোথায় একটা বড় ভুল হইয়াছে, তাই এত গণ্ডগোল। আর আমার মনে হইল, ভবেশ আপনার পায় আপনি কুঠার মারিয়াছে ; আর একজনের উপর, বিশেষ স্ত্রীর উপর, কি অত আশা স্থাপন করিতে আছে? ও বিষয়ে আমার মত স্বতন্ত্র ; আমি আমার বন্ধুবান্ধব, উপন্যাসপাঠ, পার্টি, চুরুটের পাইপ, হাওয়া

খাওয়া, এই সব লইয়া আছি; গৃহিণী তাঁহার ছেলে মেয়ে, গৃহকর্ম্ম, হাঁড়ি কুড়ি লইয়া ব্যস্ত আছেন;—একটু পশমের কারু কার্য্য, তাহাও এক ছেলের মা হইয়াই ছাড়িয়াছিলেন। আমার অসুখটা কিসের? তবে মধ্যে মধ্যে একটু ঝগড়া ঝাঁটি, মান অভিমান,—কোন স্বামী স্ত্রীর তাহা নাই? আমি ত বেশ সন্তুষ্ট আছি; গৃহিণীরও কোনও অসুখ দেখি না। ছেলে মেয়ের অসুখের সময় তাঁহার মুখখানি একটু মলিন হয়, নহিলে নহে।

পত্রের শেষে ভবেশ লিখিয়াছে ঃ—

"আজ কয় মাস হইল, একদিন একটা সামান্য কথা লইয়া তাঁহার সহিত একটু বাদানুবাদ হইয়াছিল; তাঁহার কথার ভাবে আমার বোধ হইয়াছিল, আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা নাই। সেই দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'তোমার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ না হইলে বোধ করি তুমিও ভাল থাক, আমিও ভাল থাকি।' তাহার কয় দিন পরে তিনি পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করি নাই, তিনিও আইসেন নাই। সত্যই আমার মনে হয়, প্রণয়হীন পরিণয় অপেক্ষা পরিণয়হীন প্রণয়ও ভাল।

"তিনি আমাকে ভালবাসেন নাই—ভালবাসেন না। আমার হৃদয়ের ভালবাসা এখন বিরক্তিতে, ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। আমিও মানুষ, আমারও হৃদয় আছে, আমিও প্রতিহিংসা লইতে পারি। আমার যথাসাধ্য আমি করিয়াছি; আমি আমার কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। আমি তাঁহাকে যত ভালবাসিয়াছি, কোন্ স্বামী স্ত্রীকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছে?—কোন স্বামী স্ত্রীকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারে? আমার দোষ কি?"

৩

ভবেশের পত্র পড়িয়া ভাবিলাম, এ পত্রের উত্তর দেওয়াই ভাল। আমি লিখিলাম,—

"তোমার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটা কোনও মতেই অভিপ্রেত নহে। তুমি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার বিবাহ করিতে চাহিতেছ, ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিও না। তোমার নৈতিক আপত্তির কথায় আমি তোমার সহিত একমত। আমাদিগের পিতামহদিগের সময় একাধিক বিবাহ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এখন আমরা প্রাচ্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রতীচ্য আদর্শ লইয়াছি—তাই এরূপ বিবাহে এখন আমাদিগের আপত্তি। কিন্তু আমাদিগের সমাজে প্রতীচ্য আদর্শ

ষোল আনা বজায় রাখা কি সম্ভব? য়ুরোপে যাহাতে ডাইভোর্স অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ আছে, এ দেশে সে অবস্থায় স্বামীর পক্ষে আবার বিবাহ করা কি দোষের? তবে কোনও বিশেষ কারণ ভিন্ন আমি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামীর আবার বিবাহের পক্ষপাতী নহি। আমি পুরুষ বা রমণী কাহারও একাধিক বার বিবাহেরই পক্ষপাতী নহি। তবে যেখানে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন না, স্বামীর যত্ন ও ভালবাসা চাহেন না, স্বামীর নিকট থাকিতে চাহেন না, সেখানে স্বামী যদি স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়া আবার বিবাহ করেন, তবে আমি তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। স্ত্রীর সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলিতাম; কিন্তু সমাজের শাসন অন্যরূপ, আইনের বিধান স্বতন্ত্র।

"তুমি লিখিয়াছ, প্রতিহিংসা লইবে। কাহার উপর? স্ত্রীর উপর? তুমি লিখিয়াছ, তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন না;—যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, সে স্ত্রী কি স্বামী আবার বিবাহ করিলে ব্যথিত হয়? কখনই নহে। তবে কি আপনার প্রতি প্রতিশোধ লইবে? স্ত্রীকে এত ভালবাসিয়াছিলে বলিয়া আপনার উপর রাগ করিয়াছ; তাই আপনার উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছ।

"আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি এখনও তোমার স্ত্রীকে ভালবাস। ভাল-বাসা যাইবার নহে। তিনি বহুদিন ধরিয়া তোমাকে সুখী করিয়াছেন; সত্য, তুমি তোমার আপনার প্রেমোচ্ছ্বাসে মগ্ন ছিলে, কিন্তু সে প্রেম ত তাঁহাকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল! কই, বিবাহের পূর্ব্বে ত সে প্রেমসুখ পাও নাই! আমার অনুরোধ, সেই প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া আরও একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বল। স্ত্রী যদি না বুঝিয়া কোন দোষ করেন, তবে স্বামী তাঁহার সংশোধনের চেষ্টা না করিলে আর কে করিবে?

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একটা কি ভুল হইয়াছে, তাই এত গণ্ডগোল। যাহা কর, অল্পক্ষণস্থায়িনী উত্তেজনাবশে একটা কায করিয়া সারা জীবন কষ্ট পাইও না। আর একবার ভাবিয়া দেখ—এক পত্নীতে যে অসুখ পাইয়াছ, অন্য পত্নীকে যে তাহাই পাইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে?"

৪

আমি ভবেশকে এই পত্র লিখিয়া, গৃহিণীকে ভবেশের স্ত্রীকে একখানা পত্র লিখিতে বলিলাম। গৃহিণী একেবারে অস্বীকার করিলেন—তাঁহার এ ছাই

হাতের লেখাও কি লোকের কাছে দেখাইতে আছে ? ছিঃ ! সে লোকের বাহির কেবল তাঁহার স্বামীটি। গৃহিণী সোজা কথায় স্পষ্ট বলিলেন, "আমি তাহা পারি না।" অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইলাম, ব্যাপার বড় গুরুতর, এ সময় তিনি একটু লজ্জা ত্যাগ করিলেই ভাল।

গৃহিণী চলিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে একখানা পত্র আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। পত্র দেখিতে আমার ইচ্ছা ছিল না ; এক জন মহিলা আর এক জন মহিলাকে পত্র লিখিতেছেন,—আমি তাহার কি দেখিব ? গৃহিণী ছাড়িলেন না।

দেখিলাম,—গৃহিণী ভবেশের পত্নীকে স্বামীকে পত্র লিখিতে বলিয়াছেন, স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে লিখিয়াছেন, স্বামীর কাছে যাইতে লিখিয়াছেন। স্বামীই স্ত্রীর পরম দেবতা, তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতে দোষ নাই। স্বামী যাহার উপর অসন্তুষ্ট, সে স্ত্রীর জীবনে সুখ কি ?—ইত্যাদি।

পত্রে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি ছিল, সেগুলি সংশোধন করিয়া আমি দুইখানা পত্রই ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

৫

প্রত্যাশিত দিবসে গৃহিণীর পত্রের উত্তর আসিল। ভবেশের পত্নী লিখিয়াছেন,—

"দিদি,—আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তুমি আমাকে পত্র লিখিয়াছ। আমি এতদিন যে যাতনা সহিয়াছি, তাহা আর কি বলিব ? আমার এ দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতেও পারি না।

"মার অসুখের কথা শুনিয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছিলাম, তাহার পর এত দিন একবার আমার সংবাদও লইলেন না ! আমি তাঁহার অনুপযুক্ত ; কিন্তু আমি ত তাঁহার স্ত্রী বটে ! আমারই কি ইচ্ছা নহে যে, আমি তাঁহার মনের মত হই। আমি কি চেষ্টা করি নাই ? তাঁহার মনের মত হইতে পারিলে লাভ কাহার ? সে ত আমারই ! আর যদি তাঁহার মনের মত হইতে না পারিলাম, যদি তাঁহার ভালবাসা না পাইলাম, তবে দিদি, এ ছাই নারীজন্মে কি ফল ! আমি এত চেষ্টা করিলাম, তঁহার মনের মত হইতে পারিলাম না। আমাকে কোন বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, আমি কিছু বুঝিতে না পারিলে, বা আগাগোড়া ভুল বুঝিলে, হতাশ হইয়া ম্লানমুখে তিনি যখন উঠিয়া যাইতেন, তখন দিদি, তাঁহার অপেক্ষা আমার কষ্ট কি কম হইত ! আমি আবার বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, তাঁহার সেই ম্লানমুখের কথা মনে পড়িত, আর পোড়া চক্ষে জল

ধরিত না। তিনি কি আমার ব্যথা বুঝিতে পারিতেন! আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে সে কথা বুঝাইব?

আমি কি বুঝিতাম না যে, এই হতভাগিনীর জন্যই তাঁহার কিছু ভাল লাগিত না, তিনি সারাদিন একলা কি ভাবিতেন, বন্ধুবান্ধবের কাছেও যাইতেন না? বুঝিতাম; কিন্তু কি করিব, আমি এত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মনের মত হইতে পারিলাম না! তিনি বলিতেন, আমার কথা তাঁহার নিকট শিশুসুলভ বলিয়া বোধ হইত, তাই ত আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতাম না। তিনি যদি আমার বুঝিবার মত করিয়া বুঝাইতেন, তবে হয় ত আমি বুঝিতে পারিতাম; নহিলে আমি বুঝিব কেমন করিয়া? আমি কেবল কাঁদিতাম।

"তাহার পর তিনি আর পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিতেন না। বলিলে, আমাকে আমার হাসি, গল্প, বসন, ভূষণ লইয়া থাকিতে বলিতেন। তাঁহার কথা বুঝিবার চেষ্টা আমি করি নাই! তাঁহার মনের মত হইবার ইচ্ছাও আমার নাই! বসন ভূষণেই কি আমার সুখ? আমার নিকট তাঁহার ভালবাসা অপেক্ষা কি বসন ভূষণই বড়? আমার বসন ভূষণে যত্ন হইলেই কি আমার সব হইল!

"স্বামীর তিরস্কার সহ্য হয়, তবুও স্বামীর ভালবাসাহীন যত্ন সহ্য হয় না; সে আরও যাতনার।

"স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে স্ত্রীর লজ্জা কি! তিনি আমার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু অভিমান করিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া আমি কয় দিন থাকিতে পারি? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছি। তাঁহার কাছে থাকিলে, তাঁহার দেখা পাইলেও যে যাতনার অনেক উপশম হয়।

"মনের কষ্টে তোমাকে অনেক কথা লিখিলাম। আশা করি, ছেলে মেয়েরা সবাই ভাল আছে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে বড় ইচ্ছা করে।

তোমার ভগিনী

শোভা।"

আমি দেখিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই সত্য; একটা বড় ভুল হইয়াছে। ভুলেই এত গোল। ভাবিলাম, এই ত রমণী; এই কোমলতা, এই মাধুরী, রমণী কি ইহা ত্যাগ করিতে পারেন? রমণী কি পুরুষের মত কঠোর হইতে পারেন? পারিলে এ সংসার মরুময় হইত, পারিলে এ সংসার মানবের বাসের অনুপযোগী হইত।

৬

ইহার দুই দিন পরে আমি ভবেশের এক পত্র পাইলাম। ভবেশ লিখিয়াছে,—

"ভাই,—তোমার পত্র পাইয়াছি। জগতে যদি আর কিছুও না পাইয়া থাকি, তবু যে তোমার মত বন্ধু পাইয়াছি, ইহা আমার অল্প সুখের কথা নহে। কিন্তু তোমাদের কিছুই করিতে পারিলাম না। তোমাদের বন্ধুত্বের উপযুক্ত হইতে পারিলাম না। উপযুক্ত হইবার সম্বল আমার ছিল। তবে আজ আমার এ দুর্দ্দশা কেন?

"জানি না, কোন জন্মের কাহার কোন অভিশাপ এ জীবনে পত্নীরূপে অনুসরণ করিতেছে; আমার জীবন মরুময় করিতেছে; আমার সকল আশা সকল কল্পনা নিষ্ফল করিতেছে। জীবনে অনেক কাজ করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুই হইল না—কিছুই হইবে না।

"আমি বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। তুমি সত্যই লিখিয়াছ, এক পত্নীতে যে অসুখ পাইয়াছি, অন্য পত্নীতে যে তাহাই পাইব না, এমন কথা কে বলিতে পারে? আমি এখন কিছু দিন দেশভ্রমণ করিব; লক্ষ্যহীন ভাবে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে যাইব। দেখিব, সেই অস্থিরতায় যদি হৃদয়ের এ যাতনা ভুলিতে পারি। কবে ফিরিব, বলিতে পারি না; ফিরিব কি না, বলিতে পারি না। যাইবার পূর্ব্বে একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি কখন বাড়ীতে থাক? হয় ত সেই শেষ সাক্ষাৎ হইবে। গৃহে যাহার কেবল যাতনা, তাহার কি আর গৃহে কোনও আকর্ষণ থাকে? তাহার কি আর গৃহে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে? আমি কোথায় যাইব, তাহার স্থির নাই।

"তোমার পত্র পাইবার পর এত দিন পরে সহসা আমার পত্নীর এক পত্র পাইয়াছি। জানি না কেন, তিনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিতে লিখিয়াছেন। হয় ত পিত্রালয়ে তাঁহার কোন অসুবিধা হইতেছে। যখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তখন তাঁহার ভরণপোষণের ভার আমার; কাজেই তিনি ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহার আগমনে বাধা দিতে চাহি না। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার আর দেখা না হওয়াই ভাল। যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নাই, ঘৃণা আছে, সে দম্পতীর পরস্পর সাক্ষাৎ যন্ত্রণামাত্র। সে যন্ত্রণা আমি ইচ্ছা করিয়া সহ্য করিব কেন? তিনি আসিবার পূর্ব্বেই আমি দেশ-ভ্রমণে চলিয়া যাইব। আমি যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইব, তাহাতে তাঁহার

কোনও অভাব হইবে না। আমার পত্নীকে এ কথা লিখিয়া দিলাম। তিনি যেদিন আসিতে চাহিবেন, সেই দিন তাঁহার আসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি চলিয়া যাইব।

"কখন তোমার বাড়ী থাকা নিশ্চিত, তাহা লিখিবে,—তোমার সহিত দেখা করিব। আশা করি, তুমি ভাল আছ। ইতি

"হতভাগ্য ভবেশ।"

পত্রখানি পড়িয়া আমি দেখিলাম—আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই বটে। ভবেশ নিতান্তই ক্ষণিক উত্তেজনায় বিবাহের সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাই আমার পত্র পড়িয়াই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে। যে ভাল করিয়া ভাবিয়া কিছু স্থির করে, সে কি সহজে আপনার মতের পরিবর্ত্তন করে ?

কিন্তু ভবেশ তাহার পত্নীকে যে পত্র লিখিয়াছে, তাহা আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কেন যে তিনি পিত্রালয় হইতে স্বামীর কাছে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি আমার পত্নীর পত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম। ভবেশ তাহা জানিত না; জানিলে তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইত। একবার ভাবিলাম, এখনই গিয়া ভবেশকে সব কথা বলি; তাহাকে দিয়া শোভাকে আর একখানা পত্র লেখাইয়া পাঠাইয়া দিয়া আসি। হায়, তখন যদি তাহাই করিতাম! কিন্তু তখন ত ভাবি নাই, এত দূর হইবে; আর সেদিন আমার বাড়ীতে কিছু কাজ ছিল।

আজ ভাবি, সে দিন সব কাজ ফেলিয়া কেন যাই নাই, কেন ভবেশকে দিয়া শোভাকে আর একখানা পত্র লিখাইয়া পাঠাইয়া দিয়া আসি নাই! সেদিন যে সুযোগ গিয়াছে, তেমন সুযোগ জীবনে আর আসিবে না; বুঝি সেরূপ সুযোগ জীবনে একবারমাত্র আইসে। একটা মানব-জীবন! আর এক জনের সর্ব্বনাশ! আমার নয় কিছু অসুবিধা হইত, কেন সব কাজ ফেলিয়া যাই নাই! সে জন্য আমি এতদিন অনুতাপ করিয়াছি; যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন অনুতাপ করিব। কিন্তু তখন ভাবি নাই, এত দূর হইবে।

৭

সে দিন যাইতে পারিলাম না। তাহার পর দিন অপরাহ্নে ভবেশের চাকর আমার নামে একখানি পত্র লইয়া আসিল। পত্রপাঠ করিয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভবেশ লিখিয়াছে,—

"ভাই, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার পত্র পাইয়া শোভা আত্মহত্যা করিয়াছে। তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহাই বটে। আমি ভুল বুঝিয়াছি..., ভুল করিয়াছিলাম। যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, সে স্ত্রী কি স্বামীর সামান্য উপেক্ষায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে? সহজে কি কেহ জীবন ত্যাগ করিতে চাহে? এ জীবন কে না ভালবাসে? তখন যদি একবার ভাবিয়া দেখিতাম, তখন যদি একবার তোমার কথা শুনিতাম!

"শোভা লিখিয়াছে—'তুমি আমাকে চরণে স্থান দিলে না; আমার অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাহিবারও অবসর দিলে না;—আর এ প্রাণ রাখিব কিসের জন্য? আমি অপরাধ করিয়াছিলাম; তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার শিক্ষক, তুমি আমার দেবতা, তুমি আমায় ক্ষমা করিলে না। যে স্ত্রী স্বামীর ভালবাসা পায় না, স্বামীকে কেবল যাতনা দেয়, তাহার মরণই মঙ্গল। তুমি কি মনে কর, আমার ব্যবহারে তুমি ব্যথিত হইলে তোমার ম্লান মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট হইত না? আমি কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব, আমি কি কষ্ট পাইয়াছি। দোষ আর কাহারও নহে,—দোষ আমার অদৃষ্টের, আর আমার। মরিবার সময় যদি একবার তোমাকে দেখিয়া মরিতে পারিতাম, যদি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মরিতে পাইতাম! হায়! এ পোড়া অদৃষ্টে তাহাও হইল না।'

"তাহার পর শোভা লিখিয়াছে 'তোমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মরিতে পারিলাম না, এই দুঃখ লইয়া মরিলাম। তোমার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা, আমার অপরাধ ক্ষমা করিও; আর আশীর্ব্বাদ করিও,—এ জন্মে যাহা হইল না, পরজন্মে যেন তাহা হয়, পর জন্মে যেন তোমার মনের মত হইয়া তোমার ভালবাসা পাই।'

"আমিই আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। আমি আত্মহত্যা করিব না; বাঁচিয়া—সুদীর্ঘ জীবনে হৃদয়ে নরকযন্ত্রণা সহ্য করাই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

"সমাজের পক্ষে আমি মৃত। আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। যদি পার, মধ্যে মধ্যে এই হতভাগ্যের কথা স্মরণ করিও। ইতি ভবেশ।"

কি দারুণ ভুল! পত্র পড়িয়া তাড়াতাড়ি ভবেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দ্বারে ভবেশের ভৃত্য জানাইল যে, ভবেশ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবে না,—আমার সহিতও নয়।

প্রেমলিপি।

১

বৈশাখী প্রভাতে যবে কুহরিত কুহুরবে
ভরিবে চম্পকবাসে বসন্তের বাসর-ভবন ;
লবঙ্গকলিকা ঘ্রাণে লালস-বিবশ প্রাণে
সহকার-কুঞ্জে পশি' শিহরিবে মৃদু সমীরণ ;
ভাবি কার চন্দ্রানন কাঁদিবে কবির মন,
অজ্ঞাতে নয়নজলে ভাসিবে নয়ন ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

২

আষাঢ়ে নিশীথকালে সজল জলদজালে
হয় যবে মুহু মুহু [illegible] দামিনী-স্ফুরণ ;
বিজন শয়ন 'পরে একা শুয়ে শূন্য ঘরে
মরমে উচ্ছ্বসি উঠে মরমের গভীর বেদন ;
তিমিরে মগন সব, অশ্রান্ত ঝিল্লীর রব,
চারি পাশে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি-বরিষণ ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

৩

আশ্বিনে আকাশ-গায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমায়
শরতের শুভ্রশশী শুভ্র হাসি বিকাশে যখন ;
সরসে কহ্লারবনে নব শোভানিকেতনে
তরল লহরী-সনে খেলা করে তরল কিরণ ;
সুদূরে স্বপন-প্রায় চকোর ডাকিয়া যায়,
কেঁপে উঠে প্রকৃতির প্রস্ফুট যৌবন ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

৪

হায়নে হেমন্ত-রাণী সোহাগে বুকেতে টানি'
রাশি রাশি ব্রীহিযব—গুচ্ছে গুচ্ছে অপূর্ব্ব শোভন—
যত দূর দৃষ্টি চলে দেখেন সুকুতুহলে
শস্যের লহরলীলা, পক্বশীর্ষে কষিত কাঞ্চন ;
হেরি সে মুরতি ধীর কৃষিবধূ মুছে নীর
সভয়ে অঞ্চলখানি করিয়া ধারণ ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

৫

পৌষে প্রথম যবে গোলাপ-কুমারী সবে
সরমে রাঙিয়া উঠে অরুণের লভিয়া চুম্বন ;
শুভ্র-হিয়া শুভ্র-বাস কুন্দ-মুখে ফুটে হাস,
ধরিত্রী কসিয়া লয় নিজ কাঁধে কুহেলি-বসন ;
সন্ধ্যা না হইতে সুখে বাঞ্ছিতেরে ল'য়ে বুকে
সাধ যায় সুপ্ত কক্ষে করিতে শয়ন ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

৬

ফাল্গুনে বসুধারাণী প্রথম যৌবন মানি'
প্রথম মুকুল দু'টি রাখে যে খা করিয়া গোপন ;
বিহ্বল সৌরভ তার ছায় ক্রমে চারি ধার,
বসে থাকে উদাসিনী আপ তে আপনি মগন ;
উন্মুক্ত অলকরাশ, শিথিল বুকের বাস
টানিয়া লইতে বুকে য় না স্মরণ ;—
হে সুন্দর! আ সিও তখন।

৭

এরূপে জীবনে যবে প্রমোদ-প্রফুল্ল রবে—
বীণার ঝঙ্কারে হ'বে প্রতিধ্বনি-ধ্বনিত ভুবন ;
প্রকৃতির স্নেহহাস পরিস্ফুট কলভাষ
জাগাইবে মর্ম্মমাঝে তৃপ্তিহীন অনন্ত স্বপন ;
সহস্র বাঁধনে বাঁধা সহস্র সাধনে সাধা
পিরীতের সরোবরে অমিয়-মন্থন ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

৮

অন্তিমে মৃত্তিকা 'পরে শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে
মরমের স্তরে স্তরে পরিতাপ বিঁধিবে যখন ;
কত দুঃখ কত ক্লেশ কিছুরি হ'বে না শেষ,
দহিবে সৌন্দর্য্য-তৃষা অন্তর্দাহী স্ফুলিঙ্গ মতন ;
বারেক বিমুগ্ধ প্রাণে চাহিয়া বিশ্বের পানে
ধীরে ধীরে যবে কবি মুদিবে নয়ন ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

শ্বেতপদ্মে ভ্রমর।

ঐতিহাসিক চিত্র।

১

আজকাল যে স্থান অধিকার করিয়া শুভ্রকায়, বিশালদর্শন, অপূর্ব্ব প্রেমের অদ্ভুত নিদর্শন, সৌমমূর্ত্তি তাজমহল আজও অতীতের সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান, জাহাঙ্গীর সাহের রাজত্বকালের প্রথমাংশে, এক দিন সেই স্থানের প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া এক ক্ষুদ্র জনতা উপস্থিত হইয়াছিল। আজকাল যেখানে তাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে, সেই স্থানে ক্ষুদ্র রাজপথ ও তাহার দুই ধারে খানিকটা মুক্ত ভূমি পড়িয়াছিল।

আকাশ প্রভাত হইতেই মেঘাচ্ছন্ন। এক প্রহর বেলা হইয়াছে, তবু কেহ সেদিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় নাই। অমন প্রাসাদসৌন্দর্য্যময়ী আগরা নগরী সে দিন যেন অত্যন্ত মলিন দেখাইতেছিল। রাজপথে অশ্বারোহী বা পদাতিক একজনও ছিল না। তাঞ্জামে চড়িয়া কোনও আমির ওমরাহও বাহির হয়েন নাই। বাদশাহের আজ্ঞা, সেদিন কোনও আমীর ওমরাহ সহরের রাস্তায় বাহির হইতে পারিবেন না। কেন যে এমন আদেশ প্রচারিত হইল, তাহা কেহ জানে না।

যাহারা নিকটে জনতা করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা বিশ পঁচিশ জনের অধিক হইবে না। তাহারা বাদশাহের লোক, সামান্য ভারবাহী কর্ম্মচারিমাত্র। সঙ্গে শিবিরসন্নিবেশের কতকগুলি উপকরণ। তাহারা অগ্রসর হইয়া ঐ স্থানে বিশ্রাম করিতেছিল।

সহসা সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মলিন ভাব অপসারিত করিয়া সূর্য্যদেব একবার নিজের মলিন মূর্ত্তি দেখাইয়া আবার অন্তর্হিত হইলেন। আবার দুই চারিখানি মেঘ কোথা হইতে সবেগে উড়িয়া আসিয়া আগ্রার রক্তপ্রস্তর-মণ্ডিত উন্নত দুর্গপ্রাচীরে ধূসর ছায়া প্রতিফলিত করিল। এমন সময়ে সহসা বেহারাদের অস্ফুট কোলাহল শ্রুত হইল।

সর্ব্বাগ্রে প্রায় পঞ্চাশ জন সেনানী, মধ্যে তিনখানি শিবিকা। ইহার মধ্যে একখানি আবার কারুকার্য্যময়ী মখমল-আচ্ছাদনীতে আবৃত। পশ্চাতে আরও

পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী। তার পরে প্রায় শতাধিক পদাতিক সারি সারি চলিয়াছে। সকলেই পথশ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন।

অশ্বারোহী সৈন্য আগ্রার রাজপ্রাসাদের কিছু দূরে দাঁড়াইল। সেনাপতি রস্তম খাঁ ভারবাহীদের বিদায় করিয়া দিলেন। পদাতিক ও সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্যকে চলিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। কেবল চারি জন পদস্থ মোগল সৈনিক তাঁহার আজ্ঞানুসারে শিবিকার পার্শ্ববর্ত্তী হইল।

বাহকেরা আবার শিবিকা স্কন্ধে উঠাইল। আবার তাহা মন্থরগতিতে সেই বিশালদর্শন দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিল। দ্বাররক্ষী সৈনিক অস্ত্র নোয়াইয়া রস্তমকে অভিবাদন করিল। রস্তম প্রথম দ্বার অতিক্রম করিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত হইলে, সেই রক্তমখমলমণ্ডিত শিবিকার মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে কে ডাকিল, "রস্তম আলি!"

মুহূর্ত্তমধ্যে রস্তম শিবিকার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। সসম্মানে বলিল, "কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

শিবিকামধ্যবর্ত্তিনী উত্তর করিলেন, "কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

"আগরার রাজপ্রাসাদে।"

"অনাথিনীর রাজপ্রাসাদ কেন?"

"কি করিব?—বাদশাহের হুকুম।"

"তোমাদের বাদশাহ কি অনাথার উপর এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন?"

"তা আমি জানি না। আপনি নিজে বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।"

"আমি বাঙ্গলা দেশ হইতে এত দূর বিনা বাক্যব্যয়ে আসিয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি যদি না যাই?"

"জীবন দিয়া বাদশাহের আদেশ প্রতিপালন করিব।"

"আমি যদি না যাই, তবে তুমি কি করিবে?"

"আমার সাধ্য কি, আমি আপনার নিকটস্থ হই। আমি দাসানুদাস। আপনি না গেলে আমায় অন্তঃপুরে খবর দিতে হইবে। তাতারী প্রহরিণী বাদশাহের আদেশ পালন করিবে।"

"এক জন সামান্য স্ত্রীলোককে আয়ত্ত করিবার জন্য এত সঙ্গীন ও বর্ষার প্রয়োজন কি? রস্তম, এখন আর আমার সে দিন নাই। এখন আর আমি

বর্দ্ধমানের সুবাদারের পত্নী নহি। আমি এখন বাঁদীর অধম। বাদশাহ এক জন সুন্দরী বাঁদী চান, তাই অত রুধিরপাত করিয়া আমায় আয়ত্ত করিয়াছেন।"

রস্তম করজোড়ে বলিল, "আমরা সামান্য সেনাপতিমাত্র। হুকুম তামিল না করিলে আমাদের মাথা যাইবে।"

মেহেরউন্নিসা বলিলেন, "রস্তম! তুমি ইচ্ছা করিলে আমায় ছাড়িয়া দিতে পারিতে। এই দুই শত সেনা তোমারই আজ্ঞাধীন। বাদশাহ তোমায় যে বেতন দেন, তার বিশ গুণ অর্থ আমি তোমায় দিতাম। আজ তোমার জন্যই আমি পিঞ্জরবাসিনী হইলাম। তোমার এই অত্যাচার আমি কখনও ভুলিব না।"

রস্তম ধীরে ধীরে অথচ সদর্পে বলিল, "আমরা মোগল বাদশাহের দাস।"

আর কেহ কোনও কথা কহিল না। রস্তম সেনাদিগকে বাহিরে থাকিতে আদেশ করিলেন। হুকুম হইল, "চালাও—মতিমহল।" বাহকেরা মতিমহলের দ্বারে আসিল। শিবিকার আচ্ছাদনী উন্মুক্ত হইল। কতিপয় তাতারী প্রহরিণী উন্মুক্ত শিবিকা দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। এমন সময়ে এক জন প্রবীণা বেগম অন্তঃপুর হইতে তথায় আসিয়া শিবিকারোহিণীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মেহের! আসিয়াছিস্, আয়, ভিতরে আয়।"

মেহেরের চক্ষে জলধারা বহিল; সেই মলিন, ক্লিষ্ট, বিষণ্ন, বৈধব্যযন্ত্রণাদগ্ধ গণ্ড বহিয়া শতধারা বহিতে লাগিল। প্রবীণা রমণী মেহেরউন্নিসাকে লইয়া মতিমহলের মর্ম্মরপ্রস্তরময় শীতল কক্ষের অভ্যন্তরভাগে লইয়া গেলেন।

এ সকল ঘটনা, এইখানেই একরূপ মিটিল। সেই দেবতার অগম্য মোগল বাদসাহদের অন্তঃপুরের কথা অন্তঃপুরিকারাও অনেক সময় জানিতে পারিতেন না। মেহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কেহ দেখিল না। দেখিলেন কেবল সেই চারি যুগের সাক্ষী সর্ব্বশক্তিমান, সেই রমণীসৈনিক-চতুষ্টয়, এবং আর এক জন। দেওয়ানখাসের একটি ছাদের আলিসার পাশে, অতি দূরে সুন্দরশ্মশ্রুপূর্ণ উষ্ণীষমণ্ডিত একখানি মুখ দৃষ্ট হইতেছিল; মেহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র সে মুখখানি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

২

কিরূপ নৃশংস ও নীতিবিগর্হিত উপায়ে, অজস্র শোণিতপাত করিয়া, জাহাঙ্গীর সাহ সের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসাকে লাভ করিয়াছিলেন,

এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। মেহেরউন্নিসা আগ্রায় আসিয়া মোগল বাদশাহের পুরীমধ্যবর্ত্তিনী হইবার পর, জাহাঙ্গীর একবারও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

জগতের নিয়মই এই, আকাঙ্ক্ষা যত দিন অতৃপ্ত থাকে, লালসা যত দিন চরিতার্থ না হয়, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর গৌরবও ততদিন! আজ যাহার ধ্যানে জীবন মন তন্ময়, কাল তাহাকে পাইলে হয় ত আর চাহিব না! যে মেহের-উন্নিসার জন্য জাহাঙ্গীর সেই বীরপ্রবর, নির্দ্দোষ, সের আফগানের শোণিত-পাত করিলেন, যাহার জন্য বাঙ্গলার সুবাদার কুতবউদ্দিন অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন, সেই মেহেরকে পাইয়া জাহাঙ্গীর কেন যে সাক্ষাৎও করিলেন না, তাহার কারণ কে নির্দ্দেশ করিবে?

আকবর সাহের এক বিধবা রাজ্ঞী, মেহেরউন্নিসাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। মোগলের অন্তঃপুর-কারায় তাঁহার স্নেহই মেহেরের একমাত্র শান্তি। রাজ্যের সামান্য এক জন কর্ম্মচারীর আহারাদির যেরূপ বন্দোবস্ত হয়, মেহেরউন্নিসার জন্যও জাহাঙ্গীর সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন!

দিন কাহারও প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে না। সকলেরই দিন যায়। যে সুখের প্রমোদহিল্লোলে জীবনতরী ভাসাইয়াছে, তাহারও দিন যায়; এবং যে চিরকাল নিরাশা, দুঃখ সহিয়া জীবনে মরিয়া আছে, তাহারও দিন যায়। মেহেরউন্নিসার দিন কেন তবে বসিয়া থাকিবে?

সরকারী বন্দোবস্তে মেহেরউন্নিসার আর চলে না। মেহের শিল্পকার্য্য আরম্ভ করিলেন। মখমলের উপর রেশমী বসনের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য, শিল্পকৌশল প্রকাশ করিয়া মেহেরউন্নিসা তাহা বাজারে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। বড় বড় আমীর ওমরাহেরা ক্রমে সেই সুন্দর শিল্পের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। বাজারে চড়া দামে তাহা বিকাইতে লাগিল।

মেহেরউন্নিসা এখন দশ বার জন পরিচারিণী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের সকলেই শিল্পকার্য্যে সুনিপুণ। জরীর কাজগুলি বাহিরে খুব চড়া দামে বিক্রীত হইতে লাগিল। মেহেরউন্নিসার নামের জন্য নহে, শিল্পের গুণে। মেহের যে ভারতে "নূরজাঁহা বেগম" হইবেন, তখন সে কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ক্রমে ক্রমে এই শিল্পকার্য্য দ্বারা মেহেরউন্নিসা ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিলেন। এখন তাঁহার পরিচারিকার সংখ্যা অনেক। মেহেরউন্নিসা সকলকে

কারুকার্য্যময় পেশোয়াজ ও আঙ্গরাখা করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের আহার, পরিচ্ছদ ও সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি তাঁহার সতত দৃষ্টি। তাহাদিগের পরিচ্ছদাদি দেখিলে, মেহেরকে তাহাদের পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইত।

বিস্তৃত গালিচার উপর সমস্ত সঙ্গিনীগণে পরিবৃতা হইয়া মেহেরউন্নিসা দিবসের অধিকাংশ সময় শিল্পকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। মধ্যে মধ্যে সেতার, এস্‌রার, বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গীতে তিনি চিত্তবিনোদন করিতেন।

এইরূপে মেহেরউন্নিসার দিন কাটিতে লাগিল। একদিন ঘটনাক্রমে বাদশাহ মেহেরউন্নিসার এই কাহিনী শ্রবণ করিলেন। সহসা বাদসাহ একদিন মেহেরউন্নিসার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, তারকামণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী রোহিণীর ন্যায় মেহেরউন্নিসা সঙ্গিণীগণ-পরিবৃতা হইয়া একমনে কাজ করিতেছেন। বাদশাহকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিণীরা যখন সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইল, তখন মেহেরের চৈতন্য হইল। মেহেরউন্নিসা সহসা নিজ কক্ষে দিল্লীশ্বরকে উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইলেন—বলিলেন,

"জাঁহাপনা! আজি সহসা এ অনুগ্রহ কেন?"—আর বলা হইল না, চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। সেই আরক্তিম, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুকুমার গণ্ডস্থলে প্রস্রবণধারার সৃষ্টি হইল।

বাদশাহ ধীরে ধীরে মেহেরের হাত ধরিলেন। তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বাদশাহ সাদরে মেহেরের কমলমুখে চুম্বন করিলেন। মেহেরউন্নিসা বাদশাহকে উপযুক্ত আসনে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

বাদশাহ ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "ইহারা তোমার বাঁদী; তোমার বেশভূষা দেখিলে বাঁদীদেরই কর্ত্রী বলিয়া ভ্রম হয়। তোমার এরূপ হীনবেশে থাকিবার কারণ কি?"

মেহেরউন্নিসা বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "দিল্লীশ্বর! আমি আমার বাঁদীদের যেমন সুখে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহারা সেইরূপই আছে। আমি আপনার বাঁদী, আপনি আমায় যেমন রাখিয়াছেন, আমিও তেমনিই আছি। ইহা আর বিচিত্র কি?"

জাহাঙ্গীর শাহ হৃদয়হীন ছিলেন না। তিনি মেহেরউন্নিসার সহিত যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। বাদশাহ প্রেমপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! এই

দিল্লীর সিংহাসন আজ হইতে তোমার হইল। শীঘ্র তোমাকে সাধারণসমক্ষে রাজ্যেশ্বরীরূপে গ্রহণ করিয়া আমি অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।”

বাদশাহ ধীরে ধীরে মেহেরকে শয্যাতল হইতে তুলিয়া নিজের পার্শ্বদেশে বসাইলেন। সে শোভা অতুলনীয়—অবর্ণনীয়। এক জন সঙ্গিনী বলিয়া উঠিল,—“ঠিক যেন শ্বেতপদ্মে ভ্রমর বসিয়াছে।”

অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাদশাহ তাহা শুনিতে পাইলেন। কথাটা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন, মেহেরউন্নিসা:কে বাহু-পাশে নিপীড়িত করিয়া বলিলেন, “বাঁদী ঠিকই বলিয়াছে—বাস্তবিকই শ্বেতপদ্মে একটা বিকৃতাকার ভ্রমর বসিয়াছে।”

রহস্যের অভিনয় এইখানেই সমাপ্ত হইল। সপ্তাহমধ্যে মহাসমারোহে মেহেরউন্নিসা “নূরজাঁহা” উপাধি লইয়া বাদশাহের পার্শ্বে বসিয়া দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ডিকেন্স।

ধর্ম্মজগতে যেমন মধ্যে মধ্যে এক এক জন মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সাহিত্য-জগতেও তেমনই মধ্যে মধ্যে এক এক জন প্রতিভাশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহারা এক এক জন অবতার,—তাঁহারা প্রতিভার অবতার, শক্তির অবতার, উন্নতির অবতার। তাঁহাদিগের কর্ম্মফলে জগতের সুখ বর্দ্ধিত হয়; চিরদুঃখকাতর মানবহৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্স সেইরূপ এক জন অবতার।

সম্প্রতি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী পত্রে মিষ্টার হার্বার্ট পল ডিকেন্সের যে সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

বর্ষাপগমে রৌদ্রকরোজ্জ্বল শরৎপ্রভাতের মত ডিকেন্সের রচনাসমূহ যখন সহসা সাহিত্য-গগনে দেখা দিয়াছিল, তখন তাঁহার আদর অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। সে যশের, সে আদরের স্রোতে এখন ভাঁটা পড়িয়াছে। যে সকল সামাজিক প্রথার উপর তিনি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সে সকল এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে; এখন লোকের ব্যবহারেও প্রচুর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কেবল এই সকল চিত্রিত করিতেই ডিকেন্সের অসাধারণ প্রতিভা ব্যয়িত হয় নাই। ডিকেন্সের

রচনা ও যশ।

সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে কেবল লিটন ও ডিস্‌রেলির উপন্যাস এখনও লোকে পাঠ করে। আবার ডিকেন্সের সহিত তুলনায় তাঁহারা ভাস্করের নিকট ক্ষীণজ্যোতিঃ খদ্যোত। ডিকেন্সের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার রচনাপ্রণালী তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি,—কাহারও অনুকরণ নহে। তাঁহাকে লণ্ডনবাসীর সেক্সপীয়ার বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। সেক্সপীয়রে তিনি আগ্রীব নিমগ্ন ছিলেন; তাঁহার প্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন—এস্ মলেট্।

যখন মনে করা যায় যে, 'পিকুইক' এবং 'অলিভার টুইষ্ট' একই সময়ে প্রকাশিত হয়, আবার 'অলিভার টুইষ্ট' শেষ হইতে হইতেই 'নিকোলাস্ নিক্‌ল্‌বির' প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে এরূপ তিনখানি পুস্তক রচনা করা, ইংরাজ লেখকদিগের মধ্যেও স্কট ও ডিকেন্স ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

ঐতিহাসিক-উপন্যাসের লেখক হিসাবেও ডিকেন্সের স্থান বড় নিম্নে নহে। এমন অনেক পাঠকও আছেন, যাঁহারা ডিকেন্সের গ্রন্থাবলীর মধ্যে Tale of Two Citiesকেই সর্ব্বোচ্চ

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

স্থান প্রদান করেন; থ্যাকারের Esmond সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। ডিকেন্সের Tale of Two Cities কার্লাইলের ফরাসী বিদ্রোহের বিবরণের উপর সংস্থাপিত; ইহাতে হাস্যরসের তেমন প্রাচুর্য্য নাই; কিন্তু এই পুস্তকখানি অনিন্দ্যসুন্দর। অথচ ইহার আখ্যানবস্তু (Plot) নিতান্ত সরল, সহজ। প্রকৃতপক্ষে ডিকেন্সের ইতিহাস-জ্ঞান তেমন গভীর ছিল না। লোকে তাঁহার ডেভিড্ কপারফিল্ডের ইতিহাসেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর করে,—কপারফিল্ড তিনি স্বয়ং। তিনিও গ্রন্থ সকলের মধ্যে এইখানিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। লোকে যে বলে, লেখক স্বয়ং আপনার রচনার প্রকৃত বিচারক নহেন, এখানে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। ডিকেন্সের রচনা বুঝিতে হইলে একটা কথা বুঝিতে হয়;—ডিকেন্স এক জন আসল অভিনেতা। অভিনয় করিতে বা অভিনয় দেখিতে ডিকেন্স বড়ই ভালবাসিতেন। ডিকেন্সের নিকট এ জগৎ রঙ্গমঞ্চ, আর নরনারীরা তাহার অভিনেতা।

ডিকেন্সের উপন্যাসসমূহের করুণরস সম্বন্ধে পাঠক ও সমালোচকদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য থাকিবেই। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে, এমন কি একই পুস্তকে, এই করুণরসের বিভিন্নতা

করুণরস।

দৃষ্ট হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, কোনও বৃদ্ধা রজকিনী বলিয়াছিল, যে, Dombey and Son যে এক জন লেখকের রচনা, ইহা তাহার বিশ্বাস হয় না। হয় ত এ কথা বলিবার সময়, ডিকেন্সের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রভূত প্রশংসাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ডিকেন্স বড় সাদাসিধা সোজা রকমের লোক ছিলেন। যখন তিনি পাঠককে হাসাইতে চাহিতেন, তখন তিনি রচনায় যথাসম্ভব হাস্যরসের প্রয়োগ করিতেন; আবার যখন তিনি পাঠককে কাঁদাইতে চাহিতেন, তখন তিনি হাস্যরস ছাড়িয়া কেবল করুণরসের ব্যবহার করিতেন। তিনি হাস্যরস ও করুণরস স্বতন্ত্র রাখিতেন, কখনও মিশাইয়া ফেলিতেন না; তাই তাঁহার হাস্য কেবলই হাস্য, তাঁহার বেদনা কেবলই বেদনা।

কেহ কেহ বলেন যে, ডিকেন্স সমাজের নিম্নস্তর যেমন বুঝিতেন, যেমন জানিতেন, উচ্চ স্তর তেমন বুঝিতেন না, তেমন জানিতেন না। এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ডিকেন্সের মত সূক্ষ্মদর্শী লেখক বিরল; তিনি যেখানে গোলাপ দেখিয়াছেন, সেখানে তাহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র কণ্টকটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি যে সমাজের এক অংশমাত্র জানিয়া নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। এ কথার প্রমাণস্বরূপ

Great Expectations গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই প্রমাণিত হইবে যে, ডিকেন্স প্রকৃত "ভদ্রলোকের" চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন।

ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্সের স্থান বড় উচ্চ। জীবিতকালে ডিকেন্স সর্ব্বশ্রেণীর প্রিয় লেখক ছিলেন। সকলেই তাঁহার পুস্তক পাঠ করিত। তাঁহার রচনা পাঠ করিতে ও বুঝিতে

সাহিত্যে ডিকেন্সের স্থান।

বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক হয় না, অথচ সাধারণ শ্রমজীবী হইতে প্রগাঢ় পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই তাহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারেন। তাঁহার মত সাফল্যলাভ বুঝি আর কোনও লেখকের অদৃষ্টে হয় নাই। ডিকেন্সের গতানুগতিকগণ তাঁহার যত অনিষ্ট করিয়াছেন, তত আর কেহ করেন নাই। তাঁহাদিগের না ছিল ডিকেন্সের প্রতিভা, না ছিল ডিকেন্সের রচনাকৌশল, অথচ ডিকেন্সের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা ছিল ষোল আনা; ফল হইত এই যে, তাঁহারা প্রায়ই শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া বসিতেন। তাই মনে হয়, Imitation may be the sincerest form of flattery. It is the most dangerous form of admiration. তাঁহারা বুঝেন না যে, ডিকেন্স শুভ্রতুষারমুকুটমণ্ডিত অম্বরচুম্বিত গিরিশিখরের মত অনধিগম্য। সুখের বিষয় এই যে, এখন এই সকল গতানুগতিকের আর বড় আবির্ভাব হইতেছে না।

ইংরাজী সাহিত্য হইতে ডিকেন্সের প্রভাব বিদূরিত হইবার নহে। ডিকেন্সের মত মনীষী মহাপুরুষের প্রভাব সাহিত্য হইতে বিদূরিত হইতে পারে না। ডিকেন্সের মত থ্যাকারেরও যথেষ্ট অনুকরণ হইয়াছে; তিনিও তেমনই উচ্চ শিখরে সমাসীন। ডিকেন্স তাঁহার সময়ের Typical humourist, আর থ্যাকারে তাঁহার সময়ের Typical satirist.

যত দিন ইংরাজী ভাষা থাকিবে, তত দিন সমালোচকগণ ডিকেন্সকে প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক ও পরিহাস-রসিকচূড়ামণি বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

সমাজতত্ত্ব।

হিন্দু রমণী।

সম্প্রতি হিন্দুমহিলা সম্বন্ধে দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় প্রবন্ধের লেখিকাই ইংরাজ রমণী; প্রথম প্রবন্ধের লেখিকা ভারতবিখ্যাত শ্রীমতী বেসাণ্ট; দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখিকা পঞ্জাবের বালিকাবিদ্যালয়পরিদর্শক, ঔপন্যাসিক শ্রীমতী ফ্লোরা অ্যানি ষ্টিল। হিন্দু সমাজের এখন পরিবর্ত্তনযুগ। আমরা যে প্রাচীন আদর্শ হারাইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখনও কোন নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে পারি নাই। অতীতের অন্ধকারে যেখানে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানেও প্রাচীন হিন্দুর সভ্যতার সকল লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর দুর্ভাগ্য যে, হিন্দু কালের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সমাজে পরিবর্ত্তন আনে নাই; তাই আজ প্রতীচ্য সভ্যতার তীব্র সুরার আস্বাদন পাইয়া হিন্দু আর প্রাচ্যসভ্যতার স্নিগ্ধসলিলের প্রতি তেমন আকৃষ্ট নহে। আমাদিগের এই গঠনযুগে চিন্তাশীলা বিদেশীয়া মহিলাদিগের মন্তব্য বিচার করিয়া দেখিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। আমরা প্রথমে শ্রীমতী বেসান্টের মন্তব্য প্রদান করিলাম।

বিবাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের মনে এই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, হিন্দুরা বহুবিবাহরত। এ ধারণার মূলে সত্য নাই; লেখিকার বহু ভারতবাসী বন্ধুর মধ্যে কেহই বহুবিবাহে রত নহেন। পরন্তু সাধারণতঃ সকল হিন্দুই একদাররত। ভারতবর্ষে দুই চারি জন দেশীয় রাজার একাধিক পত্নীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এই পর্য্যন্ত। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ সকলে যে "শুদ্ধান্ত" "অন্তঃপুর" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, সেও বোধ হয় বহুবিবাহরত রাজাদিগের গুণে—জনসাধারণ সে দোষে দোষী নহেন। তবে প্রথম পত্নীর সন্তান না জন্মিলে কেহ কেহ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন—কেন না, পুত্র না হইলে হিন্দুর প্রধান তিন ঋণের মধ্যে একটি শোধ করা হয় না। পতিপত্নীর মধ্যে সদ্ভাবের আবশ্যকতা হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে কথিত হইয়াছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা।

ইহার সহিত আর একটি প্রথার বিষয় বিবেচনা করিতে হয়—সেটি একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মত হিন্দু বিবাহান্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পত্নীকে লইয়া স্বতন্ত্র সংসার সংস্থাপন করে না। হিন্দুপরিবারে পিতামাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, অবিবাহিতা ভগিনী সকলেই একত্র বাস করেন; কোন কোন পরিবারে তিন পুরুষ একত্র বাস করিতেও দেখা যায়। জীবিত থাকিলে কর্ত্তৃত্বে পিতামহ ও পিতামহীরই অধিকার—তাঁহাদিগের সম্মতি ভিন্ন কোন আবশ্যকীয় কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর সে কর্ত্তৃত্বে জ্যেষ্ঠেরই অধিকার। এরূপ সংসার দেখিলে মনে আনন্দ হয়। প্রবীণারাই গৃহের কার্য্য পরিচালনা করেন—গৃহে তাঁহাদিগের অসাধারণ সম্মান। হিন্দুশাস্ত্রে রমণীর স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা নাই সত্য—

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥" (মনু)।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে মহিলার সম্মানের বিধান অনেক—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥" (মনু)।

বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, হিন্দু-পরিবারে মহিলার সম্মান অন্য কোন পরিবারে মহিলার সম্মানাপেক্ষা ক্ষুণ্ণ নহে। অথচ, প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের বিশ্বাস হিন্দুরা মহিলাদিগের প্রতি পশুর মত ব্যবহার করে!

বিবাহ।

হিন্দুর বিবাহের আদর্শ অতি উচ্চ, অতি মহৎ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আত্মার মিলনই প্রকৃত হিন্দুবিবাহ; দেহের মিলন ইহলোকের, তাহার উদ্দেশ্য সমাজসংরক্ষণ। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এখানেই আবদ্ধ নহে। তাই হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে বালকবালিকা প্রথম হইতেই পরস্পরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে—বালকের হৃদয়ে অন্য কোন রমণীর বা বালিকার হৃদয়ে অন্য কোন পুরুষের স্থান হয় না।

প্রাচীনা ও নবীনা।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সংসারনির্ব্বাহার্থ হিন্দুমহিলা যে শিক্ষা পাইতেন, তাহা অতি উত্তম। অল্পবয়সেই ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের শিক্ষা হইত; ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ গল্প, মহচ্চিন্তাপূর্ণ কবিতা, এ সকল তাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ থাকিত। ইহা ভিন্ন গৃহকর্ম্ম, ঔষধব্যবহার, খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ এ সকলও তাঁহারা শিখিতেন। কিন্তু মহিলারা আরও উচ্চশিক্ষা পাইতেন; হিন্দুমহিলা শারীরিক বিষয় আধ্যাত্মিক বিষয়াপেক্ষা হীন বুঝিতেন—হিন্দুমহিলা কর্ত্তব্যপালন করিতে শিখিতেন।

তাই হিন্দুমহিলার মত ধৈর্য্যশালিনী, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, স্বার্থত্যাগকারিণী, পবিত্রচিত্তা মহিলা অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহাদিগের পবিত্র প্রভা কোন স্বর্গীয় সৌরভের মত হিন্দুর সংসার ব্যাপ্ত করিয়া থাকিত।

দুঃখের বিষয়, প্রতীচ্য সভ্যতার কল্যাণে এখন আর হিন্দুমহিলার এরূপ শিক্ষা হয় না। তথাপি এখনও হিন্দুমহিলা তাঁহার স্বাভাবিকী মাধুরী হইতে একেবারে দূরে পড়েন নাই। এখন হিন্দুবালিকাদিগকে প্রতীচ্যপ্রণালীতে শিক্ষা দিবার কল্পনা হইতেছে, তাই বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইতেছে। প্রতীচ্য সভ্যতার ফলে বৎসর বৎসর বহু রমণীকে উদরান্নের জন্য জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রণালী প্রতীচ্য সভ্যতারই উপযোগী। যে বালিকাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র বাজার নহে পরন্তু গৃহ, তাহাদিগের মধ্যে এ শিক্ষা প্রচলিত করা কেন?

মহীশূরের প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে একটি প্রবন্ধে, লেখিকা হিন্দুরমণীর শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক মনে করেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখিকা বলেন যে, এই বিষয়টি বড়ই গুরুতর; কারণ, যদি প্রতীচ্য-প্রভাবই প্রবল হইয়া উঠে, তবে আমরা কেবল বিদেশীর আদর্শের কতকগুলি হীন অনুকরণ মাত্র পাইব, হিন্দুরমণীর অতুলনীয় আদর্শ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া কেবল সাহিত্যেই অবস্থিতি করিবে। সে দুর্দ্দিন যেন কখনও উপস্থিত না হয়।

ইহার পর শ্রীমতী ষ্টিলের কথা। তিনি তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসর কালব্যাপী ভারত-প্রবাস-সময়ে পঞ্জাবপ্রদেশে ভারতীয়দিগের, বিশেষতঃ ভারতীয়া মহিলাদিগের, সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। উপন্যাসপ্রিয় পাঠক তাঁহার সূক্ষ্মদর্শনের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার মত আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে।

তিন সহস্র বৎসরব্যাপী প্রাচীন সভ্যতায় ভারতবাসী সুখস্বচ্ছন্দে ছিল, তাহাতে সম্প্রদায়-বিভাগ ছিল না। সম্প্রদায়-বিভাগ অর্থে কেহ যেন এমন বুঝেন না যে, লেখিকা ভারতবর্ষে জাতিভেদের কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি সামাজিক সম্প্রদায় বিভাগের কথা বলিতেছেন না—দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাবলির সম্প্রদায়-বিভাগের কথাই বলিতেছেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য আরাম-বিলাস। এই আরামের ধারণা বা "কম্ফর্ট"-কল্পনা, এই বিলাস-বাহুল্য বা বিলাস-বাহাদুরী ভারতবাসীর নিকট একেবারেই অপরিজ্ঞাত। ভারতবর্ষে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বাস-বিষয়ে বৈষম্য বড়ই অল্প। রাজার প্রাসাদেও দরিদ্রের গৃহের মত অনাবৃত হর্ম্ম্যতল দৃষ্ট হইবে—উভয় গৃহেই আহারার্থ সেই একই প্রকার পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটামুটি কথায় বলিতে গেলে, দরিদ্রগৃহেরই মত ধনীর প্রাসাদে স্নানের সজ্জারও সম্পূর্ণ অভাব; কারণ, নদীতে স্নান করিয়া রৌদ্রতাপে গাত্রের জল শুকান ভারতবাসী অপমানজনক মনে করে না। ভারতবাসীর জীবনে বিলাসের প্রভাব নাই, তাই তাহাদের সবই সাদাসিধা রকমের। ভারতবাসী বড় জোর পত্নীর অলঙ্কারে কিছু ব্যয় করে—আপনার আরামের জন্য তাহার ব্যয় অতি সামান্য। ভারতীয় সভ্যতার এই সাদাসিধা মোটামুটি ভাব তিন সহস্র বৎসর কাল অক্ষত রহিয়াছে; য়ুরোপীয় সভ্যতায় তাহা পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে বিনষ্ট হইবে।

এখনই ভারতবাসী য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে কি আছে, তাহা কে বলিবে?

শ্রীমতী বেসাণ্টের মত শ্রীমতী ষ্টিলও বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্বাস ভারতবর্ষে বিবাহ প্রায়ই সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে। য়ুরোপে দম্পতির মধ্যে নির্দ্দয় ব্যবহার এবং অত্যাচার যত অধিক, ভারতবর্ষে তত অধিক নহে। হিন্দুর বিবাহের ধারণা য়ুরোপীয়ের বিবাহধারণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হিন্দু বিবাহটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণ করে না, পরন্তু পুত্রার্থী হইয়াই বিবাহ করে।

বিবাহ।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সহসা কোন মত প্রকাশ করা সহজ নহে; কারণ হিন্দুর কুলের কথা আদালতে গড়ায় না, হিন্দুর অন্তঃপুরে অপরের দৃষ্টি চলে না। হিন্দুমহিলার পক্ষে পতির অত্যাচারের প্রতিবিধান চেষ্টা করা, সধবা অবস্থায় বৈধব্য-ভোগের পথ পরিষ্কৃত করা। তদ্ভিন্ন আবার হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা য়ুরোপীয়ের সামাজিক ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। উভয়ের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সেই কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কে বলিবে, বিবাহের স্মৃতি খেলায় হিন্দু ভাগ্যবান? কি বলিবে, কোন বহ্নি অপরের দৃষ্টির অগোচরে হিন্দুর বিবাহিত জীবন জ্বালাময় করিয়া তুলে না?

এখন সমাজের নিম্ন স্তরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু লেখিকার মত এই যে, তাহাতে বালিকাগণ সুখী না হইয়া অসুখী হয়; কারণ, সমাজের নিম্নস্তরে পুরুষগণ সচরাচর শিক্ষিত হয় না। গভর্মেণ্টের সাহায্যে এখন যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহারা অশিক্ষিত পুরুষের সহিত পরিণীতা হয়; তাহাদের গার্হস্থ্য-জীবন বড় সুখের হয় না। লেখিকা স্বয়ং বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ছিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, কোন কোন স্থানে এই শিক্ষার জন্যই বালিকাদিগের গার্হস্থ্য-জীবন অসুখময় হইয়াছে। এখন সমাজের নিম্নস্তরেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

প্রতীচ্য শিক্ষার কুফল।

এই বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাবিস্তার অতি সামান্যই হইয়াছে। এ দেশে এখনও শিক্ষার প্রতি মহিলাদিগের আন্তরিক অনুরাগ উৎপাদিত হয় নাই; যত দিন তাহা না হয়, তত দিন মহিলাদিগের মধ্যে প্রকৃত উন্নতি ও অনুশীলন প্রত্যাশা করা আকাশ-কুসুমেরই মত অসম্ভব।

ইহা ভিন্ন এই শিক্ষায় অথবা এই শিক্ষার বৈষম্যে আর এক কুফল উৎপন্ন হইতেছে। সে কুফল ফলিতেছে, সমাজের উচ্চ স্তরে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহিলাদিগের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার বিস্তার অতি সামান্যই হইয়াছে। অথচ সমাজের উচ্চ স্তরে পুরুষদিগের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছে। এইরূপে পতিপত্নীর মানসিক অবস্থার বিষয়বৈষম্য বিলক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশীয়দিগের, ভাল হউক মন্দ হউক, দাঁড়াইবার একটা স্থান ছিল, এখন ঠিক সেই স্থানটুকু অপসারিত হইতেছে—পতিপত্নী এক স্থানে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। উভয়ের মানসিক অবস্থার বৈষম্য এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, একার কার্য্যে অপরের কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে না। পত্নীর কথা এমন শিশুসুলভ যে, তাহা শুনিতে পতির বিরক্তি জন্মে, আবার পতির কথা এমন যে, পত্নী তাহার কিছু বুঝিতে পারেন না। অনুশীলনাভাবে পত্নীর হৃদয়ের উন্নতি সাধিত হয় না। আবার অনুশীলন-ফলে পতির মানসিক বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্ত হয়; কাজেই যত দিন যায় উভয়ের মনোভাবে বৈষম্য ততই বর্দ্ধিত হয়। স্বামী আদর্শানুরূপ পত্নী না পাইয়া জীবন মরুময় বিবেচনা করেন; পত্নী ভাবেন যে, তিনি এক দিনের জন্য স্বামীকে সুখী করিতে পারিলেন না। একটা অতৃপ্ত পিপাসা, একটা দারুণ হতাশা পারিবারিক জীবন তিক্ত করিয়া তুলে। উভয়েরই হৃদয়ে একটা গুরুভার চাপিয়া থাকে। পতি মনে

শেষ কথা।

করেন, উপযুক্ত পত্নী পাইলে জীবনের সব আশা সফল হইত, জীবনে অনেক কার্য্য করিতে পারিতেন, এ মরুময় জীবন লইয়া সে সকল কিছুই হইল না—এ জীবন বৃথা গেল। পত্নী মনে করেন, পতি যদি আপনার উচ্চাসন হইতে একবার নামিয়া আসিতেন, যদি এক বার তাঁহার দিকে সদয় দৃষ্টিতে চাহিতেন, তবে তিনি কৃতার্থ হইতেন। তাহাও হইল না। সমাজস্রোতমধ্যে ক্রমবর্দ্ধনশীল চড়ার মত এই প্রশ্ন সমাজস্রোতাবলম্বী যাত্রীদিগের পক্ষে দিন দিন অধিক আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিতেছে।

আশা করি এই পরিবর্ত্তন-যুগে বাঙ্গালী এই কথাগুলি বিবেচনা করিবেন।

বিবিধ।

দীর্ঘজীবন।
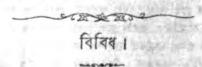
লোক্যালবোর্ড, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের, দরিদ্র প্রজার স্কন্ধে প্রায় সত্ত্বাতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া, সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার, এত চেষ্টাসত্ত্বেও দেখা যায় যে, পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন অনেক লোক অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই জীবনের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। ইহার নানা কারণ আছে। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, এ সকল সে কালে এত অধিক ছিল না। কিন্তু এ সকল ভিন্ন অন্য কারণও অনেক আছে, যাহা আমরা ইচ্ছা করিলে দূর করিতে পারি।

সম্প্রতি ডাক্তার পার্ডি, নর্থ-আমেরিকান রিভিউ পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। ডাক্তারের অনেক কথা আজ কাল আমাদের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

প্রধান কয়টি কথা।

ডাক্তার প্রথমেই তিনটি কথা বলিয়াছেন ;—প্রথম, আমরা অনেক সময় অভ্যাসের দোষে রোগ ভোগ করি ও কষ্ট পাই, আমাদিগের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিলে সে সকল সমূলে বিনষ্ট হয় ; অথচ তাহা না করিয়া আমরা কেবল ঔষধ প্রয়োগ করি। দ্বিতীয়,—আমরা অনেক সময় অনাবশ্যক কষ্ট, যাতনা ও পীড়া ভোগ করি, এবং সেই রোগ সন্তানদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়া যাই। তৃতীয়—, অনেক লোকের পূর্ব্বপুরুষদিগের পরমায়ু, দেহের গঠন ইত্যাদি দেখিয়া তাহারা যত দিন বাঁচিবে বোধ হয়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে তত দিন বাঁচে না। এইরূপ অকালমরণ ইচ্ছা করিলেই দূর করা যাইতে পারে।

সুস্থকায় সবল পিতামাতার সুসন্তান যদি কোন দৈবঘটনা বা সংক্রামক ব্যাধি ভিন্ন পঁয়ষট্টি বৎসরের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে তাহার আপনার দোষে।

আহার সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট অনিয়ম করি। প্রধান অনিয়ম—অতিরিক্ত মাংসভোজন। এ দোষে দরিদ্রগণ তত দোষী নহে। অতিরিক্ত মাংসভোজনের ফলে হৃদ্‌রোগাদি উৎপন্ন

আহার ও পান।

হয়। অতিরিক্ত মাংসভোজন না করিয়া বরং কিছু পরিমাণে নিরামিষ আহার করিলে, শরীরের পক্ষে উপকারের সম্ভাবনা। যেমন অতিরিক্ত মাংস-আহার একটা দোষ, তেমনই অতিরিক্ত শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য ও অতিরিক্ত মিষ্ট-দ্রব্যের ভোজনও একটা গুরুতর দোষ। মদ্যে অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য থাকে ; তাই অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে মাথা ধরা ও অজীর্ণ উৎপন্ন হয়।

পোষাকেও আমাদের দোষ আছে। আমরা পশমী পোষাক ব্যবহার করি না। যাহারা সাধারণতঃ বসিয়া কাজ করে, তাহাদিগের পক্ষে মৎস্য, টাট্‌কা ফলমূল এবং অম্ল ফলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাদিগের পক্ষে দিন একবারের অধিক মৎস্য-আহার উচিত নহে। শ্বেতসারযুক্ত খাদ্যের মধ্যে রুটি ও গোলআলুই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। চিনি অধিক আহার করা উচিত নহে। আহারের সময় জলীয় দ্রব্য অধিক পান করা অত্যন্ত অন্যায়। সন্ধ্যার সময়েই 'সায়মাশ' শেষ করা উচিত; আর কখনই অতিরিক্ত আহার করা উচিত নহে।

আর আর কথা।

অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রধান দেশে পশমী পোষাকের পরিবর্ত্তে রেশমী পোষাক ব্যবহার করা যাইতে পারে। শীতল জলে স্নানও সকল সময় নিরাপদ নহে; বিশেষতঃ, বয়স একটু অধিক হইলে, তাহাতে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থাকে।

ব্যায়ামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহণ, তাহার পর দ্বিচক্র-রথচালন, তাহার পর ভ্রমণ।
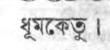
ধূমকেতু।

ধূমকেতু অপশকুন।—অতি প্রাচীন কাল হইতে, এমন কি, ধূমকেতুর প্রথম দর্শনাবধি লোকসাধারণ উহাকে অপশকুন অর্থাৎ অমঙ্গলসূচক উৎপাতবিশেষ বলিয়া জানে। ফলতঃ, প্রত্যূষের পূর্ব্বে বা প্রদোষের অনতিবিলম্বে, নভোমণ্ডলের পূর্ব্ব বা পশ্চিম কপালে, অপূর্ব্বদৃষ্ট, বৃহৎ ও বিকটাকার এক, দ্বি, ত্রি, ধূমাভশ্মশ্রুবিশিষ্ট হুষমন চেহারা অবলোকিত হইলে, স্বভাবতঃ হৃদয়ে প্রগাঢ় ভয়বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। কেহ বলেন, এ ধূমকেতু কি "উপপ্লবায় লোকানাং?" কেহ বলেন, ইহা ছত্রভঙ্গ, রাজ্যবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি অমঙ্গলের লক্ষণ। কেহ কেহ বলেন, লক্ষণবিশেষে ধূমকেতু শুভসূচকও হয়।

উক্ত বিপরীতরূপো ন শুভকরো ধূমকেতুরুৎপন্নঃ। ইন্দ্রায়ুধানুকারী বিশেষতঃ দ্বিত্রিচূলো বা। হ্রস্বতনুঃ প্রসন্ন ইত্যস্মাদুক্তাৎ যো বিপরীতো বিশেষতঃ শক্রচাপরূপকেতুরুৎপন্নঃ স ধূমকেতুঃ স চ ন শুভকরঃ, পাপং করোতীত্যর্থঃ। ইন্দ্রধনুঃ সদৃশো ন শুভকর এব তথা দ্বিশিখস্ত্রিশিখশ্চ বিশেষতঃ পাপফলদঃ। তথাচ সময়সংহিতায়াং। অচিরস্থিতোঽতিবৃষ্টস্বস্তমিতঃ স্নিগ্ধমূর্ত্তিরুদগুদিতঃ। হ্রস্বতনুঃ প্রসন্নঃ কেতুর্লোকস্যাভাবায় ন শুভো বিপরীতো বিশেষতঃ শক্রচাপসঙ্কাশঃ। দ্বিত্রিচতুশ্চলো বা দক্ষিণসংস্থশ্চ মৃত্যুকরঃ।—ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

"The blazing Star,
Threatening the world with famine, plague and war;
To princes death; to kingdoms, many curses;
To all estates, inevitable losses;
To herdsmen, rot; to ploughmen, hapless seasons;
To Sailors, storms; to cities, civil treasons."

এক্ষণে বিজ্ঞানপ্রভাবে এ অমূলক ভয় অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়াছে।

ধূমকেতু কি? রবিপরিতঃ ভ্রাম্যমান, নীহারবৎ পিণ্ডবিশেষকে ধূমকেতু বলে। ইহাদিগের ধূমকেতু নামটি সার্থক; কিন্তু সকল ধূমকেতুর কেতু বা পুচ্ছ থাকে না। ধূমকেতুর সমধিক উজ্জ্বল তারাবৎ স্থানটিকে গর্ভ বলে। ধূমকেতুগণ রবিপরিতঃ পরিভ্রমণ করে বটে, কিন্তু তাহাদিগের কক্ষার সহিত গ্রহকক্ষার বিলক্ষণ বিষমতা দৃষ্ট হয়। কেতুকক্ষা অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক, অর্থাৎ উহা অতীব দীর্ঘবর্ত্তুলের দীর্ঘচ্ছেদের মত; এমন কি, উহাকে অণ্ডাকার না বলিয়া সরল দীর্ঘ কৃশাঙ্গ পটোল বলা কর্ত্তব্য। সিরিস, পাল্লাস, জুনো প্রভৃতি খোদিষ্ট গ্রহগণেরও কক্ষা ০°৩৮২এর কম উৎকেন্দ্রিক নহে; কিন্তু ১৮৬৭ সালে আবিষ্কৃত টেম্পেল্ নামক ধূমকেতুর কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কম (০°৪০৫) হইলেও ০°৩৮২ অপেক্ষা অনেক বেশী। উৎকেন্দ্রত্বের আতিশয্য ও দীপ্তির মান্দ্যপ্রযুক্ত এই জ্যোতিষ্কগণের প্রতি ভভ্রমে পরিহেলিক হইতে কিয়দ্দূরে অপসৃত হইলেই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত বা অদর্শনীয় হয়।

ধূমকেতুর সংখ্যা।—সিদ্ধান্তশাস্ত্রে ধূমকেতুর কথা কিছু দেখি না। ইহার সংখ্যা সম্বন্ধে কেহ বলেন, ১০১; কেহ বলেন ১০০০; নারদ বলেন, একমাত্র ধূমকেতু নানা সময়ে নানারূপ দেখায়।

শতমেকাধিকমেকে সহস্রমপরে বদন্তি কেতূনাং।
বহুরূপমেকমেব প্রাহ মুনির্নারদঃ কেতুম্॥—শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ধূমকেতুর সংখ্যা কত, এই প্রশ্নের উত্তরে কেপ্লার বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রে মাছ যত।" কথাও মিথ্যা নহে, ধূমকেতুর সংখ্যা নাই। খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি ৯৬২ ধূমকেতু দৃষ্ট ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে; ইহার মধ্যে ১১৮টির পুনরাগমন ও দর্শন হইয়াছিল বলিয়া অভিজ্ঞাত; বাকি ৮৫৩টিকে একবার-মাত্র দেখা গিয়াছে, সুতরাং সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন কেতু বলিয়া ডাকা হয়। যে গুলির কক্ষা গণিত হইয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা ৩৯২। ১৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ দূরবীক্ষণের সৃষ্টির পূর্ব্বে, যে সকল ধূমকেতু পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল, সেগুলি অবশ্যই বড় বড়; তৎকালে লোকে শুধু চক্ষে দেখিতেন, ছোট ছোট ধূমকেতু দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু দৌরবীক্ষণিক অর্থাৎ ছোট ছোট ধূমকেতুর সংখ্যাই অধিক। উনবিংশ শতাব্দে অর্থাৎ ১৮০১ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত যে ২৭০ ধূমকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২৫টির বেশী শুধু চক্ষে দেখিবার উপযুক্ত নহে। গত ২০০০ বৎসরে যত ধূমকেতুর উদয়

হইয়াছিল, সে সমস্ত যদি দুরবীক্ষণ দিয়া দেখা যাইত, তবে তাহাদের সংখ্যা ৮০০০এর অধিক হইত। গ্রীষ্মকালে দিনমানের আধিক্যপ্রযুক্ত প্রায় শতকরা ১৪ কেতু দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব, এ হিসাবে আরও ১০০০ কেতু ধরিলে, মোট ৯০০০ হয়। আবার ধর, যে সকল ধূমকেতু পৃথিবীর নিকট, সে সবগুলিকে যে আমরা দুরবীক্ষণ দিয়া দেখি, এমন নহে; প্রতিনিশ নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র দুরবীক্ষণ দিয়া জ্যোতির্বিদেরা দেখিতেছেন, এমন নহে। বোধ হয়, উদিত ধূমকেতুর অর্দ্ধাধিকের খবরই লওয়া হয় না। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির কথা আর কি বলিব? অতএব এই দুই হাজার বৎসরে যে ২০০০০ ধূমকেতু আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এ সংখ্যা কেবল আমাদের দর্শনোপযোগী কেতু সম্বন্ধে। গ্রহকক্ষাব্যবহিত স্থাননিচয়ে যে কত কোটি ধূমকেতু বিচরণ করিতেছে, তাহা কল্পনার অতীত।

১৮৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত যে ৩২৯ ধূমধ্বজের গণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৩টির কক্ষা বৃত্তাভাস, ১৯৪এর কক্ষা ক্ষেপনি, এবং ছয়টির কক্ষা হাইপারবোলা।

ইউরোপীয়েরা ত্রিবিধ প্রকারে ধূমকেতু সকলকে নির্ব্বাচন করেন। প্রথমতঃ, যে বৎসর ধূমকেতু প্রথম উদিত ও পর্য্যবেক্ষিত হয়, উহাকে সেই বৎসরের ধূমকেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যেমন, ১৮১১র ধূমকেতু; কখন বা আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে অভিহিত হইয়া থাকে; যেমন, বিএলার ধূমকেতু; এবং কখন বা ধূমকেতুর গণক বা ইতিবৃত্তসংগ্রাহকের নামে পরিচিত হয়; যেমন, এঙ্কর ধূমকেতু।

ধূমকেতুর কক্ষার অবস্থান।—ধূমধ্বজগণের কক্ষার অবস্থান নানাপ্রকার। ক্রান্তিবৃত্তে উক্ত কক্ষার ০° হইতে ৯০° পরিমাণে অবনতি, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকের গতি যেমন পূর্ব্বাভিমুখী, তেমনই আবার অনেকের গতি পশ্চিমাভিমুখী; সুতরাং বলিতে হইল যে, অবনতির পরিমাণ ০° হইতে ১৮০°। গ্রহগণ ক্রান্তিবৃত্তের অনতিদূর পর্য্যন্ত বিচরণ করে, কিন্তু কেতুগণ কখন ক্রান্তিবৃত্তে, কখন বা তদীয় কেন্দ্রকদম্বকে অবলোকিত হয়।

সাময়িক ধূমকেতুগণের ক্রান্তিবৃত্তে কক্ষার অবনতি অতি সামান্য। ইহাদিগের মধ্যে অনেকের কক্ষা ক্রান্তিবৃত্তে ৫০° অবনত; ইহাদিগের মধ্যে যে ১৩টির পুনরাগমন দেখা গিয়াছে, তাহাদিগের সকলেই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যায়, কেবল হেলীর কেতু উল্টা দিকে চলে। বৃত্তাভাস কক্ষে

ভ্রমিত ২০টি পরিচিত ধূমধ্বজের মধ্যে ১৪টির পূর্ব্বা গতি, আর ৬টির পশ্চিমা বা বক্রা গতি।

ধূমকেতু কত দিন পর্য্যন্ত দেখা যায়।—কোন কোন কেতু কতিপয় নিশি, এবং কোনও কোনও কেতু বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষীভূত থাকে; সাধারণতঃ, ২।৩ মাসের অধিক দেখা যায় না। অধিকাংশ কেতুকে ৩, ৪, ৫, ৬, সপ্তাহ পর্য্যন্ত দেখা যায়। ১৮২৫ অব্দে পনসের আবিষ্কৃত, এবং ১৮৬১র তেবরত্ত আবিষ্কৃত, এই দুইটি ধূমকেতু বৎসরাবধি আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল। ১৮১১তে ফ্লগরগেসের আবিষ্কৃত কেতু ১৭ মাস পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। ধূমকেতুগণ কত দিন দৃষ্টিগোচর থাকিবে, তাহার পরিমাণ উহাদিগের আন্তরিক উজ্জ্বলতার ও রবিপৃথ্বী সম্বন্ধে তাহাদিগের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। যে সকল ধূমকেতু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর ছিল, তাহাদিগের মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান।

১৮১১ অব্দের	(১)	১৭ মাস	১৮৪৭ অব্দের	(৪)	৯½ মাস
১৮২৫	(৪)	১২ "	১৮৫৮ "	(৬)	৯ "
১৮৬১ "	(২)	১২ "	১৮৪৪ "	(২)	৮ "
১৮৩৫ "	(৩)	৯½ "	১৮৪৭ "	(২)	৮ "

গর্ভাবরণ, ভর্গ, পুচ্ছ ইত্যাদি।—অতিভাস্বর ধূমকেতুগণের ন্যূনাধিক ঘনীভূত নীহারবৎ পদার্থপিণ্ডে বিরচিত গোলাকার অঙ্গকে তদীয় শীর্ষ বলে। এই শীর্ষপ্রদেশ হইতে যে ধ্বজাকার সুতরল নীহারিকাবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহাকে পুচ্ছ বলে। এই পুচ্ছ রবির বিপরীত দিকে লম্বিত। শীর্ষদেশে মধ্যে মধ্যে তারা বা গ্রহবৎ উজ্জ্বল বিন্দু দৃষ্ট হয়, উহাকে ধূমকেতুর গর্ভ বলে। শীর্ষের মধ্যস্থল প্রায়ই ঘনীভূত নীহারবৎ পদার্থ ভিন্ন কিছুই নহে; সুতরাং তাহা দূরবীক্ষণে সতত অপরিচ্ছিন্ন আকারে লক্ষিত হয়। গর্ভাবরণের ব্যাস প্রায় লক্ষ মাইলের কম নহে, এবং কদাচ ২ লক্ষ মাইলের বেশী হইবে না। ১৮১১র কেতু গর্ভাবরণের ব্যাস ১০ কোটি মাইলের অধিক। গর্ভ ঠিক শীর্ষের মাঝারে নহে, রবির দিকে একটু বেশী সরিয়া যায়।

গর্ভের পরিমাণ।—কতিপয় স্থলে গর্ভের ব্যাস ৫০০০ মাইল পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রায়ই ৫০০ মাইলের অধিক দেখা যায় না। ধূমকেতুদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই উজ্জ্বল গর্ভ নাই।

যে যে স্থলে গর্ভের ব্যাসকে ৫০০০ মাইল ধরা গিয়াছিল, সেই সেই স্থলে

বোধ হয় শুদ্ধ সসারপদার্থবৎ গোলাকার স্থানটির মাপ হয় নাই; অত্যন্ত সান্দ্রীভূত নীহারিকাবৎ পদার্থ পর্য্যন্ত ধরা হইয়াছিল। ১৮৫৮ অব্দে দোনাতির কেতুর গর্ভের ব্যাস ১৯ জুলাই তারিখে ৫৬০০ মাইল, ক্রমে কমিয়া কমিয়া ২৩ নবেম্বরে ১২৮০ মাইল হইয়া পড়িল; ৫ই অক্টোবরে ৪০০ মাইল, ৬ই ৮০০, ৮ই ১১২০, এবং আবার ১০ তারিখে কমিয়া ৬৩০ মাইল হইল। অনেক ধূমকেতুর গর্ভ সসারপদার্থবৎ দেখায়, কিন্তু তদীয় পার্শ্বস্থ নীহারিকাবত্তা পরিত্যক্ত হইলে মূল গর্ভ অতি ক্ষুদ্র দেখাইবার সম্ভাবনা।

বিশাল ভর্গাবরণের উদাহরণ।

১৮১১র (১)	ব্যাস	১১, ২৫০০০	মাইল
হেলের ধূমকেতু ১৮৩৫		৩,৩৭০০০	„
এঙ্কর ধূমকেতু ১৮২৮		৩,১২০৮০	„

ক্ষুদ্র আবরণের উদাহরণ।

১৮৪৭এর (৫)	১৮০০০ মাইল
১৮৪৭এর (১)	২৫৫০০ „
১৮৪৯এর (২)	৫১০০০ „

বৃহদ্ভর্গের উদাহরণস্থল।

১৮৪৫এর ধূমকেতুর (৩)	গর্ভের ব্যাস	৮০০০	মাইল
১৮৫৮এর দোনাতির		৫৬০০	„
১৮৫১র		৫৩০০	„
১৮২৫এর (৪)		৫১০০	„

ক্ষুদ্রভর্গের উদাহরণস্থল।

১৭৯৮এর (১)	২৮ মাইল
১৮০৬এর	৩০ „
১৭৯৮এর (২)	১২৫ „
১৮১১র (১)	৪২৮ „

ধূমকেতুর আকারের পরিবর্ত্তন।—যত দিন পর্য্যন্ত ধূমকেতু দেখা যায়, তত দিনের মধ্যে উহার নীহারবৎ অঙ্গের বারংবার পরিবর্ত্তন হয়। ধূমকেতুর প্রথম উদয়কালের ছবির সহিত উহার মধ্যমাবস্থার ছবির বিস্তর বিষমতা দৃষ্ট হয়। যদি এক দিন ধূমকেতু দেখিয়া দুই তিন সপ্তাহ আর না দেখ, তবে তখন এ ধূমকেতু সে ধূমকেতু কি না, তাহা ঠাহরান ভার। অনেক ধূমকেতু যত

রবির সন্নিকৃষ্ট হয়, ততই খর্ব্ব হইতে থাকে ; আর যতই রবি হইতে বিপ্রকৃষ্ট হয়, ততই দীর্ঘ হইতে থাকে। এঙ্কর ধূমকেতুর অনেকবার এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। ধূমকেতুর এইরূপ আকারপরিবর্ত্তনের কারণ, বোধ হয়, তাপের ন্যূনাধিক্য। ধূমকেতু যতই রবিমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই উহার নীহারিকাবৎ আবরণ অত্যুৎত্তাপে স্বচ্ছ অদৃষ্টগোচর দ্রব পদার্থ হইয়া পড়ে ; সূর্য্যমণ্ডল হইতে যতই অবসৃত হইতে থাকে, ততই তাপের অপচিতিনিবন্ধন বাষ্পরাশি সান্দ্রীভূত হইয়া অভ্রবৎ দৃশ্য বস্তু হয়। অতএব, ধূমকেতুর দৃশ্যমান পিণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিলেও, উহার প্রকৃত পিণ্ডের হ্রাস ঘটে।

গর্ভাবরণে নীহারবত্তার পরিবর্ত্তন।—যখন সুপ্রভ পুচ্ছ এবং সমুজ্জ্বল গর্ভবিশিষ্ট ধূমকেতু সকল রবিমণ্ডলের সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন উহাদের গর্ভাবরণের নীহারবত্ত্বের চমৎকার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তখন গর্ভ ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল হইতে থাকে, এবং গর্ভ হইতে প্রদীপ্তপদার্থময় ধারা সূর্য্যাভিমুখে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ সপ্রভ পদার্থোৎসর্গ প্রায় অবিরামে বহু সপ্তাহ ব্যাপিয়া চলিতে থকে। এই তেজোময় স্রোতের আকারে ও দিকে এত বিসদৃশ ও সুব্যক্ত পরিবর্ত্তন ঘটে যে, অদ্য রাত্রিতে যেমন ধূমকেতুটি দেখিলাম, কল্য তেমনটি ছিল না, কিম্বা আগামী কল্য তেমনটি থাকিবে না। এই দীপ্তিপ্লব গর্ভের যে স্থান হইতে বিনির্গত হয়, সেই স্থানে অত্যুজ্জ্বল দেখায় ; ক্রমে যত নীহারবৎ কোষোপান্তে বিস্তৃত হইতে থাকে, তত বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং যেন পদার্থবিশেষের দ্বারা প্রতিহত হইয়া বক্রাকারে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই আলোকধারাসমূহ সমবেত হইয়া সমুজ্জ্বল ক্ষেপণীবৎ কোষের বহিরঙ্গরূপে পরিণত হয়, এবং গর্ভ হইতে যতই অপসৃত হইতে থাকে, ততই সমভাবে কলেবরের বৃদ্ধি লাভ করে। কতিপয়দিনান্তে এই সপ্রভ কোষের অন্তর্ভাগে কিয়ৎ শ্যামল স্থানের ব্যবধানে পূর্ব্বোক্ত কোষসদৃশ দ্বিতীয় কোষের আবির্ভাব হয়। এই দ্বিতীয় কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পুনরায় কতিপয়দিনান্তে তৃতীয় কোষ সমুৎপন্ন হয়, এবং এইরূপে বহু কোষের সৃষ্টি হইতে থাকে। দোনাতির ধূমকেতুর এইরূপ উপর্য্যুপরি সাতটি আবরণ দৃষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যেক দুই আবরণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্যাম মেখলা ব্যবহিত থাকে।

এই কোষগুলি পার্থিব বাষ্পবৎ পদার্থ নহে ; কারণ, উহা বাষ্পবৎ পদার্থ হইলে তদ্দ্বারা আলোকের বিবর্ত্তন দৃষ্ট হইত। বোধ হয়, এগুলি কোন প্রতি-

ঘাত। বলবিশেষ দ্বারা গর্ভ হইতে সূর্য্যাভিমুখে বিদ্রুত হয়, যেমন বৈদ্যুতিক-অবস্থাপন্ন কোনও পরিচালক হইতে বৈদ্যুতিক প্রতিঘাত কর্ত্তৃক লঘিষ্ঠ কণা সকল অপাকৃত হয়। আর প্রতিঘাতীবলের সাময়িক বিরাম বা হ্রাসপ্রযুক্ত উপর্য্যুপরি কোষব্যবহিত শ্যামপট্টিকার উৎপত্তি ঘটে।

পুচ্ছ বা কেতু।—নীহারবৎ গর্ভবেষ্টে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ধূমকেতুর কেতু বা পুচ্ছে পরিণত হয়। গর্ভের সূর্য্যাভিমুখ অঙ্গ হইতে এক একটি পদার্থকণা বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ বক্রভাবে ফিরিতে থাকে; যাবৎ উহার গতি সূর্য্যের বিপরীতদিগভিমুখী না হয়। আবরণের বৈপুল্য ও ঔজ্জ্বল্য অনুসারে অনুগামী পদার্থকণাসমূহের সংশ্লেষণ হইতে থাকে। পুচ্ছ নিরবচ্ছিন্ন কোষনিঃসৃত পদার্থে বিনির্ম্মিত; এবং ধ্বজ যেমন ধ্বজদণ্ডের প্রতীপগামী, ধূমকেতুর কেতু তেমনই সূর্য্যমণ্ডলসমুদ্ভূত তেজস্বী বলবিশেষ দ্বারা প্রতিহত হইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে ঘুরিয়া পড়ে। গর্ভের যে অঙ্গ সূর্য্যাভিমুখ, সে অঙ্গে সপ্রভ ধারার লক্ষণ লক্ষিত হয় না। এই কারণবশতঃ পুচ্ছের মধ্যভাগস্থিত শ্যাম ডোরা দ্বারা পুচ্ছটি লম্বালম্বিভাবে স্পষ্ট দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হয়। পূর্ব্বকালে অনেকে মনে করিতেন যে, ধূমকেতুর মস্তকের ছায়া উক্ত শ্যাম ডোরার মূল; কিন্তু পুচ্ছ বক্রভাবে বিবর্ত্তিত হইলে শ্যাম ডোরার অস্তিত্ব যায় না। বোধ হয়, পুচ্ছটি শূন্যগর্ভ আবরণ; আবরণের পার্শ্ব অবলোকন করিলে দৃক্‌সূত্রকে সমধিক নীহারবৎ কণারাশি ভেদ করিতে হয়, কিন্তু মধ্যরেখানুসারে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প নীহারিকা অতিক্রম করিতে হয়; তজ্জন্যই মধ্যরেখা অপেক্ষা পার্শ্ব রেখা উজ্জ্বলতর দেখায়।

পুচ্ছোদ্ভব।—উদয়কালে ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রায় থাকে না, যদি থাকে ত সে অতি খর্ব্ব; কিন্তু ক্রমশঃ নীহারবৎ আবরণ বিরচিত হইতে থাকে; অচিরে পুচ্ছ দৃষ্ট হয়, এবং ধূমকেতু যত সূর্য্যসামীপ্য প্রাপ্ত হইতে থাকে, পুচ্ছ তত উজ্জ্বল ও দীর্ঘ হইতে থাকে। ধূমকেতু যখন সূর্য্যসান্নিধ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করে, প্রায় তখনই অতিবেগে পুচ্ছ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৮৫৮ অব্দে দোনাতির ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রতিদিন দুই লক্ষ মাইলের হিসাবে বাড়িত। ১৮১১ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ রোজ নয় কোটি মাইল বাড়িত। ১৮৪৩এর ধূমকেতু পরিহৈলিক অতিক্রান্ত হইয়া অহরহ সাড়ে তিন কোটি করিয়া বাড়িত।

পুচ্ছের পরিমাণ।—ধূমকেতু সকলের পুচ্ছ প্রায় অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

১৮৪৩এর ধূমকেতুর পুচ্ছ ১৯৮০০০০০০ মাইল লম্বা হইয়াছিল। ১৮১১র কেতুর পরিমাণ দশ কোটি নব্বই লক্ষ মাইল, এবং এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল চওড়া; আর চারটি ধূমকেতুর পুচ্ছ পাঁচ কোটি মাইল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পুচ্ছের দৃশ্যমান দৈর্ঘ্য কেবল বাস্তব দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না, পুচ্ছের অক্ষের দিক এবং পৃথিবী হইতে দূরত্বের উপর নির্ভর করে। লেখা পড়ার ভিতরে এমন ছয়টি ধূমকেতু আছে, যাহাদের পুচ্ছের (পৃথিবী হইতে দেখিলে) সম্মুখস্থ কোণ ৯০এর অধিক, অর্থাৎ তাহাদের দৈর্ঘ্য ক্ষিতিজ হইতে খ স্বস্তিক পর্য্যন্ত; এবং আর দ্বাদশটির পুচ্ছ এত লম্বা যে, পুচ্ছের সম্মুখস্থ কোণ ৪৫০ এর অধিক।

অনুহৈলিক বিন্দু অতিক্রম করিবার কতিপয় দিবস পরেই কেতুর দৈর্ঘ্যের এবং ভাস্বরত্বের পরমসীমা লাভ হয়। ধূমকেতু রবি হইতে যত বিপ্রকৃষ্ট হইতে থাকে, ততই পুচ্ছ হীনজ্যোতিঃ হইতে থাকে, অবশেষে শূন্য-সাগরে অপাস্ত হইয়া যায়।

পুচ্ছের অক্ষের অবস্থান।—পুচ্ছের অক্ষ গছ সরল রেখা নহে, এবং গর্ভের নিকট ভিন্ন ইহার অন্য কোন স্থান রবির ঠিক প্রতীপ নহে। পুচ্ছের অক্ষ চলকর্ণ গ-স-এ সতত অবনত। এই অবনতি ১০° বা ২০°, এবং কখন কখন তদধিকও ঘটিয়া থাকে। ধূমকেতুর গম্যমান নভোভাগ হইতে তদীয় পুচ্ছ সতত অবনত হইয়া থাকে। ধূমকেতুর শিরঃপ্রদেশ হইতে বিনির্গত সপ্রভ পদার্থকণা যদি সৌরমণ্ডলসমুদ্ভূত বলবিশেষ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুচ্ছান্তে প্রেরিত হইত, তাহা হইলে পুচ্ছাক্ষ ঠিক রবিমণ্ডলের প্রতীপ হইত। কিন্তু
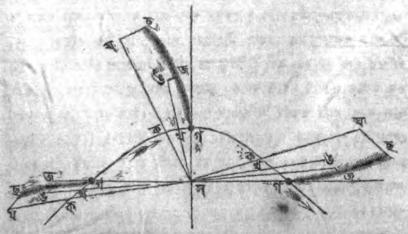
বস্তুতঃ পুচ্ছান্তে (ছএ) যে সকল পদার্থকণা থাকে, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে প্রায় ২০ দিন (যখন ধূমকেতুর মাথা কএ ছিল) গর্ভ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল; এবং সেগুলির নিশ্চেষ্টতানিবন্ধন গর্ভ হইতে বিচ্ছেদকালে কাক্ষ্য গতি যদ্রূপ ছিল, তদ্রূপ গতিই থাকিয়া যায়। পুচ্ছের মধ্যভাগ জ স্থানের কণাগুলি পূর্ব্বোক্ত কণাগুলির বিনিক্রমণের পর, সম্ভবতঃ ১ দিন পরে, বিনির্গত হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন ধূমকেতু খ এ ছিল। এবং এই কণাগুলি কক্ষার সেই দিকেই চলে, যে দিকে কণাবিনিক্রমণের কালে গর্ভ চলিতেছিল।

পুচ্ছোৎপত্তির সম্ভাব্য পদ্ধতি।—ধূমকেতুর পুচ্ছোদ্ভবরূপ ব্যাপারের ব্যাখ্যা-স্থলে নিম্নলিখিত কারণচতুষ্টয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। সূর্য্য কর্ত্তৃক ধূমকেতু নানা প্রকারে বিধূরিত ও উদ্বেজিত হয়। প্রথমতঃ সূর্য্যাকর্ষণে অহোরাত্রমধ্যে ভূমণ্ডলে জলধিজলে যেমন দুইবার জোয়ার হয়, তেমনই নভোমণ্ডলে বায়ুসাগর দুইবার উচ্ছ্বসিত হয়; পরন্তু কেতুগগনের অধিকতর বিপুলতাপ্রযুক্ত এবং উহাদের অধিকতর সূর্য্যসান্নিধ্যবশতঃ জলোচ্ছ্বাস অপেক্ষা বায়ুর উচ্ছ্বাস প্রবলতর হয়। দ্বিতীয়তঃ, তপনের তাপজনিত গর্ভ তাপাক্রান্ত হয়, গ্যাস বিস্ফারিত হইতে থাকে, নব নব বাষ্পের উৎপত্তি হইতে থাকে, এবং ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের কার্য্য হইতে থাকে; তৃতীয়তঃ, সূর্য্যমণ্ডলসমুদ্ভূত আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই অনিবার্য্য বলদ্বয়বিশিষ্ট বৈদ্যুতিকা ও অয়সাকর্ষণী শক্তি; চতুর্থতঃ, প্রতিঘাতী বলবিশেষ;—এ বলের তত্ত্ব অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। এই প্রতিঘাতক বল দ্বারা পদার্থকণাবিশেষ গর্ভ হইতে নিঃসারিত হয়, এবং পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলসম্বিরচ সমধিকতেজোসম্পন্ন প্রতিঘাতী বল দ্বারা উক্ত কণা সকল প্রণোদিত [illegible] র্য্যের [illegible]

পূর্ব্ব চিত্রে স শ [illegible], আর ক খ গ ধূমকেতুর কক্ষাংশ। ধূমকেতুর গতি শরাভিমুখী। মনে কর, গর্ভ যখন ক এতে, একটি পদার্থকণা ধূমকেতুর মস্তক হইতে বিনির্গত হইয়া স ক ঘ এর দিকে প্রেরিত হইল। এই কণার এখনও অর্থাৎ বিচ্ছেদের পরও সেই গতি থাকিবে,—যে গতি পূর্ব্বে গর্ভের গতির সহিত সমতুল ছিল। এই গতির বশবর্ত্তী হইয়া পদার্থকণা যে কালমধ্যে ঘ হইতে ছএ আসিবে, সেই কালমধ্যে কেতুর মস্তক ক হইতে গ-এ যাইবে। যখন গর্ভ খএ আসিল, তখন মনে কর, একটি কণা বহির্গত হইয়া স খ ঙ দিকে গেল। এখন এই কণার সেই গতি থাকিবে যে গতি ইহার গর্ভ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে [illegible]। এবং মস্তক যখন খ হইতে গএ গেল, তখন কণাটি ঙ হইতে

ছঞ গেল। এইরূপে গর্ভ যখন ক হইতে গঞ আসিল, তখন সমস্ত কণাগুলি গ জ ছ রেখায় অবস্থিত হইল। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রেখাটি চাপাকার এবং এটি পরিবর্দ্ধিত চলকর্ণ স গ এর গ বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে, এবং ধূমকেতুর গন্তব্য গগনপ্রদেশ হইতে সতত বক্রভাবে হেলিয়া আছে।

ধূমকেতু সম্বন্ধে ম র স বলের মত।—ধূমকেতুর সমস্ত শরীর যে সূর্য্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী, তাহার সন্দেহ নাই। ধূমকেতু যখন বৃত্তাভাস বা ক্ষেপনী কক্ষায় পরিভ্রমণ করে, তখন রবি ও ধূমকেতু উভয়ে যে মহাকর্ষণের পরতন্ত্র হইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহারও সন্দেহ নাই। ধূমকেতুর সর্ব্বাঙ্গ পক্ষে এইরূপ আকর্ষণ সত্য বটে, পরন্তু ইহাও অসত্য নহে যে, পুচ্ছ রবিকর্তৃক বিপরীত দিকে প্রেরিত হয়। এরূপ কেন ঘটে, তাহা ঠিক করিয়া বলা সাধ্যাতীত।

পুচ্ছ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা সম্ভাব্য কি না, তাহ দেখুন। ধূমকেতুর উপকরণীভূত পদার্থসমূহের মধ্যে এক বা তদধিক পদার্থ দ্বারা তদীয় পুচ্ছ বিরচিত হয়। ধূমকেতু সূর্য্যসান্নিধ্য লাভ করিয়া আতপজনিত সমুত্তেজিত হয়; সুতরাং পুচ্ছোপকরণ দ্রবীভূত হ[illegible] বাষ্পে পরিণত হয়। যদিও উপাদান সকল সমার অবস্থায় যথাযথরূপে আকৃষ্ট হয়, তথাপি অত্যন্ত বিরলীকৃত বাষ্পাকারে পরিণত হইলে, তাপ আকর্ষণকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া বাষ্পকে সূর্য্যের বিপরীত দিকে নিরাকৃত করিতে থাকে। অতএব অনুভূত হইতেছে যে, ধূমকেতু যাবৎ সূর্য্যসমীপে থাকে, তাবৎ নূতন নূতন উপাদান অনবরত বাষ্প বা ধূমাকারে পরিণত ও প্রদ্রাবিত হইয়া পুচ্ছ[illegible]ন করিতে থাকে। ইহার উদাহরণস্থল লোকোমোটিব এঞ্জিনের ধুঁয়া হয়। [illegible]রীত দিকে পুচ্ছ থাকিবার এই তো কারণ বলিয়া বোধ হয়; নচে[illegible] কই পুচ্ছ প্রথমাবধি রবিপরিত অতি প্রচণ্ডবেগে মনোজবের ন্যায় ভ্রমিত হইতে পারে, এমন বোধ হয় না।

ফ্লামেরিয়নের মত।—এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল বৃহত্তম ধূমধ্বজ নরনেত্রে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ১৮৪৩র ধূমকেতুর পুচ্ছ সম্পূর্ণ সরল ও রবির ঠিক বিপরীতদিকস্থ। এই কেতু সূর্য্যমণ্ডলের অত্যন্ত সমীপস্থ হইয়াছিল; ইহার পুচ্ছের দৈর্ঘ্য কুড়ি কোটি মাইল। এই প্রকাণ্ড অত্যদ্ভুত ধূমকেতু যে জড়পদার্থময়, তাহা কদাচ স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে এই পুচ্ছের বেগ এত অধিক হইত যে, তাহা কল্পনার অতীত।

১৬৮০, ১৮৮০, ১৮৮২, ১৮৮৭র এবং অন্যান্য বৃহদাকার ধূমকেতুগণ অনুহেলিকে উপস্থিত হইলেই উক্তরূপ ব্যাপার ঘটে। অতএব বুঝিতে হইল যে, বড় বড় ধূমকেতুর পুচ্ছে কোনরূপ জড়পদার্থ নাই। পুচ্ছ ধূমকেতুর সপ্রভ ছায়াবিশেষ একটু বাঁকা হইয়া ধূমকেতুর সঙ্গে সঙ্গে চলে; এই ছায়ার পথে মেঘ যেন অবিরত জন্মাইতেছে, এবং অবিরত বাষ্পীভূত হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে। ইহা বৈদ্যুতিক বা তদ্বৎ কিরণচ্ছটা; অথচ ইহার দ্বারা অন্তরীক্ষ যে আলোকিত হয়, তাহাও বলা যায় না; কারণ, অন্তরীক্ষ ত সতত সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে, তথাপি ইহা নয়নগোচর হয় না। অতএব ধূমকেতু কর্ত্তৃক আকাশে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে,—ব্যোমী গতি। ব্যোমের অস্তিত্ব, ব্যোম না থাকিলে আলোকতরঙ্গের সঞ্চার হইত না। অতএব অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তরীক্ষ যৎপরোনাস্তি সুস্থিল দ্রব্যে পরিপূর্ণ। এই দ্রব্যের শূক্ষতা অপরিসীম হইলেও উহা অবস্তু বলা যায় না। অতএব অপরিমেয় পুচ্ছ সকলের অপরিমেয় বেগবতী গতি, এই আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, এবং সেগুলির সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকিবার কারন ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে, এই বলাই আবশ্যক, এই বলাই পর্য্যাপ্ত যে, নভোমণ্ডলে ধূমকেতু পরকলাবিশেষের কার্য্য করে; পরন্তু ইহা হইতে সপ্রভ কিরণজাল ঠিক বিবর্ত্তিত হয় না বটে, তথাপি পার্থিব বায়ুমণ্ডলের সীমান্তে প্রাদুর্ভূতা উদীচী ঊষার অপেক্ষা তরলতর তাড়িততরঙ্গ উৎপন্ন করে। কলিকাতা হইতে লণ্ডনে তারে খবর দিলে তার দিয়া কোনও পদার্থ লণ্ডনে যায় না, বেগের গতি হয়। জলাশয়ে তরঙ্গেরই গতি দেখা যায়, জল যেখানকার, সেইখানেই থাকে। এই প্রকাণ্ড পুচ্ছ সকলে কোন দ্রব্যই নাই, সেগুলি আপনা-আপনি চলিতে পারে না। পুচ্ছ দ্বারা এইমাত্র ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, সেগুলি কেবল কোনও অনির্ব্বচনীয় অস্থায়ী ব্যোমাবস্থা এবং রবিসম্মুখে ধূমকেতুর অবস্থান প্রযুক্ত প্রচালিত হয়।

ব্রিডিসিনের মত।—মস্কাউ বেধালয়ের অধ্যক্ষ ব্রিডিসিন পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল ধূমধ্বজের পুচ্ছপরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। যদিও তাঁহার পরিশ্রমের ফল দ্বারা পরিহেলিকে আগত সুদীর্ঘ সরল পুচ্ছের গতির কারণ যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তথাপি এই গহন চরিত্র উপাহিত অঙ্গ সম্বন্ধে সে সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ কর্ত্তব্য। তিনি বহুবিধ ধূমকেতুর ইতিবৃত্ত ও চিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধূমকেতু সকলকে তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর কেতু সকল সরল, দীর্ঘ, অথচ অবিস্তৃত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেতু বিলাতী হাত-পাখার মত একীকৃত, বহুপুচ্ছ, চাপাকার এবং অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব। তৃতীয় শ্রেণীর পুচ্ছ আরও বাঁকা, আরও খাট। প্রথম শ্রেণীর পুচ্ছে হাইড্রজেনের অধিক্য; দ্বিতীয় শ্রেণীর পুচ্ছে হাইড্রকারবনের আধিক্য; এবং তৃতীয়ে ক্লোরিণ, লৌহ এবং অন্যান্য গুরুতর মৌলিক পদার্থের

ভাগ বেশী দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর পুচ্ছ উৎপাদনে আকর্ষণ অপেক্ষা প্রতিঘাতী বল দ্বাদশ গুণে অধিক হওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয় শ্রেণীর পুচ্ছের জন্য প্রতিঘাতী বল মাধ্যাকর্ষণের সমান হইলেই হয়; এবং তৃতীয় শ্রেণীর পুচ্ছনির্ম্মাণে মাধ্যাকর্ষণের পাদমাত্র বল হইলেই চলে। এই প্রতিঘাতী বলই কি তাড়িত? সূর্য্য তড়িতের অধিশ্রয়।

পুচ্ছ কি বস্তুতঃ অঙ্গারাত্মক দ্রব্যে বিরচিত? সকলেই জানেন, হীরক শুদ্ধ অঙ্গার, অঙ্গার ভিন্ন কিছুই নহে। এই বহুমূল্য বজ্রমণিকে অনায়াসে অঙ্গারে পরিণত করা যায়। রাসায়নিকের চক্ষে কহিনুরও অলৌকিক কৌশল দ্বারা বিন্যস্ত অঙ্গারকণামাত্র। তবে কি ধূমকেতু ইন্দ্রপত্নী শচী দেবীর রত্নকরঙ্ক? আদিতে নরলোকে ও অন্যান্য গ্রহমণ্ডলে অঙ্গারসংহতি উদ্ভিদের ও প্রাণিজীবনের বীজস্বরূপ ছিল, সেই অঙ্গারসংহতি ধূমকেতুর পুচ্ছে দৃষ্ট হইতেছে। বিষয়টি কি গুরুতর! পার্থিব জীবনের বীজ, পার্থিব জীবনের অঙ্কুর কোথা হইতে আসিল? এ বীজ কি ধূমকেতু বপন করিল?

বহুপুচ্ছ ধূমকেতু।—ধূমকেতুর পুচ্ছকে এড়ো দিকে ছেদ করিলে, ছেদমুখ বৃত্তাকার না হইয়া, বৃত্তাভাসাকার হয়। এই বৃত্তাভাস ন্যূনাধিক দীর্ঘ। দোনাতির ধূমকেতুর পুচ্ছছেদে যে বৃত্তাভাস, তাহার দীর্ঘ ব্যাস, হ্রস্ব ব্যাসের চতুর্গুণ। ১৭৪৪এর ধূমকেতুর উক্তরূপ পুচ্ছছেদে দীর্ঘ ব্যাস হ্রস্ব ব্যাস অপেক্ষা আরও দীর্ঘতর ছিল। এড়ো ছেদের দীর্ঘ ব্যাস প্রায় কেতুকক্ষার ক্ষেত্রগত। ফলতঃ, ধূমকেতুর পুচ্ছ (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) বিলাতি হাতপাখার ন্যায় বিস্তৃত। পুচ্ছের চওড়া কক্ষাক্ষেত্রের দিকে মাপিলে বেশী এবং এড়ো দিকে মাপিলে কম হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, সূর্য্যের প্রতিঘাতী বল পুচ্ছের উপকরণোপযোগী সকল কণার প্রতি সমান নহে। এই বল অত্যধিক হইলে, পুচ্ছ সরল ও রবির প্রতীপ হয়, এবং কম হইলে চলকর্ণের দিক হইতে বহু পশ্চাৎ পড়িয়া থাকে; অতএব ধূমকেতুর মস্তকগত কণাসকলের উপর সৌর বলের কার্য্য অসমরূপে সম্পন্ন হয়; সুতরাং বহুসংখ্যক বা অসংখ্য পুচ্ছ উৎপন্ন হয়, এবং সেই পুচ্ছগুলির অক্ষ যৎকথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হয়; কিন্তু সমস্ত অক্ষ ধূমকেতুর ক্ষেত্রগত। দোনাত্তির ধূমকেতুর পুচ্ছে যে ডোরা ডোরা দেখা যায়, তাহারও কারণ কেবল উক্ত প্রতিঘাতী বলের বিষমতা। ১৭৪৪এর বিচিত্র ধূমকেতুর বহুপুচ্ছতার কারণও উক্ত বল।

দৌরবীক্ষণিক ধূমকেতু।—যে সকল ধূমধ্বজকে শুধু চক্ষে দেখা যায় না, সে সকলকেই দৌরবীক্ষণিক ধূমকেতু বলে। ধূমকেতুর মধ্যে অধিকাংশই পুচ্ছবিহীন এবং দৌরবীক্ষণিক ধূমকেতুর এই উপাঙ্গ প্রায় দৃষ্ট হয় না। পুচ্ছবিহীন ধূমকেতুগণ সূর্য্যসন্নিধানে উপনীত হইলে, তদীয় আকর্ষণপ্রযুক্ত দীর্ঘাকৃত হয়, এবং পরমোজ্জ্বল বিন্দুটি নীহারবৎ মণ্ডলের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হয়।

এবম্ভূত ধূমকেতুগণের স্বল্পকায়তা এবং তন্নিবন্ধন আলোকের অনুজ্জ্বলতা, তাহাদিগের পুচ্ছের অনস্তিত্বের কারণ; পরন্তু পুচ্ছ যে মূলে জন্মে না, তাহা নহে; পুচ্ছ বস্তুতঃ হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কোন কোন স্থলে বোধ হয়, ভূয়োভূয়ঃ সূর্য্যসান্নিধ্যবশতঃ ধূমকেতুর যে জাতীয় কণাসমূহে পুচ্ছ বিরচিত হয়, সে কণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে অপচিত হইয়া পড়ে, এবং তখন সেগুলির আর পুচ্ছ না হইয়া আকার কেবল কথঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়। পুচ্ছের উপাদানের ও রচনাপ্রণালীর কথায়, পুচ্ছ কেমন করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, তাহা যেন বুঝা গিয়াছে; এক্ষণে দেখিবে যে, উক্তরূপ প্রণালী অনুসারে পুচ্ছ ক্রমশঃ লোপ পায়। কেতু যত সূর্য্য হইতে বিপ্রকৃষ্ট হয়, ততই তেজের হানি হইতে থাকে, এবং বাষ্পোদ্গমের বিরতি হয়। এখন প্রতিঘাতী বল বিষয়াভাবে নিশ্চেষ্ট থাকে; সুতরাং পুচ্ছ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। সাময়িক কেতুগণ অনুহেলিকে পুনরাগমন করিলে আদ্যোপান্ত পূর্ব্ববৎ পরিবর্ত্তন সকল আনুপূর্ব্বিক ঘটিতে থাকে। এখন নব পুচ্ছ উৎপন্ন, কিন্তু পুনরায় যখন ধূমকেতু অগাধ নভোসাগরে নিমগ্ন হয়, তখন ঐ উপাঙ্গের আবার লয় হয়। এইরূপে বার বার অনুহেলিকে আসিতে আসিতে ধূমকেতুর পুচ্ছকার পদার্থের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে, অবশেষে দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতুকে হীনপুচ্ছ দেখিতে হয়।

আফ্রিকাখণ্ডের সমগ্র নিগ্রোজাতি বহুবিবাহপরায়ণ। এক পত্নী লইয়া যে জীবন কাটাইতে পারা যায়, ইহা তাহারা ধারণা করিতেই পারে না। চাকি এবং বাদাগ্রি প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদিগের নিকট ক্লাপারটন সাহেব যখন ইংরেজজাতির একমাত্রপত্নীগ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখন কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিয়াছিল; ব্যাপারখানা তাহাদের চক্ষে এতই অদ্ভুত, এতই হাস্যজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল!

আমেরিকা ও আফ্রিকার ন্যায় এসিয়া ও ইউরোপখণ্ডের অসভ্য ও কিঞ্চিদুন্নত সমাজেও বহুবিবাহের বহুপ্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী জাতিসমূহের অধিকাংশই বহুবিবাহপরায়ণ, কিন্তু সকল জাতি নহে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির মধ্যে একমাত্র স্ত্রী গ্রহণ করাই জাতীয় প্রথা। কোন জাতি বহুপত্যাত্মকবিবাহপরায়ণ। ভুটানের পার্ব্বত্য প্রদেশে একই জাতির মধ্যে বহুবিবাহ এবং বহুপত্যাত্মক বিবাহ, উভয়বিধ প্রণালীই প্রচলিত দেখা যায়। ইয়াকুতজাতীয় পুরুষদিগের মধ্যে যাহাদিগকে কার্য্যোপলক্ষে দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদের গন্তব্য প্রত্যেক স্থানে একটি করিয়া স্ত্রী থাকে। পালস্ এবং কেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বহুবিবাহপরায়ণ। প্রাচীন গলেরা এবং টিউটনেরা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিত। প্রাচীন রুষিয়া ও স্কান্দিনেভিয়াতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তাসিতস্ লিখিয়াছেন যে, অন্যান্য অসভ্য জাতি অপেক্ষা জর্ম্মনেরা এক বিষয়ে উন্নত, তাহারা একটির অধিক বিবাহ করে না। কিন্তু তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যেও নেতৃস্থানীয় প্রধান প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। তাসিতসের বহুকাল পরবর্ত্তী মেরোভিঙ্গীয় নৃপতিগণ বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, জানা যায়। রাজা ডেগোবার্টের তিন স্ত্রী ছিল। সম্রাট শার্লিমেনও দুই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃপতি থিয়েরির বহুবিবাহে দোষারোপ করার অপরাধে, সেণ্ট কলম্বানকে গল্ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

সভ্যতাপ্রাপ্ত সমাজেও এই বিবাহপদ্ধতি বহুপ্রচলিত দেখা যায়। প্রাচীন মিসরে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল; কেবল ধর্ম্মযাজকেরা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত না। প্রাচীন পেরুতে বিত্তহীন পুরুষদিগকে এক স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইত, কিন্তু ইঙ্কা এবং অভিজাতবর্গ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিতেন। এমন কি, শেষ ইঙ্কা আতাহুয়েল্পার তিন সহস্র পত্নী ও উপপত্নী

ছিল। মেক্সিকোর বিবাহপ্রথাও ঠিক এইরূপ ছিল। হোমরের সমসাময়িক গ্রীকেরা বহুবিবাহ করিত না বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহারা উপপত্নী রাখিত, এবং এই সকল উপপত্নী বিবাহিতা পত্নীর সহিত এক গৃহেই বাস করিত। পরবর্ত্তী কালে এইরূপ উপপত্নীরক্ষা রাজবিধি দ্বারা অনুমোদিতও হইয়াছিল। রোমদিগের মধ্যেও অনেকটা এইরূপই দেখা যায়। তালমুদের বিধি অনুসারে এক জন পুরুষ চারিটি পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। তৎপূর্ব্বে হিব্রুজাতির স্ত্রীসংখ্যার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না। সলমনের সাত শত বিবাহিতা পত্নী এবং তিন শত উপপত্নীর কথা বাইবেলে লিখিত আছে। কোরাণের ব্যবস্থানুসারেও মুসলমানের পক্ষে চারিটির অধিক স্ত্রী বিবাহ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে উপপত্নী গ্রহণ করিতে পারে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পত্নী এবং উপপত্নীর মধ্যে প্রভেদ বড় অধিক নহে। চীন দেশে এক পত্নী বিদ্যমানে অন্য পত্নী গ্রহণ করা রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ বটে; কিন্তু ইচ্ছানুসারে উপপত্নীগ্রহণসম্বন্ধে কোন বাধা নাই। এমন কি, সমাজ এবং রাজবিধি ইহার অনুমোদনই করে; কেন না, চৈনিক আইনানুসারে উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানদিগের স্বত্বাধিকার পত্নীর সন্তানদিগের সমান।

কোরিয়ার মান্দারিনেরা সামাজিক রীত্যনুসারে অনেকগুলি পত্নী এবং অনেকগুলি উপপত্নী স্ব স্ব অন্তঃপুরে রাখিতে বাধ্য। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের স্ত্রীসংখ্যার কোন সীমানির্দ্দেশ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রসাদে যে ইউরোপ হইতে বহুবিবাহের লোপ হইয়াছিল, ইহাও বলা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গিয়াছে, আরও দেওয়া যাইতে পারে। হ্যালাম তাঁহার 'মধ্যযুগের' ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, চার্ল‍স্ দি গ্রেটের একটি বিধি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেন। 'ত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী যুদ্ধে' লোকসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যাওয়ায়, ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই জর্ম্মণীর কোন কোন প্রদেশে দ্বিপত্নীগ্রহণপ্রথা সমাজ ও রাজবিধির অনুমোদনক্রমে প্রকাশ্যভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল। হর্বর্ট স্পেন্সর্ লিখিয়াছেন যে, ইউরোপে বহুবিবাহ বিধিনিষিদ্ধ হইলেও অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, রাজাদিগের উপপত্নীরক্ষার পাকতঃ অনুমোদন করিয়া, সমাজ তাহা জীবিত রাখিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেণ্ট্ অগষ্টিন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তিনি বহুবিবাহ

নিষেধ করেন না। হেসেনের ফিলিপ্ দি ম্যাগনানিমস্‌কে স্বয়ং লুথর রাজনৈতিক কারণে দ্বিপত্নী গ্রহণ করিতে দিয়াছিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে। তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, বহুপত্নী গ্রহণ সম্বন্ধে খৃষ্ট নিজে যখন কোন কথা বলেন নাই, তখন একাধিক পত্নী নিষেধ করিতে পারেন না। মর্ম্মনদিগের বিবাহপ্রণালীর পরিচয় নূতন করিয়া দিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। ইহারা বহুবিবাহ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়াই বিশ্বাস করে। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ লেতুর্ণে লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে সকল সমাজ সভ্যতাবিষয়ে শীর্ষস্থানীয়, সেই সকল সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যৌনসম্মিলন বিষয়ে আজি পর্য্যন্ত বড়ই বৈচিত্র্যপ্রিয়। এই বেগবতী আকাঙ্ক্ষা সামাজিক বিধানানুসারে বৈধ উপায়ে পরিতৃপ্ত করিবার পথ নাই, অথচ পরিতৃপ্ত হইতে বাকিও থাকে না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, অসভ্যেরা উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, পশুপ্রকৃতি বলিয়াই দুর্ব্বল, নিরুপায় স্ত্রীলোকদিগের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের মর্ম্মে ব্যথা দিয়া, নিজের উদ্দাম ইন্দ্রিয়লালসা তৃপ্তির জন্য বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপ সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই অমূলক। স্বামী অপরাতে উপগত হইলে সভ্যসমাজের স্ত্রীলোকদিগের প্রাণে যেরূপ আঘাত লাগে, অসভ্য সমাজের স্ত্রীদিগের সেরূপ কিছুই হয় না। যৌন-সাহচর্য্য বিষয়ে অসভ্যদিগের সংস্কার ইতর জীবের সংস্কার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত মাত্র। তাহারা যেমন ক্ষুধা হইলে আহার করে, তৃষ্ণা হইলে জলপান করে, তেমনি ইন্দ্রিয়লালসা বেগবতী হইলে তাহা চরিতার্থ করে। ইহার সহিত মানমর্য্যাদা, সুখদুঃখের যে কোন সম্বন্ধ আছে বা থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের সংস্কার-বহির্ভূত। তবে স্বামী অন্য স্ত্রীগ্রহণ করিলে যতটুকু নিজের অবহেলা বুঝায়, তাহার জন্য মনোবেদনা হইতে পারে বটে; কিন্তু যেখানে কোন কালেই আদর ছিল না, সেখানে অবহেলার স্থল কোথায়? অসভ্যদিগের মধ্যে স্ত্রী ক্রীতদাসী মাত্র—গৃহপালিত পশুর অবস্থায় এবং তাহার অবস্থায় প্রভেদ অতি অল্প। সংসারের শ্রমসাধ্য সকল কাজ তাহাকেই করিতে হয়, এবং তাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি হইলে, পুরুষেরা গৃহপালিত পশুর প্রতি যে ব্যবহার করে, স্ত্রীর প্রতিও সেই ব্যবহার করে—গালি দেয়, পদাঘাত করে, চাবুক মারে, জলন্ত কাষ্ঠ দিয়া ছেঁকা দেয়, অঙ্গচ্ছেদন করে, হত্যা করে। অবহেলার স্থল কোথায়? বরং স্বামী অন্য স্ত্রীগ্রহণ করিলে, ইহাদের লাভ বৈ ক্ষতি

হয় না। অসভ্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে, স্বামী কর্ত্তৃক অধিক স্ত্রীগ্রহণের অর্থ—অধিকতর শ্রমবিভাগ। সপত্নী যত অধিক হইবে, নিজের শ্রমের এবং স্বামীর অত্যাচারের ভাগ লইবার লোক তত অধিক হইবে। আর একটা কথা। অসভ্যদিগের মধ্যে পুরুষের এক স্ত্রী দারিদ্র্যের, সুতরাং হীনতা ও নীচতার, পরিচায়ক; বহু স্ত্রী ক্ষমতা বা সঙ্গতির পরিচায়ক। সে কারণেও অসভ্য স্ত্রীলোকেরা স্বামীর একাধিক স্ত্রীগ্রহণের পক্ষপাতী। এই সকল কারণে অসভ্য রমণীরা অনেক স্থলে নিজেই স্বামীকে অন্য স্ত্রীগ্রহণ করিতে উত্তেজিত করে। মধ্য আফ্রিকার সম্বন্ধে রীড্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, "কোন পুরুষ বিবাহ করিলে, তাহার স্ত্রী যদি বিবেচনা করে যে, স্বামীর আরও স্ত্রীগ্রহণ করিবার মত সঙ্গতি আছে, তাহা হইলে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য দিন রাত তাহাকে অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকে—অস্বীকার করিলে কৃপণ বলিয়া উপহাস করে।" ম্যাকালোলো জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে লিভিংষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডে এক জন পুরুষের একের অধিক স্ত্রী হইতে পারে না শুনিয়া, ইহারা বলিয়াছিল যে, এমন দেশে তাহারা বাস করিতে চাহে না। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা কেমন করিয়া এরূপ প্রথা ভালবাসে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহাদের বিবেচনায়, যাহারই কিছু মান সম্ভ্রম আছে, তাহারই একাধিক পত্নী থাকা আবশ্যক।" কালিফর্ণিয়ার 'মোদক' জাতির সম্বন্ধে মিচ্যাম সাহেব বলেন যে, বহুবিবাহ প্রথার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের স্ত্রীলোকেরাই বিশেষ বিরোধী; জুলুদিগের মধ্যে প্রথমা স্ত্রী, স্বামীর অন্য স্ত্রীগ্রহণের সংস্থান করিয়া দিবার জন্য নিজে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করে। আর দৃষ্টান্ত বাহুল্যের বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

অল্পশিক্ষিত ইউরোপীয়েরা, বিশেষতঃ মিশনরিরা, আমাদিগকে উপহাস করিবার জন্য ঘটা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যে সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সমাজ অসভ্য; ইউরোপ সভ্য দেশ, তাই ইউরোপের লোক এক পত্নীপরায়ণ। কথাটা আদৌ মিথ্যা। ইউরোপীয়েরা একের অধিক পত্নীগ্রহণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহারা একপত্নীপরায়ণ নহে। বহুবিবাহ নাই বটে, কিন্তু তাহার অনুকল্প যে বিলক্ষণই আছে, তাহা উপরি-উদ্ধৃত ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ্ লেতুর্ণোর কথাতেই বিলক্ষণ প্রমাণ হয়। পক্ষান্তরে, এমন অনেক অত্যন্ত অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা, ইউরোপীয়দিগের ন্যায়, একের অধিক স্ত্রীগ্রহণ করে না। হিরিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন যে, উইয়ানডট্

জাতি একটিমাত্র স্ত্রী লইয়া থাকিতে বাধ্য। ইরকয় জাতির মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। কালিফর্ণিয়ার কিনক্লা এবং ইউরক্ জাতির মধ্যে এক পুরুষের একাধিক পত্নী কখন দেখা যায় নাই। কারক জাতির অধিনেতা পর্য্যন্ত একাধিক পত্নীগ্রহণ করিতে পারে না। আন্দামান্ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে ম্যান্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, "দ্বিবিবাহ, বহুবিবাহ, বহুপত্যাত্মক বিবাহ এবং স্ত্রীবর্জ্জন ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।" পার্ব্বত্য ডায়াক জাতি একের অধিক স্ত্রী কখন গ্রহণ করে না। তাহাদের এক জন অধিনায়ক একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করায়, তাহার প্রভাব ও প্রভুত্ব একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রয়োজন দেখা যায় না। এক পত্নীর অধিক বিবাহ করিতে না পাইলেই যে সভ্য হইতে হইবে, এবং একাধিক পত্নীগ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলেই যে অসভ্য হইতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি কারণে, কি প্রকার অবস্থাবশে বহুবিবাহ উৎপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, কোন সমাজে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যার অযথা আধিক্য হইলে, সমাজের মঙ্গলের জন্যই বহুবিবাহ প্রণালী অবলম্বনীয় হয়। কিন্তু কথা এই যে, কোন সমাজে, কোন জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার এরূপ অযথা বৈষম্য ঘটে কি না, যাহাতে বহুবিবাহ প্রথা অবলম্বন না করিলে চলে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার যে সকল তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে এবং ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এরূপ বৈষম্য আছে— কোথাও পুরুষের সংখ্যার অযথা আধিক্য, কোথাও স্ত্রীসংখ্যার অযথা আধিক্য। পুরুষের সংখ্যাধিক্যের স্থল নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রী-সংখ্যার আধিক্য-স্থলের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। লিসিয়ানস্কি বলেন, সিতকা দ্বীপসমূহে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক। কালিফর্ণিয়ার শষ্টিক জাতির মধ্যেও এইরূপ। ১৮৫১ সালে ওরেগণের নেজ পার্সে জাতির লোকসংখ্যা গণনা করিয়া ডাক্তার ডার্ট দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদের পুরুষের সংখ্যা ৬৯৮, এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৮২। কৃষ্ণপাদ, শিয়ান্ এবং পুক্কা জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ—স্থলবিশেষে ত্রিগুণ। ইউকাটানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ, এবং কোচারাম্বায় পাঁচ গুণ। অন্যান্য ভূখণ্ড অপেক্ষা আফ্রিকাতেই বহুবিবাহ অধিক প্রচলিত;

এবং এই আফ্রিকায় দেখা যায় যে, কেবল গঙ্গো প্রদেশ এবং এঙ্গোলা প্রদেশের কুইসামা জাতি ছাড়া আর সকল প্রদেশেই এবং সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক।

অসভ্য সমাজে স্ত্রীসংখ্যার অযথা আধিক্যের প্রধান কারণ, পুরুষের অকালমৃত্যু এবং অপমৃত্যু। স্ত্রীলোকদিগকে বহু শ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাদের কর্ম্মস্থান প্রধানতঃ নিজের কুটীর এবং তৎসংলগ্ন শস্যক্ষেত্র। রন্ধন, সন্তানপালন, ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, শস্যকর্ত্তন ও বহন, এই সকল তাহাদের করণীয় কার্য্য; এবং এ সকল কার্য্যে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু পুরুষদিগের জীবনপ্রণালী অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল; তাহাতে দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু পদে পদে ঘটিতে পারে, এবং সচরাচর ঘটিয়াও থাকে। মৎস্য এবং অন্যান্য জলচর জীব ধরিবার জন্য তাহাদের অধিকাংশ সময় সমুদ্রে বা নদীবক্ষে অতিবাহিত হয়, শীতাতপ মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হয়, ঝড় বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া যায়। ইহার ফল—কেহ রোগে মরে, অনেকে ডুবিয়া মরে। পশুশীকার উপলক্ষে হিংস্র জন্তুর কবলেও কেহ কেহ পতিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যু ঘটে যুদ্ধে। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধ প্রতিনিয়ত লাগিয়াই আছে; এবং এই নিরত যুদ্ধে অনেক লোকের ক্ষয় হয়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের সম্বন্ধে ক্যাট্‌লিন সাহেব লিখিয়াছেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জাতির সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় ইহাদের এত লোকক্ষয় হয় যে, ইহাদের পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কোন জাতির মধ্যে দ্বিগুণ, কোন জাতির মধ্যে তিন গুণ। এলিস্ সাহেব তাঁহার 'মাদাগাস্কারের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন যে, প্রতিনিয়ত যুদ্ধে ইহাদের এত লোকক্ষয় হয় যে, এই দ্বীপে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা কোথাও তিন গুণ, কোথাও বা পাঁচ গুণ।

স্ত্রীপুরুষের সংখ্যাবৈষম্য আরও নানা কারণে হয়। সে সকলের বিস্তৃত সমালোচনার এ স্থান নহে। মোটামুটি দুই চারিটার এখানে আমরা উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, স্বভাবতই খানিকটা হয়। কন্যা এবং পুত্র সমান সংখ্যায় সর্ব্বত্র জন্মে না,—কোথাও কন্যাসন্তান, কোথাও পুত্রসন্তান, অধিক জন্মে। এই বৈষম্য অনেক স্থলে বিলক্ষণ গুরুতর। ব্রস সাহেব বলেন, মেসোপোটেমিয়া, আরমেনিয়া এবং সিরিয়ার অনেক অংশে যত পুত্র জন্মে, তাহার দ্বিগুণ কন্যা জন্মে। লাটিকিয়া এবং লেওডিসিয়া হইতে সিরিয়ার উপকূল হইয়া সিডন পর্য্যন্ত প্রদেশে জন্মকালে কন্যার সংখ্যা পুত্রসংখ্যার প্রায় তিন গুণ। দ্বিতীয়তঃ, জন্মকালে কন্যা ও পুত্রসংখ্যার তারতম্য অনেকটা পিতা মাতার সাংসারিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সমাজতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সমৃদ্ধ দেশে এবং সম্পন্ন পরিবারে কন্যা অধিক জন্মে; দরিদ্র দেশে এবং দরিদ্র পরিবারে পুত্র অধিক জন্মে। তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, বহু কন্যা সন্তান জন্মিবার একটা কারণ, বহুবিবাহ; অর্থাৎ যাহারা

বহুবিবাহপরায়ণ, তাহাদের মধ্যে কন্যা সন্তান অধিক জন্মে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁহারা বলেন যে, মর্ম্মনদিগের মধ্যে পুত্র অপেক্ষা কন্যা অনেক অধিক জন্মে। ইহা ছাড়া আরও দুই একটা দৃষ্টান্ত তাঁহারা দিয়া থাকেন। কিন্তু যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহার উপর একটা তত্ত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে না। ইহা আজিও একটা অনুমানমাত্র—আজিও বিজ্ঞানের পদবীতে উন্নত হয় নাই। সুতরাং এখানে ইহার উল্লেখমাত্র করিলাম।

এই সকল কারণে অনেক সমাজে, অনেক জাতির মধ্যে, স্ত্রীসংখ্যার অযথা আধিক্য হয়, এবং সেই জাতি, সেই সমাজের পক্ষে বহুবিবাহ প্রথা অবলম্বনীয় হইয়া উঠে। এতৎপ্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, অসভ্য সমাজে, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামিলাভে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ—মৃত্যু।

যৌনসম্মিলন বিষয়ে পুরুষের আগ্রহাধিক্য যে বহুবিবাহের একটা কারণ, ইহা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতির উত্তেজনা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্যই আছে, কিন্তু স্ত্রীজাতির অপেক্ষা পুরুষ যে এ বিষয়ে অধিকতর ব্যগ্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষের এই আগ্রহাধিক্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে সিদ্ধ; কেন না, পুরুষের আগ্রহাধিক্য প্রজাবৃদ্ধির একটা উপায়। এখন, এক স্ত্রীর স্থলে স্বাভাবিক ঘটনাবশতঃই এই ব্যগ্রতা অনেক সময়ে দমন করা আবশ্যক হয়, অনেক দিন ধরিয়া লালসা-তৃপ্তি হইতে বিরত থাকিতে হয়। ঋতুকালের কথা নাই ধরিলাম; স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের কিছুকাল পর পর্য্যন্ত স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এই নিবৃত্তি বিষয়ে সভ্য জাতির অপেক্ষা অসভ্য জাতির নিয়ম কঠোরতর। অনেক অসভ্য জাতির নিয়মানুসারে, সন্তান যে পর্য্যন্ত স্তন্যপান পরিত্যাগ না করে, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ; এবং অসভ্য জাতির সন্তানেরা তিন চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করে। সন্তান যে পর্য্যন্ত বিনা সাহায্যে দৌড়াইতে না পারে, ততদিনের মধ্যে স্ত্রীসহবাস করিলে, সিয়েরা লিওন প্রদেশে তাহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। ফিজি দ্বীপে কোন স্ত্রীলোকের এক সন্তান হওয়ার পর নিয়মিত তিন চারি বৎসরের পূর্ব্বে যদি আবার সন্তান হয়, তাহা হইলে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা এই ঘটনাকে আপনাদের দারুণ অপমান বলিয়া বিবেচনা করে। এরূপ অবস্থায় উপায় কি? সুসভ্য মনুষ্যের আত্মসংযম অসভ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়ে। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকে উপগত হওয়া অসভ্য সমাজে নিরাপদ নহে। তবে উপায়? বহুবিবাহ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়। তাহা, ইন্দ্রিয়-লালসাতৃপ্তিবিষয়ে পুরুষের নূতন-প্রিয়তা। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহিত এই প্রবৃত্তির কি সম্বন্ধ, তাহা বিচার করিবার এ স্থান নহে; কিন্তু ইহা সত্য যে, পুরুষ জাতি অনেকটা ভ্রমরপ্রকৃতি—পাঁচ ফুলে বিচরণ করিতে ভালবাসে। সুসভ্য মনুষ্য উদ্দাম কল্পনার প্রভাবে যে আপনার জন্য এই কৃত্রিম লালসার সৃষ্টি করে, তাহা নহে; অসভ্যদিগেরও এই প্রবৃত্তি বড় প্রবল। এঙ্গোলা

প্রদেশের নিগ্রোরা মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সহিত স্ত্রীবিনিময় করে। মেরোলা ডা সোরেণ্টো ইহার জন্য তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করায় তাহারা উত্তর করিয়াছিল,—"একই জিনিষ কি প্রত্যহ খাওয়া যায়?" এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অসভ্যেরা বহুবিবাহ করে; সভ্য মানব বহুবিবাহ করে না বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেও ছাড়ে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বর্ষার আবাহন।

১

শ্যামানন্ত নীলাকাশ সজল জলদে ভরি,
আবরি' বসন শ্যাম ধরণী-শ্যামাঙ্গোপরি,
    ধূসর অঞ্চল দিয়ে
    চারু চন্দ্র লুকাইয়ে,
তারকা অলক-হার, প্রকৃতি-সীমন্ত-তলে,
এসেছ বরষা-রাণি! আজি তুমি ভূমণ্ডলে।

২

প্রেমময় জলধর শোভে কত রসে রসি,'
প্রেমময়ী সৌদামিনী হাসে তার পাশে বসি;
    প্রেমে দর দর মন,
    চুম্বে মুখ ঘনে ঘন,
নির্লজ্জ প্রেমিকে হেরি দামিনী লুকায় লাজে;
ঝাঁপিয়া রতন রুচি সুনীল বসন মাঝে।

৩

স্নানিতে নিদাঘতাপে বরিষা-নির্ঝরজলে,
প্রকৃতি নিবদ্ধ বেণী খুলিয়াছে বিশৃঙ্খলে,
    জলদ চিকুরভারে
    আনিতম্ব অন্ধকারে
আচরণ বিচুম্বিয়া পড়েছে কুন্তলরাশি;
এলোকেশী প্রকৃতির কি মনোমোহিনী হাসি!

৪

দেখ আজি কবিকুঞ্জ, এ বিনোদ কুঞ্জভূমি,
সাজাইলে কত রাগে, বরষা-রূপসী তুমি;
    নির্ম্মল সলিলে মাজি'
    নব তরুদল-রাজি,
মাজিয়া বিকচ তনু রূপবতী ব্রততীরে
ফুল্ল রত্ন-অলঙ্কার পরাইলে ধীরে ধীরে।

৫

স্থজিয়া আরসিখানি ভরন্ত সরসী জলে,
সাজন্ত বদন বিধু প্রকৃতি দেখিবে বলে,

নিকুঞ্জ সানন্দ-হিয়া,
রাখিয়াছে সাজাইয়া,
দেখিতেছে সে দর্পণে লতা-বধূ কুঞ্জেশ্বরী,
কত রম্যতর রুচি, নবনীরে স্নান করি!

৬

সজল অমৃতময় সুখদ প্রাবৃট কালে,
অবনী অম্বর ঢাকা অস্ফুট আলোকজালে;
অম্বরে অপ্সরা কত—
হেমদীপ শত শত,
তরল বিজলী দিয়ে, জ্বালিয়া রতনভাসে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণে নিবিড় তিমির নাশে।

৭

এমন বরিষা কালে কোথা মাগো বীণাপাণি?
এ বিনোদকুঞ্জে মম এস মা সারদা রাণি!
বৈকুণ্ঠের সরোবরে
নীলমণি থরে থরে
পদ্মরাগ মরকতে শোভিয়া সুখের ধাম,
ফুটিয়াছে হীরকের সোনার সরোজদাম;

৮

অধিষ্টিত তুমি সেই রতন-কমল-বনে;
ঝঙ্কারি বীণার তার অমৃতের বরিষণে;
ছাড়ি সে কমলবনে
আসিবে কি মনোরমে!
এ দরিদ্র কুঞ্জবনে,—এ পর্ণকুটীরে মম?
কুহকিনী আশা, মাগো তাই এই আকিঞ্চন!

৯

মৃদু মধু গরজনে গগনে জলদ তুলি,
বরষা তিমিরময়ী, দেখ মা নয়ন খুলি!
আঁধারিয়া চরাচরে
অবিশ্রামে বারি ঝরে;
এ হেন দুর্দ্দিনে কি মা আসিবে দয়ার্দ্র মনে?
দীনের অপূর্ব্ব সাধ পুরাইবে বিশ্বরমে!

১০

এস তবে এস দেবী!—গাহিব মা পুনরায়,
ছিন্ন বীণা বাঁধি সুরে তোমার ও রাঙা পায়;
পূজিব কুসুম-থরে,
ডাকি কৃতাঞ্জলিকরে,
ভারতি! করুণাময়ি! এস এ নিকুঞ্জে মম,
এ সুখ-বরষাকালে করে কবি আবাহন।

শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী। *

বঙ্গমাতা চিরদিন রত্নপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা। আজ কাল তাঁহাকে রত্ন-প্রসবিনী বলিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু পুস্তকপ্রসবিনী বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। জর্ম্মণীর কাগজ কলম খুব শস্তা; কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র, প্রতিযোগিতা ও অভাবের দায়ে, আরও শস্তা; তাই আমাদিগের মুদ্রাযন্ত্র হইতে কাব্য, উপন্যাস, নাটক, দিন দিন রাশি রাশি উদ্গীরিত হইতেছে। ইহাদের পৌনে ষোল আনা, অপাঠ্য, অশ্রাব্য, অস্পৃশ্য—উপন্যাসগুলি প্রেতোপন্যাস, নাটকগুলি কেবল উন্মাদালয়ে অভিনীত হইবার যোগ্য, আর কাব্যগুলি যে কি অদ্ভুত পদার্থ, তাহার পরিচয়, পাঠক—"ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে" লইবেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিভ্রাট ও অরাজকতার দিনে, 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর' ন্যায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হাতে পড়িলে কত যে আহ্লাদ হয়, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। সেই আহ্লাদের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষেই অতি উপাদেয় হইয়াছে। প্রথম প্রথম যাঁহারা বঙ্গভাষায় বঙ্গের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজের লিখিত ইতিহাস এবং ইংরেজের লিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ হইতে তথ্যসংকলন করিয়া, তাহাই বাঙ্গলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা তথ্যনির্ণয় করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র প্রয়াস পান নাই। তাই তাঁহাদের সংকলিত ইতিহাসনামধেয় গ্রন্থ সকল ইতিহাস হইত না, উপন্যাসমাত্র হইত। হইবারই কথা। ইংরেজ ইতিহাসলেখকেরা স্বজাতির দোষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর গুণ ঢাকিবার জন্য না করিতে পারেন, এমন কাজ নাই। আপনাদিগকে দেবতা এবং শত্রুকে পিশাচ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা, ইংরেজের স্বভাব। আপনাদের গৌরবখ্যাপনের জন্য অপরে ভীরুতা, শঠতা, নীচতার আরোপ করিতে ইংরেজ ঐতিহাসিক বড়ই তৎপর। তাই তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাসে আমরা পাঠ করি যে, সতর জন মাত্র মুসলমান অশ্বারোহী বঙ্গবিজয় সংসাধিত করিয়াছিল; যে পলাশীর যুদ্ধ,ইংরেজ সেনার অলোকসামান্য বিক্রম এবং ক্লাইবের অতুলনীয় সামরিক প্রতিভার জ্যোতিষ্মান্ নিদর্শন; যে সিরাজদ্দৌলা মানবাকারে পিশাচ ছিল; যে অন্ধকূপহত্যারূপ পৈশাচিক কাণ্ড তাঁহারই আদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে—সর্ব্বৈব মিথ্যা। দেখা যায় যে, মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় সতর জন অশ্বা-রোহীর দ্বারা হয় নাই; তাহার প্রকৃত কারণ—বিশ্বাসঘাতকতা। দেখা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধ একটা যুদ্ধই নহে—রাজদ্রোহ, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃত-

---

* মুর্শিদাবাদ-কাহিনী;—শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি. এ. প্রণীত। বহরমপুর; শ্রীবনওয়ারীলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাগজে বাঁধা ২॥ দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২॥০ আড়াই টাকা।

ঘ্নতা, নীচতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, অপরিণামদর্শিতা এবং নিমকহারামির একটা বীভৎস অভিনয়মাত্র। দেখা যায় যে, তখনকার ইংরেজ কর্ত্তাদের তুলনায় সিরাজকে দেবচরিত্র বলিলও বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। দেখা যায় যে, অন্ধকূপহত্যারূপ কোনও ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না, ইহা বিলক্ষণ সন্দেহের বিষয়। যদিই ঘটিয়া থাকে, একটা সামান্ত কোন কিছু ঘটিয়াছিল ; এবং সেই সামান্ত কোন কিছুও সিরাজদ্দৌলার অজ্ঞাতে ঘটিয়াছিল। ইংরেজের লিখিত ইতিহাস ও প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বঙ্গভাষায় বঙ্গের বা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ উপন্যাস বৈ আর কি হইবে—উপন্যাস বৈ আর কি হইতে পারে ? পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে, অধুনা এই গড্ডলিকাবৃত্তির পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। এখন যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাস বা বঙ্গদেশসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা স্বাধীন গবেষণা দ্বারা তথ্যনির্ণয় করিতে যত্নবান। ইহাঁরা বঙ্গমাতার সুসন্তান, এবং ইহাঁদিগের দ্বারা বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাসের যে এক দিন উদ্ধার হইবে, এরূপ আশা করা যায়। বঙ্গের এই সকল সুসন্তানদিগের মধ্যে শ্রীমান্ নিখিলনাথ রায় এক জন।

এই গ্রন্থের উপকরণসংগ্রহের জন্য গ্রন্থকারকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অনেক প্রাচীন উর্দ্দু, ফারসী ও ইংরেজি গ্রন্থ এবং হস্তলিখিত কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে ও পড়িতে হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের নানা স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থিতি করিয়া তত্তৎস্থানপ্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে কতক তথ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিজের ভূমিকাতেই প্রকাশ যে, আজ প্রায় পাঁচ বৎসর তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এরূপ কার্য্যে পরিশ্রম ছাড়া অর্থব্যয়ও যে হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। এই অর্থব্যয়, এই পরিশ্রম, এই যত্ন এবং আগ্রহ যে সার্থক হইয়াছে, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

কেবল অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও যত্নে এতটা সার্থকতা হয় না। লিখিতব্য বিষয়ে প্রাণ থাকা আবশ্যক। তাহা নিখিলনাথের আছে। মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, এবং বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া, নিখিল বাবু যে মর্ম্মে মর্ম্মে আহত, তাহার পরিচয় এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। এমন সমবেদনা, এত সহানুভূতি না থাকিলে, এই গ্রন্থ এত উপাদেয় হইত না। গ্রন্থকার বড় দুঃখে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, কোন মহানগরীর মুর্শিদাবাদের ন্যায়, এত অল্প কালের মধ্যে ধ্বংস হয় নাই। ইহা সত্য কথা। আমরাই বাল্যকালে ও নবীন বয়সে যাহা দেখিয়াছি, তাহার কিছুই এখন নাই। আজিকার মুর্শিদাবাদে বসিয়া বাল্যকালের সেই মুর্শিদাবাদের কথা স্মরণ করিলে, মনে হয়, যেন শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়া কোন অমরাবতীর স্বপ্ন দেখিতেছি। হায়! বাল্যকালের সেই উৎসাহময়, আনন্দময়, হাস্যময়, মহিমাময় মুর্শিদাবাদ কোথায় গেল! আজও মুর্শিদাবাদ আছে—কিন্তু, হায়! কত নিষ্প্রভ, কত মলিন, কত প্রাণশূন্য! মহাকালের করাল ধ্বংসচ্ছায়া আসিয়া

ইহার উপর পতিত হইয়াছে। বিধাতা বাদ সাধিলে আর কে রক্ষা করিবে!

এই গ্রন্থের যথাযথ পরিচয় দিতে হইলে ইহার অনেক প্রবন্ধ আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিতে হয়। গ্রন্থকারের উপর সে অত্যাচার আমরা করিব না। পাঠকবর্গ গ্রন্থপাঠ করিয়া গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণ করেন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। বাঙ্গালী পাঠক যে সে পরিচয় লইবে, এরূপ আশা কতকটা দুরাশা, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী, কদর্য্য উপন্যাস পাঠ করে, নাটকাকারে পাগলামি পড়ে, রহস্য-নামে অভিহিত ইতরামির আদর করে, কিন্তু যাহা পড়িলে শিক্ষা হয়, জ্ঞান হয়, ভ্রান্তিনিরসন হয়, আলোকলাভ হয়, তাহা পড়ে না। কিন্তু অধিক গ্রাহক না জুটিলেই যে গ্রন্থরচনার সার্থকতা হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নাই। ভাল পুস্তকের পাঠক আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে না জুটিবারই কথা। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী যদি অধিক না বিকায়, তাহাতে গ্রন্থকারের দুঃখিত হইবার কোন্ কারণ নাই। কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু এক দিন বলিয়াছিলেন,—"আমার পুস্তকের বিশেষ কোন গুরুতর দোষ আছে, নতুবা ইহাদের এত আদর কেন?" বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ সম্বন্ধে না খাটুক, কথাটা মোটের উপর সত্য বটে।

উপসংহারে গ্রন্থকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে সাহিত্যসেবা করিয়া নিজের এবং দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। "সতীর খেলা" শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থের রচিত একটি 'আষাঢ়ে' উপকথা; রচনার বিশেষত্ব বা কোনও বৈচিত্র্য নাই। উপকথার বিষয় অতিমানুষ ও অত্যন্ত অলৌকিক,—সেকালের বুড়ীদের মুখে শোভা পাইতে পারে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "সৌর কলঙ্ক" একটি জ্যোতির্ব্বিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় "প্রবাদ প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রবাদবচনের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতেছেন। কোন্ প্রবাদপ্রসঙ্গ কোন অঞ্চলে প্রচলিত, তাহার উল্লেখ করিলেও ভাল হয়। "বিদেশে বাঙ্গালী" স্বাক্ষর করিয়া এক জন লেখক "হায়দ্রাবাদ এসাইণ্ড ডিষ্ট্রিক্টস্" নামক প্রবন্ধে বেরারের অন্তর্গত অমরাবতী নগরীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "কবির মালকে" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের চারিটি কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে দেবেন্দ্র বাবুর মৌলিকতা নাই; পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। "জাতীয় শোক ও জাতীয় হর্ষ" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। লেখকের বক্তব্য কি, তাহা আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল না। "স্বরলিপিতে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান আছে; গানটি সুনির্ব্বাচিত সুমিষ্ট শব্দের সমষ্টিমাত্র;—ভাবের বিশেষত্ব, যাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির নিকট আশা করা যায়,—ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। "রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও তাহার প্রতিকার" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। নামেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, প্রবন্ধটি রাজনৈতিক। "কাহাকে" এখনও

চলিতেছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "রাম রাজার মুলুক" বেশ হইতেছে। "জাতীয় মহাসভা ও জাতীয় সজ্জা" ইঙ্গবঙ্গগণের আলোচনার যোগ্য।

নব্যভারত। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির "ভারতীয় ইতিহাসের একাংশ" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। লেখক মোগল ইতিহাসের এক অংশ,—১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ঘটনা,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবৃত করিতেছেন। লেখকের অনুসন্ধাননিপুণতা প্রশংসার যোগ্য। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "নেপালের পুরাতত্ত্ব" নামক উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নিবন্ধটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। আমরা ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, "খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম" প্রবন্ধে "য়িহুদীবংশাবতংস জগৎ-বিখ্যাত য়িশুখ্রীষ্টের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের উৎপত্তি উন্নতি এবং পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা" করিবেন। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "শেলি" দ্বিতীয় প্রস্তাব এবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট হইতেছে। শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসুর "বর্ষাসঙ্গীত" কবিতাটি উল্লেখ-যোগ্য। এই সংখ্যায় "নব্যভারতের" সম্পাদক মহাশয়ের রচিত "খোসামুদী" নামক একটি 'অমর' প্রবন্ধ পত্রস্থ হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় একটি অমূল্য 'সত্য' প্রকটিত করিয়াছেন,—দেশের সবাই খোসামুদে; "তাহারা একটা স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়াছে। আর আমি স্বতন্ত্র একাকী। দল বাঁধিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিবার লোক যুটিয়াছে, আর আমার নিন্দা, দিবারাত্রি, চতুর্দ্দিকে অবাদে (অবাধে ?) ঘোষিত হইতেছে। আমি সপ্তরথি-বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় একাকীত্বের ভীষণ সংগ্রামে অহরহ যুঝিতেছি।" আমরা কি বলিয়া এই রোরুদ্যমান সম্পাদককে আশ্বাস দিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে একটা আশার কথা এই যে, যাহারা দল বাঁধিয়া পরস্পরের প্রশংসা করিতেছে, তাহারা 'নব্যভারত'-সম্পাদককে দল হইতে খারিজ করিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পাদক তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিফল করিয়াছেন। অধুনা তিনি নিজের ঢাক নিজে বাজাইতেছেন; লোকে কখন প্রশংসা করিবে, তজ্জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া, নিজের বাদ্য নিজে বাজাইলে মন্দ হয় না, নব্যভারতের 'অভিমন্যু' সম্পাদক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। লোকে হয় ত এই প্রবন্ধটি পড়িয়া তাঁহার সহজ বুদ্ধির অভাব কল্পনা করিবে, কিন্তু বলিতে কি, আমরা তাঁহার এই শিশুসুলভ সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছি! তিনি নিজে না গাহিলে আমরা তাঁহার এই একচেটে সত্যপ্রিয়তার গান আদৌ শুনিতে পাইতাম না!

উৎসাহ। শ্রাবণ। "অজ্ঞেয়বাদ" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত জলধর সেন এবার "উৎসাহে" "রাজনীতি" ধরিয়াছেন। "প্রতিবাদে" লেখক নেপোলিয়ানের জীবনের কতিপয় তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। "জুয়ারী জাতি" প্রবন্ধটি সুপাঠ্য, জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

মুকুল। শ্রাবণ। "জ্ঞানবীর" প্রবন্ধটিতে অনেকগুলি চিত্র আছে, কিন্তু বড় ভাল হয় নাই। "ভূমিকম্প" প্রবন্ধটিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "বিগত ভূমিকম্পে নীলফামারী রেলওয়ে ষ্টেশন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অবস্থা"—ইতিশীর্ষক ছবিখানি বেশ হইয়াছে।

সখা ও সাথী। শ্রাবণ। "বিবিধ" সুপাঠ্য। "শীকার" প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। নীল গাইএর ছবিটি সুন্দর। "সেকালের সরীসৃপ" প্রবন্ধটি পড়িয়া ছেলেরা আমোদের সহিত শিক্ষা লাভ করিবে। "হাসি" একটি রহস্য-কবিতা; ছবিগুলি দেখিয়া বালক বালিকারা হাসিতে পারে, কিন্তু কবিতাটির রচনা ভাল হয় নাই,—উহাতে হাস্যরসের অত্যন্ত অভাব।

পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব।

১

মাতা। চল্ মা, চল্।

কন্যা। কোথায়?

মাতা। বড় বাড়ী।

কন্যা। আমি যাব না।

মাতা। কেন?

কন্যা। না মা, তুমি যাও।

মাতা। যাবিনি কেন বল্?

কন্যা। যে দুরন্ত ছেলে, ওকে নিয়ে পরের বাড়ীতে যেতে আমার লজ্জা করে।

মাতা। ছেলে দুরন্ত কার না আছে? গ্রামের সব লোকই ত আজ সেই বাড়ীতে।

কন্যা। তা থাক। তুমি যাও।

মাতা।" তুই না গেলে এখনি বড় গিন্নি আস্‌বেন ডাক্‌তে। বড় গিন্নিই ত তোকে আন্‌তে পাঠিয়েছেন; বেহারাদের টাকা দিয়েছেন। আমাকে বলে দিলেন,—'মেয়েকে সঙ্গে করে এখনি এস।'

কন্যা। যেতে ইচ্ছা করে না আমার—তা কি কর্ব্বো! ছেলেটার না আছে একখানা কাপড়, না আছে এক জোড়া জুতো।

মাতা। তা ত বুঝি। যেমন কপাল করেছিলে মা।

এই কথার পরে উভয়ের অপাঙ্গে অশ্রু দেখা দিল।

জননী কন্যাকে বুঝাইলেন, "বছরকার দিনে চখের জল ফেলো না মা। ওকে মানুষ কর্ত্তে পালে ও নিজেই নিজের কাপড় জুতো করে নিতে পার্ব্বে।"

মাতার সান্ত্বনায় কন্যার মনোবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু সে তাড়া-তাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া মাকে কহিল, "ঐ যে জ্যাঠাইমা আসছেন।"

কিঞ্চিৎ দূর হইতে একটি প্রবীণা রমণী ডাকিলেন, "সুরির মা, এখনও বসে আছ? এস শীগ্গির।"

"যাই দিদি!" বলিয়া সুরির মা উত্তর করিল।

যে রমণী আসিয়া অজ্ঞাতে এই মাতাপুত্রীর অশ্রুস্রোত থামাইয়া দিলেন, তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর। পরিধান একখানা লালপেড়ে শাড়ী। হাতে দুটি শাঁখা ও দুগাছি সোনার বাউটী। নাকে একটি মুক্তা-দেওয়া নথ, কপালে খানিক টক্‌টকে সিন্দুর।

২

জেলা নদীয়ার উত্তরপূর্ব্বাংশে বেণীপুর গ্রাম। বেণীপুরের দেবীপ্রসাদ বসু এক জন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। দেবীপ্রসাদের বয়স ষাইট বৎসর হইবে। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ গিরিশের এক পুত্র হইয়াছে, তাহার নাম বিজয়। বিজয়ের বয়স চারি বৎসর হইয়াছে। কনিষ্ঠ মাধব এখনও অপত্যহীন। দেবীপ্রসাদের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার কাল হইয়াছে। বিধবা ভ্রাতৃজায়ার সন্তান নাই। দেবীপ্রসাদের সন্তানেরা তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকে ছোট মা বলিয়া ডাকেন। ছোট মাই সংসারের কর্ত্রীস্বরূপা। লোককে দেওয়া থোওয়া যা কিছু, সবই ছোট মার হাতে। দামী কাপড়চোপড় গহনাপত্র প্রভৃতি যে সব বাক্সে থাকে, তার চাবিও ছোট মাই রাখেন। তিনি বিধবা হইলে দেবীপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী পরামর্শ করিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গ্রামে দেবীপ্রসাদের স্ত্রী ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া যথাক্রমে বড় গিন্নি ও ছোট গিন্নি নামে পরিচিতা।

বোসেরা বুনিয়াদি লোক। বাড়ীর ভিতরে চকমিলানো দোতলা কোটা। বাহিরবাড়ীতে পূজার দালান, বৈঠকখানা এবং কাছারিঘরও পাকা। গ্রামের লোকে তাঁহাদের বাড়ীকে বড় বাড়ী বা বাবুদের বাড়ী বলিয়া থাকে।

৩

দেবীপ্রসাদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হয়। আমরা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। এই সময়ে বেণীপুরের বোসেদের বাড়ীতে পূজায় বড়ই সমারোহ হইত। দেবীপ্রসাদ নিষ্ঠাবান হিন্দু। দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁহার ভক্তি অসীম। পূজা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের হেতু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সারা বৎসর ধরিয়া তিনি পূজার উদ্যোগ, পূজার আয়োজন করিতেন। মনে করিতেন, পূজাই হিন্দু গৃহস্থের সাংসারিক নিত্য ব্রতের বার্ষিক উদ্‌যাপন; সংবৎসর আয়োজন উদ্যোগ করিয়া, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এই উদ্‌যাপনে গৃহস্থের বার্ষিক সঞ্চয়ের অধিকাংশ ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

পূজার কয়েক দিন ধরিয়া দেবীপ্রসাদ অকাতরে অসংখ্য লোককে অন্ন দান করিতেন। কিসে লোকে ভাল খাইবে, কেমন করিয়া কোথা হইতে কি নূতন জিনিস আনা যাইবে, পূজার পূর্ব্বে কেবল এই চিন্তাই তাঁহার মনে আসিত। তাঁহার এক আত্মীয় মেদিনীপুরে চাকরি করিতেন; তিনি একবার কতকগুলি মিঠা পান আনিয়া দেবীপ্রসাদকে দিয়াছিলেন। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, পূজার সময়ে তুমি এই পান দু' তিন হাজার পাঠাইবে;—আমি দাম পাঠাইয়া দিব। কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরি ভাল বলিয়া দেবীপ্রসাদ প্রতি পূজায় তথা হইতে দু' জন লোক আনাইতেন, এবং বাড়ীতে সরভাজা সরপুরি প্রস্তুত করাইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে খাওয়াইতেন।

বস্তুতঃ, দেবীপ্রসাদ যাহা ব্যয় করিতেন, তাহার অধিকাংশই লোকের আহারের নিমিত্ত। গৃহসংস্কার, অলঙ্কারনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য, সেকালের পল্লীগ্রামের পূজার অঙ্গীভূত ছিল না।

আজ কাল এই ভাবের পূজা কমিয়া আসিতেছে। আমাদের কোনও রহস্যপটু বন্ধু, তাঁহার রচিত একটি তর্জ্জা গানে, দেবদেবীবন্দনার স্থলে, দেবী দশভুজাকে "দ্বাদশ-দিন-ছুটি-প্রদায়িনী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এখন তেমন ভাবে পূজা করিব, লোক জন খাওয়াইব,—সে প্রাণ, সে স্ফূর্ত্তি, আমাদের নাই। পূজার সময়ে খাটুনির বিরাম হয় বলিয়াই যেন আমাদের আনন্দ। দেবীপ্রসাদের সময়ে নিয়ম বিপরীত ছিল। তখন সারা বৎসরের পরিশ্রম পূজার সময়ে করিতে হইত। বাড়ীর লোকে পূজার কয় দিন প্রায় অনাহার অনিদ্রায় কাটাইতেন। রাত্রি দু'টার সময়ে গেলেও দেখা যাইত, হয় দেবীপ্রসাদ, না হয় তাঁহার কোনও পুত্র, আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছেন।

জিনিসটা গিয়াছে, বা যাইতে বসিয়াছে; কিন্তু কথাটা আছে। এখনও আমরা "দুর্গোৎসব ব্যাপার," "দুর্গোৎসবের আয়োজন" বলিলে, একটা মহা ব্যাপার, মহা আয়োজনই বুঝিয়া থাকি। বঙ্গের সাধারণ লোকে ইহাকে বড় পূজা বলিয়া থাকে। শুধু "পূজা" বলিলেও কেবল দুর্গোৎসবই বুঝায়। এমন পূজা ত আর নাই!

৪

বোসেদের বাড়ীর অতি নিকটে দীননাথ দাস নামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। দীননাথের দু' চারি বিঘা জমি ছিল। তাহার ফসলেই তাঁহার

একরূপ চলিয়া যাইত। দীননাথ সামান্যরূপ লেখা পড়া জানিতেন। দীননাথ শৈশবে অভিভাবকহীন। তদবধি দেবীপ্রসাদের আশ্রিত। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। দেবীপ্রসাদ সাহায্য করিয়া তাঁহার বিবাহ দিয়া দেন। দীননাথ পাঁচ বৎসরের এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। দেবীপ্রসাদের অনুগ্রহে, দীননাথের স্ত্রী কন্যাটির কুলীন বরের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অদৃষ্টদোষে সেই কন্যা আঠার বৎসর বয়সে তিন বৎসরের একটি পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছে। শ্বশুরালয়ের অবস্থা সচ্ছল নহে। তাহার স্বামীই উপার্জ্জনক্ষম ছিল। মার অবস্থাও ততোধিক। বিধবা হইবার পর সে একবার আসিয়া মাকে দেখিয়া গিয়াছে। এবারে পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে দীননাথের স্ত্রী একদিন দেবীপ্রসাদের গৃহিণীর সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন, "ডুলি-ভাড়া দিতে পাল্লে পূজার সময়ে একবার মেয়েটাকে আন্‌তাম।" বড় গিন্নি বলিয়া দেন, "তুমি তাকে আন্‌তে পাঠাও, বেহারার টাকা আমি দিব।"

দীননাথকে বোসেদের বাড়ীর সকলেই ভালবাসিতেন। দীননাথ উপকারী লোক ছিলেন। দেবীপ্রসাদ বা তাঁহার কোনও পুত্র যখনই কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছেন, দীননাথ তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেন। পুত্রদের সঙ্গে তিনি অভিভাবকের ন্যায় থাকিতেন। প্রয়োজন হইলে কখনও পাচকের এবং সময়ে সময়ে তিনি ভৃত্যের কাজও করিতেন। কেহই কিন্তু দীননাথকে অবজ্ঞা করিতেন না। দীননাথ দেবীপ্রসাদকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। গিরিশ এবং মাধব তাঁহাকে দীনু খুড়ো বলিতেন।

দীননাথের গুণ স্মরণ করিয়া বড় গিন্নি তাঁহার বিধবা পত্নীকেও বড় ভাল-বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে দু' একটি টাকা দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন। তখন-কার দিনের হিন্দুগৃহের পুত্রবতী রমণীরা সাধারণতঃ দয়ার আধার ছিলেন।

৫

বেণীপুরে পনের ষোল ঘর কায়স্থের বাস। ষষ্ঠী হইতে বিজয়ার দিন পর্য্যন্ত ইহাদের কাহাকেও উনুনে হাঁড়ি চড়াইতে হইত না। সকলেই পূজাবাড়ীতে প্রসাদ পাইতেন। বেণীপুরে আর কোনও বাড়ীতে পূজা নাই। নিকটে দুই গ্রামে দুই বাড়ীতে পূজা হইত। গ্রামের কেহ কেহ সেখানে গিয়া দুই বেলা নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেন। বাকি কয় বেলাই বোসেদের বাড়ীতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার চলিত।

বলা কর্ত্তব্য যে, গ্রামের লোকে যে কেবল নিমন্ত্রিতের ন্যায় উদরের ব্যাপার

নিষ্পন্ন করিত, তাহা নহে। পূজার কয়েক দিন ধরিয়া তাহারা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই বোসেদের বাড়ীতে থাকিত; এবং স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর ভিতরে ও পুরুষেরা বাহিরে, অম্লানচিত্তে ও অক্লান্তদেহে পরিশ্রম করিত। কোনও কোনও বাড়ীতে দু' এক জন বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য লোক থাকিত। কেহ কেহ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ক'দিনের মত আসিয়া বোসেদের বাড়ীতে উঠিত। দুই চারি জন রাত্রিতে বাড়ী যাইত। সকলেই মনে করিত, যেন পূজা গ্রামস্থ সকলেরই। পূজার কথা লইয়া তাহারা অন্য গ্রামের লোকের সহিত জাঁক করিত। অন্য গ্রামের পূজায় কিরূপ যাত্রার বায়না হইল, বা হইবে, তাহার সংবাদ লইয়া তাহারা গিরিশ বাবুকে উস্কাইত,—"ওদের চাইতে ভাল যাত্রা আন্‌তে হবে।"

পূজার দেবার্চ্চনা এবং আহার-অঙ্গ বৃদ্ধ দেবীপ্রসাদের দৃষ্টির বিষয় ছিল। যাত্রা প্রভৃতি আমোদ-অঙ্গ গিরিশ বাবুর বিবেচনাধীন। গ্রামের বৃদ্ধদিগের সহিত দেবীপ্রসাদ পরামর্শ করিতেন। গিরিশ বাবুর কথায় যুবকেরা খাটিত। কোনও কার্য্যে কোথাও যাইতে হইবে শুনিলে, এক জনের যায়গায় পাঁচ জন দাঁড়াইত।

সময়ের পরিবর্ত্তনে পল্লীগ্রামের এ ভাবও চলিয়া যাইতেছে। শিক্ষায় আমাদের পরশ্রীকাতরতা কমাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেকালের সে সরলতা ও মেশামিশির ভাবটাও যেন লোপ পাইতেছে। তখন অশিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেক সময়ে দলাদলি থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে গ্রামে দেবীপ্রসাদের ন্যায় লোকের বাস, সেখানে পরস্পরের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব ও প্রীতি লক্ষিত হইত।

৬

দীননাথের কন্যার নাম সুরধুনী। কিন্তু বাপের বাড়ীতে এখনও সেই শৈশবের সুরি নাম ঘুচে নাই।

১২৭৯ সালের দুর্গোৎসবের সপ্তমী পূজার দিন বেলা তিনটার সময় সুরি পিত্রালয়ে পঁহুছে।

গ্রামের যে সকল বিধবার অন্য বিধবার হাতে খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহাদেরই জন্য দীননাথের স্ত্রী বোসেদের বাড়ীতে রন্ধন করিতেছিলেন। পাক শেষ হইলে তিনি গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িতে যাইবেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, তাঁহার কন্যা আসিয়াছে। তিনি ঘরের কবাট বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন; বড় গিন্নিকে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী গেলেন।

দু' চারি কথার পরেই জননী কন্যাকে বড় বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ

করিলেন। দুঃখিনী বিধবা তাহাতেই আপত্তি করিতেছিল। মনে ব্যথা থাকিলে, আমোদের বা উৎসবের স্থানে যাইতে ইচ্ছাই হয় না।

এ দিকে দীননাথের স্ত্রীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া দেবীপ্রসাদের গৃহিণী অন্য একটি বিধবাকে তাহাদের অন্ন পরিবেশন করিতে বলিয়া, নিজে সুরির মাকে ডাকিতে গেলেন।

বেলা শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের জলপান, কায়স্থদের ভোজন ও সধবাদিগের আহার হইয়া গিয়াছে। দুঃখী, কাঙ্গালী ও চাকরেরাও খাইয়াছে। কেবল বিধবাদের বাকি। গৃহিণী ছুটাছুটি করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও জল-গ্রহণ করেন নাই। আরতি শেষ হইয়া গেলে কর্ত্তা আহার করিবেন। গৃহিণী তার পরে।

তিনি ডাকিবামাত্রই দীননাথের স্ত্রী ও কন্যা তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। রন্ধনশালার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেবীপ্রসাদের গৃহিণী কহিলেন, "সুরির মা, সুরিকে খাইয়ে দাও, তুমি খাও, আমি দেখে আস্‌ছি—মাছ আছে কি না। ওর ছেলেটাকে দু'খানা মাছ দিতে বলি।"

সুরধুনী বলিল, "আপনি আর মাছ দেখতে যাবেন না। খোকা আমার সঙ্গেই যা হয় দুটো খাবে এখন।"

গৃহিণী জিদ করিলেন, "কেন রে? মাছ আছে। তোর ছেলেকে আমার সঙ্গে দে। আমি ওকে মাছের ঘরের বারাণ্ডায় খাইয়ে দিচ্ছি।"

সু। না জ্যাঠাইমা, ও ভারী দুরন্ত।

গৃহিণী। হ'ক দুরন্ত। দুরন্তপনা কল্লে ওর কান কেটে দেবো।

এই বলিয়া তিনি সুরধুনীর ছেলেটির হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, "সুরি, খাওয়া হলে তোর ছেলেকে নিয়ে ওপরে বউমাদের কাছে যাস্‌। সুরির মা, সুরিকে দিয়ে এস।"

৭

আহারান্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুরধুনী পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া উপরে গেল। উপরে এক সারি ঘর আছে,—যাহার জানালা হইতে বাহিরবাড়ীতে দৃষ্টি চলে। সমস্ত জানালাতেই চিক দেওয়া। সুরধুনী দেখিল, এই ঘরগুলি স্ত্রীলোকে পুরিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রায় সকলেই, এবং কুটুম্বালয়ের অনেকেই সেখানে সমাগত। তাহাদের শিশু পুত্র কন্যারাও অবশ্য সেখানে। কেহ ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন; কাহারও ছেলে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে; কেহ বা

ছুটাছুটি করিতেছে। গিরিশ বাবুর পুত্র বিজয় খেলিতেছিল। তার মা মাধবের স্ত্রী ও অন্য দু' এক জনকে সঙ্গে লইয়া পান সাজিতেছিলেন।

পূজার সময়ে পান সাজা, জল খাবার সাজানো, ইত্যাদি মিহি কাজের ভার যুবতীদিগের উপর। রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি প্রৌঢ়ারা করিয়া থাকেন।

সুরধুনীর জননী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সিঁড়ির উপর থাকিয়াই তিনি কন্যাকে কহিলেন, "যা, ঐ যে বউমারা পান সাজছেন্।" তিনি সরিয়া যাইতেই বড় বধূ ডাকিলেন,—"এস ঠাকুরঝি, এস। আয় বসন্ত, আয়।"

সুরধুনীর ছেলের নাম বসন্ত। সে মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছিল।

বসন্তের চেহারা মন্দ ছিল না। চক্ষুর্দ্বয় মেধাব্যঞ্জক। কিন্তু মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে দরিদ্রতার কালিমা-মাখানো।

বড় বধূ কহিলেন, "ঠাকুরঝি! তোমার ছেলে বিজয়ের সঙ্গে খেলা করুক; তুমি এসে সুপুরি কাটো কি পান সাজো।"

সুরধুনী কহিল, "ছেলেটি আমার বড় ঠাণ্ডা নয়।"

বড় বধূ। ঠাকুর জামাই ত খুব ঠাণ্ডা ছিলেন। ছেলে অমন হ'ল কেন?

এই কথায় ছোট বধুর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সুরধুনী কোনও উত্তর না দিয়া ছেলেটিকে বিজয়ের কাছে দিয়া আসিল। সে দেখিল, তখনও রাশী-কৃত পান সাজিতে বাকি রহিয়াছে। সে বড় বধূ ও ছোট বধুর সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল।

তখন পল্লীগ্রামে যাত্রার কাছে পানের দোকান বসিত না। আজ কাল বসে। শ্রোতৃবর্গ সে সময়ে পূজাবাড়ী হইতেই পান পাইতেন।

৮

বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। দেবীপ্রসাদ পূজার দালানেই বসিয়া আছেন। প্রত্যূষে প্রাতঃস্নান করিয়া তিনি সেখানে গিয়াছেন। পূজা কোনও রূপে অঙ্গহীন না হয়, কোনও অভ্যাগতের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ত্রুটী না হয়, ইহাই তিনি দেখিতেন। পূজা শেষ হইয়া গেলে ব্রাহ্মণদিগের জলপান, কায়স্থদিগের ভোজন, কাঙ্গালীর আহার, তিনি দেখিয়াছেন। দেবীপ্রসাদের আদর, অন্তরে ও ব্যবহারে। মুখে তেমন প্রকাশ নাই। পাঁচটার সময়ে একজন বৈরাগী আসিয়া রামপ্রসাদের শান্তিরসাত্মক গান গাহিতেছে। দেবীপ্রসাদ ও সমাগত

লোকেরা তাহাই শুনিতেছেন। গীত শেষ হইলে একটা শব্দ উঠিল,—"শীতল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়াছেন!"

শীতল একজন ভোজনপটু ব্রাহ্মণ। প্রতি বৎসর পূজার সময়েই ইনি আসিয়া থাকেন। সপ্তমী অষ্টমী নবমী ঠিক নাই। সাধারণতঃ ইনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দেখা দেন। দেবীপ্রসাদের বাড়ীতে পূজার ক'দিন ব্রাহ্মণ যে কোন সময়ে আসিলেই আহার পান।

শীতল কায়স্থের বাড়ীতে লুচি তরকারি ইত্যাদি খান না। খান সুধু দই, ক্ষীর, আর মিষ্টি। তাহাই এমন খান যে, তাঁহার জল খাওয়া দেখিবার জন্য লোক দাঁড়াইয়া যায়। কথিত আছে যে, ১২২৫ সালে যে সমস্ত উদরসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ নলডাঙ্গার রাজবাড়ীতে আহার করিয়া মর্ত্ত্যধামে নিদারুণ বিসূচিকা রোগ আনয়ন করেন, শীতলের পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন। আহারের নিমিত্ত শীতল কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

শীতল পাদপ্রক্ষালন করিলেন। তাঁহার জলযোগের উদ্যোগ হইতে লাগিল। চারিদিকে লোক ফিরিয়া দাঁড়াইল। উপর হইতে রমণীগণ দেখিতে লাগিলেন। শীতলের বয়স সত্তর বৎসর হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার শরীর দেখিলে বুঝা যায় যে, বয়সকালে তিনি একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে শীতল ছ' সের ক্ষীর, তিন সের রসগোল্লা, চারি সের সন্দেশ ও পাঁচ সের দধি উদরস্থ করিলেন। আহারান্তে কহিলেন, "আর সে দিন নাই, আহার কমিয়াছে!" দেবীপ্রসাদ তখনও জিদ্ করিতে লাগিলেন, "আর কিছু নিন্।" তিনি তাঁহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক আহার করিতে দেখিয়াছিলেন।

৯

আচমন করিয়া হরিতকী চর্ব্বণ করিতে করিতে শীতল গল্প আরম্ভ করিলেন, "দাদা গেছ্‌লেন একবার গঙ্গাস্নানে। কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্যদের নাম শুনে ভাবলেন, কিছু ওষুধ নিয়ে যাই। দাদার তখন একটু অগ্নিমান্দ্যের মত হয়েছিল। তাতেও কিন্তু তিন সের চালের অন্নধ্বংস কর্ত্তে পার্ত্তেন। রাস্তায় এক বাড়ীতে অতিথি হন। গৃহস্থ রীতিমত সিদে দেয়। দাদা সেই আধ সের আন্দাজ চাল চালজলের মত খেয়ে বসে আছেন। খানিক বাদে বাড়ীর কর্ত্তা এসে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'আপনি পাক কচ্ছেন না?' দাদা উত্তর কল্লেন, 'চাল পাই নি।' 'চাল দিয়েছিল ত?' 'সে অল্প ছটো আমি চাল-জল খেয়েছি।'

শেষে গৃহস্থ তিন চারি সের চাল আনিয়া দিলেন। দাদা আহারে বসিলে গৃহস্থ এসে দেখেন যে, সব অন্নই উঠে গেল। আহার হয়ে গেলে তিনি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু কোথায় যাচ্ছেন?' দাদা বল্লেন, 'কাঁচড়াপাড়া।' 'কেন?' উত্তর হল, 'চিকিৎসার জন্য।' 'আপনার ব্যারাম কি?' 'অরুচি!' গৃহস্থ আর কিছু না বলিয়া কহিলেন, 'চিকিৎসা হবার পরও কি এই দিক দিয়া ফিরবেন?'"

চারিদিকে হো হো হাসির শব্দ পড়িয়া গেল। ভোজনসম্বন্ধে শীতলের অনেক গল্প ছিল। "বেলা শেষ হইল" বলিয়া তিনি আর বসিলেন না। দেবী-প্রসাদ তাঁহাকে দক্ষিণা ও প্রণামী দিয়া বিদায় করিয়া, যাইবার সময়ে হাস্যমুখে কহিলেন, "মধ্যে মধ্যে যেন পায়ের ধূলা পড়ে।"

এখনকার দিনে শীতলের ন্যায় ব্রাহ্মণ বা অতিথি দেখিলে, আমরা বোধ হয় তাড়াইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে জিদ করিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া খাওয়াইলেন। সমাজের দেবীপ্রসাদেরা পলায়ন করিতেছেন বলিয়াই শীতলের ন্যায় ব্রাহ্মণেরও অন্তর্দ্ধান হইতেছে। শীতলের বংশধরেরা নানা উপায়ে জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। গত বৎসর পল্লীগ্রামের এক পূজার আমরা প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ পুরোহিত দেখিয়া আসিয়াছি।

বলিতে পার, সময়ের সহিত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দশ জন লোককে আহার দিতে যাহা লাগিত, এখন হয় ত চারি জন লোককে খাওয়াইতে তাহাই লাগে। তখনকার দিনে যে ব্যয়ে সংসার চলিত, এখন তাহা চলে না। ইহাও ঠিক যে, এক এক কন্যার বিবাহেই অনেকের উপর সেকালের দুই দুর্গোৎসবের চাপ পড়ে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের মধ্যে অন্নদান, বস্ত্রদান প্রভৃতির প্রবৃত্তি ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। এখন আমাদের মৌখিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের কিছু বাড়াবাড়ি। কিন্তু মনে মনে যেন আমরা অনেকেই এই মত পোষণ করিতে শিখিতেছি যে, "বর্ব্বরেরা দেয় খানা, বুদ্ধিমানে খায়।"

১০

বসন্ত, বিজয়ের প্রতি হুকুম চালাইতে লাগিল। বিজয় বড়মানুষের ছেলে, আর সে দরিদ্র, এ পার্থক্য বুঝিবার বয়স এখনও তাহার হয় নাই। পৃথিবীর পার্থক্য, অত্যাচার বুঝিতে পারে না বলিয়াই ত শিশুরা এত সুখী!

অল্পক্ষণেই বসন্ত তাহার দুরন্তপনা দেখাইল। আধ ঘণ্টা না যাইতে

যাইতেই সে বিজয়ের দুই তিনটি খেল্‌না ও কাঁচের পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বিজয় শেষে বড়ই চটিয়া গেল। "যাও, তোমার সঙ্গে খেল্‌ব না" বলিয়া সে তাহাকে এক ধাক্কা মারিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ছোট গিন্নি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ছি দাদা, ওকি? তোমার বাড়ীতে পূজো; তোমার কি কাউকে কিছু বল্‌তে আছে?"

বিজয় ভাঙ্গা জিনিসগুলি দেখাইয়া কহিল, "দেখ ত কি করেছে?"

ছোট গিন্নি কহিলেন, "তা করুক। আমি কালই আবার ও সব তোমাকে এনে দেব।"

বিজয় ইহাতেই চুপ করিল।

বিজয় ও বসন্ত দৃষ্টির বাহিরে থাকিলেও, সুরধুনীর কান সেই দিকেই ছিল। শীতল চক্রবর্ত্তীর জলযোগ তাহাকে একটু অন্যমনস্ক করিয়াছিল। সহসা ছোট গিন্নির কথা তাহার কানে প্রবেশ করিল। সে নিশ্চয়ঃবুঝিল, পুত্র কিছু অন্যায় করিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সে ভাঙ্গা খেল্‌না দেখিতে পাইল, এবং বসন্তের গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল।

বসন্ত অবশ্য কাঁদিয়া উঠিল। ছোট গিন্নি বিজয়কে ছাড়িয়া দিয়া বসন্তকে কোলে করিলেন। অশিষ্ট বালক মাকে ফিরাইয়া মারিবার জন্য পুনঃপুনঃ কোল হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ছোট গিন্নি তাহাকে নামিতে দিলেন না, কিন্তু তাহার মাকে বকিতে লাগিলেন,—

"বছরকার দিনে ছেলেটাকে মাল্লি কেন? তুই ভারী যা'চ্ছেতাই।"

সু। ওকে নিয়ে আমার কোথাও মুখ পাবার যো নাই, খুড়ীমা। এই ছেড়ে দিয়ে গিয়েছি, দেখ, এর মধ্যেই কি কারখানা করেছে—

ছো। কি কর্‌বি তা বলে? ছেলে মানুষ, বুদ্ধি হলেই সেরে যাবে।

এই সময়ে বড় গিন্নি উপরে আসিলেন। "কি, হয়েছে কি?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করায়, ছোট গিন্নি তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন।

বড় গিন্নিও বসন্তের গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুরধুনীকে বকিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরধুনী অপ্রস্তত হইয়া পান সাজিবার যায়গায় ফিরিয়া গেল।

বড় গিন্নি ছোট গিন্নিকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে গিরিশ বাবু উপরে আসিলেন, এবং কহিলেন, "ছোট মা! আমি নিমন্ত্রণ খেতে যাই।"

ছোট মা। কেন, মাধব? সে যাবে না?

গি। মাধবের মাথা ধরেছে ;—ক'দিন যে খেটেছে। বাবা বল্লেন আমাকে যেতে।

ছোট মা। যাও, রাত্ করো না। শীগ্গির ফিরে এস।

গি। যেমন যাব, অমনই আস্‌ব। নৌকায় যাচ্ছি। জ্যোৎস্না রাত আছে।

ছোট মা। মাধবকে উপরে এসে শুয়ে থাকৃতে বল।

১১

বসন্ত তখনও ছোটমার কাছে দাঁড়াইয়া।

কাঁধে চাদর্ ফেলিতে ফেলিতে গিরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে, ছোট মা ?"

ছোট মা। চিনতে পাল্লে না ? তোমার ও বাড়ীর খুড়োর নাতি।

গি। আমি ওকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। মধ্যে ওরা একবার এসেছিল। আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। ওর মা এসেছে বুঝি ?

বড় মা নিকটেই ছিলেন। তিনি কহিলেন, "হাঁ। আমিই আন্‌তে পাঠিয়েছিলুম।"

বড় মা আসিয়া ছোট মা ও গিরিশ বাবুর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং আস্তে আস্তে দু'জনকেই বলিতে লাগিলেন, "মেয়েটা শ্বশুরবাড়ীতে বড়ই কষ্টে থাকে। তাদের কিছু নাই। দেখতে পাচ্ছ না ছেলেটার অবস্থা ?"

ছোট মা কহিলেন,"ওর মা ত পাবেই,ওকেও এক জোড়া কাপড় দিতে হয়।"

বড়। তাই একটু ভাল দেখে। আমি যখন ওর মাকে আর দিদিমাকে ডাকতে যাই, তখন বোধ হয় মায়ে ঝিয়ে কাঁদছিল। আমি ডাকতেই দু'জনে উঠে এল। দেখলাম, দু'জনেরই চোখ ড্যাবডেবে। ছেলেটার কাপড় নাই, জুতো নাই, বোধ হয়, তাইতে মেয়েটা আস্‌তে ইতস্ততঃ কচ্ছিল।

গি। কি করবো ? এখানকার দোকানে ত ভাল দিশী কাপড় নাই। আমাদের পূজোর কাপড়ও প্রায় বিলি হয়ে গেছে। যদি একটু আগে বলতে। ছেলেপিলের কাপড় ত খুব বেশী আনা হয় না।

বড়। খোকা পূজোয় যে সব কাপড় পেয়েছে, তার এক জোড়া দিলে হয় না ?

গি। বেশ হয়, ওরা ত এক-বয়সী। ছোট মা, খোকার এক জোড়া কাপড় এনে ওকে দাও। দীনু খুড়ো যে ভালবাসতেন আমাদের—তাঁর নাম রাখতে ত আছে কেবল ঐ।

বলিতে বলিতে ছোট মা এক জোড়া রেশমী-পেড়ে দেশী কাপড় লইয়া আসিলেন। সুরধুনীকে ডাকিলেন, "সুরি! এ দিকে আয়।"

সুরধুনী আসিয়া গিরিশের পায়ে এক নমস্কার করিল।

ছোট মা কহিলেন, "তোর দাদা তোর ছেলেকে এই কাপড় দিলে।"

কাপড় জোড়া হাতে লইয়া সুরি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল। কহিল, "এত ভাল কাপড় নিয়ে ও কি করবে?"

গি। তা হ'ক, তুই নে। আমি তোর ছেলের এক যোড়া জুতো কিনে দেবো। একটা পোষাক করে দেবো।

সু। পোষাক টোষাক চাইনে দাদা, ওকে মানুষ করে দিও।

গি। তা দেবো।—ও বেঁচে থাক, ওকে বিজয়ের সঙ্গে রেখে দেবো।

সুরধুনীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু ছুটিল।

দরিদ্রা বিধবার প্রাণের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে কুড়াইতে গিরিশচন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

এই সময়ে নীচে কাঙ্গালী-বিদায়ের ন্যায় একটা গোল উঠিল। নিকটস্থ যে সমস্ত সামান্য গৃহস্থদের স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতিমা দেখিতে আসে, তাহারা বোসেদের বাড়ীতে তেল পান সুপারি পাইয়া থাকে। সেই সকল স্ত্রীলোকে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে।

ইহা একটু পরেই সান্ধ্য আরতি;—তার পর নৈশ আহার; পরে ক্ষণিক আরাম; শেষে সেই সাবেকী আমোদ—যাত্রার আয়োজন।

পূজা 'একদিনও যা, তিন দিনও তা।' আমরা এক দিনের তিন ঘণ্টার সামান্য চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। পল্লীগ্রামে এখনও দু'একজন বৃদ্ধ হিন্দুর বাড়ীতে দেবীপ্রসাদের পূজার ন্যায় পূজা হইয়া থাকে। কিছু দিন পরে হয় ত এমন পূজা আর দেখিতে পাইব না!

আগন্তুক।

কি গো! তুমি কে আবার! বলি কোথা হতে!
কি চাও?—কি মনে করে এ বিশ্বজগতে!
এই দ্বন্দ, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
—এই স্বার্থ, এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-ভরা নীচ মর্ত্ত্যভূমি-
মাঝখানে—বলি—ওগো—কে আবার তুমি?
কি দেখিছ চারি দিকে চেয়ে আগন্তুক?
এ শৌণ্ডিকালয়। এর দুঃখ, এর সুখ
মাতালের।—দেখিছ না মদ্যপাত্র হাতে
কেহ হাঃ হাঃ অট্টহাসে; কেহ কার সাথে
করে বাগ্বিতণ্ডা কিম্বা বাহুযুদ্ধ; কেহ
একধারে বিস্তারিয়া তার স্ফীত দেহ
প্রবল নাসিকাধ্বনি করি' নিদ্রা যায়;
কেহ বকে; কেহ কাঁদে; কেহ নাচে গায়;
কেহ মদ্য খায়; তাহা কেহ বা উদ্গারে;
কেহ বা ঝিমোয় দূরে বসি একধারে
মদ্যপাত্র হাতে; কেহ অকারণ রেগে
কারো নাসা কামড়ায় গিয়া তীব্রবেগে;
(সে হয় ত এক গণ্ডে কামড়ালে দিত,
ফিরায়ে অপর গণ্ড; কিন্তু বিধি তায়
দিয়াছেন একটি নাসিকামাত্র সবে,
কোথা পাবে অন্য নাসা ফিরাইতে? হয়ে
সে জন্য অনন্যোপায়) কেশে ধরি তার
লাঞ্ছনা করিছে বিধিমত।—এ আগার
প্রকাণ্ড শৌণ্ডিকালয়।—অতিথি! হেথায়
কেন তব আগমন—শিশু! নিঃসহায়?
—কি এ সুরা? তীব্র ধনলিপ্সা। জন্য যার
এ অধম নর করে নিত্য হাহাকার,
দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, নিত্য সাধাসাধি,
চৌর্য্য, হত্যা, দাস্য, শাঠ্য—খুঁজিতে উপাধি—
ব্যগ্র, উগ্র, করে ফৌজদারি আদালত,
ভণ্ডামী।—ইহারই জন্য সংসার বৃহৎ
অরণ্য; মনুষ্য তায় হিংস্র জন্তু মত
উত্তম শিকারে শুদ্ধ ফিরিছে নিয়ত।
কোথা হ'তে ক্ষরিয়াছে মধু—অমনি এ
ব্যগ্র পিপীলিকাদল সারি সারি গিয়ে
চায় স্বাদ, মিটাইতে-কাল্পনিক ক্ষুধা
অমর হইতে যেন পিয়ে সেই সুধা!
কোথায় ক্ষরেছে ব্রণ—মক্ষিকার মত
ছুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ব্রণক্ষত
লক্ষ্য করি'। (হায় নর! হা অন্ধ মানব!
এই চেষ্টা, এ বিপুল উদ্যম—এ সব
ভস্মে ঘৃত ঢালা।)—সেই সংসার-বিগ্রহে
যোগ দিতে এসেছ কি? না না তাহা নহে।
তুমি শুদ্ধ, তুমি শান্ত। বল কি স্বর্গীয়
সন্দেশ এনেছ শুনি।—এস মম প্রিয়,
নেত্রাঞ্জন, হৃদয়রঞ্জন—এস নেমে
স্বর্গ হ'তে সুকুমার সুপবিত্র প্রেমে
বিরঞ্জিত স্বর্গদূত। তুমি শুধু কহ—
"এসেছি, আমারে ভালবাস, কোলে লহ,
দুগ্ধ দাও"—তুমি বল,—"তোমরা কে তাহা
জানি না, চিনি না; তবু আমি চাহি যাহা
তাহা দিবে জানি—আছে সে টুকু মমতা।
আর, নাহি থাকে যদি—শোন এক কথা—
আমি এমনই মন্ত্র জানি—সারি সারি
কালসর্প সম সবে খেলাইতে পারি,
দংশিতে ভুলিয়া যাবে দংশিতেই আসি
সেই মন্ত্রে।—সেই এক মন্ত্র মোর হাসি।
"আরও এক মন্ত্র জানি। সে কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র।
যদিও উল্লেখ তার কোন হিন্দু শাস্ত্র
খুঁজে পাবে নাক! সেই দিব্য মন্ত্রবলে,
দি গ্বিজয়ী আমি; তাহা মাতৃবক্ষঃস্থলে
খাটে সর্ব্বাপেক্ষা; আর অন্যে নিরুপায়
হাজারই বিরক্ত হোক ভাবে খুব দায়।
হয় সব বিপর্য্যস্ত মুহূর্ত্তে অমনি—
সে অস্ত্র এ ক্ষীণ কণ্ঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।
যা চাই তা দিতে হবে, কোন তর্ক যুক্তি
নিষ্ফল, যা চাই দাও, তবে পাবে মুক্তি।"
—কি দেখিছ? পরিচয় করিতে কি চাও
আমাদের সঙ্গে? যাঁর স্তন্যদুগ্ধ খাও
ইনি তোর মাতা; উনি মাসী; ইনি পিসী;
ইনি কাকী; উনি জ্যেঠী; যাঁর দাঁতে মিশি

উনি মামী ; উনি দিদি, ইনি মাতামহী।
উনি পিতামহী ; ইনি—না না আমি নহি,
এই ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতামহ ; আর আমি—
আমরা—এঁহেম্—সব ওঁয়াদেরই স্বামী।
আজি শুয়ে মাংসপিণ্ডসম ; উর্দ্ধে চাও,
চাও চারিদিকে ; নাড়ো হস্তপদ ; দাও
করতালি ; কর হাস্য ; জ্বলিলে জঠরে
অগ্নি, কাঁদ মাতৃবক্ষঃস্তন্যদুগ্ধ তরে ;
সব দুঃখ—দৈহিক যন্ত্রণা কিম্বা ক্ষুধা ;
সব সুখ—পান করা মাতৃস্তন্যসুধা ;
ক্রীড়া—হস্তপদ সঞ্চালন একা একা ;
কার্য্য—শুধু নিদ্রা কিম্বা শুধু চেয়ে দেখা।
দ্বিতীয় অঙ্কেতে তুমি দাও হামাগুড়ি,
বেড়াও যে চতুষ্পদ ঘরময় জুড়ি'।
যা দেখ তা নিতে চাও ; যা পাও তা নিয়ে
দাও মুখমধ্যে পুরে ; সেই মুখ দিয়ে
চাও সব রাখিতে সে নিরাপদ গর্ত্তে,
পুরাইতে পারে নাই এত দিন মর্ত্ত্যে
যাহা কেহ কভু। তৃতীয় অঙ্কেতে গিয়া
একবারে চতুষ্পদ-অবস্থা ছাড়িয়া
দ্বিপদে উত্তীর্ণ। যাও পড়ি শতবার
অ[illegible] অধ্যবসায়ে উঠি চারিধার
কর পরিক্রম। কহি বিবিধ বচন,
'মা-মা দা-দা খাব নেব' আনন্দবর্দ্ধন
কর স্বজনের। কার্য্য করা গর্ত্ত পূর্ণ ;
দ্রব্যপ্রাপ্তিমাত্রে করা ছিন্ন কিম্বা চূর্ণ
মূল্য নাহি দিয়া। অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময়,
পৃথিবীর দ্রব্যে শুধু আবদ্ধ সে নয় ;
সূর্য্য চন্দ্র তারা,—তাও তোমার মৌরুষি !
না পাইলে সে ব্রহ্মাস্ত্র। কিসে থাকে খুসি
ভেবেই অস্থির সবে ;—সাধ্য কি অসাধ্য
সকল কামনা তোর পুরাতেই বাধ্য ?
চতুর্থ অঙ্কেতে জগতের এ নিষ্ঠুর
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের আয়োজন। দূর
নিভৃতে সাজায় যত্নে পিতামাতা বসি,'
দিয়া আগ্নেয়াস্ত্র, তীর-ধনু, চর্ম্ম অসি ;—
যাহার যা সাধ্য কিম্বা রুচি। নব দীক্ষা
বালকের ; মন্ত্রপাঠ, ব্যায়াম ও শিক্ষা ;
উদ্যম ও কর্ম্ম ; নীতি, ধর্ম্ম, জাগরণ—
[illegible] সেই সমরের যোগ্য আয়োজন।

পঞ্চম অঙ্কেতে সেই নিষ্ঠুর সংগ্রাম
জীবিকার জন্য। সেই নিত্য অবিশ্রাম
দ্বন্দ্ব। সেই অন্ধ দ্বন্দ্বে মাতা নহে মাতা ;
পিতা ?—অতীতের বস্তু। ভগ্নী কিম্বা ভ্রাতা—
সে আবার কারে বলে, সে ত প্রকৃতির
খেয়াল। পুত্র ও কন্যা ! নিত্যই অস্থির
তাদের বিবর্দ্ধমান সংখ্যায় ; স্বীকার্য্য
তবে এত দূর যে, তাহারা অনিবার্য্য।
প্রেম ? কারে বলে ! সে ত দৈহিক পিপাসা,
বন্ধুত্ব ত দু'দণ্ডের হাসি ও তামাসা,
গল্প ও গুজব। ভক্তি স্নেহ ? পড়ি বটে
উপন্যাসে ; ভালো লাগে আমার নিকটে
কবিতা কি গল্পে। তবে সত্য কি পদার্থ ?
সত্য রৌপ্য, সত্য নিজ সুখ, সত্য স্বার্থ।
অর্থ চাই অর্থ চাই—তাহার লাগিয়া
অনন্ত পিপাসা—মুখ ব্যাদান করিয়া—
উর্দ্ধকণ্ঠে তৃষ্ণাতুর চাতক যেমন
চায় জলবিন্দু ; চায় রৌপ্য নরগণ।
এ চীৎকার থামে শেষে সেই একাকারে,
সেই নিত্যপ্রধূমিত ঘন অন্ধকারে।
এস দিব্য, এস কান্ত, এস মিষ্টহাসি,
এস গৌরকান্তি, এস সুন্দর সন্ন্যাসী।
এস ধরাধামে বৎস। হেথা বিশ্বময়,
সকলই কদর্য্য নয়, সবই দ্বন্দ্ব নয়।
হেথা সব মেঘ ঝড় বজ্র ও আঁধার,
নয়। শুষ্ক মরুভূমি নয় সব তার।
—আছে উর্দ্ধে নীলাকাশ—শান্ত দিব্য স্থির,
অনন্ত অন্তর-ভরা স্নিগ্ধ সুগভীর
স্নেহে বক্ষে ধরি ধরণীরে। নিত্য তাহে
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র করুণনেত্রে চাহে
অনন্ত অনুকম্পায় ধরণীর পানে।
এখানেও সূর্য্য ওঠে। বিতরে এখানে
চন্দ্র দিব্যরশ্মি। দূরে কল্লোলিয়া যায়
উচ্ছ্বসিত স্বচ্ছ নীল জলধি। হেথায়
হাসে শ্যামা ধরিত্রী। আলেখ্যবৎ তাহে
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ রাজে ; অশ্রান্ত প্রবাহে
ধায় নদনদী ; ফোটে পুষ্প ; গায় পিক।
হেথা বহে বসন্ত-পবন দশ দিক
বিকম্পিত করি মৃদু সুস্নিগ্ধ পরশে ;—
আসে এক বার তাহা বরষে বরষে।

হেথা সবই কালসর্প, কীট ও কণ্টক
নয়; সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
নয়।—আছে হেথা নব শৈশবের মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া, যৌবনের চিরস্বত্ব,
প্রেমের রাজত্ব, বার্দ্ধক্যেও ক্ষীণ আশা—
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালবাসা
চিরপ্রবাহিত নির্ঝরের ধারাসম
অবারিত-উৎসারিত নিত্য মনোরম
চিরস্নিগ্ধ; সেই স্নেহ কভু নাহি যাচে
প্রতিদান।—হেথা দুঃখ আছে, সুখ আছে;
মিথ্যা আছে, সত্য আছে; উদ্বেগ ও ভয়
আছে; শান্তি ও ভরসা আছে। বিশ্বময়
সব স্থানে তুঁষ-মধ্যে ধান্য আছে;—তবে
শুদ্ধ সেই টুকু বৎস! বেছে নিতে হবে।
  এস, এই বিমিশ্রিত সুখ দুঃখ মাঝে,
প্রিয়তম। আর আমি (ব্যস্ত বড় কাজে
বেশী অবসর নাই) তোরে বক্ষে ধরি
কায়মনোবাক্যে এই আশীর্ব্বাদ করি—
সুখে থাকো সুখে রাখো;—আর বেছে নিও
সংসারে গরল হ'তে যে টুকু—অমিয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বটগাছের কথা।

আমি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ;—এই নদীতীরে সুদীর্ঘ শাখাবাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া তোমরা কি ভাবিতেছ জানি না। কিন্তু এক সময়ে আমি তোমাদেরই মত ছোট ছিলাম; প্রকৃতি-মাতা অতি ধীরে ধীরে আলোক ও উত্তাপে, জল ও বায়ুপ্রবাহে, তাঁহার সুললিত স্নেহস্তন্যদানে আমাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন; আমি অচলভাবে চিরদিন একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছি; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বুঝি আমাকে এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কাহার পথ চাহিয়া আমি দিবারাত্র দাঁড়াইয়া আছি জানি না, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারি না।

আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাক না থাক, আশা ও নিরাশার জীবন-ব্যাপী দ্বন্দ্বে হৃদয় ক্ষত করিয়া, আমি তোমাদের মত নিষ্ফল ক্রন্দনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করি না। তোমরা দেখ—আমার কোন কাজ নাই, কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি কোন কাজ করি না? তোমরা যাহাকে কাজ বল, তাহার অর্থ স্বার্থ; স্বার্থসিদ্ধি করিয়াই তোমাদের আনন্দ, সুতরাং তোমাদের আনন্দ দিয়া আমার আনন্দের পরিমাণ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের অপেক্ষা আমার আনন্দোচ্ছ্বাস অল্প নহে। কত দূর হইতে প্রতিদিন সহস্র পাখী আসিয়া আমার শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের প্রতি দিবসের গান, তাহাদের বিমুক্তবন্ধন স্বেচ্ছ-জীবনের নিত্য নব হর্ষ-কাকলি আমার কর্ণমূলে প্রতিদিন সুখস্বপ্নের ন্যায় ধ্বনিত হয়; কত পথশ্রান্ত

রৌদ্রক্লান্ত পান্থ আমার পদপ্রান্তে বসিয়া ক্লান্তি দূর করে; আমি ধীরে ধীরে তাহাদিগকে বীজন করি। কত দুর্ভাগ্য পথিক কত দিন আমার ছায়ায় বসিয়া তাহাদের রৌদ্রতপ্ত, মরুময় ব্যর্থ জীবনের দুঃখগাথা একান্তে তাহাদের সহচর-বর্গের নিকট ব্যক্ত করিয়াছে, শুনিয়া আমার কঠিন হৃদয়ও বিচলিত হইয়াছে; যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমার এই স্থূল বল্কল ভেদ করিয়া তাহাদের জন্য স্নেহের উৎস প্রবাহিত করিতাম।

অদূরে ঐ নদী দেখিতেছ, আজিকার বর্ষার প্রবল প্লাবনে প্রায় আমার মূলদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গ্রীষ্মের সময় উহা কিছু দূরে থাকে। আমার সম্মুখ দিয়াই নদীতে যাইবার পথ; এই পথ দিয়া স্নান করিয়া যাইবার সময়, বৈশাখী প্রভাতে পল্লীরমণীগণ আমার পাদমূলে জলধারা দান করিয়া নতমস্তকে প্রণাম করিয়া যায়, তাহাদের সজল কোমল কুন্তলস্পর্শে আমি ভক্তের মনোবাঞ্ছা বুঝিতে পারি।

আমার এই সুবিস্তীর্ণ কাণ্ডদেশ তোমরা সিন্দূররাশিতে চর্চ্চিত দেখিতে পাইতেছ? পল্লীযুবতীগণ প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার পাদমূলে ষষ্ঠীপূজা করিয়া যায়, কত জন আমার অবনত শাখায় পুষ্পমালা ঝুলাইয়া দেয়, কত রমণী প্রদোষে ভক্তিভরে মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া রাখে;—বিজন অরণ্যের প্রান্তে নির্জ্জন পথের ধারে তরুমূলে, এই ক্ষুদ্র প্রদীপ নিশাগমে অতি মৃদুরশ্মি বিকীর্ণ করে, তাহাদের অন্ধকার হৃদয়ের ভক্তির আলোকের ন্যায় তাহা স্নিগ্ধ। জানি না, তাহারা আমাকে এত ভক্তি করে কেন? জানি না, তাহাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাগুলি কখন সফল হইয়াছে কি না? কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেও আমার প্রতি তাহাদের ভক্তি অবিচল, আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা তাহারা পাপ বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাহাদের এই ভক্তি আমি স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারি না—সে ক্ষমতা আমার নাই। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিখিলজীবধাত্রী ধরিত্রীর যিনি আদি কারণ, সেই সর্ব্বভক্তির আধার অনন্ত দেবতার পদে প্রতিদিনের সঞ্চিত ভক্তি আমি সমর্পণ করি, আমি ধন্য হই, পুলকে আমার পত্রে পত্রে কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নৈশ শিশিরাশ্রু ফুটিয়া উঠে।

এ পর্য্যন্ত আমি কত দৃশ্য দেখিয়াছি, কত বিচিত্র সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি; শুধু বিহঙ্গের কলকাকলি নহে, স্রোতস্বিনীর অস্ফুট মর্ম্মগাথা নহে, সমীরণের কুসুমসুরভিসংমিশ্রিত সুমন্দ আনন্দহিল্লোল নহে, মানবহৃদয়ের কত হর্ষের,

কত শোকের, কত বিরহবিষাদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাস, কত দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া, পূরবীরাগিণীর ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া আমার সম্মুখে যত সুখের ও শোকের দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কথা আজ তোমাদের কাছে বলিতে পারিলে, তাহা তোমাদের একখানি অতি সুন্দর ইতিহাস হইতে পারিত।

সকল কথা মনে নাই, অনেক দিনের কথা কি না! কিন্তু তথাপি দুই একটি ঘটনা আমার মনে এমন দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, যেন কাল তাহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়;—তাহার একটি কথা আজ তোমাদের কাছে বলিব।

কত বৎসরের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না; আমার এই জঙ্গম-জীবনের বৎসর আর তোমাদের বৎসর ঠিক একরূপও নহে। কিন্তু মনে আছে, তখন আমি বড় হই নাই, তখন আমার প্রথম যৌবন। তখন যাহারা আমার কাছে খেলা করিতে আসিত, তাহাদের অনেককেই এখন আর দেখিতে পাই না! কত শিশু বৃদ্ধ হইয়াছে, কত বালিকা পিতামহী হইয়াছে, আবার কত জন অকালে সংসারপ্রবাস ছাড়িয়া গিয়াছে; জীবস্রোত তেমনিই প্রবহমান রহিয়াছে বলিয়াই হয় ত ধরণী চিরনবীন দেখাইতেছে, কিন্তু যদি তোমরা আমার মত দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিতে—যদি তোমরা বসুধাকে এমনি করিয়া সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া, তাহার বক্ষের উপর আমার মত অটলভাবে অবস্থিতি করিতে পারিতে—তাহা হইলে বুঝিতে, বর্ত্তমানের উল্লাসহাস্যের নিম্নস্তরে কত হৃদয়ভেদী হাহাকার, কত রুদ্ধশোকাশ্রু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—তাহা হইলে পুরাতন শোকের স্মৃতি মনে করিয়া, তোমাদের নয়নপ্রান্ত হইতে আনন্দাশ্রু-ধারা ঝরিয়া পড়িবার অবসর পাইত না। যে স্থানে কত লোকের জীবনান্ত হইতে দেখিয়াছি, ঠিক সেই স্থানে কত দিন পরে মিলনোৎসবের আনন্দ-বাদ্য ধ্বনিত হইয়াছে দেখিয়া আপন মনে 'হা' 'হা' করিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই! আমার সেই বিদ্রূপহাস্য দেখিয়া লোকে ভাবিয়াছে, বায়ুপ্রবাহে বুঝি আমার শাখাপত্র সঞ্চালিত হইতেছে—তোমাদের চর্ম্মচক্ষু এতই মোহান্ধ!

কিন্তু কি বলিতে চাহিয়াছিলাম ভুলিয়া গিয়াছি, কথায় কথায় আমার ভ্রম! এত বিভিন্ন স্মৃতি দিবারাত্র আমার বক্ষের মধ্যে একত্র মিশিয়া গুঞ্জন করিতেছে যে, যখন যে কথা বলিব মনে করি, ঠিক সেই সময়ে তাহা বলিয়া

উঠিতে পারি না। যে সময়ে তোমাদের পিতামহগণ, আজিকার তোমাদের ছোট ছোট ছেলেদের মত বয়সে, অপরাহ্নে মাঠে বেড়াইতে আসিয়া, আমার পাদদেশে যে একটা কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া থাকিত, তাহার উপর বসিয়া গল্প করিতেন, সেই সময়ে এক এক দিন একটি বালিকা আসিয়া সকালে ও সন্ধ্যাকালে আমার পদতলে কত খেলা করিত। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে যখন সমস্ত পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, এবং কর্ম্মশ্রান্ত গ্রামখানির মিশ্র কোলাহল সংযত হইয়া আসিত, তখন নিদ্রাকুলা স্নেহময়ী জননীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বালিকা অতি লঘুপদক্ষেপে তাহার ভ্রাতার সঙ্গে আসিয়া, আমার পদতলে তাহাদের খেলিবার ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিত। তাহার মা স্নান করিয়া গৃহে ফিরিবার সময়, সিক্তবস্ত্রে অবনতমস্তকে আমার নিকট প্রার্থনা করিত, "মা ষষ্ঠী আমার সুরমাকে জন্মএয়েস্ত্রী করিও।" আমি শাখা নাড়িয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতাম।

ক্রমে সুরমা বড় হইয়া উঠিল। এক দিন শরৎকালের সকালবেলা গ্রামের মধ্যে ভারি শানাই বাজিতেছিল; শানাইয়ের সেই হৃদয়ভাঙ্গা করুণসুর শরতের উজ্জ্বল প্রভাতে পীতরৌদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া সমস্ত গ্রামখানি এক বিষাদ-কোমল রাগিণীতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। শুনিলাম, আজ সুরমার বিবাহ; বুঝিলাম, তাই সে এ দু'দিন আমার কাছে আসে নাই, এই বুঝি আমাদের বিচ্ছেদের সূত্রপাত; বুড়োবরের সঙ্গে নাকি সুরমার বিবাহ হইতেছে; শুনিয়া আমার বড় দুঃখ ও রাগ হইল, আমি শাখাপল্লব কাঁপাইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

পরদিন আমার পাশ দিয়া পাল্কী চড়িয়া খুব সমারোহে সুরমা শ্বশুরবাড়ী গেল। আমি একবার তাহার সেই চন্দনচর্চ্চিত ভাল, লজ্জারক্তিম সুন্দর মুখ-খানি দেখিয়া লইলাম; সেই চঞ্চলা সরলা বালিকাকে অবগুণ্ঠন টানিয়া এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতে কে বাধ্য করিয়াছে? আহা, পিতামাতার স্নেহ-বিজড়িত সঙ্কোচহীন গৃহকোণ ছাড়িয়া সে কত দূরে কোন্ অপরিচিত স্থানে চলিয়াছে, হয় ত সেখানে তাহাকে দেখিবার শুনিবার, স্নেহ করিবার কেহ নাই, হয় ত তাহারা পদে পদে তাহার দোষ ধরিবে, কত তুচ্ছ কারণে উচ্চ কথা বলিয়া তাহার মনে আঘাত দিবে; অভিমানে তাহার বুক ফাটিয়া গেলে কে দুটি স্নেহের কথা বলিয়া তাহার অভিমান দূর করিবে? সে তাহার মায়ের বড় আদরিণী মেয়ে, তবু সে মায়ের উপর অভিমান করিয়া কত দিন

আমার কাছে আসিয়া বসিয়া থাকিত। আমি আদর করিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতাম, তাহার সুকোমল কুন্তল দোলাইয়া তাহাকে সোহাগ করিতাম, পাখীর দল আমার শাখায় বসিয়া সুললিত আলাপে তাহার অভিমান দূর করিত। আজ সে হঠাৎ আমাকে না বলিয়া চলিয়া যাইতেছে! তাহার যাইবার সময় হইয়াছে, তাহা বুঝি সে জানিত না, কত জন ত এমনি করিয়া না বলিয়া অসময়ে চলিয়া গিয়াছে! আমি ত কাহাকেও স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই, আমি শুধু একই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্ম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছি; কিন্তু কাহারও বিরহে কখনও আমার মনে এত কষ্ট হয় নাই। সুরমার বিদায়দৃশ্য দেখিয়া আমার বল্কলাবৃত শুষ্ককঠিন বুক বেদনায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল, আমি অনুভব করিতে পারিলাম, আমার বক্ষের মধ্যে সমস্ত শিরা উপশিরা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সেই মাতৃক্রোড়বিচ্যুতা বালিকাকে একবার আমার এই পল্লবময় ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করি, ক্ষণেকের জন্ম তাহার মস্তকের উপর আমার স্নেহছায়া দান করি।

কিন্তু আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, সে চলিয়া গেল। তাহার পর অনেক দিন সুরমার কোন কথা শুনিতে পাই নাই। শারদোৎসবের অবসানে, বিজয়া দশমীর ভাসানের দিন গ্রামের চারিদিক হইতে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতে লাগিল, আমার কিন্তু সে দিন শুধু সুরমার সেই বিবাহের দিনের কথাই মনে পড়িতেছিল। সে দিন কত বালকবালিকা উৎসবের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমার নিকট দিয়া নদীতে ভাসান দেখিতে গিয়াছিল, আমি ব্যাকুল হৃদয়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম,—তেমনি সজ্জাসজ্জা করিয়া উৎসবের দীপ্ত ছবিখানির মত যদি তাহাকে সেই বালিকাদলের সঙ্গে যাইতে দেখি! কিন্তু সে তাহাদের মধ্যে ছিল না, সে গ্রামেও না, সে দেশেও নয়, বুঝি তাহার অশ্রুসজল ঢলঢল মুখখানি শুধু আমার হৃদয়পটেই অঙ্কিত ছিল। হায়! যদি আমার দুখানি চরণ থাকিত, আমি তোমাদের মত চলিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি দেখিয়া আসিতাম, আমার সেই অবোধভক্ত, অভিমানিনী বালিকা কোন্ দেশে কেমন আছে!

কত দিন পরে একদিন ঘাটের পথে শুনিলাম, সুরমা বাপের বাড়ী আসিয়াছে, তাহার বৃদ্ধ স্বামী বড় পীড়িত, বাঁচে কি না!—তাই তাহার চিকিৎসার জন্ম সুরমার মা বাপ তাহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। আমি

আগ্রহভরে সুরমার পথ চাহিয়া রহিলাম, কত দিনের সেই পরিচিত পদশব্দ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে বহু দিনের বিস্মৃতপ্রায় সেই কোমল পদধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, চাহিয়া দেখিলাম, আমার সেই সুরমাই বটে!

কত কাল পরে সুরমাকে দেখিলাম! সে এখন অনেক বড় হইয়াছে, এতদিন পরে কেহ তাহাকে দেখিলে বোধ হয় চিনিতে পারিত না। তাহার সেই বাল্যচাপল্যের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই, রূপ তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া উঠিয়াছে—যেন শ্রাবণের তরঙ্গময়ী গঙ্গা; কিন্তু তাহার মুখে একটুও হাসির রেখা নাই, যেন ভাদ্রের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আছে। তাহার বিষাদাচ্ছন্ন মুখখানি এবং জ্যোতিহীন ম্লান চক্ষু দুটি দেখিয়া আমার মনে হইল, সে যেন কত রাত্রি নিদ্রা যায় নাই, যেন সে সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার মত অসীম ধৈর্য্যসহকারে মৌনভাবে হৃদয়ের উপর দিবানিশি অসহ্য ভার বহন করিতেছে! সেই দিন হইতে সুরমা তাহার পীড়িত স্বামীর সেবা করিয়া অবসর পাইলে অনেক বেলায় নদীতে স্নান করিয়া যাইত, অতি ধীরে ধীরে সে নিজের ছায়ার মত আসিয়া আমার পাদদেশে লুণ্ঠিতমস্তকে প্রণাম করিত, সকাতরে প্রার্থনা করিত, যেন তাহার পীড়িত বৃদ্ধ স্বামী শীঘ্র সারিয়া উঠে; যেন তাহার হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকে।

আমি কে, আমি কতটুকু, আমি কত ক্ষুদ্র! আমি কি সেই পতিব্রতা সাধ্বীর এই অন্ধভক্তির উপযুক্ত? কেমন করিয়া আমি তাহার স্বামীকে রক্ষা করিব? ভগবান, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে দয়া কর, তাহার জীবনের অনেক সাধ নষ্ট হইয়াছে, তাহার শেষ আশা চূর্ণ করিও না।

কিন্তু কাহারও অনুরোধে পৃথিবীর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার কঠোর, নির্ম্মম নিয়ম-চক্র অন্ধবেগে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে আবর্ত্তন করিতে থাকে, যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি তাহার নীচে আসিয়া পড়ে, তাহাকেই নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিয়া যায়—কাহারও আগ্রহ, দীর্ঘশ্বাস, হাহাকারে নিয়মের গতি রুদ্ধ হয় না,—আমার অনুরোধ কে শুনিবে?

সুতরাং যাহা হইবার তাহাই হইল। সুরমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, তাহার আত্মীয়গণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, এক ঘনঘোরা বর্ষার অপরাহ্নে সুরমার স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিল। অনেক দূর হইতে সুরমার মাতার রোদনধ্বনি আমার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল; সুরমা কাঁদে নাই কেন জানি

না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের হাহাকার আমি অনুভব করিতে পারিলাম, শুনিলাম তাহার চক্ষে অশ্রু ছিল না—জ্বালাময় তীব্র বেদনায় তাহার সমস্ত হৃদয় শুকাইয়া মরুভূমি হইয়াছিল। কিন্তু মূর্খেরা তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, বুড়ো স্বামী মরিয়াছে, সুরমার বেশী দুঃখ হয় নাই; শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল, পৃথিবীতে সুরমা কাহাকে ভাল না বাসে?

সে দিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি। আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যের মত সাজিয়া আসিয়াছিল—কি কঠোর বজ্রনাদ, বিদ্যুতের কি জ্যোতির্ম্ময় তীব্র বিকাশ! বোধ হইতে লাগিল, সুরসুন্দরীগণের জন্য দেব-দৈত্যে আকাশে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, শঙ্কাকুলা সুন্দরীগণ কেবল দ্রুত পলায়নে আত্মরক্ষা করিতেছে। আমার বৃহৎ শাখাগুলি ঝটিকাবেগে মড় মড় করিতে লাগিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপত্র ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া কোথায় উড়িয়া গেল, সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, ঝঞ্ঝাবিক্রীড়িত নৈশ অন্ধকারের মধ্যে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রলয়ের প্রতীক্ষায় আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রলয় হইল না, কিন্তু গভীর রাত্রে একটি ভয়ানক দৃশ্যে আমার দেহ ও মন আলোড়িত হইয়া উঠিল! আজ সুন্দরী সুরমা কি মনোমোহিনী সাজে সজ্জিত হইয়াছে! তাহার সীমন্তে উজ্জল সিন্দূরবিন্দু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, প্রকোষ্ঠের শাঁখা কি শুভ্র! তাহার বামহস্তে আলতার পেছে, দক্ষিণ হস্তে ধান্য-পূর্ণ আড়ি, চক্ষে কজ্জল, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত, কিন্তু তাহার নির্নিমেষ দৃষ্টি কি ভয়ানক! সুরমা কি আজ উন্মাদিনী? সে কি এই ঘনান্ধকারপূর্ণ প্রলয়ঙ্করী নিশীথে কোন নৈশ অভিসারে যাত্রা করিয়াছে? সঙ্গে এত আলো, এত বাদ্য কেন? পার্শ্বে কি কাহারও মৃতদেহ?—কে বলিয়া উঠিল, আজ রাত্রে সুরমার সহমরণ। সুরমা ধীরে ধীরে আমার পাদমূলে আসিয়া নতমস্তকে বলিল,—"মা, এতদিন বাঁচিয়া মরিয়া ছিলাম, এখন যেন মরিয়া বাঁচিতে পারি। লজ্জা নিবারণ করিও।"

আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। ধীরে ধীরে তাহারা শ্মশান অভিমুখে চলিয়া গেল, আমি আমার সমস্ত শাখাপত্র প্রসারিত করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। অনেক দূরে শ্মশানে শুধু একবার মশালের চকিত আলো দেখিতে পাইলাম, ঢাকের শব্দ ঝড়ের শব্দের সঙ্গে মিশিয়া এক একবার রুদ্রতালে আমার কানে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল; তাহার পর চন্দনের সুগন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, ঘৃতাহুতিপূর্ণ জ্বালাময় ঊর্দ্ধমুখ বহ্নিশিখা

আমার চক্ষের উপর আসিয়া পড়িল; অতি ভীষণ 'বল হরি!' শব্দ আমার কর্ণ বধির ও আমার হৃদয় মথিত করিয়া ফেলিল, আমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম।

সে চলিয়া গেল! কোথায় গেল, জানি না; কোন্ পাপে সেই পবিত্র কুসুম অকালে দগ্ধ হইল, বলিতে পারি না। কিন্তু হায়, শ্রাবণের সেই তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথে মরণোৎসবের মধ্য দিয়া সে তাহার রোগক্লিষ্ট বৃদ্ধ অক্ষম স্বামীর প্রেমমহিমাদীপ্ত আত্মা সঙ্গে লইয়া কোন্ এক অজ্ঞাত রাজ্যে চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না! আমি মাথা নাড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, লোকে ভাবিল, শুধু ঝড় আর বৃষ্টি হইতেছে!

তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে আবার কত নূতন অতিথির আবির্ভাব হইয়াছে; প্রকৃতি তেমনি সুন্দর এবং সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ, বিহঙ্গের কাকলি, সমীরণের প্রবাহ, তরঙ্গিণীর কলোচ্ছ্বাস তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে, কেবল সুরমা নাই! তাহার পরিবর্ত্তে কত ছেলেমেয়ে কতদিন আমার পদতলে, আমার ছায়ায় বসিয়া তেমনি করিয়া খেলা করিয়াছে, কিন্তু আর কাহাকেও আমি তেমন ভালবাসি নাই, আর কাহাকেও আমি তেমন ভালবাসিতে পারিব না; আমার হৃদয় উদাস হইয়া গিয়াছে, মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে শুধু নিত্যকালব্যাপী সুদুঃসহ বিষাদের অভিনয় দেখিয়া জীবনে অনাস্থা জন্মিয়াছে।

এখনও কত গৃহস্থ-বধূ আসিয়া সন্ধ্যাকালে আমার পাদমূলে প্রদীপ রাখিয়া যায়, কত সুন্দরী আমার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া আমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে; কিন্তু আমি তাহাদের কি বলি? আমি বলি, "কেন তোরা এখানে এমন করিয়া তোদের কামনা ব্যর্থ করিতে আসিয়াছিস্? তোদের উপকার করিবার আমার ক্ষমতা নাই; আমি অতি অক্ষম, অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন।"—কিন্তু তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারে না, দিবারাত্র আমার সেই মর্ম্মকথা তাহাদের কর্ণে অর্থহীন পল্লবমর্ম্মরের ন্যায় প্রবেশ করে। আমি প্রাণপণ আগ্রহে, মাথা নাড়িয়া, শাখা নাড়িয়া, তাহাদের যত কথাই বলি না কেন, তাহারা শুধু শুনিতে পায়—"সন্, সন্, সন্।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অশিক্ষিতা।

১

গ্রামের বিদ্যালয় হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, যতীশচন্দ্র যখন অধ্যয়নমানসে কলিকাতায় আসিল, তখন লেখাপড়া শিখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসারের উন্নতি করাই সে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু সৌধারণ্য মহানগরীর ধূলিধূমসমাকীর্ণ বাতাসে শীঘ্রই সেই স্নিগ্ধশোভাময় পল্লিগ্রাম হইতে আগত যুবকের সব কল্পনা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; আপনার অধ্যয়ন অপেক্ষা অন্য কার্য্যে সে অধিক সময় ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল।

রাজনীতি অপেক্ষা সমাজসংস্কারেই তাহার অধিক মনোযোগ লক্ষিত হইত। বাল্যবিবাহের বিপক্ষে বা বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে যখনই কোথাও বক্তৃতা হইত, তখনই যতীশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইত; তাহাতে সে বারিপাত এবং ঝঞ্ঝাবাতও গ্রাহ্য করিত না। তদ্ভিন্ন সে "সমাজ-সংস্কার" "শিক্ষা-প্রচারক" প্রভৃতি পত্রে স্ত্রীশিক্ষা, পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি সমর্থন করিয়া নানা প্রবন্ধ লিখিত, এবং "মাস-এডুকেসনের" আবশ্যকতা প্রতিপাদনচেষ্টার ত্রুটি করিত না।

এই সকল কথা তাহার দেশের অন্যান্য ছাত্রগণ কর্ত্তৃক তাহার পিতার নিকট বিজ্ঞাপিত হইলে, তিনি মনে করিলেন যে, বিবাহ না হইলে ছেলের এ সকল রোগ দূর হইবার নহে। তিনি পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশের সময় আপনার নববিকশিত নানা মত লইয়া যতীশচন্দ্র গৃহে গেল। কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইবার সময় সে স্থির করিয়া গিয়াছিল যে, এবার দেশে যাইয়া দুইটি কার্য্য করিবে, গ্রামে বালিকাদিগের জন্য একটি বালিকা-বিদ্যালয় এবং কৃষকদিগের সন্তানগণের জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবে। "শিক্ষা-বিস্তার-সমিতি" তাহার এই সঙ্কল্পিত মহদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং তাহার নিকট প্রথম দুই মাসের সাহায্য দশটি টাকাও দিয়াছিলেন। দেশের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য কল্পনা করিয়া যতীশচন্দ্র আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছিল। সে দেশহিতে, জনহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, আপনার কথা তাহার মনেই ছিল না; সুতরাং যখন বাড়ী আসিয়া সে শুনিল যে, কোন দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ

সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। এ বিবাহে সে কিছুতেই সম্মতি দিতে পারিল না।

কিন্তু তাহার মতামতের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়া তাহার পিতা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। সে বাড়ী আসিবার দুই দিন পরে জন দুই ভদ্র লোক আসিয়া পাকা দেখা শেষ করিয়া গেলেন। তখন সে বিবাহ না করিলে তাহার পিতাকে অপমানিত হইতে হয়, কাজে কাজেই এরূপ স্থলে সব বাঙ্গালী ছেলে যাহা করে, যতীশও তাহাই করিল—অর্থাৎ নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিবাহ করিল।

২

বিবাহবন্ধনে একটা কি আছে, যাহাতে বিবাহের অব্যবহিত পর হইতেই পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের উপর একটা আকর্ষণ সৃজিত হয়; তাই যে নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করে, সেও বিবাহের পর ভাবে, ইহাতে এত আপত্তি করিয়াছিলাম কেন? কিন্তু পূর্ব্বের সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, বাধ্য হইয়া এই এক বোধোদয়-মাত্র-পড়া অর্দ্ধশিক্ষিতা দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারীকে বিবাহ করায় যতীশচন্দ্রের মনে এমনই বেদনা বোধ হইয়াছিল যে, তাহার বেদনাস্রোতে পত্নীর প্রতি তাহার ক্ষীণ আকর্ষণ স্রোতোমুখে লঘু তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। যতীশচন্দ্র বড় ব্যথিত হইল।

তাহার পর জৈষ্ঠমাসে জামাই-ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ খাইয়া যতীশচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া গেল—কোন বিদ্যালয়ই স্থাপন করা হইল না;—"শিক্ষা বিস্তার সমিতির" দশ টাকা ব্যাগে যেমন আসিয়াছিল, তেমনই ফিরিয়া গেল। ট্রেণে যতীশচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে গেল, কেমন করিয়া সে আর সংস্কারসঙ্গী বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে! আর সে কেমন করিয়া সংস্কার-সভায় যোগদান করিবে!

বাস্তবিক কলিকাতায় আসিয়া বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রথম প্রথম কয়দিন তাহার লজ্জা করিতে লাগিল! এরূপ লজ্জা অধিক দিন স্থায়ী হয় না—কয়দিনেই লজ্জা কাটিয়া গেল; তখন যতীশচন্দ্র আবার নানা সংস্কার সভার কার্য্যে যোগ দিতে লাগিল। কিন্তু বড় দৌড়মুখে একটা বিশেষ বাধা পাইলে, অশ্বের আবার পূর্ব্বের উৎসাহ পাইতে যেমন কিছু বিলম্ব হয়, তেমনই সংস্কারকার্য্যে আবার পূর্ব্বের উৎসাহ পাইতে যতীশচন্দ্রের কিছু বিলম্ব হইল।

এই বিলম্বের যে অবসর, তাহারই মধ্যে যতীশচন্দ্র হৃদয়ে একটা অননুভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতে লাগিল। তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার হৃদয়ে সেই সদ্যঃপরিণীতা পত্নীর প্রতি একটা আকর্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া যতীশচন্দ্র কিছুই খুঁজিয়া পাইত না। উভয়ে পরিচয় অতি সামান্য; উভয়ের শিক্ষার প্রভেদ প্রভূত; উভয়ের বয়সে অনৈক্য অনেক; উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা যথেষ্ট; উভয়ের মনোভাব—তাহাও হয় ত একই প্রকার নহে। তবে এ আকর্ষণের উৎপত্তির কারণ কি, এ আকর্ষণের মূল কোথায়? যতীশচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিত না, তথাপি সে সেই আকর্ষণ অনুভব করিত। সে আকর্ষণ দর্শনের বা বিজ্ঞানের, বিশ্লেষণের বা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

অল্পদিনের মধ্যেই যতীশচন্দ্র আবার পূর্ব্বের মত সংস্কারাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

৩

সংস্কারকার্য্যে অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করাতেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, যতীশচন্দ্র সে বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে তিনবার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া, সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে চাকরীর উমেদারী করিয়া, বিফলমনোরথ যতীশচন্দ্র শেষে বাড়ীর টাকায় কলিকাতার বাসার প্রাপ্য চুকাইয়া আসিল। উমেদারীপেশনযন্ত্রের প্রবল চাপে তাহার স্ফীত সংস্কার-সঙ্কল্প অনেকটা ছোট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহার ব্যাপ্তি যেমন কমিয়াছিল, তাহার কাঠিন্য তেমনই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সঙ্কল্প এখন তাহার হৃদয়ের ক্ষুদ্র এক কোণে আসিয়া স্থির হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কোণে সে তাহার পূর্ণভার স্থাপন করিয়াছিল, সেখান হইতে তাহাকে স্থানচ্যুত করা আর সহজ নহে।

চাকরীর চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া যতীশচন্দ্র গৃহে ফিরিল; কিন্তু তখন তাহার পক্ষে চাকরী করাও আবশ্যক। তাহার পিতার অবস্থা তত ভাল নহে, তাহার পত্নী সুকুমারীর তখন একটি কন্যা হইয়াছে, আর বসিয়া বসিয়া পৈতৃক অর্থ ধ্বংস করা ভাল দেখায় না। চাকরীর জন্য তাহার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না।

বাড়ী আসিবার অল্প দিন পরেই যতীশচন্দ্র তাহার এক বন্ধুর সুন্দরবনে কোন জমিদারীর নায়েবী পদ পাইল। অগ্নিযানী মরুমধ্যে পিপাসার্ত্ত স্নিগ্ধ

সলিল পাইলে, যেমন আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করে, যতীশচন্দ্র তেমনই আগ্রহের সহিত এই চাকরী গ্রহণ করিল। কিন্তু সে এই চাকরী লইল বলিয়া তাহার সংস্কার-সভার অনেক বন্ধু দুঃখিত হইলেন; কারণ জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা যে নিষ্পাপ জীবন যাপন করিতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের ছিল না। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, জমিদারী সেরেস্তা পাপের লীলাভূমি।

৪

চাকরী পাইয়া যতীশচন্দ্র সুন্দরবনে গেল—পত্নী সুকুমারী, কন্যা লাবণ্যময়ী এবং চাকর বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া গেল।

আদায় তহসিলের কার্য্য সেখানে বড় অধিক নহে। জমিদারী বন, সেই নিবিড় বনমধ্যে এখানে ওখানে দুই চার ঘর প্রজা। প্রজারা সেই বনের মধ্যে দুই চার বিঘা জমিতে ধান্য বুনে, তাহার পর বনে কাঠ আছে, নদীতে মৎস্য আছে, অনাহার ক্লেশ তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। আর তাহাদিগের প্রধান কার্য্য—চুরি করিয়া গাছ কাটিয়া বিক্রয় করা; জমিদারের কর্ম্মচারীর প্রধান কার্য্য—এই সকল তস্করের কুঠারাঘাত হইতে বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করা। বিস্তৃত বনমধ্যে প্রভূত বৃক্ষ রক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দুই জন নায়েব ইতিপূর্ব্বে সে চেষ্টা করিয়া প্রজাদিগের শানিত কুঠারাঘাত সহ্য করিয়াছেন। তাহার পর যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা কিছু অর্থ পাইলে আর তস্করদিগের এ সকল কার্য্য দেখিয়াও দেখিতেন না। কিন্তু যতীশচন্দ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্যরূপ ছিল। সে ভাবিয়া আসিয়াছিল, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাও দিবে।

নদীর তীরে কাছারিবাড়ী—চারিদিকে সুগঠিত প্রাচীরে বেষ্টিত, দস্যুতস্করের আশঙ্কায় জমিদার কাছারিবাড়ী যথাসম্ভব সুগঠিত এবং সুরক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কাছারি হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে বিদ্যালয় বা চিকিৎসক ছিল না—এতদুভয়ের আবশ্যকও ছিল না। প্রজাদের বিদ্যা-শিক্ষার প্রবৃত্তি বা অবসর কিছুই ছিল না, লেখাপড়া কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানিত না; আর চিকিৎসক—তাহাদের চিকিৎসকের কোনই আবশ্যক ছিল না। কোনরূপ পীড়া হইলে, তাহারা হয় কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করিত না, নহে ত, কোন গাছগাছড়ার রস বা পত্রমাত্র ঔষধরূপে গ্রহণ করিত; অথচ তাহাদিগের মধ্যে শিশুর যকৃৎবৃদ্ধি, যুবকের অজীর্ণ, [illegible] বহুমূত্র ও রমণীদিগের মূর্চ্ছার একেবারেই অসদ্ভাব ছিল!

সেই সুগঠিত বলিষ্ঠ বনবাসীদিগকে দেখিয়া যতীশচন্দ্র ভাবিত—হায়, ইহাদের মধ্যে যদি শিক্ষার বিস্তার করিতে পারিতাম, তবে এ নিষ্ফল জীবনে একটা মহদনুষ্ঠান সাধন করিয়া যাইতে পরিতাম। তাহা কি পারিব না?

যতীশচন্দ্র চেষ্টা করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে, ইহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। নিতান্ত দুঃখের সহিত সে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল।

শিক্ষাপ্রচারের সৎ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া যতীশচন্দ্র ভাবিল—যাহাই হউক, যেখানে চিকিৎসা হইলে হয় ত একজনের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, সেখানে যাহাতে বিনা চিকিৎসায় সে না মরে, তাহা করিব। কাহারও অসুখ হইয়াছে শুনিলেই, নায়েব যতীশচন্দ্র আপনার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইত। মলিন ছিন্ন শয্যায় রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিয়া আসিত। ভয়ে রোগীর আত্মীয়গণ তাহার প্রদত্ত ঔষধ গ্রহণ করিত এবং সে গৃহের বাহির হইলেই ঔষধ ফেলিয়া দিয়া, তাহার উদ্দেশে নানা অপ্রীতিকর কটুবাক্য কহিতেও ত্রুটি করিত না। এই সকল কারণে তাহারা নায়েব মহাশয়কে বড় ঘৃণা করিত। যতীশচন্দ্র তাহা বুঝিত না—সে ভাবিত, প্রজাগণ তাহার উপর সন্তুষ্টই হইবে। তাহার এ ভ্রম শীঘ্র নিবারিত হইল না।

৫

কর্ম্মস্থলে আসিয়া যতীশচন্দ্র এক জন দাসী নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহার পিত্রালয় কাছারির কাছেই, সে বালবিধবা—পিত্রালয়েই থাকিত। প্রথমে তাহার মাতার মৃত্যু হয়—তাহার পর যতদিন তাহার পিতা জীবিত ছিল, ততদিন ভ্রাতারা এবং ভ্রাতৃবধূরা তাহাকে সম্মান করিয়াই চলিত; ততদিন সেই বাড়ীর কর্ত্রী ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইতে না হইতেই ভ্রাতারা তাহাকে নিতান্ত অনাবশ্যক গলগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, এবং ভ্রাতৃবধূগণের রসনার তীব্র বিষ তাহাকে কথায় কথায় সহ্য করিতে হইতে লাগিল। অভাগিনীর দাঁড়াইবার অন্য স্থান ছিল না, সে সকলই সহ্য করিয়া থাকিত।

সে যতীশচন্দ্রের গৃহে দাসীপনা করিতে লাগিল।

পত্নীর নিকট তাহার দুঃখদুর্দ্দশার ইতিহাস শুনিয়া, যতীশচন্দ্র বলিত, "যতদিন দেশে শিক্ষাবিস্তার না হইবে, ততদিন স্ত্রীলোকের এ দুঃখ দূর হইবে না। শিক্ষা পাইলে, এমন কি সামান্য কিছু শিল্পশিক্ষা পাইলেও, ইহাকে আজ

আর ভ্রাতাদিগের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইত না। তাহা হইলে শ্যামা অনায়াসেই আপনার জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিত। যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদিগের দ্বারা কোন মহদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, সকল সময় আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনোপায় হওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।"

শুনিয়া পত্নী সুকুমারী এক দিন বলিয়াছিলেন, "কেন, যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের দ্বারা কি কোন মহদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে না?"

যতীশচন্দ্র বলিয়াছিল, "যাহাদের মনের বিস্তার হয় নাই, তাহাদের দ্বারা কি কোন মহদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে? অশিক্ষিতা শ্যামার মনে কি কোন মহৎ চিন্তা স্থান পাইতে পারে যে, সে কোন মহৎ কার্য্য করিবে?"

৬

প্রজাদিগের নিকট নূতন নায়েব ক্রমেই অপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রজারা গাছ কাটিলে, নায়েবকে দুই এক টাকা ঘুস্ দিলেই সব চুকিয়া যাইত। কিন্তু যতীশচন্দ্রের সে প্রবৃত্তি ছিল না। তবে সে দোষীর কোন কঠোর শাস্তি বিধানও করিত না, কারণ, সে জানিত শাস্তিতে অনেক সময় ভাল না হইয়া মন্দ হয়; তাই অনেক সময় দোষীকে ন্যায়ান্যায়সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ উপদেশ দিয়াই সে ছাড়িয়া দিত।

এক দিন নিশাকালে সহসা জাগরিত হইয়া, যতীশচন্দ্র যেন কাছারির কাছে রাস্তায় কোন ভারী-জিনিস-বোঝাই গরুর গাড়ীর গমন-শব্দ শুনিতে পাইল। পরদিন মুহুরীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া সে জানিতে পারিল যে, দস্যুতস্করগণ রাত্রিকালে গাছ কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। সে কথা পূর্ব্বে তাঁহাকে না বলার জন্য সে মুহুরীকে তিরস্কার করিল; সে জানিত না যে, মুহুরী সবই জানিত, অধিকন্তু এই সকল দুষ্কার্য্যে তাহার কিছু আয়ও ছিল।

পরদিন গভীর রাত্রে যতীশচন্দ্র স্বয়ং যাইয়া কাছারির কাছে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। সেখানে অনেকগুলি বিততবহুবলি বৃক্ষ, দিবাভাগেও সে স্থানটিকে অস্পষ্টালোকময় করিয়া রাখে। সে দিন অমাবস্যা; ঘনমেঘরাশি আকাশে তারকাকুলের মৃদুজ্যোতিও নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছে; বনমধ্যে নিবিড় অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, কিছুই চিনিতে পারা যায় না; কেবল সেই গভীর অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া মধ্যে মধ্যে চঞ্চল চপলালোক দৃষ্ট হইতেছে; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; পবন একটু বেগে বহিয়া কাননের মৃদুমর্ম্মর, সম্মোহন সঙ্গীত এবং আর্ত্তচীৎকার মিশাইয়া দিতেছে।

যতীশচন্দ্র দাঁড়াইয়া মশকদংশন সহ্য করিতে লাগিল। বহুক্ষণ মধ্যে শকটের আগমনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। যতীশচন্দ্র ভাবিল, বুঝি আজ আর শকট যাইবে না; সে কাছারিতে ফিরিবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় দূরে শকটের শব্দ শ্রুত হইল—সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

শকট নিকটে আসিল, যতীশচন্দ্র উচ্চস্বরে বলিল, "গাড়ী থামাও।"

গাড়ী থামিল। প্রজারা সকলেই জানিত, নায়েবের নিকট রিভলভার থাকে, আর শকটচালক মনে করিয়াছিল যে, নায়েবের সঙ্গে অনেক লোক আছে।

যতীশচন্দ্র বলিল, "গাড়ী কাছারিবাড়ীতে লও।"

শকটচালক প্রহৃত সারমেয়ের মত গাড়ী কাছারিবাড়ীতে লইয়া গেল। শকটচালক যতীশচন্দ্রের দাসী অশিক্ষিতা শ্যামার ভ্রাতা মধু।

পরদিন প্রভাতে যতীশচন্দ্র মধুকে বলিল, "দেখ, আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে শাস্তি দিতে পারি।" তাহার পর সে প্রথামত ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিল। সে বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইলে, কেহ পাঠ করিত কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, মধু তাহার কিছুই শুনে নাই।

বক্তৃতা শেষ হইলে মধু চলিয়া গেল। হিংস্র জন্তুর মুখ হইতে তাহার শিকার কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিলে, তাহার নয়নে যেরূপ দৃষ্টি বিভাসিত হইয়া উঠে, দীর্ঘ বক্তৃতাতে গৃহে গমনসময় মধুর নয়নে সেইরূপ দৃষ্টি বিভাসিত হইয়া উঠিল—সে দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিস্ফুট।

সে দিন ভ্রাতার ভাব দেখিয়া, শ্যামা শঙ্কিতা হইল। যতীশচন্দ্র কোন সন্দেহই করিল না, বরং একটা লোককে ন্যায়ান্যায় বুঝাইয়া পাপপথ হইতে পুণ্যপথে লইতে চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া, সে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। সে জানিত না, প্রজারা তাহার প্রতি কিরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

৭

মধ্যে মধ্যে কোন কোন পরিবারে এমন দুই একটি মহিলা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, যেন তাহারা যে পরিবারে জন্মান উচিত ছিল, কোন ভ্রমে সে পরিবারে না জন্মিয়া অন্য পরিবারে জন্মিয়াছে। শ্যামাকে দেখিলে তাহাই মনে হইত। তাহার ভ্রাতাদিগের হীন ব্যবহার সে ঘৃণা করিত, তাহার পিতৃগৃহের অপরিচ্ছন্নতা তাহার মনে অত্যন্ত বিরক্তি উৎপাদন করিত, অথচ সে তাহারই মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে তাহারই

মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে সকল তাহার জীবনে প্রভাবসংস্থাপন করিতে পারে নাই।

আবাদী জমি যেমন বহুদিন পড়িয়া থাকিলে তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল উর্ব্বরতা বাহির হইতে পথ না পাইয়া, আপনার মধ্যে আপনি বর্দ্ধিত হয়, এবং যদি কোন ক্রমে তাহাকে একটি ক্ষুদ্র বীজ পতিত হয়, তবে সেই জমি ক্ষুদ্র বীজের উপর আপনার পূর্ব্ব উর্ব্বরতা ঢালিয়া দেয়; তেমনই বালবিধবা শ্যামার হৃদয়ে স্নেহাদি কোমলবৃত্তি বাহির হইবার পথ না পাইয়া হৃদয়েই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এবং এখন সে যতীশচন্দ্রের দুহিতা লাবণ্যময়ীর উপর আপনার সেই পূর্ণ স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিল। অন্তরের পূর্ণ আবেগে সে সেই বালিকাকে ভালবাসিত।

শ্যামা বুঝিতে পারিত না, কোথা হইতে এই বালিকা আসিয়া তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতেছে। সে ভাবিয়া পাইত না, এই বালিকা তাহার কে। কিন্তু সে তাহাকে ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পারিত না।

প্রকৃতপক্ষে অল্পদিনের মধ্যেই শ্যামা আপনাকে যেন যতীশচন্দ্রের পরিবারের কেহ বলিয়া মনে করিত। নিষ্ঠুর স্বজাতিদিগের মধ্যে থাকিয়া, তাহার হৃদয়ে যে কোমলতা ফুটিতে পাইতেছিল না, এখন তাহা ফুটিয়া উঠিল—শ্যামার হৃদয়ে যেন নূতন জগৎ সৃষ্ট হইল।

অশিক্ষিতা শ্যামার হৃদয়ের এত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে পারে, যতীশচন্দ্র তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না; কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শিক্ষা ভিন্ন হৃদয়ের উন্নতি নাই। কূপমণ্ডূক যেমন বুঝিতে পারে না যে, কূপের বাহিরে বিচিত্রশোভাময় জগৎ থাকিতে পারে; তেমনই তাহার সঙ্কীর্ণ মত লইয়া যতীশচন্দ্র বুঝিতে পারিত না যে, পুঁথিগত বিদ্যা না হইলেও মানবের মনের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারে।

৮

যে দিন যতীশচন্দ্র মধুকে ধরিয়াছিল, তাহার পর এক মাস চলিয়া গেল। বর্ষার পর শরৎ আসিল—আকাশে আর স্নিগ্ধগম্ভীর মেঘমালা নাই; উপরে নীল আকাশ আর নিম্নে নদীকূলে সোনার ধান—প্রকৃতির আর সে গম্ভীর মূর্ত্তি নাই, এ যেন ক্রীড়াচঞ্চলা বালিকা। ইহার মধ্যে কোনই গোলমাল হইল না। শ্যামার আশঙ্কা ক্রমেই বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে লাগিল।

ইহার পর এক দিন অপরাহ্লে বন তদারক করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পর

ফিরিয়া যতীশচন্দ্র দেখিল, কাছারিতে মুহুরী নাই; তাহার পর পাইকদিগকে ডাকিয়া দেখিল, কেহই উপস্থিত নাই। সে ভাবিল, এ কি! যতীশচন্দ্র কাছারি-বাড়ীর পশ্চাতে যে বাটীতে স্কুমারী থাকিত, সেখানে গেল। শ্যামাও নাই!

তখন যতীশচন্দ্রের মনে সন্দেহ হইল। চাকর বিশ্বনাথকে লইয়া দুই জনে চারিদিকে সব দ্বারগুলা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর স্বামীস্ত্রীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—অজানিত বিপদের আশঙ্কায় উভয়েই ত্রস্ত। স্কুমারী বলিল, "আমি শ্যামাকে ভাল বলিয়াই জানিতাম, আজ সেও গেল! ইহাদের বিশ্বাস করিতে নাই।" যতীশচন্দ্র বলিল, "আমি ত বরাবরই বলিয়াছি, যাহার শিক্ষা নাই, তাহার কি মহত্ত্ব থাকিতে পারে? অশিক্ষিতার মনে কি কোন মহৎ চিন্তা স্থান পাইতে পারে?" দুই জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল—বনমধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। স্কুমারী প্রদীপ জ্বালিল। লাবণ্য ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পর রজতস্বপ্নে গগন পূর্ণ করিয়া চন্দ্র উদিত হইল।

সহসা কাছারিবাড়ীর সদরদ্বারে কোলাহল শ্রুত হইল। বাহিরে এক দল লোক গৃহবাসীদিগকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া তাহারা দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। দ্বার দৃঢ় কাষ্ঠে নির্ম্মিত, আগাগোড়া বড় বড় পেরেক মারা—কুঠারের ধার নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

যতীশচন্দ্রের নিকট রিভলভার ছিল—সে দ্বারের ছিদ্রপথে তাহা ব্যবহার করিলে হয় ত ইহারা নিবৃত্ত হইত; কিন্তু সে ভাবিল, আমার জীবনও যেমন, ইহাদের জীবনও তেমনই। এই অশিক্ষিত দুর্বৃত্তগণ আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে বলিয়া, আমি কি ইহাদের হত্যা করিব? যাহা হয় হউক, আমি এ পাপে লিপ্ত হইব না।

এ দিকে দ্বার ভাঙ্গিতে অশক্ত হইয়া দস্যুদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "ইহাদের পোড়াইয়া মার্।" সে মধু। তখন সকলে কাষ্ঠ ও শুষ্কপত্রাদি আনিয়া দ্বারের নিকট ফেলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় এক দল সশস্ত্র লোক সেখানে আসিয়া পড়িল। কেহ কেহ পলাইয়া গেল, মধু ও আর কয়জন ধৃত হইল। আগন্তুকদিগের মধ্যে এক জন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমি দারোগা—দ্বার খুলুন।"

দ্বার খুলিয়া স্ফুটচন্দ্রালোকে যতীশচন্দ্র দেখিল, পাঁচ জন দুষ্কৃতকে পাঁচ জন

কনেষ্টবল ধরিয়া রাখিয়াছে, আর তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আরও কয়জন কনষ্টেবল, দারোগা ও শ্যামা!

শ্যামার চরণ ধূলিধূসর—সে তখনও পথশ্রমে হাঁপাইতেছে। যতীশচন্দ্র বলিল, "শ্যামা, তুমি এখানে?" শ্যামা বলিল, "আজ যখন জানিতে পারিলাম এই কাণ্ড হইবে, তখন বুঝিলাম আজ কাছারিবাড়ীতে কেহ থাকিবে না। কাজেই, আর কাছারিতে সংবাদ দেওয়া বৃথা জানিয়া, আমি একেবারে থানায় গিয়াছিলাম।"

শ্যামার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কনষ্টেবলের হস্ত হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া, বসনাভ্যন্তর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া, মধু তাহা ভগিনীর হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "তোর কাজ?" কয় জন কনষ্টেবল তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

শ্যামা পড়িয়া গেল। যতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া সে এক বার ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "লাবণ্যকে লইয়া আপনি দেশে ফিরিয়া যাইবেন।" সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

তাহার বিদীর্ণ ফুসফুস্ হইতে রক্তস্রোত এবং তাহার দেহ হইতে জীবন স্রোত বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। চন্দ্রালোক তাহার মরণাহত মুখে আসিয়া পড়িল, সে মুখে কোন বেদনাব্যঞ্জক ভাব দৃষ্ট হইল না।

রাণী ভবানী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজ্য-নাশ।
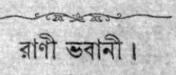
আলিবর্দ্দী জিতেন্দ্রিয় সাধুস্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি বলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছেন। বিলাসলোলুপ বাসনাসক্ত মুসলমান নবাবদিগের ন্যায় সুরা এবং সহচরী লইয়া আত্মহারা না হইয়া, আলিবর্দ্দী একটিমাত্র সহধর্ম্মিনীতে অনুরক্ত থাকিয়া, সাধ্যানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেন। তাঁহার সাধুস্বভাবের পরিচয় পাইয়া, অল্পদিনের মধ্যেই লোকে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘটনাচক্রের অনতিক্রমনীয় আবর্ত্তনে, এরূপ শান্তস্বভাব প্রবীন নরপতির শাসন-সময়েও রামকান্ত এবং রাণী ভবানীর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল!

এতকাল পর্য্যন্ত দেবীপ্রসাদ উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিবার জন্য অলক্ষিত-ভাবে নীরবে দিন-গণনা করিতেছিলেন। রাষ্ট্র-বিপ্লবে সম্পূর্ণ নূতন নরপতি সিংহাসনে পদার্পণ করায়, দেবী-প্রসাদের অভীষ্টপূরণের সুসময় সমুপস্থিত হইল। তিনি নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, মহারাজ রামজীবনের উত্তরাধিকারীহীন রাজসাহী-রাজ্য বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথোপযুক্ত শাসন-সংরক্ষণের জন্য তিনি একখানি সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, রাজসাহীর ন্যায় অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী বিশাল রাজ্যের রাজকরসংগ্রহের জন্য নবাব সরকার ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং দেবীপ্রসাদের অভিযোগের সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিবার জন্য কালক্ষয় না করিয়া, তাঁহাকেই আবশ্যক "সনন্দ" প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সনন্দখানি এরূপ সুকৌশলে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে দেবীপ্রসাদের হস্তগত হইল যে, রামকান্ত বা রাণী ভবানী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা যখন প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলেন, তখন আর দেবীপ্রসাদের গতিরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; তখন তিনি লোক লস্কর লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন! সুতরাং দেবীপ্রসাদ সহজেই রামকান্ত এবং রাণী ভবানীকে গৃহতাড়িত করিয়া সগৌরবে রাজসাহীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

নাটোর-রাজবংশের ইতিহাসে ইহাই গৃহবিবাদের প্রথম সূচনা। কিন্তু এই গৃহবিবাদের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী লইয়া ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে বহুবিধ বাদপ্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে। রাণী ভবানী যে সত্য-সত্যই রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইয়া জগৎশেঠের সহায়তায় পুনরায় রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনরূপ মতপার্থক্য নাই; এবং নবাব আলিবর্দ্দীর শাসন সময়েই যে এই দুঃখদুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু কি জন্য, কাহার চক্রান্তে, কোন্ সময়ে এই রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া একজন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, "পতি রামকান্ত অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয়মন যৌবনোচিত চাঞ্চল্যে পূর্ণ। বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া, অসংখ্য দাস দাসীর উপর আধিপত্য পাইয়া, তাঁহার যৌবনোচিত হৃদ্বেগ আর কিরূপে নিবৃত্ত থাকিবে? অর্থ অমৃতময়; কিন্তু ব্যবহারের বিপর্য্যয়ে তাহা হইতে

প্রাণনাশক বিষের সৃষ্টি হয়। তরুণ রামকান্ত আর অর্থের ব্যবহার কি জানেন? সুতরাং তাঁহার হস্তে অর্থ অনর্থকর হইল। দয়ারাম বহুকাল হইতে রাজসরকারের কর্ম্মচারী। রামজীবনের মৃত্যুর পর রামকান্তের পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হয়। রামকান্তের বিকৃত চরিত্রকে (!) প্রকৃতিস্থ করিবার কারণ তিনি রামকান্তকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকান্ত সে হিত বাক্য শুনিলেন না। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গরীয়ান্ নবীন যুবক দয়ারামকে অবমানিত করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। * * * * দয়ারাম সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মনিষ্ঠ। অবমানিত হইয়া রাজভবন হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতিপালকের অধঃপতন দেখিতে পারিলেন না। * * * * রামকান্তের চৈতন্যসম্পাদন দয়ারামের লক্ষ্য। রামকান্তের অধঃপতন অনিবার্য্য দেখিয়া, সুবুদ্ধির গুণে তিনি ধীরে ধীরে সে লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন!

"এই সময়ে বঙ্গদেশ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনাধীন। অত্যাচার করা তাহাদের অঙ্গের ভূষণ। কুলকামিনীর পবিত্র কুল তাহাদের অত্যাচারে রক্ষা হওয়া বড়ই কঠিন ছিল। চতুর দয়ারাম আলিবর্দ্দীচরিত বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন। * * * * তিনি আলিবর্দ্দী সমীপে বলিলেন, 'রাজসাহীর রাজভাণ্ডার অর্থপরিপূর্ণ। অথচ রাজা রামকান্ত আপনাদের প্রাপ্য কর প্রদান না করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছেন। সুতরাং আপনি রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎস্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করুন।' দয়ারামের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, অর্থলোলুপ আলিবর্দ্দী এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, রাজ্য কিছুদিন লোকের মনপ্রবোধের জন্য অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া, পরে আবার তাহা যবনরাজ্যভুক্ত (!) করিয়া লইব। * * * সৈন্যদল পাঠাইয়া আলিবর্দ্দী রামকান্তের রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। বলপ্রদর্শনপূর্ব্বক অকারণে অন্যায়রূপে রামকান্তকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, দয়ারামের অভিলাষক্রমে লোকের মন বুঝাইবার জন্য, দেবীপ্রসাদ রায় নামে ঐ বংশীয় এক ব্যক্তি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। সস্ত্রীক রামকান্ত গৃহত্যাগী হইয়া জগৎশেঠের শরণ লইলেন।" *

এই সুলেখক যেরূপ উজ্জ্বলভাবে দয়ারাম ও আলিবর্দ্দীর গুপ্ত কথোপকথন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া স্বতই মনে হয় যে,

* বাদশনারী।

অবশ্যই এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সরস বর্ণনার কোন না কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। সে প্রমাণ কি, লেখক কিন্তু একবারও তাহার উল্লেখ করেন নাই। ঐতিহাসিক জীবন-চরিত লিখিতে বসিয়া, তদুপলক্ষে কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিতে হইলে, যেরূপ নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা ও অনুসন্ধানতৎপরতা থাকা আবশ্যক, আমাদের মধ্যে সেরূপ প্রবৃত্তি প্রয়োজনানুরূপ বিকাশ লাভ করে নাই। আমরা সামান্য একটু জনশ্রুতি পাইবামাত্র কল্পনা-বলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলি, এবং স্বকপোলকল্পিত চিত্রখানি লইয়া জনসাধারণের নিকট ইতিহাস বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি! উপন্যাস-পিপাসা এতই প্রবল যে, একটু লিপিচাতুর্য্য, একটু সরস-পদ লালিত্য-বিকাশ, অথবা একটু অনুপ্রাস-প্রয়োগ-কৌশল দেখাইবার সুবিধা পাইলে, তাহার অনুরোধে ঐতিহাসিক সত্যনির্ণয়ের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, যথেচ্ছভাবে পদবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হই!

'দ্বাদশনারী'তে রাণী ভবানীর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ স্বাধীন অনুসন্ধানতৎপরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয় 'নবনারী'-লেখকের পদানুসরণ করিয়াই 'দ্বাদশনারী' রচিত হইয়া থাকিবে। 'নবনারী'-লেখক বহুদিন রাজসাহী-প্রদেশে বসতি করিয়া অনেক জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সবিশেষ সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 'নবনারী' এবং 'দ্বাদশনারী', এই উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামজীবন পরলোকগমন করেন,—তৎকালে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক।" উভয় লেখকেরই এইরূপ ধারণা যে, তৎকালে আলিবর্দ্দী বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব। কিন্তু ইতিহাসপাঠী পাঠশালার বালকেরাও জানে যে, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আলিবর্দ্দী সিংহাসনে পদার্পণ করেন নাই;—১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনার শাসনকর্ত্তা, একজন রাজকর্ম্মচারী মাত্র!

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামজীবনের মৃত্যু হয়;—ইহা সত্য হইলেও, তৎকালে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক", এ কথা সত্য হইতে পারে না। ১৭২৪ অথবা ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের অভাবে রামকান্তকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক" হইলে, দত্তকগ্রহণের সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসরের ন্যূন হইতে পারে না। 'দ্বাদশনারী'তে লিখিত আছে যে, রামকান্ত যখন "অষ্টাদশ-

বর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক", রাণীভবানীর তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। এই হিসাবে রাণী ভবানীর বিবাহের সময় লইয়াও বিলক্ষণ বিতর্ক উপস্থিত হয়। অতি শৈশবকালে "গৌরীদান"-প্রথামতে রাণী ভবানীর উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল; 'দ্বাদশনারী'র হিসাবে রামকান্ত তখন একাদশ বৎসরের বালক! রামজীবন কি বিবাহের পর ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক রামকান্তকে সস্ত্রীক দত্তকগ্রহণ করিয়াছিলেন? বয়ঃক্রমসম্বন্ধে 'দ্বাদশনারী'-রচয়িতা যেরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য বর্ণনার মধ্যেও সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

রাণী ভবানী বা নাটোর রাজবংশ সম্বন্ধে যত পুস্তকে এই রাজ্যনাশ-কাহিনী লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'দ্বাদশনারী'তেই কল্পনার প্রাবল্য কিছু অতিমাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, এই লেখক বোধ হয় মিত্র মহাশয়ের সরসবর্ণনার উপর আরও একটু রং চড়াইয়া, স্বরচিত ইতিহাসখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মিত্র মহাশয় রাজসাহীতে ডেপুটী কালেক্টরী করিবার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নানা কারণে দিঘাপতিয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। সেই সূত্রে প্রাচীন কর্ম্মচারিদিগের নিকট যে সকল 'গল্পগুজব' শুনিতে পাইয়াছিলেন, মিত্র মহাশয় তাহার একবর্ণও পরিত্যাগ করেন নাই। সুতরাং মিত্র মহাশয়ের সকল কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। *

---

* "If Ramkanta had had something of the intelligence and foresightedness of his wife, he would have succeeded in managing the Raj; but he had not in his whole composition a particle of that strong common sense and clear judgment which distinguished the Maharani Bhabani. He was destitute of the faculty of appreciating the merits of men, and he could never distinguish friends from foes. A few months after he succeeded to the Estate, he quarrelled with Dayaram Rai who had been the firm friend, the trusted adviser and confidential agent of Ramjibana. The Raj *being in arrears*, Dayaram remonstrated with the Maharaja *against his* careless management and pointed out to him the necessity and importance of collecting and punctually forwarding the revenue to the Nawab. Ramkanta, being unable to appreciate this disinterested advice, was offended with his outspokenness. He first ceased to be guided by the

মিত্র মহাশয়ের বর্ণনালালিত্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। যে দেশে ইতিহাসের সমাদর নাই, সে দেশে জনশ্রুতিই একমাত্র সম্বল; সুতরাং বংশপরম্পরায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের অনুকম্পায় অনেক অলৌকিক জনশ্রুতি এইরূপে ইতিহাস বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। যাঁহাদের পলিতকেশ, গলিতদন্ত, শিথিলচর্ম্ম বহুদর্শনের পরিচায়ক বলিয়া লোকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, তাঁহারা যখন বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে "সে কালের" প্রাচীন কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন সে সকল কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। নীরবে পিতামহীর কাহিনী শুনিবার মত, মধ্যে মধ্যে 'হুঁ' পূরণ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু মিত্র মহাশয় ইতিহাস লিখিতে বসিয়াও, এই সকল উপকথায় 'হুঁ' পূরণ করিয়া সত্যানুসন্ধানের পথ কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন।

দয়ারামের বাহাদুরি বাড়াইবার জন্য যাঁহারা এই সকল জনশ্রুতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, মিত্র মহাশয় সেই সকল মূল প্রস্রবণ হইতে কাহিনী

---

advice of Dayaram, then ceased to shew common courtesy to him, whom he had been taught by Ramjiban to regard and address as his *dada* or elder brother and at last he dismissed him from the post of Dewan. Surrounded by a band of flatterers, he was led by them to believe Dayaram to be more an enemy than a friend. Dayaram was astounded and disgusted with this insult and wishing to bring the young Maharaja to his senses, he proceeded to Moorshidabad, *where he represented the real* state of things to the Nawab. Having entire confidence in the Rai Rayan, His Excellency deprived Ramkanta of the management of the Raj: and made it over to Deviprasad, the son of Visnuram and nephew of Ramjiban. Ramkanta was helpless and solicited the interference of his *quondam* Dewan for the restoration to the Raj. Dayaram compassionating the condition of Ramkanta, and specially of his wife, Maharani Bhabani, for whom he had great regard, moved, and with success, the court of Moorshidabad to restore the rightful owner to the Gadi. Dayaram returned to the old post of Dewan after having taught his young master a lesson which he was not in a hurry to forget."—The Rajas of Rajshahi.

সংগ্রহ করিতে গিয়া, দয়ারামের ধর্ম্মনিষ্ঠ, উদার চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। দয়ারামের ন্যায় প্রভুভক্ত রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে এরূপ ব্যবহার করা আদৌ সম্ভব কি না, সে কথার আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। দয়ারাম যেরূপ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান বলিয়া চিরপরিচিত, তাহাতে মুসলমান দরবারের অব্যবস্থিতচিত্ততার কথা তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। একবার মুসলমান নবাব দেবীপ্রসাদকে রাজ্যদান করিলে, আবার যে রামকান্ত পিতৃরাজ্যে অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না। দয়ারাম মুসলমান দরবারের রীতিনীতি জানিয়া শুনিয়াও, এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইবেন কেন? মিত্র মহাশয় যে সকল কারণে দয়ারামের ক্রোধোদয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, সে গুলি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। রামকান্ত কেন, কোন রাজাই স্বহস্তে রাজকার্য্য সম্পাদন করেন না। সুতরাং দয়ারামের ন্যায় বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী থাকিতে রামকান্ত যে রাজস্বপ্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে রামকান্ত যে একবৎসরও রাজস্বদানে ক্রটি করেন নাই, এখনও তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিলুপ্ত হয় নাই। এরূপ অবস্থায়, রামকান্তের রাজস্বদানের শিথিলতা উপলক্ষ করিয়া, দয়ারামের হস্তে রামকান্তের রাজ্যনাশ ও বনবাস সংঘটিত হওয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দয়ারামের বিষয় বিভবের অভাব ছিল না—তিনি মহারাজ রামজীবনের সময় হইতেই তরফ নন্দকুজাদিগরের তালুকদার বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন। রামজীবনের কৃপায় এই তালুক লাভ করিয়া দয়ারাম সবিশেষ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা উপভোগ করিতেছিলেন। এই তালুকের রাজস্ব নাটোররাজসংসারে প্রদান করিতে হইত, এবং এই তালুকের অস্তিত্বও সে কালের রীতি অনুসারে নাটোর রাজবাটীর অনুগ্রহের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। সুতরাং দয়ারামের ন্যায় বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী, যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারই মূলচ্ছেদ করিয়া আপনার হাতে আপনার সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করিবেন কেন?

রামকান্তের চরিত্র-সম্বন্ধে মিত্র মহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সহিত 'ধাদশনারী'র বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। নবাবসরকারের কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামকান্তের শাসনসময়েই রাজসাহী-রাজ্যের

সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইয়াছিল। সে রাজ্য সর্ব্বতোভাবে "যবনরাজ্যভুক্ত" থাকাই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-প্রবোধের জন্য তাহাকে দিনকতক মাত্র পরের হাতে রাখিয়া, অবশেষে শনৈঃ শনৈঃ "যবনরাজ্যভুক্ত" করিয়া লইবার জন্য আলিবর্দ্দীর এত মস্তিষ্ক-কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইবে কেন? নবাবী আমলের গল্পগুজব প্রায়ই অসম্ভব কাহিনী ও 'দ্বাদশনারী'লেখকের এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণ তাহারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আর একজন লেখক বলেন যে, ১১৫৮ সালের সমসময়ে রায় রাইয়াঁ নন্দকুমারের চক্রান্তে পড়িয়া মহারাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতা হন; কিন্তু তখন তিনি বিধবা। * মিত্র মহাশয় ইহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † সুতরাং মিত্র মহাশয়ের মতানুসারে রাণী ভবানীর দুইবার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং দুইবারই আলিবর্দ্দীর সময়ে। আমরা ইহার কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া আলিবর্দ্দী একবার মাত্র রাণী ভবানীকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহার পর প্রত্যেক বর্ষেই নবাবদপ্তরে রাণী ভবানীর নামজারি দেখিতে পাওয়া যায়।

১১৫৮ সালের সমসময়ে রাণী ভবানীর সবিশেষ গৌরবের অবস্থা। তখন তিনি ভারতবর্ষের বিবিধ পুণ্যক্ষেত্রে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য পিপাসার পরিচয় দিতেছিলেন। এই সকল মন্দিরফলকে শকাব্দার উল্লেখ আছে। তৎকালে রাজ্যনাশ ও বনবাস সংঘটিত হইলে, এই সকল পুণ্যকীর্ত্তি সংস্থাপিত হইতে পারিত না।

রাজ্যচ্যুত হইলে রাণী ভবানীর আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। তিনি জগৎ শেঠের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, দেওয়ান দয়ারামের সহায়তায় রাজ্যলাভের জন্য নবাব-দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, আলিবর্দ্দীর শাসন সময়েই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। কাহার চক্রান্তে রাণী ভবানীর সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, কেবল সেই সম্বন্ধেই যাহা কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাণী ভবানী মণি-মুক্তাপ্রবালাদি অপেক্ষা স্বর্ণালঙ্কারই বহুল পরিমাণে পরিধান করিতেন।

---

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

† The Rajas of Rajshahi.

ইহাতে অল্পবয়স্কা শেঠকন্যারা কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, রাণীজী সুবর্ণের ধাতুপাত্র প্রস্তুত না করিয়া, তাহাকে পরম সমাদরে অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন কেন? তৎকালে রাণী ভবানীর এরূপ দৈন্যদশা যে, রাজ্যোদ্ধারের জন্য যাহা কিছু ব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্যও অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিতে হইয়াছিল! এ সকল অবশ্যই "গল্পগুজব"; কিন্তু তথাপি ইহা রাণী ভবানীর বৈধব্যদশার "গল্পগুজব" নহে।

কুচক্রী দেবীপ্রসাদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়াই যে রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইতে হইয়াছিল, এবং প্রভুভক্ত দয়ারাম ও ক্ষমতাশালী জগৎশেঠের অধ্যবসায়গুণেই যে তাঁহারা নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাপুদেব শাস্ত্রী নামক এক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বহু পূর্ব্বে আলিবর্দ্দীর সিংহাসনলাভের কথা গণনা করিয়া দিয়াছিলেন। * এই জনরব সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, আলিবর্দ্দীর সময়ে এক জন হিন্দু সাধুপুরুষ এবং তাঁহার শিষ্য নন্দকুমারের সবিশেষ ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছিল। নন্দকুমার অলক্ষিত ভাবে ইতিহাসে প্রথম পদার্পণ করেন; পরে নবাব আলিবর্দ্দীর সময় হইতে গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত, বাঙ্গালার ইতিহাস কেবল মহারাজ নন্দকুমারের নামে এবং কার্য্যবিবরণীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আলিবর্দ্দীর শাসন-সূচনাতে নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে সবিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর নন্দকুমার যখন হুগলীর ফৌজদার, তখন তাঁহার মনস্তুষ্টিসম্পাদনের জন্য ইংরাজ বণিকেরাও তাঁহাকে বৎসরে ২৭০০৲ টাকা পার্ব্বণী প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন! † এই মহারাজ নন্দকুমারের চক্রান্তেই রাণী ভবানীর সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-রচয়িতা মহাশয় তাহার যেরূপ কালনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। নন্দকুমারের চক্রান্তে রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়া থাকিলে, নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে বাস করিবার সময়েই যে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-রচয়িতা মহাশয় কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন,

---

* মহারাজা নন্দকুমার—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন।

† Long's Selections from the Records of the Government of India, Vol. I.

তখন নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার, এবং রাণী ভবানী বৈধব্যভারগ্রস্ত—আত্মজীবনে বীতরাগ হইয়া জামাতা রঘুনাথ লাহিড়ীর নামে নবাব-সরকারে রাজসাহী-রাজ্যের নামজারি করিয়াছিলেন!

দেবীপ্রসাদ বহুদিন হইতে যে রাজসাহী-রাজ্যের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, নন্দকুমারের চক্রান্তে সেই রাজসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াও দীর্ঘকাল উপভোগ করিবার অবসর পাইলেন না! জগৎশেঠের কল্যাণে রামকান্ত এবং রাণী ভবানী কয়েক মাস পরেই নষ্ট রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ রামকান্ত এবং মহারাণী ভবানী দেবী যখন শেঠগৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, জগৎশেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত রাজবাটীর তখন বড়ই গৌরবের অবস্থা। এখনও সেই ধ্বংশাবশিষ্ট ইন্দ্রপুরীকে লোকে 'মহিমাপুর' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু এখন আর মহিমাপুরের পূর্ব্ব মহিমার লেশমাত্রও বর্ত্তমান নাই। সে বিচিত্র সৌধমালার অধিকাংশই ভাগীরথী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে! এখনও যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আর মানুষের বাসোপযোগী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ভাগ্যবিবর্ত্তনের বিচিত্র শাসনে জগৎশেঠের দীন দরিদ্র বংশাবতংসগণ সেই জরাজীর্ণ রাজপ্রাসাদের কয়েকটি মসীমলিন ভগ্নকক্ষেই কোনরূপে কালাতিপাত করিতেছেন! শেঠ-ভবন বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে গৃহের গুপ্তমন্ত্রণাবলে পলাসিবীর বৃটীশ-বণিক্ কালক্রমে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিনায়কপদে সমারূঢ় হইয়াছেন, সে মন্ত্রভবন এখন নদীগর্ভে, তাহার উপর দিয়া ভাগীরথীর জলস্রোত ধীর মন্থরগতিতে কায়ক্লেশে প্রবাহিত হইতেছে।* যেখানে বাদশাহের মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আর চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই;—ইংরাজবণিক তাহার শেষ ইষ্টকখানিও সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের সাজসরঞ্জামগুলি কুড়াইয়া লইয়া, অন্যত্র যাদুঘর সুসজ্জিত করিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।† যে গৃহে শুভ পুণ্যাহ-উপলক্ষে বাঙ্গালাদেশের ছোট বড় সকল জমীদারকেই কখন না কখন সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতে হইত; যেখানে আবশ্যকমতে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপ মুসলমান নবাবদিগকেও সময়ে সময়ে শুভাগমন

* H. Beveridge. C. S.

† Hunter's Bengal Mss.

করিতে হইত; যেখানে ঋণগ্রহণের জন্য, অথবা পদাশ্রয়লাভে নবাবের উৎপীড়ন হইতে নিরাপদ হইবার জন্য, জগৎশেঠের কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় চিন্তাক্লিষ্ট বৃটীশ-বণিক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রহর গণনা করিতেন; সে সকল ঐতিহাসিক প্রাসাদকক্ষ এখন ধূলিবিলুণ্ঠিত হইতেছে। কয়েকটি জীর্ণ তোরণ, তাহার উপর কতকগুলি তৃণলতা, এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি ইষ্টক ও প্রস্তরস্তূপ ব্যতীত জগৎশেঠের রাজবাটীতে এখন আর দেখিবার বস্তু অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রত্যেক জীর্ণ প্রস্তরের সঙ্গে শতবর্ষের গুপ্তকাহিনী এখনও যেন চিরজীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই শেঠভবনে রাজসাহীর রাজ-পরিবারের যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া রামকান্ত ও রাণী ভবানী যদি এক জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াও জগৎশেঠের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহাতেও সমাদরের ক্রটি হইত না। তাঁহারা সশরীরে শেঠভবনে সমাগত হইলে, জগৎশেঠ প্রাণপণে তাঁহাদের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইলেন। আলিবর্দ্দীকে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত করিতে যাহা কিছু বিলম্ব হইল। আলিবর্দ্দী অবিলম্বে মূলানুসন্ধান করিয়া আবার রামকান্তকেই রাজসাহী-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ।

সুব্যবস্থার উদাহরণ দিতে হইলে, লোকে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত বলে, "বিধাতা কেমন সুন্দর কৌশলে এই অনন্ত সৃষ্টিখানা শাসনে রাখিয়াছেন; তাঁহার রাজ্যে বিদ্রোহিতা নাই, আর তাঁহার আইন-গুলি এত সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত যে, সেই সৃষ্টির কাল হইতে সেগুলা একবারমাত্রও সংশোধিত না হইয়া, কেমন পরস্পর নির্ব্বিরোধ-ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে।" এ কথাগুলি ভ্রমপূর্ণ বলা যায় না, বুদ্ধিমান ক্ষুদ্র মানুষ যখন সজ্ঞানে অর্থহীন "ভুয়ো" কার্য্য করে না, তখন সেই মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা—অনন্ত বিশ্বের বিধাতা যে যথেচ্ছ কার্য্য করিবেন, এ কথা কিছুতেই গ্রাহ্য নয়। তাঁহার সৃষ্টি-ব্যাপী আইন-সকল নিশ্চয়ই কোন এক গূঢ় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কার্য্য করিতেছে; কিন্তু সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধিপথে অগ্রসর হইবার কালীন তদ্দ্বারা যে কোন উচ্ছৃঙ্খল কার্য্য হয় না, তাহা বলিতে পারি না। মেকলে সাহেবের পিনালকোড নামক আইনগ্রন্থখানির উদ্দেশ্য অতি মহৎ; তাহার সাহায্য

ব্যতীত রাজ্যস্থিতি ও শান্তিরক্ষা অতীব কঠিন, এ সকলই সত্য; কিন্তু তাহার ব্যবহারে যে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কে বলিবে? ভগবদ্ভক্ত বলিবেন, "হে মঙ্গলময় বিধাতা, তোমার রাজ্যে অকল্যাণ নাই, তোমার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যই গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সৎ, এ কথা ধ্রুব সত্য; কিন্তু দয়াময়! মধ্যে মধ্যে এ প্রকার ভূমিকম্প হইলে কি স্বস্তি থাকিবে? তোমার মঙ্গলময় নামে আর কলঙ্ক লেপন করিও না, প্রভো, লীলা সংবরণ কর।" অতি নিরীহ রাজভক্ত নাগরিক বলিবে, "হে সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাকার, পিনাল কোড্‌টা খুব ভাল আইন, ইহার প্রত্যেক ধারার প্রত্যেক কার্য্যটি তোমার অসাধারণ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেছে সত্য; কিন্তু একটা হাঙ্গামা হইলে, মাদৃশ নিরীহকেও গোলাগুলির ভয়ে গৃহকোণে আশ্রয় লইয়া, আইন-প্রয়োগকর্ত্তা পুলিশের ভয়ে কম্পিত হইতে হয় কেন? অতএব হে আইন-বিশারদ, অধীনদের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষপাত কর।" শান্তিময় সুব্যবস্থিত রাজ্যের আইনকানুনের কার্য্যে যে প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, একটু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, অশেষ কল্যাণের নিদানভূত প্রাকৃতিক নিয়মেরও সেই প্রকার অপব্যবহার ও তজ্জনিত দৃশ্যতঃ কুফল প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এই ব্যাপারের উদাহরণ, প্রকৃতির অনেক কার্য্যেই আমরা দেখিতে পাই; তন্মধ্যে আকাশরাজ্যের অধিবাসী জ্যোতিষ্কগণ সময়ে সময়ে তদ্দ্বারা যে নির্য্যাতন ভোগ করে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ গ্রহনক্ষত্রাদির নিয়মিত গতি ও নক্ষত্রাদির স্থিরতা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, আকাশস্থ প্রত্যেক জ্যোতিষ্ক, নির্দ্দিষ্ট গতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক সুমধুর সঙ্গীতরব উত্থিত করিয়া পরমেশ্বরের মহিমা গান করিতেছে, সে সঙ্গীতের বিরাম নাই। মানুষ ও অপর প্রাণীগণ উক্ত মহান্ গীতে যোগ দিয়া, তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া সংসারে আনাগোনা করিতেছে, এই ঐকতান সঙ্গীতের একটি স্বরও "বেসুরা" নয়, তাহার "তাল" "ফাঁক" "সম" ঠিক্ যথাকালে পড়িয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে জ্যোতিষ্কপরিদর্শনোপযোগী নানা উন্নত যন্ত্রের উদ্ভাবনে ক্রমেই সে বিশ্বাস অপনীত হইতেছে—দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র সাহায্যে এখন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহনক্ষত্রাদিগণের সেই নৃত্য দেখিতে পাইতেছেন না, এবং উক্ত মহান্ সঙ্গীতের রসাস্বাদনও করিতে পারিতেছেন না। প্রাচীনেরা যাহাকে ঐকতান সঙ্গীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেটা

আধুনিকের নিকট, তাললয়হীন ও হাহাকারপূর্ণ বিকট চীৎকাররূপে প্রতিভাত হইতেছে। জ্যোতিষ্করাজ্যে গ্রহউপগ্রহাদির গতি প্রভৃতিতে সুন্দর নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে এ প্রকার জ্যোতিষ্ক অনেক দেখা যাইতেছে, যাহারা লক্ষ্যহীন হইয়া অনন্ত আকাশে মহাবেগে ছুটাছুটি করিতেছে।

প্রাচীনেরা যে সকল নক্ষত্র নিশ্চল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে তাহাদের সকলেরই পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসংযত গতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার-বার্ত্তা জগতে ঘোষিত হইলে, সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্রগণের পরস্পর সংঘর্ষণ সম্ভবপর কি না, এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইয়াছিল; কিন্তু অনেক দিন অবধি ইহার মীমাংসা হয় নাই। এই ঘটনার বহুকাল পরে, জ্যোতিষীগণ এক জাতীয় "পরিবর্ত্তনশীল তারকা" (Variable Stars) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নক্ষত্র প্রায় জ্যোতিষ্কপুঞ্জমাত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সহসা প্রথম শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া, পরে কয়েক দিবসের মধ্যে ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া যায়। এই ব্যাপার কোন পার্থিব কারণ বা দৃষ্টিবিভ্রম দ্বারা সংঘটিত হয় বলিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রথমতঃ বিষয়টির তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে হঠাৎ একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাহার অন্তর্দ্ধান প্রত্যক্ষ করিয়া, উহা যে একটা প্রকৃত নাক্ষত্রিক ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন, এবং ঐ সময় হইতে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত "পরিবর্ত্তনশীল তারকার" উৎপত্তিতত্ত্বনির্ণয়ের জন্য নানা পরিদর্শনাদি করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অনেকদিন অবধি তদ্বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অধুনা ভুবনবিখ্যাত জ্যোতিষী আচার্য্য বলপ্রমুখ পণ্ডিতগণ তারকাগণের আকস্মিক প্রজ্বলন, নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণের ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ, এবং মানব-বুদ্ধি-প্রসূত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিরও শক্তি সসীম। মানবচক্ষুর অগোচর এবং সহস্র সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহত্তর কোটি কোটি অসংখ্য জগৎ অনন্ত আকাশবক্ষে ভাসমান রহিয়াছে;—ইহাদের অস্তিত্ব অতি বৃহৎ দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, উক্ত অদৃশ্য জগৎ মহাবেগে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রমণপথের কোন স্থানে অপর জ্যোতিষ্কের সহিত সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইলে, ঘর্ষণজাত তাপ দ্বারা উভয়েই প্রজ্বলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া

পড়ে, এবং শীঘ্রই উক্ত তাপ দ্বারা উভয়েই ভস্মীভূত হইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যায়। সংঘর্ষণজাত তাপ দ্বারা দুইটা বৃহৎ জগৎ এককালীন প্রজ্জলিত হইয়া ভস্মীভূত হওয়া অসম্ভব মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত ঘটনা। প্রতি সেকেণ্ডে আঠার মাইল হিসাবে পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সার্ রবার্ট বল্ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যদি পৃথিবী এই নির্দ্দিষ্ট গতিতে চলিয়া ঠিক তাহার ন্যায় আর একটি জ্যোতিষ্কের সহিত সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উভয়েই প্রজ্জলিত হইয়া অল্প সময় মধ্যে কেবল বাষ্পরাশিতে পরিণত হইবে।

জ্যোতিষ্কপরিদর্শনকার্য্যে ফটোগ্রাফি ও রশ্মিনির্ব্বাচন-যন্ত্র (Spectroscope) প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায়, অতি অল্পকাল মধ্যে অনেক নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, হারভার্ড বিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত মানমন্দির হইতে কেবল একটি নক্ষত্ররাশিতে ৮৭টি সংঘর্ষণের ফটোগ্রাফ ছবি তোলা হইয়াছিল। অন্যান্য নক্ষত্ররাশির তুলনায় কন্যারাশিস্থ তারকাগুলির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষণজাত উৎপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন্ রাশিতে কি পরিমাণে এই নাক্ষত্রিক উৎপাত সংঘটিত হইতে পারে, অদ্যাপি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই, জ্যোতির্ব্বিদ্ নিযুক্ত রহিয়াছেন। এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, প্রত্যেক রাশির দৃশ্যমান নক্ষত্রের সংখ্যার সহিত সংঘর্ষণ-পরিমাণের একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত আছে; কিন্তু সে অনুপাতটি যে কি, তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই।

প্রতি মুহূর্ত্তেই আকাশরাজ্যে এই প্রকার সৃষ্টিনাশ প্রত্যক্ষ করিয়া, ভবিষ্যতে আমাদের সৌরজগৎটার অবস্থা কি হইবে ভাবিয়া, অনেকে আকুল হইয়াছেন। কক্ষপরিভ্রমণ ও মেরু-রেখা-আবর্ত্তনজাত আহ্নিক গতি ব্যতীত পৃথিবীর আরও একটা গতি আছে,—সেই গতি যে কেবল পৃথিবীরই আছে, তাহা নয়; স্বয়ং গ্রহরাজ সূর্য্য এবং সৌর-পরিবারস্থ প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতুও সেই গতির বশবর্ত্তী হইয়া মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য নিশ্চল বলিয়া যে একটি কথা আছে, তাহার অর্থ অন্যরূপ। চলিষ্ণু যানে এক ব্যক্তি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে এবং অপর এক আরোহী তথায় চলাফেরা করিলে, প্রথম ব্যক্তিকে দ্বিতীয়ের তুলনায় যে প্রকার নিশ্চল বলা যায়, সেই হিসাবে গতিশীল গ্রহউপগ্রহাদির তুলনায় সূর্য্য স্থির। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সমবেত সৌর জগতের উক্ত গতি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,

কোন দ্রুতগামী যান আরোহণ করিয়া চলিলে, যানের সম্মুখস্থ দূরবর্ত্তী বৃক্ষাদি প্রথমতঃ নিবিড় জঙ্গলরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সেগুলির পরস্পর ব্যবধান বেশ বুঝা যায়; আবার উক্ত বৃক্ষ সকল অতিক্রম করিয়া চলিলে, তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রকারে যানের গতির অন্য কোনও চিহ্ন জানিতে না পারিলেও, কেবল উক্ত চিহ্ন দ্বারা গতির দিক্ ও পরিমাণাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আকাশের এক অংশের নক্ষত্র ক্রমেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং তাহার ঠিক বিপরীত অংশস্থ তারকাসকল পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত উদাহরণানুযায়ী সমবেত সৌরজগতের গতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। জ্যোতির্বিদগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্যদেব ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রহউপগ্রহাদি পরিবৃত হইয়া, হারকিউলিস্ রাশিস্থ একটি নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া, বৎসরে ৩৩ কোটি মাইল তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। কথাটা যে অতীব বিস্ময়কর ও ভয়জনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ভবিষ্য মহাপ্রলয়ের ভয়ে, আপাততঃ উৎকণ্ঠার কোনও কারণ নাই। হারকিউলিস্ রাশির যে নক্ষত্রটির সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণের সম্ভাবনা অনুমিত হইতেছে, তাহা সৌরজগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত; এই ব্যবধান এত অধিক যে, আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশি হাজার মাইল গমন করিয়াও, ৫১ বৎসরে উক্ত সুদীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারে না। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রায় দুই কোটি বৎসর পরে উক্ত প্রলয় সংঘটিত হইবে; প্রতিযুগে জীবরাজ্যের যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, উক্তসময়ান্তে পৃথিবীর অবস্থা কি প্রকার থাকিবে, তাহা সহজেই অনুমতি হইতে পারে। সম্ভবতঃ সেই দূর ভবিষ্যতে নানা-বৈচিত্র্যময় এই জীবরাজ্য, জলবায়ুশূন্য প্রাণিহীন চন্দ্রের দশা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিবে, এবং সহসা এক দিন হারকিউলিস্ রাশির সহিত মিলিত হইয়া, অনন্ত আকাশের এক অংশ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত করিয়া চির-কালের জন্য অন্তর্হিত হইবে। হয় ত সৌরজগতের এই ভয়ানক পরিণামের স্মৃতি, কোন নবাভ্যুদিত জ্যোতিষ্কের অধিবাসিগণের হৃদয়ে কিয়দ্দিন জাগরিত থাকিবে, আবার কিছু কাল পরে তাহাও লুপ্ত হইয়া, এই অতি ক্ষুদ্র কীর্ত্তিটির অস্তিত্বের কাহিনী পর্য্যন্তও বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্য।

সাহিত্যের এই নিত্য পরিবর্ত্তনের যুগে বিগত দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যে যে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সংকীর্ণ পরিসরে তাহার সম্যক আলোচনা করা সহজ নহে, বুঝি সম্ভবও নহে। সম্প্রতি নর্থ আমেরিকান রিভিউ পত্রে প্রখ্যাতনামা ইংরাজ সমালোচক মিষ্টার এডমণ্ড গস্ এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; আমরা তাঁহার প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

লেখকের মতে বিগত দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রাচীন লেখকদিগের তিরোভাব এবং নবীন লেখকদিগের আবির্ভাব। বিগত দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যের প্রাচীন সেবকগণ প্রায় সকলেই মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত হইয়াছেন। সাহিত্যস্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে স্থানে স্থানে বাধা পাইয়া কিছুক্ষণ বিলম্ব করে। মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের জীবনের দীর্ঘতার সহিত এই বিলম্বও বর্দ্ধিত হয়। কারণ সে সকল সাহিত্যসেবক প্রায়ই খ্যাত্যাপন্ন, রক্ষণশীল মতের এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিভানুসারে সম্যকরূপে সম্মানিত। সাহিত্যের স্রোতোমুখে তাঁহারা দৃঢ়গঠিত গিরির মত দণ্ডায়মান হইয়া, সেই প্রবাহে বাধা প্রদান করেন। মরণের করস্পর্শে সে সকল বাধা দূর হইলে সাহিত্যস্রোত অগ্রসর হয়। প্রমাণস্বরূপে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বেন জনসনের, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ড্রাইডেনের, এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল জনসনের মৃত্যুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল বৎসরে সাহিত্যের কাটা খালে যেন নূতন জোয়ারের জল প্রবেশ করিতে পাইয়াছিল।

মৃত্যুর প্রভাব।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সাহিত্যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবীন সাহিত্যসেবকের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। টেনিসন, ব্রাউনিং, নিউম্যান, যোয়েট, টিণ্ডাল, হাক্সলি, কিংলেক, ফ্রুড, ইঁহারা সকলেই তখন জীবিত। সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, এই সকল প্রাচীন সম্মানিত লেখকের কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসানের অধিক বিলম্ব নাই; কিন্তু ইহাও সকলে আশা করিয়াছিলেন যে, সেই সকল ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের নবীন জ্যোতিষ্কগণ সাহিত্যাম্বরে তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া আলোক ও জ্যোতিঃ বিকীরণ করিবেন। টেনিসন ও ব্রাউনিং যাইলেও, ম্যাথু আর্ণল্ড ও উইলিয়াম মরিসের থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। যোয়েট যাইলেও পেটারের থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, এবং ফ্রুডের পর তাঁহার স্থান ক্রিম্যান অধিকার করিবেন, ইহাই একরূপ নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু এই বিগত দশ বৎসরের বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে প্রবীণ লেখকদিগের এবং যে সকল অপেক্ষাকৃত নবীন লেখকগণের তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাদিগেরও মৃত্যু হইয়াছে। প্রাচীন লেখকদিগের মধ্যে এখন দুই জন মাত্র জীবিত—রাস্কিন ও স্পেন্সার। ইঁহাদিগের মধ্যে আবার রাস্কিনের লেখনী দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর এখন নিশ্চল হইয়াছে। কাজেই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রবীণ সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে এখন এক স্পেন্সারই বর্ত্তমান।

বিশেষত্ব।

সহজেই আশা করা যায় যে, এই সকল প্রবীণ লেখকদিগের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রতিভাশালী নবীন লেখকের আবির্ভাবে সাহিত্যাম্বর আলোকিত হইবে; কিন্তু হায়, দুঃখের সহিত এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, সে আশা সফল হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লেখকের আবির্ভাব বড় হয় নাই। এখন গ্রন্থকারদিগের ব্যবসায় বেশ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সত্য; কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পর উচ্চাঙ্গের সাহিত্যস্রোতে আর কখনও এমন মন্দা পড়ে নাই।

আশায় নিরাশা।

কেবল কবিতাই এই নিয়মের বহির্ভূত দেখা যাইতেছে।

আর্ণল্ড, ব্রাউনিং, রসেটি এবং সর্ব্বোপরি টেনিসনের মৃত্যুতে কবিতায় প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে—কবিতার কিছু সুবিধাও হইয়াছে বলিতে হইবে। টেনিসনের মৃত্যুর সময় সংবাদ-পত্রের লেখকগণ বলিয়াছিলেন যে, এইবার কবিতার মৃত্যু হইল; এখন প্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহাদিগের সে ভবিষ্যৎবাণী সত্য নহে। প্রবীণ লেখকদিগের জীবনকালে পাঠকগণ বহু প্রতিভাশালী তরুণ কবির সংবাদ রাখেন নাই—তাঁহারা অনাদৃত ছিলেন। এখন বিহগের প্রথম কাকলির মত তাঁহাদিগের মধুর সঙ্গীতে পাঠকগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কবিতার পূর্ণ প্লাবন—এখন সে প্লাবন সরিয়াছে সত্য; কিন্তু স্রোতস্বতী এখনও কূলে কূলে ভরা। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের নবকবিগণ যদি প্রবীন কবিদিগের মরণজনিত সাহিত্যের ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে সম্পূরণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদিগের আবির্ভাবে সাহিত্যের যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কবিতার উন্নতি।

বিগত দশ বৎসরে বহু উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে দুই চারখানি প্রথম শ্রেণীর। অনেকগুলি সুখপাঠ্য এবং অবশিষ্ট গুলি অসার—সাহিত্যের আবর্জ্জনা মাত্র। উপন্যাস অনেক স্থলে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আজকাল লোকে উপন্যাস ভালবাসে, উপন্যাসই এখনকার "ফ্যাসান", তাই সকল লেখকই উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করেন—তা সেদিকে তাঁহাদিগের প্রতিভা থাকুক আর নাই থাকুক; ইহাতে সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ষ্টিভেন্‌সনের প্রতিভা প্রবন্ধ-রচনা এবং হয় ত দর্শনালোচনার উপযোগী ছিল; কিন্তু প্রথম ছেলেদের জন্য "ট্রেসার আইল্যাণ্ড" আরম্ভ করিয়া শেষ তিনি উপন্যাস রচনাই করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করাতে আমরা এক জন প্রতিভান্বিত সাহিত্য-সমালোচক হারাইয়াছি। এইরূপ মিষ্টার জর্জ্জ মুরে আমরা এক জন সমাজতত্ত্ববিৎ এবং মিষ্টার ওয়াই-ম্যানে এক জন ঐতিহাসিক হারাইয়াছি। সকল শ্রেণীর লেখকগণ যে আর সকল বিষয় ছাড়িয়া উপন্যাসরচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহা সত্য সত্যই বড় আশঙ্কার বিষয়।

উপন্যাসের প্রাচুর্য্য।

উপন্যাসের এই অতিরিক্ত আদরের অবশ্যম্ভাবী ফলে পাঠকগণ এখন উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই পাঠ করিতে চাহেন না। লেখক যদি কোন নূতন ভাব, কোন নূতন মত প্রচার করিতে চাহেন—তবে তাঁহাকে তাহা উপন্যাসে প্রচার করিতে হইবে, নহিলে কেহ তাহা পাঠ করিবে না। এখন ক্রমেই পাঠকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে সত্য, কিন্তু গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের কথার সহিত মিশাইয়া না দিলে কোন বিষয় ভাল করিয়া পাঠ করেন, এমন পাঠকের সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে ভিন্ন বাড়িতেছে না। এখন যাঁহারা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছু লিখেন, তাঁহারা আলোচ্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন; কিন্তু বড় অধিক পাঠক সে সকল পাঠ করেন না। অধিকাংশ পাঠক উপন্যাস এবং সংবাদপত্র ব্যতীত আর কিছু পাঠ

উপন্যাসের অপকারিতা।

করিতে চাহেন না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, "Modern Painters", "The Grammar of Assent", এমন কি "The History of Civilisation"ও যদি বিগত দশ বৎসর মধ্যে প্রকাশিত হইত, তবে অল্প লোকেই সে সকলের আদর করিত। বাকল, নিউম্যান, এমন কি রাস্কিন যদি বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আবির্ভূত হইতেন, তবে তাঁহাদিগকেও আপনাদিগের মত-প্রচারের জন্য বাধ্য হইয়া উপন্যাস লিখিতে হইত।

আজ কাল আবার যুবকদলে ব্যায়াম-চর্চ্চাটা অসম্ভব বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় তিনটি—ইতিমধ্যে প্রবীণ লেখকদিগের প্রায় সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে; ইতিমধ্যে ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের কিছু অধিক আবির্ভাব হইয়াছে; ইতিমধ্যে সাহিত্যের পক্ষে অশুভজনক ব্যায়ামপ্রিয়তা এবং ব্যবসাব্যাপৃতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষা।

শিল্প-বিদ্যা।

ইংলণ্ডে আজকাল টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ শিল্পবিদ্যাশিক্ষার একটা হুজুগ উঠিয়াছে। সহসা পাউণ্ড-পূজক ইংরাজের এ নূতন হুজুক কেন? ইহার প্রধান কারণ,—জার্ম্মানির বাণিজ্যে অসাধারণ উন্নতি। ফ্রি ট্রেড অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের পথরোধ করিয়া জার্ম্মানি এখন আপনার বাণিজ্যে বিস্ময়কর উন্নতি করিয়া লইয়াছে। এই ভারতবর্ষেই দেখিতে পাই, জার্ম্মানির সস্তা জিনিস অনেক স্থলেই ইংলণ্ডের জিনিসকে আর আমল দিতেছে না। তাই এখন Made in Germany শুনিলে ইংরাজ শিহরিয়া উঠে। ইংরাজের বিশ্বাস এই, শিল্পবিদ্যাশিক্ষার আধিক্যেই জার্ম্মানির এত উন্নতি; তাই ইংলণ্ডে এই নূতন হুজুগ। এই হুজুগ আমাদের দেশে পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক সভাসমিতিতে আজকাল গরিব প্রজাপুঞ্জের অবস্থার উন্নতির পক্ষে এই শিল্পবিদ্যাশিক্ষা মহৌষধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিল্পবিদ্যাশিক্ষা সম্ভবমত ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন হুজুগ এমন প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের আশঙ্কা হয়, কতকদিন পরে আমাদের দেশে কেহ কেহ বঙ্গদেশের পলিপড়া মাটিতে কর্ণওয়ালের বিশুদ্ধ টিন বাহির করিবার কল্পনা করিবেন।

সম্প্রতি লণ্ডনে School of Economicsএ বিগত আদমসুমারীর কর্ত্তা মিষ্টার বেনস্ এবং দেশদ্রোহী স্যর মান্‌চারজি ভবনগরী, ভারতবর্ষে শিল্পবিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তদুভয় প্রবন্ধের সারসংগ্রহ প্রদান করিলাম।

মিষ্টার বেন্‌সের কথা।

কেবল শিল্পবিদ্যাশিক্ষা কেন, সকল শিক্ষাই সাধারণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হওয়া আবশ্যক। নহিলে তাহাতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। বিদেশের আমদানী

সুবিধা অসুবিধা।

জিনিস সকল সময় সাধারণের পক্ষে উপকারী হয় না। বঙ্গদেশে অশ্বত্থবৃক্ষ বিনা যত্নেও বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু বহু যত্নেও ওক বৃক্ষ জন্মে কি না সন্দেহ;—আবার জন্মিলেও তাহা স্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইবে না। মধ্য-যুগের শেষভাগে য়ুরোপের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ভারতবর্ষের অবস্থা কতকটা সেইরূপ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ইংলণ্ডের নবীন খরস্রোত সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে,—যেন সে প্রাচীন সভ্যতার মূলদেশ কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে এবং পশ্চিম য়ুরোপে নৈসর্গিক প্রভেদও প্রভূত।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে কলকারখানার প্রধান উপযোগী জিনিস—কয়লা এবং লৌহ—বড় সুলভ প্রাপ্য নহে। উষ্ণপ্রধান দেশে মানব সাধারণতঃই কিছু শ্রমবিমুখ হয়; তদ্ভিন্ন উষ্ণপ্রধান দেশে কলকারখানায় বহুলোকের একত্র সমবেশ বড় সুবিধাজনক নহে। কলকারখানার জন্য সহর বাজার আবশ্যক; কিন্তু ভারতবর্ষে শতকরা কেবল পাঁচ জন লোক সহরে বাস করেন। অবশিষ্ট সকলেই পল্লীগ্রামে নীরবে জীবন যাপন করে। এখন ইংরাজ-শাসনে লোকের গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, এখন লোকে বহির্জগতের সংবাদ রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে অধিকাংশ লোকে গ্রামে পিতৃপিতামহাদিক্রমে অধিকৃত জমি চাষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এক গ্রামের লোক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের সংবাদও রাখিত না। গ্রামেই গ্রামবাসীদিগের আবশ্যকসম্পূরণের জন্য কুম্ভকার, সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার মিলিত; তাহাদিগের কার্য্যের জন্য তাহারা গ্রামে কোন জমি খাসে বা ভাগে আবাদ করিত, অথবা কৌলিকপ্রথানুসারে কিছু কিছু নগদও পাইত। তখন লোকের এত অভাব ছিল না, তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতবাসী আপনার চারি দিকে অভাবের ক্রমবর্দ্ধনশীল গণ্ডি দেয় নাই, কাজেই ব্যবসায়ীরাও অধিক মক্কেল সংগ্রহ করিবার

সেকাল ও একাল।

চেষ্টা করিত না—করিবার সুবিধাও ছিল না। দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ছিল, শুল্ক দিতে দিতে ব্যবসায়ীর প্রাণান্ত হইত। ইহার উপর আবার দস্যুভয়, এমন কি, রাজকর্ম্মচারীদিগের ভয়ও ছিল। আবার জাতিভেদের কঠোর শাসনে ব্যবসায়ীকে পুরুষানুক্রমে একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে হইত। জাতিভেদের এই শাসন এখন অনেকটা শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থও পূর্ব্বপুরুষের অকৃতপূর্ব্ব অনেক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে। পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া অনেকে এখন কলে কাজ করিতেছে; কলিকাতায় ও পশ্চিমভারতবর্ষে অনেক কলে লোকে বৎসরে কয় মাস খাটিয়া থাকে, তাহাতে জাতির অভিমান বড় থাকে না। (সে অনেকটা—"পেট কি ওয়াস্তে।")

পুরুষানুক্রমে একই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় যেমন অপকার হয়, তেমনই উপকারও হয়। প্রতাপগড়ের মিনার কার্য্য, সুরাটের রেশম এবং জরীর কার্য্য এবং কাশ্মীরের জগৎবিখ্যাত শালের কার্য্যে এত উন্নতির ইহাই প্রধান কারণ। এখন আবার বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে জাতিভেদ সৃষ্ট হইতেছে। যে সকল তন্তুবায় রেশমের কাজ করে, তাহারা, যে সকল তন্তুবায় সূতার কাজ করে, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না। যাহারা রঙ্গিন সূতার কাজ করে, তাহারা, আবার যাহারা সাদা সূতার কাজ করে, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে অনিচ্ছুক। সাধারণ সূত্রধরগণ মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার গাড়ী মেরামতি কার্য্যে ব্যাপৃত স্বজাতীয়গণের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে লজ্জা বোধ করে। অনেক ব্যবসায়েই এইরূপ হইতেছে। যাঁহারা ভারতবর্ষে শিল্পবিদ্যাশিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টিত, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিল্পজাতই ধনীদিগের ব্যবহারে আসিত, কাজেই শিল্পদ্রব্যসকলও রাজধানীর নিকটেই প্রস্তুত হইত। ঢাকার মশলিন্,

পরিবর্ত্তন।

উত্তর ভারতবর্ষের প্রস্তর ও ধাতুর দ্রব্য এবং আহম্মদাবাদের জরীর কাপড় প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এখন রেলপথে দেশে গমনাগমন সহজ, এমন কি সুখকর

হইয়া উঠিয়াছে, তাই বোম্বাই, কানপুর প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পাটের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আবার রেলওয়ের কারখানাসমূহে কাজ করিয়া কত লোক নূতন মত, নূতন শিক্ষা, অন্ততঃ নূতন প্রকারের যন্ত্রপাতি লইয়া দেশে ফিরিতেছে। ইহাতে ধীরে ধীরে গৌণ উপায়ে পল্লীগ্রামেও নূতন ভাব আসিতেছে।

প্রকৃত পথ।

কেবল বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপরিপ্লুত বক্তৃতায় বা প্রভূতপাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে দেশে শিল্পবিদ্যাশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং বিজ্ঞান-চর্চ্চা বিশেষ আবশ্যক। এ বিষয়ে ভারতবর্ষ অন্য সকল দেশ অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এখনও ভারতবাসী-(ব্রহ্মদেশ ধরিয়া)-দিগের মধ্যে শতকরা চুরানব্বুই জন নিরক্ষর। দেশের এই অবস্থার জন্য লেখক প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগকেই দোষী স্থির করেন। হিন্দু রাজাদিগের সময় ব্রাহ্মণদিগেরই প্রাধান্য ছিল; তখন তাঁহারা স্বার্থসাধনোদ্দেশে সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান অবস্থা তাহারই ফল। সাধারণ লোকেরা লেখাপড়া আবশ্যক বলিয়াই মনে করে না। লেখক যুরোপীয় মতের রঙ্গিন চশমা চক্ষে দিয়া ব্রাহ্মণদিগের বিচার করিয়াছেন; তাই তিনি ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্যের গুণের বিষয়ে একেবারেই অন্ধ।

গভর্মেন্টের এত চেষ্টা সত্ত্বেও এখন প্রধানতঃ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণই শিক্ষিত হইতেছেন; আর আধুনিক ক্রান্স ও গ্রীসের মত ভারতবর্ষে কেবল ব্যবহারজীবীর সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে ত্রিশ লক্ষ ছাত্র শিক্ষারম্ভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা কেবল একজন উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। অন্যান্যদেশবাসীদিগেরই মত ভারতবাসী সাধারণ লোকেরা বড়ই রক্ষণশীল। দেশে শিল্পবিদ্যাশিক্ষাবিস্তারের পূর্ব্বে তাহার উপকারিতা এবং উপযোগিতা সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইবে; নতুবা সকল চেষ্টাই বিফল হইবে।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে কেবল কৃষিকার্য্যে আর চলে না। দেশের লোকের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে লোকের আয়বৃদ্ধির কোন উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্তই প্রয়োজন। শিল্পবিদ্যাশিক্ষাবিস্তারের জন্য এখন গভর্মেন্টের চেষ্টা এবং প্রজার প্রকৃত অনুরাগ আবশ্যক।

সার মান্‌চারজি ভবনাগরীর কথা।

দেশের দারুণ দুর্দ্দশা।

ভারতের অধিবাসীদিগের সংখ্যা ২৮৮০০০০০০, তাহার মধ্যে প্রায় ১৮০০০০০০০ কৃষি-ব্যবসায়ী। তাহারা যদি দেশী মোটা কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করে, তবুও অবশিষ্ট লোকের মধ্যে শিল্পবিদ্যাশিক্ষার ফল বহুপরিমাণে প্রচলিত হইতে পারে। দেশে শিল্পবিদ্যাশিক্ষা বড় কিছু হয় নাই—তাহার প্রমাণ,—কলের সহিত প্রতিযোগিতায় এখনও দেশীয় তন্তুবায়গণ বিধ্বস্ত হয় নাই। এখন দেশে দরিদ্রের শূচ, সূতা, দেশলাই হইতে ধনীর প্রাসাদসজ্জাদি সকলই বিদেশ হইতে আমদানি হয়।

ধর্ম্মের কঠোর শাসনে এখনও অধিকাংশ লোকে দেশে উৎপন্ন ধান্য, গোধূম, ডাউল, শাকসবজী, দুগ্ধ, এই সকল আহার্য্য ব্যবহার করে। কিন্তু পার্শী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও "উদার মতাবলম্বী" হিন্দু, এই সকলে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক বিদেশীয় পাত্রে রক্ষিত খাদ্য এবং মদ্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা থাকিলে এই যে টাকা বিদেশে যায়, তাহার অনেকটাই দেশে রাখিতে পারা যাইত।

শিল্পের মধ্যে ভারতবর্ষে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যেরই বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইহার জন্য হিন্দু, মুসলমান, উভয়েই বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই

শিল্পচাতুর্য্য দেবালয়ে প্রদর্শিত হইত। এখন আর মন্দিরে বা মসজিদে সে সকল বিপুল ব্যয়সাধ্য বিচিত্র শিল্পকৌশল প্রদর্শিত হয় না; তথাপি এখনও পাশ্চাত্য আদর্শের কাষ্ঠ ও প্রস্তরের কার্য্যে ভারতবাসীর শিল্পনৈপুণ্য প্রকটিত হইয়া থাকে।

দুই শতাব্দী পূর্ব্বে য়ুরোপের এবং ভারতবর্ষের অবস্থা প্রায় একইরূপ ছিল; উভয়ই কৃষিপ্রধান ছিল। আর এখন?——আজ প্রতীচ্য প্রদেশের প্রবল প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্প মুমূর্ষু। ঢাকাই মস্‌লিন, বারাণসীর বসন—সে সকল আজ অতীতের স্বপ্নমাত্র!

মালাবার-উপকূলে সংস্থাপিত কালিকট নগর হইতে কালিকো কাপড়ের নামকরণ হয়, আর আজ ভারতে কালিকো আইসে বিদেশ হইতে। দেশের লোকের নিত্যব্যবহারের সূতি কাপড় ল্যাঙ্কাষ্টার, এমন কি, জার্ম্মানি হইতেও আমদানী হইয়া থাকে। রেশমী কাপড়েই সুরাট প্রভৃতি নগরের সমৃদ্ধি; আর, প্রথমে চীনের, তাহার পর ফ্রান্সের প্রতিযোগিতায় সে রেশমি শিল্প এখন দেশছাড়া হইয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি, চীনবাসীরাও ভারতবাসীদিগের মত হাতে কাজ করে—কল ব্যবহার করে না। ইহা হইতে বুঝাযায় যে, শিল্পবিদ্যাশিক্ষার অভাবে ভারতবাসীরা আপনাদিগের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যবসায়ে

অন্যান্য ব্যবসা।

ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। পার্থিব উন্নতির প্রতি প্রথম হইতেই ভারতবাসীর অমনোযোগ। তবে বিদেশীরগণ আজও ভারতবর্ষের শাল ও জরীর ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কি আছে, কে বলিতে পারে? এখনও ভারতবর্ষে প্রচুর কার্পেট প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রাসেল্‌সের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতায় সে ব্যবসা আর অধিক দিন টিকিবে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০টি সূতার কল চলিতেছে; তদ্ভিন্ন ২২টি মদ্যের কারখানা ও কতকগুলি কাগজের ও পাটের কলও আছে। এই সকল কলে মোটের উপর প্রায় ৩০০০০০০ লোক কাজ করে; দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এই ত্রিশ লক্ষ অতি সামান্য। আবার ইহার মধ্যে অধিকাংশই "নগদা মুটে"—তাহারা দৈনন্দিন কার্য্যের জন্য বেতন প্রাপ্ত হয়, এই পর্য্যন্ত; কলের লাভে তাহাদিগের কোনও অংশ নাই। চা ও কফির ব্যবসা বিশেষ লাভজনক; কিন্তু তাহা বিদেশীয়ের হস্তে।

১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ২১৭৯৫৭৬০ টাকার অপরিষ্কৃত চামড়ার রপ্তানি হয়, আবার ঐ বৎসরেই ১৭৮৫৯৭০ টাকার পরিষ্কৃত চামড়া এবং জুতা প্রভৃতির আমদানি হয়।

আমদানি ও রপ্তানি।

ঐ বৎসরে ১২৩০৯০৩০ টাকার দলুয়াচিনি ও গুড়ের রপ্তানি হয়, আবার ২৮৭০২৯৭০ টাকার পরিষ্কার চিনির আমদানি হয়। ঐ বৎসর তৈল আমদানি হইয়াছিল ২১২২৯৯৯০ টাকার, কিন্তু তৈলের জন্য বীজ রপ্তানি হইয়াছিল ১৪২০৬০৪২০ টাকার। আর অধিক উদাহরণ আহরণ করা অনাবশ্যক। অনেক বিষয়েই এই অবস্থা।

আবার এই আমদানি রপ্তানি ব্যাপারে ভাড়া, শুল্ক, বাট্টা, দালালি প্রভৃতিতে যে কত টাকা যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে এই সকল দ্রব্য যদি দেশেই পরিষ্কৃত হইত, এবং অবশিষ্ট অংশ যদি কতক পরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া বা অপরিষ্কৃত অবস্থাতেই

উপায় কি?

রপ্তানি হইত, তবে অপব্যয় হইত না; আর দেশের কত শত অর্দ্ধাশনাভ্যস্ত হতভাগ্যের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হইত। এখন ভারতবর্ষের জিনিস ভারতবর্ষেই ক্রয় করিয়া বিদেশীয়গণ আপনাদিগের দেশ সমৃদ্ধিশালী

করিতেছে, আর উপযুক্ত শিল্পবিদ্যাশিক্ষার অভাবে ভারতবাসী অর্দ্ধাশন হইতে ক্রমে অনশন অভ্যাস করিতে বাধ্য হইতেছে।

যে সকল ব্যবসায়ে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক, কেবল সে সকলে নহে, পরন্তু সকল ব্যবসায়েই এই অবস্থা। চা, কফি, তামাক, এ সকলের ব্যবসায়ে বিশেষ কোনও শিক্ষার প্রয়োজনই হয় না। কার্য্যকারকগণ প্রায়ই ভারতবাসী, মালমসলাও ভারতবর্ষের, কিন্তু লাভ—"মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন।" বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা অল্প বয়স হইতে এই সকল ব্যবসা শিখিয়া এই সকলেই বিশেষ পারদর্শী হইয়া লাভবান হয়; আর দেশের লোকের অন্ন হয় না। ইহা কি কম আক্ষেপের কথা?

ভারতবর্ষের চা ও কফি-বাগানসমূহের স্বত্বাধিকারীদিগের, তামাক ও চামড়ার কারখানা-গুলির অধিকারীদিগের, এবং লোহের, তেলের, ময়দার, সূতার ও রেশমের কলগুলির মালিকদিগের নাম দেখিলে, দেশের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া নিতান্তই ব্যথিত হইয়া পড়িতে হয়;—তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয়।

বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগার সংস্থাপন ব্যতীত ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-সঙ্গতমতে ব্যবসাশিক্ষাবিস্তারের বিশেষ কোনও চেষ্টাই হয় নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে

শিল্পবিদ্যা-শিক্ষাপ্রচার।

কয়েকটি কলেজের বিজ্ঞানাগারে এবং রেলওয়ে বিবিধ কলের কারখানায় ভিন্ন আর কোথাও দেশীয়দিগের বিজ্ঞান ও কলকব্জার কাজ শিখিবার উপায় ছিল না। এই সময় বোম্বাই ও মান্দ্রাজে শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগার অর্থাৎ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন সংস্থাপনের প্রথম প্রস্তাব হয়। মান্দ্রাজে কেবল কথাবার্ত্তাই সার হইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনও কার্য্যই আরব্ধ হয় নাই। বোম্বায়ে সৌভাগ্যক্রমে তখন লর্ড রিয়ে গভর্ণর; তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় কয় জন কর্ম্মঠ লোক লইয়া পরিচালনসমিতি সংগঠিত হয়। উপযুক্ত সম্পাদকও মিলিল—মিষ্টার ওয়াদিয়া ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যবসাগঞ্জে মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ দিকে আবার তিনি দেশের অভাব এবং দেশের লোকের ভাবগতিক বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। লর্ড রিয়ের পর লর্ড হেরিস্‌ও বোম্বাইয়ের এই শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগারের উন্নতির জন্ম বিশেষ চেষ্টা করেন। এই সকল কারণে বোম্বাইয়ের এই শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

প্রথমেই য়ুরোপ হইতে উপযুক্ত শিক্ষিত শিক্ষক আনাইয়া বোম্বাই বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ প্রচলিত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। যোগ্য লোকের হস্তে ভার থাকায় অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষে এই শিল্পবিদ্যাশিক্ষার উপযোগিতা সপ্রমাণিত হইয়া গেল; এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ স্থানীয় কলকারখানায় বিশেষ লাভের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপ নানা কারণে আজ বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ত কোন বিভাগে এরূপ কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূত্রধরের ব্যবসা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্ম বিদ্যালয় আছে সত্য, কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের বন্দোবস্তই বোম্বাই বিদ্যালয়ের বন্দোবস্তের মত নহে; তাই সে সকলে কাজও ভাল হয় না।

পূর্ব্বে জাতিভেদের কঠোর শাসনে পুরুষানুক্রমে একই ব্যবসা শিক্ষা করায়, তাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতিই হইত;—ক্রমে তাহা বিনষ্ট হইতেছে, এদিকে আবার নূতন ধরণে নূতন ব্যবসায়শিক্ষার কোনও চেষ্টাই হইতেছে না। কর্ম্মশিক্ষার জন্ম শিক্ষানবিশ দেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহার উপর আবার ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হইতেও কুফল উৎপন্ন হইতেছে। শিক্ষার দোষে যুবকগণ পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িয়া চাকরী ও আইন ব্যবসায়ের জন্য লালায়িত।

শিক্ষার দোষ।

সকলেই যদি এই দুই দিকে যাইতে চাহিবে, তবে আর অন্য অন্য ব্যবসায়ের উন্নতি হইবার উপায় কি? এই সকল কারণে এবং সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য বাণিজ্যের প্রবল প্রতিযোগিতায়, নূতন ব্যবসায়ের উৎপত্তি হওয়া দূরে থাকুক, পুরাতন ব্যবসাগুলি নষ্ট হইতে চলিল। আজকাল ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্যে পার্শিজাতিই শীর্ষস্থানীয়, শিক্ষাতেও তাহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে তাহারা পোতগঠনে, গৃহসজ্জানির্ম্মাণে, গজদন্ত ও চন্দন কাষ্ঠের খোদাই কার্য্যে এবং অন্যান্য নানা ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে আজ তাহারা আরও উন্নতি করিয়া বিদেশীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে পারিত; কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে তাহাদিগের সন্তানগণ এখন পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িয়া ওকালতি, ডাক্তারি, স্কুলমাষ্টারি এবং কেরাণীগিরি করিতে ব্যস্ত। তাই দেশের এই দুর্দ্দশা। পাঠক! স্বর্গীয় ঈশ্বর গুপ্তের সেই কথা মনে করিবেন, "যত গোপগোয়ালা, সদরআলা—কে দেবে গো ঘোল?" এখন দেখা যাইতেছে, যে সম্প্রদায় যত অধিক দিন বর্ত্তমান সাহিত্যপ্রধান শিক্ষার বন্যা রোধ করিতে পারিবে, সে সম্প্রদায় তত অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

সকল সম্প্রদায় সম্বন্ধেই আজ এই কথার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে এক সময় চট্টগ্রামে জলযাননির্ম্মাণের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। উপযুক্ত শিক্ষা ও শিল্পীর সাহায্য পাইলে সেখানে সেই ব্যবসায়ের আরও উন্নতি হইত; কিন্তু আজ তাহা বিধ্বস্তপ্রায়।

ভারতবর্ষে কয়লা ও লৌহ যথেষ্টপরিমাণে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষে মজুরের পারিশ্রমিক এতই অল্প যে, তাহাতে সে অসুবিধা পোষাইয়া যায়। প্রতীচ্যদেশের

ভারতবর্ষে সুবিধা।

ব্যবসায়ীদিগের মূলধনে ভারতবর্ষে নানা ব্যবসা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহা হইতেই লেখকের কথা প্রমাণিত হইতেছে। ভারত-বর্ষে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ভারতবাসীরা বহুকালের অভিজ্ঞতা ও দেশের অবস্থা হেতু বিশেষ দক্ষ, সে সকলেও তাহাদিগের উন্নতি হয় না। তাহার কারণ,—তাহাদিগের ব্যবসায়-বিদ্যার শিক্ষা হয় না, এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে তাহারা পরস্পরের উপর বিশ্বাস করিতে পারে না। তাই সে সকল ব্যবসাও বিদেশীয়দিগের হস্তে যাইতেছে;—চা, নীল, নানাপ্রকার ঔষধ প্রভৃতির ব্যবসায়ও ইহার দৃষ্টান্ত। বিদেশ হইতে অনেক রক্ষিতখাদ্য (Preserved Food) ভারতবর্ষে আমদানি হয়; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে বহু সুবিধাসত্ত্বেও মৎস্য এবং নানারূপ ফলের রপ্তানি হয় না, পরন্তু বিক্রয়াভাবে সে সকল বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। একটু চেষ্টা করিলে সে সকল রক্ষিত খাদ্যরূপে বিদেশে রপ্তানি করিয়া বেশ দু পয়সা লাভ করা যাইতে পারে। আজকাল ভারতবর্ষ হইতে চাটনি এবং আচার প্রভৃতির রপ্তানি হয় সত্য; কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে, তাহাতে দেশীয়গণ অতি সামান্য লাভই পাইয়া থাকে। আর ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন চতুর বিদেশীয়গণ তাহাই শোভনদৃশ্য পাত্রে করিয়া অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রয় করে এবং বিশেষ লাভবান হয়। যে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য রূপান্তরিত ও দেশান্তরিত করিয়া বিদেশীয় বণিকগণ লক্ষ্মীশ্রী লাভ করিতেছে, সেই দেশের অধিবাসীরা এক সন্ধ্যাও পেট পুরিয়া খাইতে পায় না,—ইহা বিচিত্র নয় ত কি?

শেষ কথা।

ভারতবর্ষে ব্যবসা-যোগ্য দ্রব্যের অভাব নাই; লোকেরও অভাব নাই; অভাব কেবল উপযুক্ত শিক্ষার। ভারতবাসীরা কেবল যে পিতৃপিতামহাদিক্রমে অনুসৃত ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে, এমন নহে; পরন্তু প্রতীচ্য-জগৎপ্রসূত শিল্পেও শিক্ষা পাইলেই তাহারা অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখন দেশে শিল্পবিদ্যাশিক্ষারই প্রয়োজন।

তবে প্রথমেই আমরা বলিয়াছি যে, দেশের লোকের ইচ্ছা এবং চেষ্টা ব্যতীত কেবল গভর্মেণ্ট এবং বিদেশীয়দিগের চেষ্টায়, কেবল সভাসমিতিতে, কেবল বক্তার বাগ-বৈদগ্ধ্য-বিপ্লুত বক্তৃতায় বা সংবাদপত্রের সুদীর্ঘ সন্দর্ভে কিছুই হইবে না।

উদ্দাম সঙ্গীত।

অয়ি গঙ্গে! আজি এই সরস শ্রাবণে
সঘন গগনতলে শ্যাম আস্তরণে
কি অপূর্ব্ব শোভা তোর! বরষা-বিভবে
পরিপূর্ণ নরতনুখানি, কি গৌরবে
যৌবনতরঙ্গ 'পরে তুলি আন্দোলন,
রাজরাজেন্দ্রাণী সম মহিমা আপন
প্রতি সৌম্যপদক্ষেপে করিছে প্রচার!
বহুদূরবিসর্পিত সলিলসম্ভার;
শুভ্র ফেন-লেখা তাহে, ধূর্জ্জটীর ভালে
শুভ্রকান্তি শশিকলা সম। মেঘমালে
দিগন্ত লম্বিতপ্রায়,—প্রসারিত-কর
ব্যোমচারী করী যেন আলস্যমন্থর
স্নিগ্ধ শান্ত তৃপ্তিভরে গাঢ় আলিঙ্গনে
বুকে তোর পড়েছে হেলিয়া। ক্ষণে ক্ষণে
ঘনাইছে শ্যামছায়া, ঝরিছে সলিল,—
তপোলোক-প্রান্ত হ'তে প্লাবিয়া নিখিল
ঋষিদের আশীর্ব্বাদধারা। পূর্ব্বতটে
মুহূর্ত্তে আবার, ঘননীল চিত্রপটে
স্তব্ধ বনশ্রেণীশিরে প্রশান্ত শোভায়
বিকশিছে পূর্ণশশী, রজত-প্রভায়,
উজলি বসনখানি বরষা-বধূর।
কভু ধীরে সমীরণ স্নিগ্ধ সুমধুর
আসিছে ভাসিয়া; মনোবনবিহারিণী
প্রেয়সীর সুখস্পর্শসম, উদাসিনী
বাসনারে, সোহাগের বেদনে ব্যথিয়া
করিছে বিহ্বলপ্রায়; নিতেছে টানিয়া
কোন্ কল্পকুঞ্জগৃহ পানে। শিহরিত
সুপ্তশাখা ত্যজি কভু স্বপ্নবিজড়িত
বকুলকলিকাগুলি ঝরিছে আলসে;
কভু বা পল্লব হ'তে বায়ুবেগবশে।
বনানীর অশ্রুরাশি স্নেহের মতন
করিছে সান্ত্বনাসিক্ত সর্ব্ব দেহমন।

এই সন্ধ্যাকূলে আজ ফুলের সৌরভে,
পূর্ণিমা-কিরণে আর ঊর্ম্মিকলরবে
মনে হয় মিথ্যা সব; মিথ্যা এ সংসার,
সুখে দুঃখে মোহে গড়া বিড়ম্বনা তার।
সত্য শুধু ওই স্নিগ্ধ অঙ্কশয়ন;
হে জাহ্নবী! সত্য শুধু সুন্দর মরণ
সুন্দর সলিলতলে তোর। অতিশয়
শ্রান্তিভরে আজি মোর উদ্ভ্রান্ত হৃদয়
চাহে অবসর, চাহে সাঙ্গ করিবারে
এ সংগ্রাম, দুরাশার দুষ্ট-পারাবারে
জীর্ণ তরী বাহি নিত্য উত্থান-পতন।
হায় মাগো! হেথা কভু করি প্রাণপণ
মিটে না প্রাণের সাধ; দিবসের সুখ
সন্ধ্যারে হেরিয়া হয় আপনি বিমুখ;
অসীম আগ্রহপূর্ণ প্রমোদ-রজনী
আঁখির পলকে কোথা মিলায় অমনি
প্রভাত বাতাসে! তার পরে চিরকাল,

যতনে কুড়ায়ে লয়ে স্মৃতির জঞ্জাল,
জ্বলন্ত সন্তাপশিখা মরমের তীরে
নীরবে নিভাতে হয় নয়নের নীরে।
যে উগ্র ব্যগ্রতাভরে সৌন্দর্য্য-স্বপনে,
প্রকৃতির প্রেমকুঞ্জে প্রথম যৌবনে
পশিতাম শতবার, আজি সে অনল
বাধিছে মথিছে শুধু মরমের তল!
কবির হৃদয় মোর অনন্ত উদার,
মুক্তপক্ষে জলে স্থলে শূন্যের মাঝার
করে সদা বিচরণ; হেলিয়া হেলায়
নীচতার শত ছল, গিরিচূড়াপ্রায়
সহজে স্পর্শিতে চায় আকাশ-নীলিমা;
সপ্তলোকসঞ্চারী সে উন্নত মহিমা
সে গুরু গরিমাজ্ঞান অঞ্জলি ভরিয়া,
তুটি উদরান্ন তরে দিয়েছি ঢালিয়া
অতি হীন দাসত্বের পদে। ঘৃণাভরে
করি যারে অবহেলা, সংসার-প্রান্তরে
অন্ধ দেহভারবাহী পশুর মতন,
নিশিদিন নতশিরে তাহারই শাসন
বিধির বিধানসম নিয়েছি মানিয়া।
চিরবাঞ্ছিতের লাগি বাসর রচিয়া,
তুচ্ছ যশোবাসনারে মোহের আবেশে
বরিয়া সাদরে সেথা বসায়েছি শেষে!
হায়, তাও বৃথা মোর! শত-সাধভরা
হৃদয়-শোণিতে লেখা সৌন্দর্য্যপশরা
লুটাইছে ধূলি 'পর; দুরাশা-দহন
দহে শুধু মর্ম্মবিদ্ধ শল্যের মতন।

তাই অয়ি গঙ্গে! তোর স্নেহমূর্ত্তিখানি
মত্ত বাসনারে মোর লইতেছে টানি,
সান্ত্বনার বশে: আজি হেন মনে লয়,
ওই যেথা রঙ্গে তোর অগাধ হৃদয়
অগাধ-সলিল-ভঙ্গে উঠিছে উলসি'!
শশীর কিরণে, ওই সুধনীরে পশি'
জুড়াইবে জ্বালা মোর; মন্দ কলকলে
ঢেকে যবে দিবি তুই তরল অঞ্চলে,
সংসারতপনতপ্ত এই তনু মন
লভিবে অনন্ত শান্তি সুষুপ্তি-শয়ন।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

ধূমকেতু।

ধূমকেতুর কক্ষা।—এক্ষণে উত্তমরূপ অবগতি হইয়াছে যে, অনেকানেক ধূমকেতু সময়ে সময়ে পুনরাগমন করে, কতিপয় বৎসর অদৃশ্য থাকিয়া নয়নপথে পুনরাবির্ভূত হয়, এবং পুনরপি ভ্রমণ সমাধা করিবার প্রয়াসে অন্তরীক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এখন কথা এই যে, ধূমকেতু আবার যখন দেখিলাম, তখন কেমন করিয়া বুঝিব যে, এটি সেই ধূমকেতু? এখন সে আকার নাই, সে শোভা নাই, সে পুচ্ছ নাই, চিনিবার কোন উপায় নাই, বহিরঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ধূমকেতু এইরূপে ছদ্মবেশীর ন্যায় সাধারণ দর্শকের চক্ষে ধূলি দিয়া অপরিচিতের মত বিনা সম্ভাষণে চলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু গতি-গণিতজ্ঞের কাছে তাঁহার পার পাইবার যো নাই। যিনি হউন না কেন, এক

বারের পর দ্বিতীয় বার এই পার্থিব বায়ুসাগরে ভাসমান হইলেই, কেপলারীয় বিধিজালে জড়ীভূত হইতে হইবে।

মাধ্যাকর্ষণ-সদৃশ কোন মধ্যবর্ত্তী বলপ্রভাবে কোন পদার্থ যদি উক্ত বল-পরিতঃ ভ্রামিত হয়, এবং উক্ত বল যদি পদার্থের দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী হয়, তবে উক্ত পদার্থ কোন না কোন সূচীখণ্ডে অর্থাৎ ক্ষেপণী, বৃত্তাভাস বা পার্শ্বসমান্তর খণ্ডবৃত্তে (হাইপারবোলায়) ঘুরিতে থাকিবে। এই প্রতিজ্ঞাটি প্রথমতঃ নিউটন কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল। অনেক ধূমকেতু পটলাকার অত্যুৎকেন্দ্র বৃত্তাভাসে পরিভ্রমণ করে, অনেকের কক্ষা ক্ষেপণী বলিয়া স্বীকৃত হয়, এবং কতিপয় ধূমকেতু পার্শ্বসমান্তর খণ্ডবৃত্তে চালিত বলিয়া বোধ হয়। এখন দেখুন, ক্ষেপণী ও পার্শ্বসমান্তর খণ্ডবৃত্ত, উভয়েই পরাক্ বা প্রতীপগামী ও অসীমশাখাবিশিষ্ট,—এইরূপ বৃত্তখণ্ডে ভ্রামিত পদার্থের কোন কালেই রবিপরিতঃ একটি পূর্ণ ভ্রমণ হইতে পারে না। এবংবিধ ধূমকেতু সুদূর গগন হইতে সৌরজগতে উপনীত হয়, এবং অনুহেলিক অতিক্রম করিয়া ভিন্ন দিকে বিনির্গত হয়, এবং অদৃষ্টিগোচর গগনে চলিয়া যায়, আর কখন ফিরিয়া আইসে না। অতএব যে সকল জ্যোতিষ্ক ক্ষেপণী বা পার্শ্বসমান্তর খণ্ডবৃত্তে চালিত হয়, সে সকলকে সাময়িক ধূমকেতু বলা যায় না; কিন্তু যে সকল ধূমকেতু গ্রহ-গণের ন্যায় বৃত্তাভাস কক্ষে চলে, তাহাদিগের উপর্য্যুপরি ভ্রমণ সম্পন্ন হয়।

ইহাও অসঙ্গত বোধ হয় না যে, যে সকল কক্ষাগুলিকে ক্ষেপণী বলিয়া ধরা যায়, সেগুলি হয় ত সুদীর্ঘ বৃত্তাভাস; কারণ যতদিন ধূমকেতু দেখা যায়, তত দিনে উহার কক্ষাংশ বৃত্তাভাস কি ক্ষেপণী, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য।

১৮৭৫অব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে সকল ধূমকেতুর গণিত সমাধা হইয়াছে, তন্মধ্যে, ২০টি সাময়িক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ৬৬টির পুনরাগমন দৃষ্ট হইয়াছে; ৪৩টির কক্ষা বৃত্তাভাস কি না তাহা সন্দেহ; ১৯৪টি ক্ষৈপণিক ধূমকেতু; ৬টি হাইপারবলিক ধূমকেতু।

কোন কোন গণক নিম্নের ধূমকেতুগণকে বার্ত্তভাসিক বলেন; কিন্তু এ বিষয়ে অদ্যাপি প্রচুর প্রমাণের অভাব;—

১৮৪৫, ১৫৮৫; ১৭৪৪, ১৭৭৩, ১৮২৬ (২), ১৮৩২ (২), ১৮৪৬ (৮); ১৮৪৭ (১); ১৮৪৭ (৩); ১৮৪৯ (১); ১৮৫০ (১); ১৮৫৭ (৫); ১৮৬০ (৩)।

নিম্নলিখিত ছয়টি হাইপরবলিক ধূমকেতু ;—

১৭২৯ ; ১৭৭১ ; ১৭৭৪ ; ১৮৪০ (১) ; ১৮৪৩ (২) ; ১৮৫৩ (৩)।

কোন কোন গণক নিম্নের ধূমকেতুগণকে হাইপরবলিক বলেন ; কিন্তু এ বিষয়ে অত্যাপি প্রচুর প্রমাণের অভাব ;—

১৭২৩ ; ১৭৭৩ ; ১৭৭৯ ; ১৮১৮ (৩) ; ১৮২৬ (২) ; ১৮৩০ (১) ; ১৮৪৩ (১) ; ১৮৪৪ (৩) ; ১৮৪৫ (১) ; ১৮৪৫ (২) ; ১৮৪৯ (৩) ; ১৮৫২ (২) ; ১৮৬৩ (৬)।

বেধ দ্বারা ধূমকেতুর কক্ষা-নিরূপণ।—গ্রহকক্ষ নিরূপণজন্য অধ্যায়ে যে সকল প্রথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেগুলি ধূমকেতুর কক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপেই প্রয়োজ্য নহে ; কারণ তদ্রূপ প্রথা অবলম্বন করিলে, কক্ষার স্থানবিশেষের বেধ আবশ্যক হয়, এবং তদ্রূপ বেধ বহুবর্ষ অন্তর ভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ধূমকেতুগুলি আমাদের নেত্রপথে কতিপয় সপ্তাহমাত্র আবির্ভূত থাকে, এবং সেই স্বল্পকালমধ্যে নির্ব্বাহিত কতিপয় বেধ দ্বারা কক্ষার অবস্থান নিরূপণ করিতে হয়। ধূমকেতুর অবস্থানে তিন বেধমাত্র অবলম্বন করিয়া কক্ষাকার স্থির করিবার প্রথা প্রথমতঃ স্যার আইজাক নিউটন দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। এই প্রথা এক্ষণে অনেক সুগমীকৃত হইয়াছে, এবং গণিতের সুবিধা ও সৌকর্য্যার্থে সারণী সকল প্রস্তুত হইয়াছে।

ধূমকেতুর কক্ষানিরূপণ জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিনে আকাশমণ্ডলে ধূমকেতুর দিক জানা আবশ্যক। এই তিন বেধ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমাধা হইতে পারে ; কিন্তু বেধের ব্যবধান-কাল যতই দীর্ঘ হয়, বেধলব্ধ কক্ষা ততই ঠিক বলিয়া বিশ্বাস হয়। যদি প্রথম বেধ হইতে দ্বিতীয় বেধের কাল, দ্বিতীয় বেধ হইতে তৃতীয় বেধের কালের সমান হয়, তবে হিসাবের বড় সুবিধা হয়, কিন্তু এরূপ ব্যাবৃত্তি নিতান্ত আবশ্যক নহে। মনে কর, পৃথিবী হইতে ধূমকেতুকে তিন স্থলে বেধ করা গেল, অর্থাৎ উহার তিন অবস্থানে বিষুবাংশ ও ক্রান্তি লওয়া গেল ; এখন বিষুবাংশ ও ক্রান্তিকে যথাক্রমে ভোগে ও বিক্ষেপে পরিণত কর, কারণ ধূমকেতুর গতি ভূকক্ষায় আনিয়া হিসাব করিলে অনেকটা সুবিধা হয়।

এক্ষণে নাবিক-পঞ্জিকা হইতে উক্ত বেধত্রয়ের সমসাময়িক রবির ভোগ ও বিক্ষেপ লও ; এই ভোগে ১৮০° যোগ করিলেই পৃথিবীর ভোগ হইল। তদনন্তর ভূকক্ষার পরিলেখ প্রস্তুত কর, এবং এই কক্ষোপরি উক্ত কালত্রয়ে

পৃথিবীর অবস্থান যথাযথরূপে অঙ্কিত কর। এই তিন স্থান হইতে যে দিকে ধূমকেতু দেখা গেল, সেই দিকে রেখা টান। এই সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া ধূমকেতুর কক্ষা নিরূপণ করিতে হয়।

ধূমকেতুর কক্ষার গণিতে স্বীকৃত নিয়মাবলি।—সৌরজগতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ পরিজ্ঞাত গ্রহউপগ্রহগণের গণিতে যে সকল নিয়ম প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেই সকল নিয়ম ধূমকেতুর কক্ষাগণনায় স্বীকৃত হইয়া থাকে ;—

১ম।—ধূমকেতুর কক্ষা অবশ্যই সূর্য্যমণ্ডলের ক্ষেত্রগত।

২য়।—ধূমকেতুর কক্ষা অন্যতম সূচিখণ্ড। এই সূচিখণ্ডের অন্যতর অধিশ্রয়ণ সূর্য্যাধিষ্ঠিত ; সূচিখণ্ডের উৎকেন্দ্রত্ব অত্যধিক হইলে, কক্ষার আকার ক্ষেপণী হইতে বড় তফাৎ হওয়া সম্ভব নহে ; অতএব স্বীকৃত হইল যে, কক্ষা ক্ষেপণী।

৩য়।—রবিপরিতঃ কক্ষায় ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্কের গতি এরূপ যে, চলকর্ণ দ্বারা সমকালে সমক্ষেত্রফল বিলিখিত হয় ; অতএব কোনও ক্ষেত্রফল কাল দ্বারা বিভক্ত করিলে, ভাগফল সেই জ্যোতিষ্কসম্বন্ধে (জ্যোতিষ্ক গ্রহ বা ধূমকেতু) ধ্রুব হইবে, অর্থাৎ অভিন্ন থাকিবে।

৪র্থ।—রবিপরিতঃ ভ্রাম্যমাণ ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ্কসম্বন্ধে উক্ত ভাগফলের বর্গ উত্তেজিনীর (Latus Rectum) অনুপাতী।

ধূমকেতুর কক্ষানিরূপণ জন্য এই সকল বিধিপ্রয়োগকালে প্রথমতঃ কক্ষার একটা ক্ষেত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এই কল্পিত ক্ষেত্র যদি উপরি-উক্ত কোন ক্ষেত্রের বিরোধী না হয়, তবে জানা গেল যে, কক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্রই গ্রহণ করা হইয়াছে ; অন্যথা ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ; যাবৎ না উক্ত বিধি-চতুষ্টয়ের অবিসম্বাদী ক্ষেত্র পাওয়া যায়, তাবৎ এইরূপ ক্ষেত্রান্তর কল্পনা করিতে হইবে। অনন্তর গৃহীত কক্ষায় ধূমকেতুর দিন দিনের অবস্থান গণিত করিতে হইবে ; এবং গণিত স্থানের সহিত বেধলব্ধ স্থানের তুলনা করিতে হইবে। বেধে আর গণিতে যে অন্তর, তাহা পর্য্যবেক্ষণে অপরিহার্য্য যে ভ্রম, তাহার অধিক হওয়া উচিত নহে। যদি অধিক হয়, তবে পুনরায় কক্ষান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, যাবৎ দৃগ্‌গণিত ঐক্য না হয়। পর্য্যবেক্ষণে অবশ্যম্ভাবী ভুলটুকু অবশ্যই রহিয়া যাইবে। এইরূপে স্থির করা যাইতে পারে যে, কেতুকক্ষা ক্ষেপণী বা বৃত্তাভাস বা হাইপারবোলা। প্রথম স্বীকারে ভুল থাকিলে কিছু ক্ষতি হয় না।

গণিতের প্রথা পরিলেখ-যোগে বিশদীকরণ।—স্ সূর্য্য, ক খ গ তিন দিন

বেধকালে পৃথিবীর স্বীয় কক্ষে অবস্থান; সূক, সূখ, সূগ এই তিন রেখার অবস্থান ও পরিমাণ নাবিক পঞ্জিকাতে পাওয়া যায়। ক হইতে ক ঘ রেখা টান; প্রথম দিন যে দিকে ধূমকেতু ছিল, ক ঘ সেই দিকে; তদ্রূপ খ ঙ ও গ ঢ় অপর দুই দিবসে ধূমকেতুর দিক্‌সূচক রেখা। প্রথম দর্শন কালে ধূমকেতু কখ রেখার কোন এক স্থলে ছিল, কিন্তু ঠিক কোন স্থলে ছিল, তাহা অবিজ্ঞাত। যদি ধর যে, প্রথম দিন জ্যোতিষ্ক ছএ ছিল, তবে পূর্ব্ব প্রকরণের প্রথম বিধি অনুসারে, অপর দুই তারিখে উহার অবস্থান খজ ও গঝ অবশ্য হইবে, অধিকন্তু উহার ক্ষেত্র সূছ দিয়া যাইবে; আবার উক্ত প্রকরণের তৃতীয় বিধি অনুসারে ক্ষেপণীখণ্ড সূজছ ও সূজঝ সমান হইবে। আর বেধকালের ব্যবধান যদি কতিপয় দিন মাত্র হয়, তবে সূজছ ও সূজঝ সমতল ত্রিভুজ হইবে এবং উভয়ের ক্ষেত্র ফল প্রায় সমানই হইবে। শুদ্ধ এই সকল সময়-সহায়ে কেতুকক্ষার অবস্থান প্রায় ঠিক করা যাইতে পারে। যদি ক্ষেপণীখণ্ডদ্বয়ের ক্ষেত্রফল ঠিক সমান হয়, এবং উক্ত প্রকরণের চতুর্থ বিধির লিখনানুরূপ ক্ষেত্রের পরিমাণ হয়, তবে নিশ্চয় জানা গেল যে, প্রকৃত কক্ষা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক প্রথা অবলম্বনপূর্ব্বক কতিপয় দিন ব্যবধানে তিনটি বেধ করিলেই, এক ঘণ্টার মধ্যে ধূমকেতুর কক্ষা নিরূপিত হইতে পারে; এরূপ গণিতাগত কক্ষা যদিও ঠিক বাস্তব কক্ষা না হয়, তথাপি বাস্তব কক্ষা হইতে বড় তফাৎ হয় না।
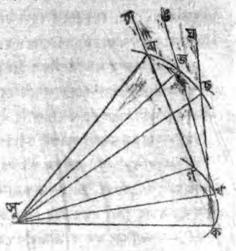
কক্ষা গণিতের ধারা।—কেতুকক্ষার উপকরণীভূত বিষয়গুলি যথাযথ রূপে গণিত করিতে হইলে, উক্তরূপ বিধিমূলক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্বে যে রেখার ও ক্ষেত্রের সম্বন্ধ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা সমীকরণের আকারে ব্যবস্থিত হয়, এবং অসস্কৃত আসন্ন রাশি গ্রহণপূর্ব্বক সমীকরণ সাধিতে হয়। সারণী-সহায়ে ধূমকেতুর আনুমানিক কক্ষোপকরণ অনায়াসে পাওয়া যায়। যথাসম্ভব প্রকৃত কক্ষানিরূপণ করিতে হইলে, ধূমকেতু যাবৎ

দৃষ্টিগোচর থাকে, তাবৎ কাল পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং বেধলব্ধ ফলেরও তারতম্য দেখিতে হইবে; সুতরাং এজন্য অনেক দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয়।

এ স্থলে গণিতের যে রীতি প্রদর্শিত হইল, তাহা যদ্রূপ কেতুকক্ষানিরূপণ জন্য প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ গ্রহকক্ষানিরূপণ জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গ্রহগণের গতি যে সকল নিয়মের অধীন, ধূমকেতুগণ সেই সকল নিয়মের অধীন। সুতরাং উভয়বিধ জ্যোতিষ্কের কক্ষাগণিতের সবিশেষ রীতিভেদ হইতে পারে না। ভেদের মধ্যে এই যে, কেতুকক্ষা সাধারণতঃ ক্ষেপণী বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই ক্ষেপণীব্যক্ত সূচীখণ্ড বিশেষ উৎকেন্দ্রত্ববিশিষ্ট; তাহা হইলেই গ্রহকক্ষায় যত অব্যক্ত রাশি থাকে, কেতুকক্ষায় তাহা অপেক্ষা একটি কম অব্যক্ত রাশি থাকে। পূর্ব্বে গ্রহবিষয়ক উপকরণ সকল নিরূপণের যে সকল বিধি লিখিত হইয়াছে, সে সকল কেবল উজ্জ্বল গ্রহ পক্ষে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু যখন একটি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হয়, তখন কতিপয় দিবসের বেধলব্ধ ফল দ্বারা কক্ষনিরূপণ করা আবশ্যক, এবং তখন এই পরিচ্ছেদে লিখিত রীতি অবলম্বন করিতে হয়।

কোন ধূমকেতু সাময়িক কি না, তাহা জানিবার উপায়।—কেতুগণ যাবৎ অনুহেলিকের আসন্ন থাকে, অর্থাৎ যখন রবিসন্নিহিত কক্ষাংশে বিচরণ করে, তাবৎ তাহারা দৃষ্টিগোচর থাকে; পরন্তু অনুহেলিক বিন্দুর উভয় পার্শ্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত কি বৃত্তাভাস, কি ক্ষেপণী, কি হাইপারবোলা সকলই একাকার দেখায়; সুতরাং এই ত্রিবিধ সূচীখণ্ডের মধ্যে কোন্‌টিতে কেতু ঘুরিতেছে, তাহা ঠিক করা কঠিন। ধূমকেতু যদি বৃত্তাভাস-কক্ষায় পরিভ্রমণ করে, তবে এক ভভ্রম-সমাপনের পর আবার অনুহেলিকে অবশ্যই আসিবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের দুইটি ধূমকেতুকে অভিন্ন, কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। তবে খুব সম্ভব যে, কেতুদ্বয় অভিন্ন অর্থাৎ একই কেতু বৃত্তাভাসে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরুদিত হইয়াছে; এবং এই কেতুকে যদি পুনঃপুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখা যায়, তবে কেতুকক্ষার বৃত্তাভাসত্বের পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গেল।

কোন ধূমকেতুর ভগণকাল ৩$\frac{১}{২}$ বৎসরের ন্যূন নাই। ধূমকেতুর পুনরুদয় দেখিয়া দৃঢ়রূপে প্রমাণিকৃত দীর্ঘতম ভগণকাল ৭৫ বৎসরের অধিক পাওয়া যায় নাই। অনেক ধূমকেতুর গণিতাগত ভগণকাল শতাব্দের অধিক; অনেকের

ভগণ বহু শতাব্দও সম্ভব। কেতু যদি বস্তুতঃ ক্ষেপণীকক্ষে ভ্রামিত হয়, তবে তাহার পূর্ণ ভগণ কোন কালেও সম্পূর্ণ হইবে না। নিম্নলিখিত তেরটি ধূমকেতুর ভগণ কাল অবিসংবাদী।

এন্‌কে	৩.৩০৮	বৎসর	দ আরেষ্ট	৬.৬৮৬	বৎসর
টেম্পেল ১৮৭৩	৫.২১২	"	ফে	৬.৫৬৬	"
টেম্পেল ১৮৬৭	৬.৫০৭	"	বিএলা	৬.৬০৮	"
টেম্পেল স্বীফ্‌ট	৫.৫৩৫	"	তুত্তেল	২৩.৭৬০	"
উইন্‌নেক	৫.৮১২	"	ওলবর্স	৭২.৬৩	"
ব্রোর্সেন	৫.৪৬২	"	পোনস ব্রুক্স	৭১.৪৮	"

হেলি ৭৬.৩৭ বৎসর।

ক্রমশঃ।

গান।

ছায়ানট,—আড়াঠেকা।

সখা, দিও না দিও না মোরে এত ভালবাসা;
জগতে তা হলে মোর রবে না কিছুরই আশা।
তুমি দিলে সারা মন,
কি করিব আরাধন,
মাগিয়ে তোমার দ্বারে শুধু কি পাব নিরাশা?
প্রতিদিন ফুল তুলে,
যাইব তোমার কূলে,
সে দিনের মত শুধু মিটায়ো প্রেমপিপাসা।
কোটি কোটি লয়ে কান,
যাব শুনিবারে গান,
সরমে কহিও শুধু একটি মরম-ভাষা।
আমার জীবন-নদী
এত প্রেম পায় যদি,
ভাঙিয়া ভাসিয়া যাবে আমার সুখের বাসা।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। "স্থখু" শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিরচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। লেখক বোধ করি নূতন ব্রতী। "ইন্দ্র" শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত একটি পাণ্ডিত্যপুর্ণ, শিক্ষাপ্রদ জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "পাটের চাষ" প্রবন্ধটিতে বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু নাই। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "ঝুলনযাত্রা" প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "রাম রাজার মুলুক" ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "কাহাকে" এখনও চলিতেছে; এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "কাব্য-বিজ্ঞানে" 'চন্দ্রের ইতিবৃত্ত' ও 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' নামক দুইটি কবিতা আছে। কবিতা দুটির কবিত্ব কি, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না; বরং ইহাতে কিঞ্চিৎ হাস্তরস আছে, বোধ হইল। "দর্প্পেশিনী" একটি গল্প, ক্রমশঃপ্রকাশ্য। লেখকের ভাষা বড় দীন; গল্পটি অদ্ভুত, কিন্তু কৌতূহলের উদ্দীপক। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় "সমালোচনা" প্রবন্ধে সমালোচকের লক্ষণ ও কর্ত্তব্য প্রভৃতির নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের "পাথুরিয়া কয়লা সমাচ্ছন্ন বাষ্পীয় যান ঘর্ঘরিত সভ্যতা" প্রভৃতি ভাষা অত্যন্ত কর্ণকটু ও বিকৃত বলিয়া মনে হয়।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "রাজ-তরঙ্গিণী" একটি গবেষণাপুর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। ত্রৈলোক্য বাবু প্রত্নতত্ত্বে পারদর্শী,—এ বিষয়ে তিনি বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটিও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রভূত পরিচয় দিতেছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর "দার্শনিক মতভেদ" উৎকৃষ্ট হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র ঘোষের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" আলোচনার যোগ্য। "বল ও ব্যায়াম" প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন গুপ্তের রচিত। এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। আমাদের শারীরিক বলের উৎকর্ষ সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই আমাদিগের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা এ বিষয়ে বাঙ্গালীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী "একশৃঙ্গ" নামক মনোজ্ঞ প্রবন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধাননিপুণতা ও রসানুভাবকতার পরিচয় দিয়াছেন। লেখক ইহাতে রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত অবদান-কল্পলতার একশৃঙ্গের অভিন্নতা প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং উভয় আখ্যায়িকার বিশ্লেষণ ও তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। "দীন-জননী মহারাণী স্বর্ণময়ী" প্রবন্ধটি "নব্যভারতের" সম্পাদক মহাশয়ের রচিত। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। স্বর্ণময়ীর জীবনের আলোচনায়, লেখক সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা ঢালিয়া দিয়াছেন।

উৎসাহ। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী "জুলিয়াস্ সিজারে পোর্সিয়া" প্রবন্ধে পোর্সিয়া-চরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবন্ধ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাজসাহী" প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে।

সখা ও সাথী। ভাদ্র। "মহারাণী স্বর্ণময়ী" প্রবন্ধটি বালকদিগের জন্য লিখিত, কিন্তু ভাষা ও ভাব তাহাদের উপযোগী করিবার জন্য লেখক চেষ্টা করেন নাই। "সাথীর" "সিংহ ভয়ে পলাইও না" ও "মুকুলের" "বাঘের ভয়" দুটি গল্পই এক; বোধ করি, উভয় লেখকই এক স্থান হইতে গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছেন। এরূপ বিভ্রাট বড় মন্দ নয়! "রটন" প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। "ধূর্ত্ত শেয়াল" একটি সচিত্র পদ্য। ছবিখানি মন্দ নয়, কিন্তু কবিতাটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

মুকুল। ভাদ্র। "মুন্সী কালীপ্রসাদ" একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। আমরা বয়স্ক পাঠকগণকেও এই হিন্দুস্থানী কায়স্থ মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিতে বলি। "বাঘের ভয়" গল্পটি মন্দ নয়। "অদ্ভুত শিক্ষা" নামক প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। "কয়লার কাহিনী" রচনাটি শিক্ষাপ্রদ। "মা ও মেয়ে" কবিতাটি আমাদের মতে প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত।

স্বাস্থ্য। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। ইহা একখানি নূতন মাসিকপত্র। নামেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, স্বাস্থ্যবিষয়িণী আলোচনাই বক্ষ্যমাণ নবীন পত্রের উদ্দেশ্য। আশা করি, "স্বাস্থ্য" দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ, স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবী লোক, রুগ্ন শিশুর শুশ্রূষা, খাদ্যের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির বিষয় উৎকৃষ্ট ও সাধারণের উপযোগী; কিন্তু ভাষা ভাল নহে। ভাষার দোষে বক্তব্য বিষয়গুলি অনেক স্থলে পরিস্ফুট হয় নাই। এরূপ পত্রের ভাষা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল হওয়া আবশ্যক। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

বীণাবাদিনী। "সঙ্গীত-প্রকাশিনী মাসিকপত্রিকা।"—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা; শ্রাবণ। আমরা এই অভিনব মাসিকপত্রিকার উদয় দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। সঙ্গীতবিষয়িণী মাসিকপত্রিকার প্রচার বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। আশা করি, সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রথম উদ্যম অচিরে সফল হইবে, এবং ভবিষ্যতে "বীণাবাদিনী"র "পতিত মন্দিরে বঙ্গীয় সঙ্গীতশ্রীর রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই সংখ্যায় সাতটি গান ও তাহার স্বরলিপি আছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা এই সাতটি গানের প্রণেতা। এরূপ ঐকদেশিক নির্ব্বাচন সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গসাহিত্যে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের অভাব নাই;—"বীণাবাদিনী" যে চারি জন রচয়িতার গান লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের গীত রচনা করিবার, এমন কি, ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বেও, অনেক সুপ্রথিত সঙ্গীতরচয়িতার গানের তানে বঙ্গভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহাদের পরেও এ দেশে সঙ্গীতের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া যায় নাই। সঙ্গীতশাস্ত্রের পারদর্শী ও সঙ্গীতসাহিত্যে সুনিপুণ "বীণাবাদিনী"র সম্পাদকমহাশয়কে বোধ করি তাহার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। দেখিতেছি, "বীণাবাদিনী"র প্রথম সংখ্যায় আর সকলে একেবারেই বাদ পড়িয়াছেন। অন্ততঃ বৈচিত্র্যের অনুরোধেও বাহিরের দু'একটি গান প্রকাশিত হইলে আমরা সুখী হইতাম। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত সঙ্গীতসাহিত্য পুঞ্জীকৃত হইয়াছে, তাহার গুণগ্রহণে অক্ষম বা অনিচ্ছু হইলে "বীণাবাদিনী" প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। যে সাতটি সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও সবগুলি সাধারণের উপযোগী বা চিত্তরঞ্জনের যোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী" ইতিশীর্ষক গানটি উল্লিখিত হইতে পারে। গানটিতে সুমিষ্ট শব্দসমষ্টি ব্যতীত আর কি আছে, বলিতে পারি না। এরূপ গানের প্রচারে, কেবল "বীণাবাদিনী"র নয়, আমাদের প্রিয় কবিরও প্রতিষ্ঠাহানি হয়। "মম হৃদয় শয়ন-মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে মম অন্তরে থাকি থাকি" কেবল কষ্টকল্পিত চর্ব্বিতচর্ব্বণ নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক।

আমরা "বীণাবাদিনী"র দীর্ঘজীবন ও সুপ্রতিষ্ঠার অভিলাষী; তাই প্রথম সাক্ষাতেই এই অপ্রিয় সত্য কীর্ত্তন করিতে হইল। আশা করি, "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ", এই কবিবচন স্মরণ করিয়া মাননীয় সম্পাদক মহাশয় আমাদের ক্ষমা করিবেন।

রাণী ভবানী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজ-দম্পতি।

সমতল-ক্ষেত্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর প্রবাহ-বিধৌত বঙ্গভূমি সমধিকরূপে রূপৈশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া বিদেশের লোকে চিরদিনই বাঙ্গালীর অনায়াসলভ্য পর্য্যাপ্ত অন্নব্যঞ্জনের প্রতি ঈর্ষ্যাকলুষিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়োচিত অবসর উপস্থিত হইলে, কেহই এ দেশের ধনধান্য লুণ্ঠন করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এই জন্য একদিন পাঠানসেনা "সোনার বাঙ্গালা" বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল ; এই জন্য আবার পাঠানকে সুবর্ণরেখা-পারে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া মহারাজ টোডরমল্ল ও মানসিংহের বীর বাহু বাঙ্গলাদেশে মোগলের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।* মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানী যখন রাজসাহী-রাজ্যে পুনরায় অধিকার লাভ করিলেন, তখন হইতে আবার বঙ্গভাগ্যে অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ইতিহাসে ইহারই নাম 'বর্গীর হাঙ্গামা'।

মহারাষ্ট্র-শক্তির অদ্বিতীয় অধিনায়ক ছত্রপতি শিবাজীর দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসরণ করিয়া, যাহারা বাহুবলোন্মত্ত বাদশাহ আলমগীরকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, শিবাজীর স্বর্গারোহণের পরে তাহারাই আবার লুণ্ঠনলোলুপ দস্যুদলের ন্যায় ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে আত্ম-শক্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের উপদ্রবে বাদশাহের মুমূর্ষু শক্তি আরও হীনবল হইয়া পড়িল, ইহাদের লুণ্ঠনযাতনায় ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ জনপদগুলি হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ; অবশেষে বন্যাতরঙ্গতাড়িত জলস্রোতের ন্যায় এই সকল মহারাষ্ট্রবাহিনী "হর হর মহাদেও" রবে সগর্ব্বে বঙ্গভূমির বুকের উপর পিশাচের ন্যায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম, নগর উৎসন্ন হইতে লাগিল, শস্যক্ষেত্র পদদলিত হইতে লাগিল, লোকে প্রাণ লইয়া দূর স্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল ;† কেবল নিশিদিন,

---

* Stewart's History of Bengal.

† Despatch to the Court of Directors ; 8 January 1752 ; para 49.

আজ এখানে কাল সেখানে,—বনে জঙ্গলে, গ্রামে, নগরে, নদীসৈকতে, রাজপথে,—নবাবসেনার সহিত মহারাষ্ট্রসেনার তুমুল সংঘর্ষে বঙ্গভূমি রুধিররঞ্জিত, নরকঙ্কালাকীর্ণ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল! নবাব আলিবর্দ্দীর অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় সে প্রতিকূল শক্তির গতিরোধ করিতে পারিল না; রাজধানী মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইয়া গেল! *

বর্গীর হাঙ্গামা বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইয়া পড়িল। † ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ জনপদগুলি জনশূন্য হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজসাহী-রাজ্যের প্রধান রাজধানী বড়নগর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদয় স্থান মহারাষ্ট্রনির্য্যাতনে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। রামকান্ত ও রাণী ভবানী রাজসাহীরাজ্যে অধিকার লাভ করিয়াও এই সকল কারণে নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিবার অবসর পাইলেন না।

লোকে দলে দলে ভাগীরথী এবং পদ্মার প্রবল প্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্বারোহী মহারাষ্ট্র-সেনার সহিত বাঙ্গালী পদাতিক সেনা কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। অবশেষে নবাবপরিবার নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার জন্য মহাবীর আলিবর্দ্দীও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ‡ রামকান্ত ও রাণী ভবানী ভাগীরথীতীরসংলগ্ন বড়নগর-রাজবাটীর মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া, নাটোরের পরিখাবেষ্টিত সুগঠিত রাজবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজবাটী রক্ষা করিবার জন্য মথুরাবাসী বলিষ্ঠদেহ বীরবংশোদ্ভব রণকুশল সেনা-দল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন; § এবং গৃহতাড়িত অনাথ প্রজাপুঞ্জের সকরুণ হাহাকার নিবারণ করিবার জন্য অন্নবস্ত্র ও আবাসগৃহের সংস্থান করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ¶

---

* Mutakherin.

† During the 15 years of Aliverdi's Government or reign, scarcely a year passed free from the ruinous invasions of the Mahrattas—Mill's History of British India, Vol III. 161.

‡ Stewart's History of Bengal.

§ রাণী ভবানীর পুররক্ষী মথুরাবাসী সিপাহীসেনাদলের অবস্থিতির জন্য নাটোর রাজবাটীর অন্দরমহলের পার্শ্বদেশে যে সেনানিবাস বা 'বারিক' ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পনে গৃহগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে!

¶ বর্দ্ধমান অঞ্চল বর্গীর হাঙ্গামার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। সে অঞ্চলের যে সক

মহারাষ্ট্র-লুণ্ঠনে রাজসাহী-রাজ্যের একাংশ বিধ্বস্ত হইয়া গেল, রাজকোষ দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, আত্মরক্ষা এবং প্রজাপালনের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সেনাদল পোষণ করিতে হইল; ইহাতেই মহারাজ রামকান্তের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল! এই মহাবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গে নিপতিত না হইলে, মহারাজ রামকান্তও যে সবিশেষ শাসন-কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিতেন না, তাহা কে বলিতে পারে? এরূপ বিপ্লবের মধ্যে নিশিদিন বিড়ম্বিত হইয়াও, তিনি যতটুকু শাসনকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত যৎসামান্য নহে। পদ্মার উত্তরতীরস্থ রাজসাহী-প্রদেশের লোকে তাঁহার শাসনকৌশলে এই মহাবিপ্লবের মধ্যেও এরূপ অবিচলিতভাবে দিনযাপন করিয়াছিল যে, নবাব আলিবর্দ্দী রামকান্তের রাজ্যমধ্যেই নবাব পরিবারের জন্য নিরাপদ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামপুর বোয়ালিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী গোদাগাড়ি গ্রামে এই ঐতিহাসিক নবাব-বাড়ীর সীমাচিহ্ন ও ভগ্নাবশেষ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে; এই স্থানের নাম "কেল্লা বারুইপাড়া।"*

রাজসাহী-প্রদেশ শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের জন্য যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া নবাগত ইউরোপীয় বণিকেরা ইহার স্থানে স্থানে অনেকগুলি বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল কুঠীর কোন কোন পুরাতন অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামায় এই সকল ইউরোপীয় বণিকদিগকেও সবিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেকালে জলপথেই অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য চলাচল করিত; কিন্তু ভাগীরথীতীরে মহারাষ্ট্রসেনা থানা দিয়া বসিয়া থাকিত বলিয়া, লুণ্ঠনভয়ে কেহ সহজে কলিকাতা-অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে স্বীকার করিত না।

ইহাতে শিল্পবাণিজ্যের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইলেও কৃষিপ্রধান রাজসাহী-রাজ্যে কোনরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং রামকান্তের সময়ে রাজসাহীর

লোক আত্মরক্ষার আশায় পৈতৃক স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাণী ভবানীর রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদের বংশপ্রবাহ এখনও রাজসাহী-প্রদেশের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

* The district contains no forts, except one belonging to the Nawab of Moorshidabad, at Godagaree, which was built in former times as a place of refuge for the Nawab's household, and is now in a most ruinous condition.—Hamilton's Description of Hindoostan, Vol. 1.

অধিকাংশ স্থানের প্রকৃতিপুঞ্জ যে অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবাবী আমলে রাজকর ব্যতীত অনেকগুলি বাজে জমা প্রদান করিতে হইত। এই বাজে জমার সংখ্যা এবং পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মুরশিদ কুলি খাঁ এবং সুজা খাঁর আমলেই অধিকাংশ বাজে জমা সংস্থাপিত হয়। আলিবর্দ্দী সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পর, 'আবওয়াব মন্‌সুরগঞ্জী' ও 'চৌথ মারহাট্টা' নামে কয়েকটি বাজে জমা প্রচলিত হইয়াছিল। * এই সকল বাজে জমা ও বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট রাজকর যথাকালে নবাব-সরকারে প্রদান করিতে রামকান্ত কোনদিনই ত্রুটি করেন নাই। চারিদিকে যখন মহাবিপ্লব, চারিদিকে যখন নিরন্তর হাহাকার, চারিদিকে যখন অন্নাভাব, রাজসাহী-রাজ্যে যে তখনও ধনধান্য লইয়া প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে সংসার পালন করিয়া অকাতরে রাজকর প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহাই রামকান্তের শাসনগৌরবের উৎকৃষ্ট পরিচয়।

রামকান্ত ও রাণী ভবানী বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারলাভ করিয়াও সাংসারিক জীবনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। রাণী ভবানীর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু দুইটি সন্তানই অকালে পরলোক গমন করায়, রাজদম্পতীর পক্ষে সংসার-সম্পদ বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র রাজকুমারী তারা তাঁহাদিগের শোক-সন্তপ্ত রাজপরিবারে সায়াহ্নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শশিকলার ন্যায় ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিলেন। এই কন্যারত্নই রাজদম্পতীর অপত্যস্নেহের একমাত্র আধার হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকান্ত ও রাণী ভবানী তাঁহাকে আশৈশব পুত্রের ন্যায় পরম স্নেহে লালনপালন করিতে ও বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। আজকাল এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইতেছে, সেকালে স্ত্রীশিক্ষার এরূপ সমাদর ছিল না। কিন্তু তথাপি সেকালের প্রাচীন রাজপরিবারের কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হইত। † স্বাভাবিক স্নেহবশতঃই হউক, আর রাজসংসারের মর্য্যাদারক্ষার জন্যই হউক, রাজকুমারী তারা বাল্যকাল হইতেই বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন।

রামকান্ত ও রাণী ভবানী উভয়েই ধর্ম্মানুরাগে বিবিধ পুণ্যকার্য্যের প্রতিষ্ঠা

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বামীর জীবনকালেই রাণী ভবানীর নাম দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ রামকান্তকে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের হয় ত এইরূপ ধারণা যে, রাণী ভবানীর পুণ্যকার্য্যগুলি, তাঁহার বৈধব্যদশায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। রামকান্ত স্বয়ং ধর্ম্মানুরাগী না হইলে রাণী ভবানীর পক্ষে রাজপুরবধূ হইয়া বহুব্যয়সাধ্য পুণ্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সহজ হইত না। উপর্য্যুপরি দুইটি পুত্রসন্তানের পরলোক-গমনে স্বামীস্ত্রী উভয়েই সংসারে কথঞ্চিৎ বীতরাগ হইয়া পরসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রামকান্ত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে, হয় ত তাঁহার সংসারসুখ আবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, কিন্তু অতি অল্পবয়সে সহসা তাঁহার পরলোকগমনে রাণী ভবানী সংসারসুখে চিরজীবনের জন্য জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামকান্ত সহসা পরলোক গমন করায়, রাণী ভবানী রাজসাহী-রাজ্যের অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী হইলেন। রাজসাহীর বিস্তৃত জনপদ এবং রাজকুমারী তারা তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। চারিদিকে রাষ্ট্রবিপ্লব—স্বয়ং নবাব আলিবর্দ্দী অসিহস্তে মহারাষ্ট্রদমনে ছুটাছুটি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন, কত প্রতিভাশালী রাজা, জমীদার রাজ্যরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন,—এমন সময়ে রমণী হইয়া, অন্তঃপুরচারিণী হইয়া, রাণী ভবানী কেমন করিয়া রাজসাহীর ন্যায় অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিবেন, নবাব আলিবর্দ্দী সে জন্য একবারও চিন্তিত হইলেন না। রাণী ভবানীর উজ্জ্বল প্রতিভার কথা রাজা রামকান্তের জীবিতকালেই চারিদিকে রাষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং নবাব আলিবর্দ্দী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহাকেই জমীদারী সনন্দ প্রদান করিলেন। সেকালের জমীদারদিগের জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা ছিল, বাহুবলে রাজ্যরক্ষা করিবার স্বাধীনতা ছিল, এবং আবশ্যকমতে রাজদরবারে উপনীত হইয়া, মন্ত্রণাবলে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিবার দায়িত্ব ছিল। জমীদার সর্ব্বতোভাবে করসংগ্রাহক শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সুতরাং কোন জমীদার নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার বিধবা রমণীর পক্ষে উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে পতিত্যক্ত রাজসম্পদ ও শাসনক্ষমতা সম্ভোগ করিবার অধিকার ছিল না। নবাব বাহাদুর যাঁহাকে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাকে শাসনভার সমর্পণ করিয়া পরলোকগত জমীদারের পরিবারবর্গের ভরণ-

পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে, শাসনকৌশলের পরিচয় না পাইলে, আলিবর্দ্দীর ন্যায় প্রবীণ নরপতি যে বিপ্লবময় রাজসাহী-রাজ্য একজন রমণীর শাসনাধীন রাখিতে সম্মত হইতেন না, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাণী ভবানী যখন রাজসাহী-রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্ণ গৌরবের অবস্থা। বাঙ্গালাদেশ যে একাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আট চাক্‌লায় রাজসাহীর জমীদারী বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রাণী ভবানী মুরশিদাবাদ, ঘোড়াঘাট, ভূষণা, আকবর-নগর, জাহাঙ্গীরনগর, বর্দ্ধমান, যশোহর এবং কড়াইবাড়ী নামক আট চাক্‌লার বিবিধ স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।* এই আট চাক্‌লার মধ্যে কোন কোন চাক্‌লার সমুদায় স্থানই রাণী ভবানীর অধিকারভুক্ত ছিল। এই সকল বহুবিস্তৃত জনপদের রাজকর সংগ্রহ করাই কত কঠিন; তাহার উপর আবার সেকালের রাজবিধির ব্যবস্থানুসারে এই বিস্তৃত রাজ্যের প্রকৃত শাসনভারও রাণী ভবানীর হস্তেই সমর্পিত হইল। সুতরাং বিপ্লবময় যুগে বিধবা হিন্দুরমণীর হস্তে এতগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রদেশের শাসনভার সমর্পিত হইবামাত্র রাণী ভবানীর সকল চিন্তা রাজসাহী-রাজ্যের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি কিরূপ সুকৌশলে সেই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপন নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

রাণী ভবানীর অধিকৃত রাজসাহী-রাজ্যের বর্ণনা করিতে গিয়া একজন সমসাময়িক ইংরাজ লেখক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই বর্ণনানুসারে জানা যায়, "তৎকালে রাণী ভবানীর বার্ষিক দেড়কোটী টাকা আয় ছিল, তাহা হইতে কেবল ৭০ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান করিতে হইত; এবং তিলিবংশীয় মন্ত্রীবর দয়ারামের সাহায্যে তিনি সুসংস্থাপিত রাজসাহী-রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিতেন।"† এই শাসনভার পরিচালনা করিবার সময়ে রাণী

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† At Nattore about ten days' travels North-east of Calcutta resides the family of the most ancient and opulent of the Hindu princes of Bengal. Raja Ramkant of the race of Brahmins, who deceased in the year 1748,

802

ভবানী যে সকল পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, একালের লোকের পক্ষে তাহার মর্য্যাদা নির্ণয় করা সহজ নহে। একালে টাকা থাকিলে যাহা সম্ভব হয়, সেকালে টাকা থাকিলেই তাহা সম্ভব হইত না। দেশে পথ ঘাট ছিল না, লোকে দস্যুতস্করের ভয়ে সযত্নসঞ্চিত ধনরত্ন মৃত্তিকাগর্ভে বা ভস্মস্তূপে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হইত; সর্ব্বত্র বাহুবলের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সুতরাং জমীদারদিগকে বাহুবলে রাজ্যরক্ষা করিতে হইত, বিচারবলে দুষ্টের দমন করিতে হইত, শাসনকৌশলে শান্তি সংস্থাপন করিতে হইত; এবং এই সকল দুরূহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে না পারিলে, কেহই দেশে দেশে পুণ্য-কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর লাভ করিতেন না। বর্গীর হাঙ্গামার দেশের মধ্যে তুমুল কোলাহল ও দীর্ঘস্থায়িন অরাজকতা উপস্থিত হইয়া, এই দুষ্কর ব্রত আরও দুষ্কর করিয়া তুলিয়াছিল। রাণী ভবানী সেই ব্রত যেরূপ সুকৌশলে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া ইতিহাস-লেখকমাত্রেই তাঁহাকে অজস্র সাধুবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।* রাণী ভবানীর জীবনকাহিনী আমাদের দেশের অর্দ্ধশতাব্দীর সুখদুঃখের বিস্তৃত কাহিনীর সঙ্গে এরূপ ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, সমসাময়িক ইতিহাসের আলোচনা না করিলে, তাঁহার জীবনকাহিনীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার উপায় নাই। এখন আর সেদিন নাই! এখন আমরা পরাধীন; অন্নবস্ত্রের জন্য, শিক্ষাদীক্ষার জন্য, সুবিচার সুশাসনের জন্য, দেশের উন্নতি অবনতির জন্য, সকল বিষয়ের জন্যই পরমুখাপেক্ষী। রাণী ভবানীর সময়ে যদিও মুসলমান এ দেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিতেন, তথাপি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশ

---

was succeeded by his wife, a princess named Bhobanee Ranee, whose Dewan or minister was Dayaram of the Teely caste or tribe; they possess a tract of country about thirty-five days' travel and under a settled Government; their stipulated annual rent to the Crown was seventy lakhs of sicca Rupees, the real revenues about one krore and a half"—Holwell.

* She was the most celebrated personage in the whole family and her administration of the Raj, during the last half of the last century, was memorable. ... ... Maharani Bhabhani was pious, liberal and actively benevolent. She was not slow in performing the duties of her station, as she understood them according to the lights of her age and country.—The Rajas of Rajshahi.

জমীদারদিগেরই শাসনাধীন ছিল। সে শাসনকার্য্যে নবাবের মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না, কিংবা প্রত্যেক শাসনকার্য্যেই ভয়ে ভয়ে পদসঞ্চালন করিতে হইত না। প্রতিভাশালিনী রাণী ভবানী সেই জন্য স্বাধীন শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার লাভ করিয়া আত্মগৌরবে বাঙ্গালী জাতিকেও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলে, বাঙ্গালী কত সহজে, কত অল্পব্যয়ে, কিরূপ সুকৌশলে রাজ্যশাসন করিয়া প্রজাপুঞ্জের সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতে সক্ষম, রাণী ভবানীর জীবনকাহিনীই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

আলিবর্দ্দী সামান্য অবস্থা হইতে প্রতিভা ও বাহুবলে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি সে সময়ে সরফরাজের সিংহাসনে আরোহণ না করিতেন, তবে যে মহারাষ্ট্র লুণ্ঠনে এদেশের কত না দুর্গতি হইত, তাহা অনেকেই দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পরবর্ত্তী ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরাও সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন! * আলিবর্দ্দী বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল বাহুবলে অথবা সংগ্রামকৌশলে মহারাষ্ট্র সেনার নিষ্ঠুর নির্য্যাতন হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা অসম্ভব; সেই জন্য তিনি সমুদায় জমীদারদিগের সহিত মিলিত হইয়া, কখন বাহুবলে, কখন মন্ত্রণাকৌশলে, কখন বা শাসনগুণে দেশরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই জন্য নবাবের সঙ্গে জমীদারদিগের এবং জমীদারদিগের সঙ্গে নবাবের যে স্বাভাবিক স্নেহবন্ধন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতেই আলিবর্দ্দীর সিংহাসন তুমুল সংঘর্ষের মধ্যেও অটল হইয়া রহিল! সেই সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য জমীদারদল সেনাসাহায্য করিয়া, অর্থসাহায্য করিয়া, কেহ কেহ বা যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও আলিবর্দ্দীর পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, রাজসাহী-রাজ্যের অধীশ্বরীকে এই কার্য্যে বিশেষভাবে নবাবের সহায়তা-সাধন করিতে হইত। তজ্জন্য নবাব-দরবারে রাণী ভবানীর নাম বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিল।

আলিবর্দ্দীর পুত্রসন্তান ছিল না;—তিনটি মাত্র কন্যা। তিনি ভ্রাতা হাজি আহ্‌মদের তিন পুত্র—নওয়াজেস্ মোহম্মদ, সাইয়েদ আহম্মদ এবং জয়েনউদ্দীনের সঙ্গে আপন কন্যাত্রয়ের বিবাহ দিয়া, নওয়াজেস্‌কে ঢাকার, সাইয়েদকে পূর্ণিয়ার এবং জয়েনউদ্দীনকে পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন;

* Mill's History of British India, Vol. III.